পুরুলিয়া

তরুণদেব ভট্টাচার্য

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

প্রকাশক
ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীও. সি. গাঙ্গুলী

মুদ্রক
শক্তি রঞ্জন মিশ্র
ইউনাইটেড প্রিণ্টার্স
৩০২/২/এইচ/৫, এ. পি. সি. রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

১৫. মানবাজার রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো, বিগ্রহহীন, কলাবৌ।

১৬. মানচিত্র

(ক) পুরুলিয়া জেলা

(খ) ভূমধ্যস্থ অঞ্চল

সৌজন্য স্বীকার

ছবি—৩, ৪—অনাথ মোহান্ত, রঘুনাথপুর।

৭—অজিত মিত্র, পুরুলিয়া সহর।

৮—হরিহর সিংহদেব, চাকলতোড়।

১১—চিত্তরঞ্জন দত্ত, পুরুলিয়া সহর।

১২—তারকেশ চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়া সহর।

১৩—Chota Nagpore: A little-known province of the Empire by F. B. BRADLEY-BIRT.

১৪—জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্র, পুরুলিয়া।

১৫—দেবাশীষ নারায়ণ দেব, মানবাজার।

পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ও পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গ দর্শন গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ড পুরুলিয়া। প্রথম দুটি খণ্ড মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া সময়ের যে ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছিল, পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে সে সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের তাগাদা ছিল নিরবচ্ছিন্ন। লেখক ও প্রকাশকেরও প্রচেষ্টার কমতি ছিল না। তবু গ্রন্থটি কেন যথাসময়ে প্রকাশিত হয়নি, পাঠক নিশ্চয়ই জানতে চাইতে পারেন। বিলম্বের প্রধান কারণ দুটি। এক, পুরুলিয়া বিষয়ে তথ্যাদির স্বল্পতা; দুই, জেলার প্রত্যন্ত প্রদেশে যাতায়াতের দুরধিগম্যতা।

বিহার ও উড়িষ্যা, দুই দিকে দুই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও জনজীবনের ধারার মধ্যে প্রাক্তন মানভূম জেলা ছিল মধ্যবর্তী অঞ্চলের মত। বাংলা চিরকাল সমন্বয়ের ক্ষেত্র তৈরি করে এসেছে। এক্ষেত্রেও বাংলার সঙ্গে ছিল তার আত্মিক যোগ। মুঘল আমলের চাকলা বা ব্রিটিশ শাসনের জেলা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ছিল নিতান্ত কৃত্রিম বিভাগ। কৃত্রিম হলেও দৈনন্দিন জীবনে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় চৌহদ্দির উপযোগিতা উপেক্ষনীয় ছিল না। জনজীবনের মূলধারা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছিল। কৃত্রিম বিভাগের প্রভাব সেখানে ছিল পরোক্ষ।

মানভূম জেলার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে ছোট বড় পাঁচটি রাজ্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল ঐতিহাসিককালের বিভিন্ন পর্যায়ে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও পরিচিত ছিল শিখরভূম রাজ্য। পার্শ্বনাথ পর্বত বা পরেশনাথ পাহাড়টিকে ঘিরে উদ্ভূত হয়েছিল রাজ্যটি। অধিবাসীরা ছিলেন বেশিরভাগ জৈন ধর্মাবলম্বী। রাষ্ট্রীয় ধর্মও ছিল জৈন। যীশুখ্রীস্টের জন্মের তিন কি চারশো বছর আগে রাজ্যটির উদ্ভবকাল হওয়া অসম্ভব নয়। দামোদর নদের উত্তর তীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল পরিসীমা। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় দুর্বল হয়ে পড়েছিল রাজ্যটি, দামোদর পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। শেরগড় বা চৌরাশি পরগণা ঘিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। মানভূম জেলায় জৈনধর্মের ঐতিহ্য সেই সময় থেকে প্রোথিত হয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে মানভূম জেলার দক্ষিণাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জড়িয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। নাম, বরাহভূম রাজ্য। চাণ্ডিল, জৈদা, পলমা, বরাহভূম ও পাতকুমে পাওয়া ঐতিহাসিক বস্তু-সমূহ নির্দেশ করে রাজ্যটির শাসকবংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে শৈব। ক্ষুদ্র হলেও রাজ্যটি টিঁকে ছিল বহুদিন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল।

পাল আমলের সমসাময়িককালে দামোদরের তীরে আর একটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত প্রাচীন শিখরভূম রাজ্যের ধ্বংসের ওপর গড়ে উঠেছিল সেটির কাঠামো। নাম, তৈলকম্প রাজ্য। এটিও ছিল ধর্মে শৈব। পাঁচেট জলাধারে নিমজ্জিত যেসব মন্দিরগুলির হদিস পাওয়া যায় ও জে. ডি. বেগলার ভ্রমণ বিবরণে যেসব মন্দির ও বিগ্রহ রিপোর্ট করেছিলেন তাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত। হয়ত তৈলকম্প রাজ্যটির গৌরবময় কালে শিখরভূম থেকে একটু একটু করে জৈন প্রভাব অন্তর্হিত হয়েছিল। মন্দির, তীর্থঙ্করদের অজস্র মূর্তি ও শরাকদের জীবনযাত্রার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তার অন্তিম রেশটুকু।

তৈলকম্প রাজ্যের পরিসীমার মধ্যে পরবর্তীকালে উদ্ভূত হয়েছিল পাঁচেট বা পঞ্চকোট রাজ্যটি। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উপজাতিরা। তাদের পাঁচটি খুঁট বা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে রাজ্যটির বিকাশ সূচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে পঞ্চখুঁট রূপান্তরিত হয়েছিল পঞ্চকোটে। অধিপতি হয়েছিলেন পাঁচটি অদ্রি বা পর্বতের। শিলালেখে পঞ্চাদ্রিশ্বর।

ইংরেজ আমলে বিগত-বৈভব পঞ্চকোট রাজ্য পরিণত হয়েছিল কাশীপুর জমিদারীতে। ব্রিটিশ শাসনের মধ্যপর্বে কাশীপুরের জমিদার নীলমণি সিংহদেব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন মহাবিদ্রোহে। সাঁওতাল উপজাতিবৃন্দ তার নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনের সুরু থেকে জঙ্গল সর্দারেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে চলেছিলেন। বার বার বিধ্বস্ত হয়েছিল ইসট ইন্ডিয়া কোমপানির প্রেরিত বাহিনী। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে সংগঠিত হয়ে চলেছিল সেই প্রতিরোধ। প্রতিরোধের তীব্রতায় কখনও কখনও কেঁপে উঠত ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল। মহফেজখানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রেকর্ড ছাড়া অরণ্য সন্তানদের সেই সাহসিকতা ও স্বাধীনতা রক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টা উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হয়নি। গ্রথিত হয়নি ভারতীয় জাতীয় ইতিহাসের মূলধারার অঙ্গ হিসাবে।

রাজ্য ও রাজবংশগুলির উদ্ভব ও বিকাশ, অরণ্য সন্তানদের প্রতিরোধ সংগ্রাম বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। রাজ-বংশগুলির সঙ্গে বিজড়িত জনগোষ্ঠী মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলার বসতি বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করে আছে। উপজাতিগুলির সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ গড়ে তুলেছে বর্তমান জনসমাজ। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতিনীতি বৎসরব্যাপী উৎসব ও পালপার্বনের মধ্যে নিহিত হয়ে আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লুপ্তপ্রায় অবশেষ। পুরুলিয়ার জনজীবন বহু-বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মিলনমিশ্রণে উদ্ভূত একটি বর্ণাঢ্য জাজিম।

পুরুলিয়ায় ঘোরার সময় যারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিলেন এবং বহু তথ্যাদি, বইপত্র ও ডকুমেনট সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় বন্ধুবর শ্রীঅজিত মিত্রের। তার কাছে ঋণ শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরিশোধ হবার নয়। যে দুজন মহাপ্রাণ গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন, ৺অশোক চৌধুরী ও ৺ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তারা আর ইহজগতে নেই। সকৃতজ্ঞ চিত্তে ও ভারাক্রান্ত মনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার তার অমূল্য সময় নষ্ট করে কয়েকটি শিলালিপি পাঠ করে দিয়ে-ছিলেন, তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তার স্মৃতির প্রতিও জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের মা, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও শ্রীঅরুণ ঘোষ, জেলার একদা প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক শ্রীসন্তোষ রায়, সাংবাদিক শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন—তাদের সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীছবীন্দ্র রায়, শ্রী জ্যোৎস্না কর্মকার, শ্রীদেবাশীষ নারায়ণ দেব, শ্রীমতী তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়, বিভিন্ন সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন, নোট নিয়েছেন, তাদেরও জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। শ্রীপ্রবীর মল্লিক, শ্রীঅমূল্য কর্মকার, শ্রীসুনীত পাঠক—এরাও নানাভাবে সাহায্য করেছেন—এদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। নানা বিষয়ে যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে গ্রন্থে। কাজ সুরুর প্রথম দিকে পুরুলিয়া জেলার তৎকালীন এস. ও. পি. ডি. শ্রীঅশোককুমার বালা, রঘুনাথপুরের শ্রীঅনাথ মোহান্ত ও ঝালদার প্রাক্তন বি ডি. ও শ্রীসুশীত কুমার বিশ্বাসকেও এই অবকাশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীও. সি. গাঙ্গুলী তার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

মুদ্রণ প্রমাদ সম্ভবত বাংলা অক্ষর উদ্ভাবনের মতই প্রাচীন। শত চেষ্টা সত্ত্বেও অজস্র ভুল বইটির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেগুলির মধ্যে যেসব গুরুতর, পাঠকদের সুবিধার জন্য উল্লেখ করা হল। সহৃদয় পাঠক যদি ভুলগুলি মেরামত করে নেন, লেখক কিছুটা স্বস্তি পাবেন। যেমন, পৃষ্ঠা ১৯, ৪১, ৪৭, ৬৪, ৮৬, ৮৯, ৯৬, ১০২ যথাক্রমে 'পুণ্ড'র জায়গায় হবে পুণ্ড্র, বাসনের পরিবর্তে বানসা, Couplund-এর বদলে Coupland, কর্ণেল গউনের বদলে কর্ণেল গর্ডন, 'বদলে গিয়েছিলেন'-এর পরিবর্তে 'বদলে নিয়েছিলেন', বস্তু ভূমির স্থলে বাস্তু জমি, র‍্যাপসরের বদলে র‍্যাপসনের তৈলকল্প-এর পরিবর্তে তৈলকম্প ইত্যাদি। অনুরূপ সংশোধন প্রয়োজন ১১৮ পৃষ্ঠায় গঙ্গানারায়ণপুরের বদলে গঙ্গারামপুর, ১৯১ পৃষ্ঠায় চ'-এর বদলে 'ট', ২৪৩, ২৫৭, ২৮৩, ৩৩৮ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে গণনার মিশনের বদলে গশনার মিশন, করবের বদলে করম, শিল্পিশ্রমের জায়গায় শিল্পাশ্রম এবং পিল্পের বদলে শিল্প।

যে কোন জেলার জনজীবনের স্রোতটি বাংলার মূল জনজীবনের ধারার একটি অংশমাত্র। জনজীবনের বহুবিচিত্র ধারার মধ্যে নিহিত আছে নানাদিক। তথ্য, ঘটনা বা এমন কোন সংবাদ যদি বাদ পড়ে থাকে যা বইটির ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল বা কোন ভুলচুক যদি দৃষ্টিগোচর হয়, পাঠক সাধারণের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন লেখক বা প্রকাশকের ঠিকানায় জানিয়ে দেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেসব সাদরে গৃহীত হবে।

মুর এভেনিউ হাউসিং এসটেট
ব্লক-এল, ফ্ল্যাট—২
কলকাতা-৭০০ ০৪০

তরুণদেব ভট্টাচার্য

১। পাকবিড়রার ধ্বংসক্ষেত্র। পুনর্নির্মিত মন্দির

২। দেউলঘাটে (বোড়াম) তিনটি মন্দির

৩। দামোদরের গর্ভে নিমজ্জিত তেলকুপির মন্দির
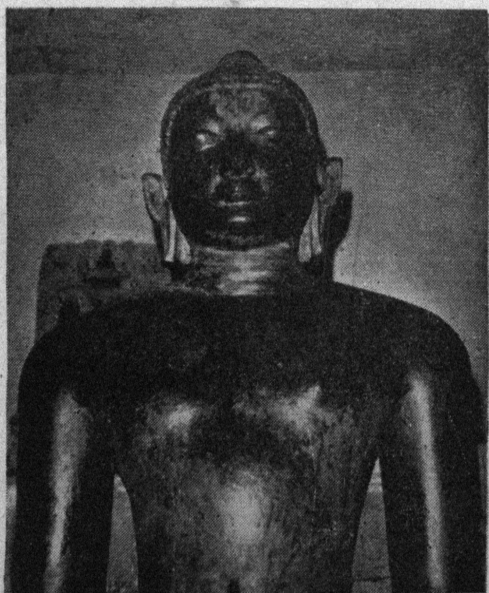
৪। পাকবিড়রায় ভীরম
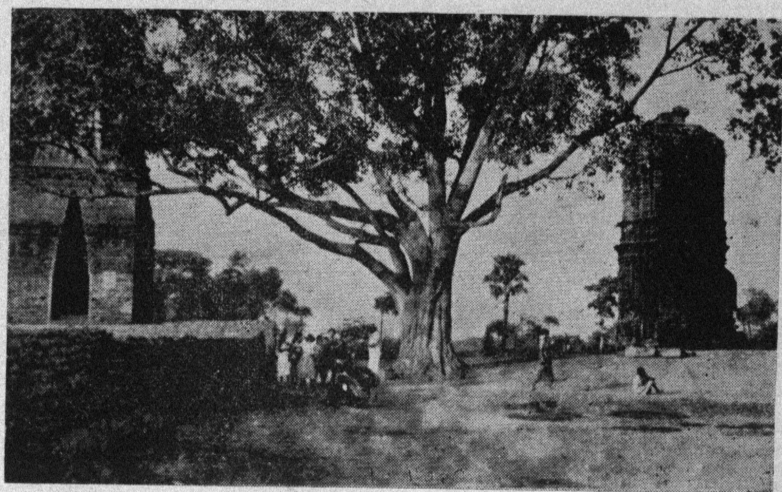
৫। পাড়ার দুটি মন্দির

৬। বাঁধনা পরবের শোভাযাত্রা, পুরুলিয়া সহর

৭। পুরুলিয়ার চার্চে রক্ষিত রেজিস্টারের একপাতা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত গড-ফাদার, ১৮৭২
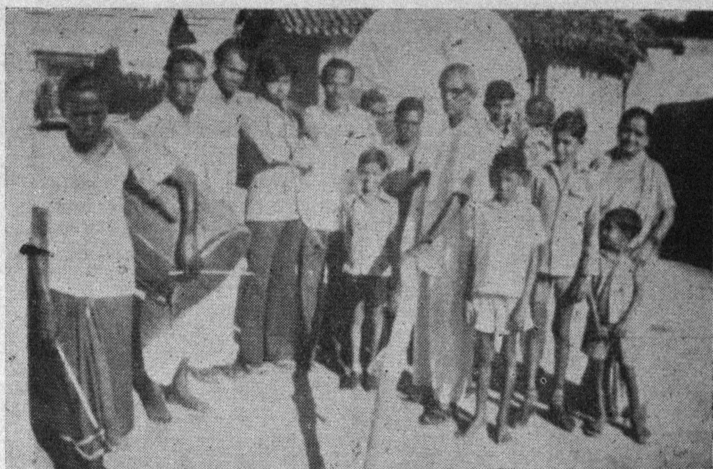
৮। ছাতা পরবের প্রারম্ভ (শোভাযাত্রার সূচনা), চাকলতোড়

৯। মানবাজার মাঝ-পাড়ায় রক্ষিত ধর্মঠাকুর

১০। বরাবাজার রাজবাড়ির অস্ত্রশস্ত্র ও রাজছত্র
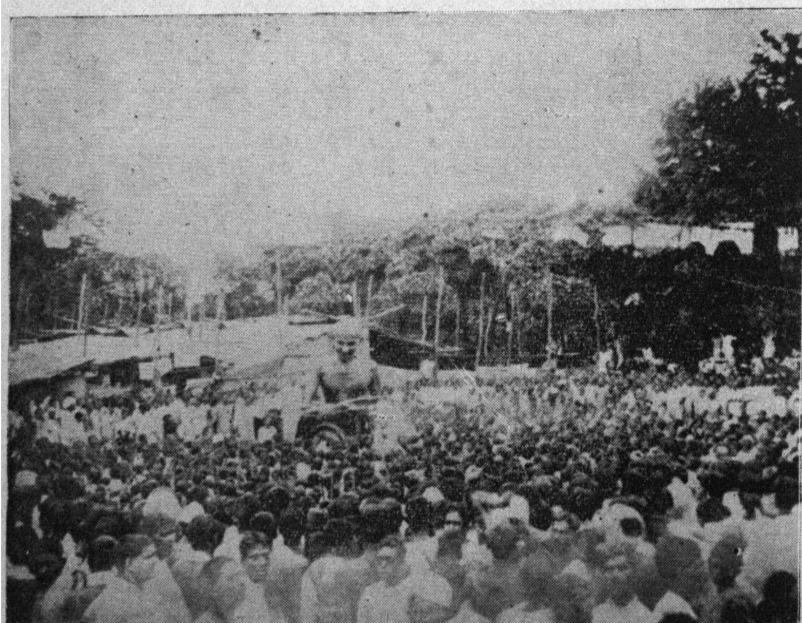
১১। পুরুলিয়ায় গান্ধীজী, ১৯২৫

১২। পুরুলিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩৯

১৩। পুলিসের বেষ্টনীতে বীরসা মুণ্ডোর কয়েকজন সহযোদ্ধা
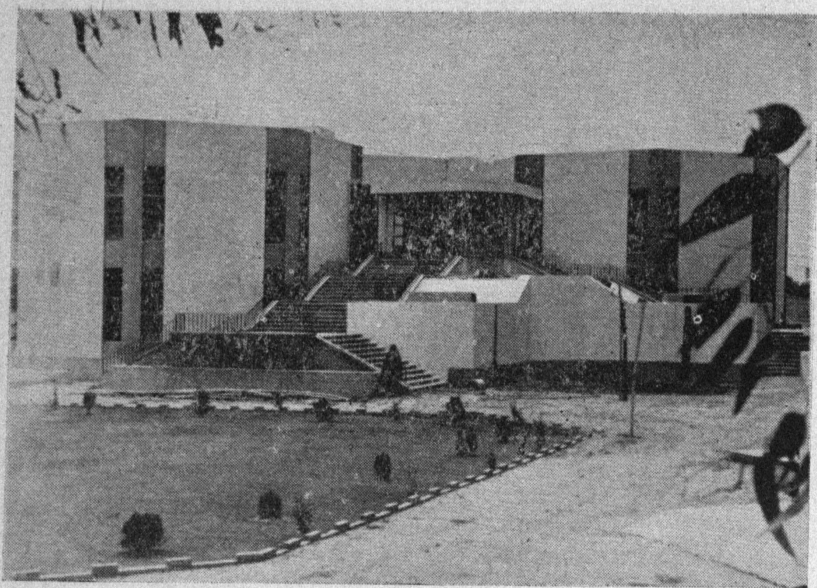
১৪। জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্র, পুরুলিয়া

১৫। মানবাজার রাজবাড়িতে দুর্গাপূজা,
বিগ্রহহীন, কলাবৌ

ভূমযুক্ত অঞ্চল
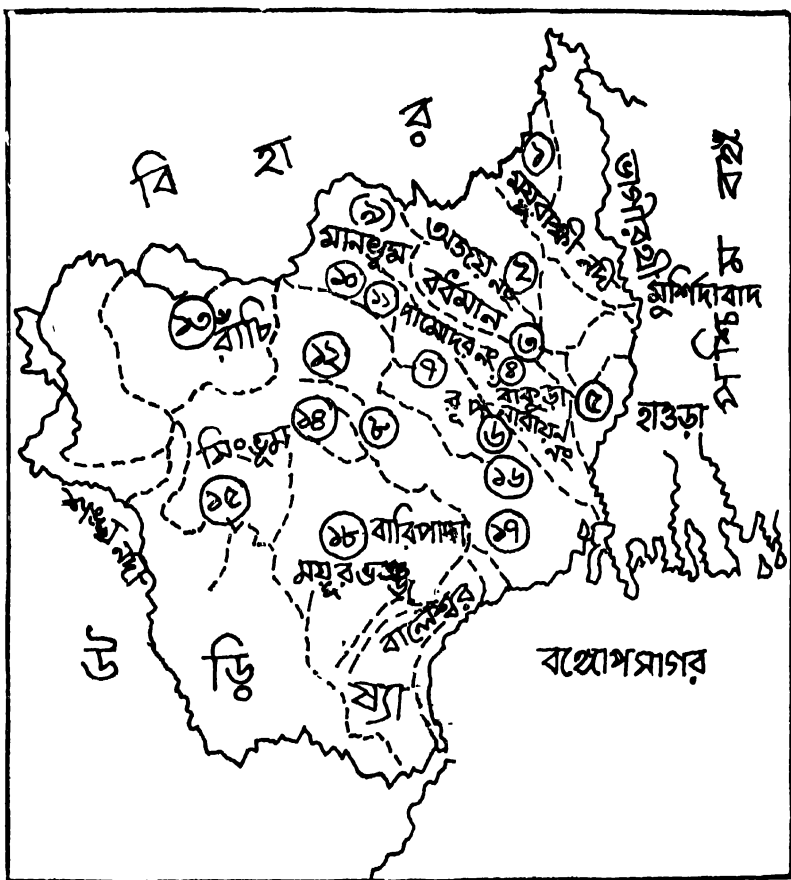
ভূময়ুক্ত অঞ্চল

স্কেল ১" = ৩২ মাইল

১. বীরভূম	২. সেনভূম	৩. গোপভূম	৪. শূরভূম
৫. ভাওয়ালভূম	৬. সামন্তভূম	৭. মল্লভূম	৮. তুঙ্গভূম
৯. শিখরভূম	১০. আদিত্যভূম	১১. মানভূম	১২. বরাহভূম
১৩. নাগভূম	১৪. ধলভূম	১৫. সিংভূম	১৬. ব্রাহ্মণভূম
১৭. বাগভূম	১৮. ভঞ্জভূম		

পুরুল্যে

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে ?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আকাশে অগ্নিবলয়। পলাশের ফুলে আগুনের ছোঁয়া। তামাটে লাল রঙ ধরেছিল কুসুমের পাতা। যে গ্রীষ্ম নিদারুণ উত্তাপে সমস্ত জেলাটাকে বহ্নিব্যূহ করে তোলে, আকাশ বাতাস মাটি ও পাথরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়েছিল তার রেশ। আগুন মাটি, বাতাসে আগুনের হল্কা।

নদীগুলোর খাত শুকনো। সুতোর মত সরু জলের ধারা। বুক জুড়ে পাথরের বড় বড় চাঙড়া, মোটা দানার হলদেটে বালি। তীরের দুদিকে সার বেঁধে চলেছে গড় মন্দির ও পুরনো বসতির বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। পুরুলিয়া পুরাভূমির অন্তর্গত।

পুরাভূমির মাটি রুক্ষ, পাথুরে। গাঙ্গেয় বাংলার মাটির মত পলি দিয়ে গড়া নয়। নরমও নয়। ভেতরে যা জমে আছে, ধুয়ে ধুয়ে কিছুটা সরে গেলেও, একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। ফলে ভূগর্ভের স্তরে স্তরে নিহিত হয়ে আছে আদিম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত অগণিত মানুষের বসবাসের নানা চিহ্ন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের হাতিয়ার, তামার কুঠার, মুদ্রা, মূর্ত্তি ও অপরূপ ভাস্কর্যের অসংখ্য নিদর্শন। নানা জনগোষ্ঠীর আগমন ও নিষ্ক্রমণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জীবন ও জীবিকার স্বরূপ ও পরিচয়।

পরিকল্পিত উৎখননের মাধ্যমে সে ইতিহাস আজও সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পুকুর খুঁড়তে, বাঁধ কাটতে বা পতিত জমিতে লাঙল দিতে গিয়ে যখন হঠাৎ কোন নিদর্শন উঠে আসে, বিস্মিত হয়ে যান গ্রামের মানুষ। মাটির ভাঁড়ে, এমন যত্নে কে পুঁতে রেখেছিল এত মুদ্রা! তামার পাতে হিজি-বিজি আঁচড় কেটে কি লেখা রয়েছে এসব। হাতখানা ভেঙ্গে গেল, তবু লাঙলের ফালে কার মূর্ত্তি উঠে এল, কোন দেবতা ইনি!

গাছের নিচে কি ষোল আনার চালাঘরে সাজিয়ে রাখেন সেসব। নিজেদের মত করে নামকরণ করেন। কেউ গেলে হয়ত ঋষভনাথের লাঞ্ছন দেখিয়ে বলেন,

—হেই, বাবার নন্দী দেখেন।

পার্শ্বনাথের সাপ দেখিয়ে বলেন,

—হাই, ফ্যাচট দেখেন বটে।

মহাবীরকে দেখিয়ে বলেন,

—বাবা বাঘাহুট বঙ্গা।

বৈপরীত্যের সমন্বয়ভূমি পুরুলিয়া। উত্তরে দিগন্তজোড়া ধানের ক্ষেত। সমতলবঙ্গের একটা টুকরা যেন কেটে বসানো। তারই ভেতর মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পাথরের টিলা। স্থানীয় ভাষায় ডুংরি। সবচেয়ে বড় ডুংরিটার নাম পাঁচেট পাহাড়। উন্নত, দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ। পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে ভূপৃষ্ঠ ঢেউখেলানো। টাঁড়টিলা ও ছাড়া ছাড়া জঙ্গলে সমাকীর্ণ। ছোটনাগপুরের মালভূমির বৈশিষ্ট্যমাখানো। এদিকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্বতশ্রেণী বাগমুণ্ডি বা অযোধ্যাপাহাড়।

আদিম যুগে অশান্ত ছিল পৃথিবী। তার বুকের ভেতর তপ্ত তরঙ্গের যে টানাপোড়েন চলত তাতে ভূকম্পনের অন্ত ছিল না। ভেতরের কঠিন শিলাস্তর যেমন মোচড় খেয়ে ওপরে উঠে আসত, তেমনি বসে যেত কোথাও। ছোটনাগপুরের সমগ্র মালভূমি জুড়ে ভূপৃষ্ঠের ওলোটপালটের নানা চিহ্ন বিদ্যমান। পশ্চিমে রাঁচির দিকে উত্তুংগ অধিত্যকা, পূর্বদিকে গড়াতে গড়াতে মেদিনীপুরের সমতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। ফাঁকে ফাঁকে, ছাড়া ছাড়া শৈলশ্রেণী। পশ্চিম থেকে পূবে ছুটতে গিয়ে যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে অবস্থায় আজও স্থির।

গ্রীষ্মে এখানকার চেহারা হয়ে ওঠে ভয়ংকর। দিগন্তজোড়া প্রান্তর রুক্ষ, অগ্নিময়। গাছপালা শুকিয়ে বিবর্ণ, জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। মাটির ওপর আঁকাবাঁকা সরু চিড়গুলো খাদানের মত চওড়া ও গভীর হয়ে ওঠে। কাজ থাকে না কোথাও। গ্রামে গ্রামে উপবাস শুরু হয়। উত্তাপের সংগে অনাহার, রুক্ষতার সংগে কর্মহীনতা, তিল তিল করে শুষে নেয় জীবন, জীবনের আনন্দ ও প্রাণশক্তি।

আষাঢ় মাসের প্রথম বর্ষণে সুরু হয় ব্যস্ততা। চাষের উদ্যোগ চলে। চাষ এখানে সহজসাধ্য নয়। বার বার লাঙল চালিয়ে তৈরি করে নিতে হয় মাটি। লোকে বলে,

বারো মাস, তেরো চাষ
তবে ক'রো, গোরা আশ।

গোরা, অর্থাৎ উঁচু বা টাঁড় জমির ধান।

সঙ্গে চলে গ্রাম ছাড়ার প্রস্তুতি। দলে দলে, কাতারে কাতারে চলে অবিচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ মিছিল—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান, হুগলী হাওড়া ও চব্বিশ পরগণায়।

দেখতে দেখতে ঘন ঘোর বর্ষা নামে। উন্মনা হয়ে ওঠে গৃহবধূদের মন। ক্লান্ত, উদাস কণ্ঠে গ্রামে গ্রামে শোনা যায়,

পড়লি ভাদর মাস
পিয়া পরদেশে
পি কত দূরো ডাকে রহি হাম কাছে
ও মন রহলি উদাসে গো
মদন প্রকাশে।

দ্বিতীয় বৈপরীত্য মাটির সঙ্গে জড়ানো দুঃসহ দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধ ধ্বংসস্তূপ। বর্ণহিন্দু ও আদিবাসী উপজাতি কোমগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান জনবসতি। তারা কেউ এখানকার ইতস্তত পরিকীর্ণ ধ্বংসক্ষেত্রের জনক নন। কারা গড়ে তুলেছিলেন কারুকার্যমণ্ডিত, ব্যয়বহুল, সুশোভন সব মন্দির ও প্রাসাদ, তাদের সম্পদের উৎস কি ছিল, রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও একদা ঐশ্বর্যের যে বিপুল নিদর্শন, জীর্ণ ও ভগ্নদশায় আজও প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে, প্রান্তে ও উপান্তে ছড়ানো, তা কি কোন বিলুপ্ত শাসকশ্রেণীর ঐতিহ্য বহন করছে, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের? ভ্রাম্যমান বণিকদলের? না এখানকারই একদা কোন সমৃদ্ধ ও রুচিশীল অধিবাসীবৃন্দের? পুরুলিয়ার গ্রামের পথ ধরে চোখ খুলে হাঁটতে গেলেই এমন অনেক প্রশ্ন ভিড় করে মনে আসে।

জেলায় কৃষিক্ষেত্র উর্বর নয়, পরিমাণেও স্বল্প। অধিবাসীদের সারা বছরের খোরাক জোগাতে অকুলান হয়ে পড়ে। অরণ্য নির্মূল। নির্মূল হবার অনেক আগে থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসন অরণ্যের অধিকার অধিবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। জনসমাজের এক বিরাট অংশ হয়ে পড়েছিল ছিন্নমূল। জীবিকায় নিরাশ্রয়। পুরুলিয়া জেলার পূর্বসূরী মানভূম হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুলি যোগানোর প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। অরণ্যের অধিকার আজও ফিরে আসেনি। জীবিকায় স্থিত হননি জেলার বৃহত্তর জনসমাজ। দারিদ্র্যের রূপ এখানে ভয়াবহ, নিষ্ঠুর ও মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা বিলোপকারী।

তবু তারই মধ্যে অধিবাসীদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি বিস্ময় উদ্রেক করে। দু'বেলাও নয় একবেলার মত পেটপুরে খাবার সংস্থান হলেই প্রাণে আনন্দের বান ডেকে যায়। গ্রামে গ্রামে বেজে ওঠে মাদল আর ধামসা। শোনা যায় গান,

কালো ছুঁড়া মাদল বাজাচ্ছে
সে ত আগাছে আর পেছাছে।

বৈপরীত্যের তৃতীয় বিস্ময় নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুরন্ত প্রাণশক্তির সহাবস্থান। জীবনের এই দুর্দমনীয় তেজ ও শক্তির উৎস কি? সে কি এখানকার মাটি, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান? নাকি, দারিদ্র্য নিষ্পেষিত প্রাণ বেঁচে থাকার অভিলাষে দ্বিগুণিত হয়ে উঠেছে? অথবা, প্রকৃতি ও অরণ্যের কোলে সুদীর্ঘকাল ধরে লালিত সন্তানেরা প্রকৃতির কাছ থেকে যে তেজ ও শক্তি একদা আহরণ করেছিলেন, সময়শাসিত ক্ষয় ও অবক্ষয়ের স্রোতের মধ্যেও তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

পুরুলিয়ার তিন দিক ঘিরে আছে বিহার রাজ্যের চারটি জেলা। উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে ধানবাদ ও হাজারিবাগ, পশ্চিমে রাঁচি, দক্ষিণপশ্চিমে সিংভুম। পুবের দরজা হাট করে খোলা বাংলার দিকে। উত্তরপূর্বে বর্ধমান, পুবের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাঁকুড়া জেলার সীমানা, দক্ষিণপূর্বে মেদিনীপুর।

বর্ধমান ভুক্তি বা ডিভিশনের পশ্চিম-সীমান্তের শেষ জেলা পুরুলিয়া। মানভূম জেলার অংশ কেটে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে। মানভূম ছিল ছোটনাগপুর ভুক্তির অন্তর্গত। বিহার রাজ্যের অন্যতম খনিজ সমৃদ্ধ জেলা। বিহার রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে। ধানবাদ মহকুমা ছিল খনিজ ঐশ্বর্যের প্রধান উৎস। পুরুলিয়া যখন বাংলায় এল, ধানবাদ চলে গেল বিহারে। মানভূমের সদর মহকুমা পুরুলিয়া, যেমন পশ্চিম বাংলায় এসে জেলা হয়ে উঠল, ধানবাদও তেমনি জেলা হয়ে গেল বিহারে।

মানভূমের দুই সন্তান বিছিন্ন হয়ে গেল। বাংলার মানচিত্রে মানভূম ছিল প্রায় আটাত্তর বছর, বিহারের মানচিত্রে চুয়াল্লিশ বছর। উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে পশ্চিমবাংলা ও বিহারের যে নতুন মানচিত্র আঁকা হল, তাতে কোথাও লেখা হলনা মানভূম নাম। ভারতের বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল পুরানো জেলাটা।

তবু মানভূমকে জড়িয়ে বাংলা ও বিহারের যে সমন্বয় ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, তাকে বাদ দিয়ে পুরুলিয়া জেলার আলোচনা যেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায়,

তেমনি অসম্পূর্ণ থেকে যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চলের আলোচনা। তাই পুরুলিয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে যতবার মানভূমের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে, তা অধুনালুপ্ত মানভূম জেলার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইংগিত করেছে।

মানভূম জেলার দুই মহকুমার বিচ্ছিন্নকরণ আজও পুরুলিয়ার মানুষ খোলা মনে মেনে নিতে পারেন নি। প্রসঙ্গ উঠলেই দুঃখ করে বলেন,

মানভূম্যের মানট থাকল নাই, গেল হই বিহারকে। টুকচু ভুম থাকলি ন বাংলায়।

মান মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল

অঙ্গ বঙ্গা মুদ্‌গরকাঃ অন্তর্গিরিবহির্গিরি।
তথা প্রবঙ্গ—বাঙ্গেয়া মানদা মানবর্ত্তিকাঃ ॥[১]

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ

হাজারিবাগ জেলায় দুধপানি পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সংস্কৃত পদ্যে একটি লিপি খোদাই করা আছে। লিপিটি ছোট গল্পের মত। উদয়মান, ধৌতমান ও অজিতমান, তিনভাই এক সময় অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্তে গিয়েছিলেন বাণিজ্য করতে।[২] বাণিজ্যে অনেক ধনসম্পত্তি উপার্জিত হয়েছিল। ফিরে চলেছিলেন দেশে। পথে ভ্রমরশাল্মলি নামে গ্রামে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মগধের রাজা আদিসিংহ তখন হাতি শিকারে বেরিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের কাছে তিনি অভলগক বা অভলগন নামে জিনিষ চেয়েছিলেন। জিনিষটি কি, বুঝতে পারছিলেন না গ্রামবাসীরা। উদয়মান সেটি এনে দিলে খুশী হয়ে উঠেছিলেন রাজা। উদয়মানকে সেই অঞ্চলে একটি গ্রাম দান করেছিলেন। গ্রামবাসীরাও সানন্দে তাকে তাদের রাজা বলে মেনে নিয়েছিলেন।[৩] অপর দুই ভাইকেও দুটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল।

উদয়মানের বংশধরেরা কাহিনীটা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়ে

---

১. অঙ্গ—পূর্ব বিহার। বঙ্গ—দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ। মুদ্‌গরকা—বর্তমান মুঙ্গের, উৎকীর্ণ লিপিতে মোদাগিরি।
কোন কোন পুরাণে শেষ শব্দ দুটি আছে 'মলদা মল্লবর্তকা।' ড. ডি. সি. সরকার অনুমান করেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের শেষ শব্দ দুটি প্রক্ষিপ্ত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মান রাজাদের রাজ্য মানভূম, সিংভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ছিল। আরও স্মরণীয়, অধুনালুপ্ত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে মানদা নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে এবং সেখান থেকে রাস্তা তৈরির সময় বহু প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। দ্রষ্টব্য, History of Orissa, vol-I, R. D. Banerji, pp. 34-35.

২. অথ কাস্মিশ্চি (শ্চ) ময়ে বাণিজ্যে ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তাম্রলিপ্ত (ম) যোধ্যায়া যযু পূর্ব্বস্বনিশ্চয়া ॥—Dudhpani Rock Inscription of Udayamāna by Prof. F. Kielhorn, Epigraphia Indica, vol-II, pp. 343-47.

৩. দ্রষ্টব্য ২।

রেখেছিলেন। ড. কীলহর্ণের মতে খোদাই করা হয়েছিল আট শতকে। যদিও ঘটনাটা ঘটেছিল আরও অনেক আগে।

চারশো বছর পরেও যে মানবংশের বিলুপ্তি ঘটেনি, আর একটা পাথরের লিপিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটা পাওয়া গিয়েছিল গয়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। নওয়াদা মহকুমার ভেতর গোবিন্দপুর ছোট গ্রাম। লিপিটা ছিল নরসিংহ মালির বাড়ি। কানিংহাম সাহেব রাবিং সংগ্রহ ক'রে ড. ফ্লিটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। পাঠোদ্ধারের জন্য ড. ফ্লিট পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক কীলহর্ণের কাছে।[৪]

লিপি ভাষা ছিল সংস্কৃত। অক্ষর অদ্ভুত ধরণের মাগধী। লিপিকাল ১০৫৯ শক বা ১১৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। রচয়িতা ছিলেন কবি গঙ্গাধর। আরও ছ'জন মগ ব্রাহ্মণ কবির কথা লিপিটাতে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাদের হদিস পাওয়া যায় 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে। ড. কীলহর্ণ সদুক্তি কর্ণামৃতের শ্রীধর দাসের সঙ্গে গঙ্গাধরকে সনাক্ত করেছিলেন।

গঙ্গাধর ছিলেন মানবংশের রাজা রুদ্রমানের মন্ত্রী ও বন্ধু। এগারো শতকের শেষ ও বারো শতকের প্রথম দিকে মগধের রাজা ছিলেন বর্ণমান ও তার পুত্র রুদ্রমান। এ পর্যন্ত এ তথ্য অজানা ছিল। বর্ণমানের পরে কোন এক সময়ে সম্ভবত মগধ থেকে মানবংশের শাসন উচ্ছিন্ন হয়েছিল। কারণ গঙ্গাধর লিখেছেন, এসময় মানবংশের চন্দ্র, রাজা রুদ্রমানের জন্ম হয়েছিল। তিনি বরাহ-অবতারের মত বিপদসংকুল সমুদ্রের মধ্য থেকে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন।[৫]

দুধপানি পাহাড়ের গায়ে লেখা অজিতমান ও তার দুই ভাইয়ের সঙ্গে মগধের রাজা বর্ণমান ও রুদ্রমানের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।[৬] মান-

---

৪. Sir A. Canningham লিপিটির rubbing সংগ্রহ করেছিলেন অক্টোবর ১৮৮৩ সালে। পাঠোদ্ধার করে Prof. Keilhorn লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৮৯৪ সালে। দ্রষ্টব্য, E.I., vol-II, pp. 330-342.

৫. তদন্তরে মাননরেন্দ্রচন্দ্রমাঃ স রুদ্রমানোজনি যেন ভূভুজা
স্ববৈরিদনীমণ্ডলমাদিকীলবহ (হব) লাদমিগ্নাম্বুনিধেং সমুদ্ধৃতং ॥ ২৪।
দ্রষ্টব্য, পাদটিকা ৪।

৬. "Unfortunately there is no other reference to this family of rulers, though it is possible to imagine some connections with Māna brothers who had come much earlier to the Court of Adisinha, the king of Magadha and *were granted three villages.in Hazaribagh district*"—The Comprehensive History of Bihar, vol-I, pp. 271-72, by K. P. Jaiswal.

ভূম, সিংভূম ও উড়িষ্যার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মানরাজাদের শাসন যে খ্রীষ্টীয় ছয় শতকে বিস্তীর্ণ ছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ছয় শতকের শেষ ও সাত শতকের প্রথম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ তোষলীতে অধীশ্বর ছিলেন মহারাজা শম্ভুযশ। তিনি ছিলেন মানবংশের সন্তান, গোত্র মুদগল বা মৌদগল্য। উত্তর তোষলীতে তার সামন্ত রাজা ছিলেন সোমদত্ত।[৭] দক্ষিণ তোষলীতে শিবরাজা।[৮]

মেদিনীপুরের একাংশ, মানভূম, সিংভূম ও বালেশ্বর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল উত্তর তোষলী। কেউ কেউ অনুমান করেছেন উত্তর তোষলীই ছিল প্রাচীন উৎকল রাজ্য। খ্রীষ্টীয় ৫৭৯ অব্দে মানবংশের মহারাজা পরম ভট্টারক শম্ভুযশ ছিলেন সেখানকার রাজা। ছ'শো দুই খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ তোষলীও তার রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯] সম্ভবত কটক, পুরী, গঞ্জাম এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল দক্ষিণ তোষলী।

ঘটনাবলী থেকে মনে হয় ছয় শতকের শেষ দিকে উড়িষ্যার উপকূলভাগের ওপর আধিপত্য নিয়ে বিগ্রহ ও মানবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছিল। বিগ্রহ বংশ প্রথমে উত্তর তোষলী ও পরে দক্ষিণ তোষলী থেকে মানদের কর্তৃত্ব উচ্ছিন্ন করেছিলেন।

গৌড়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটেছিল সাত শতকের প্রথম দিকে। তিনিই প্রথম মানদের আঘাত করেছিলেন।[১০] কারণ তার রাজ্য পুরী ও গঞ্জাম জেলার মাঝামাঝি সীমানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। বালেশ্বর কটক অঞ্চলে আধা-স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন দত্ত-সামন্তেরা। শশাঙ্কের আঘাত

---

৭. Four Copper Ptates from SORO—N. G. Majumdar, E I. vol XXII. ড. ডি. সি সরকারের মতে শম্ভুযশের পট্টটির সময়কাল ৫৭৯ খ্রী। ড. এন. জি. মজুমদারের অভিমত ছিল ৫০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৮. Epigraphia Indica, vol. IX.

৯. Studies in the Geography of Ancient and Medieval India—Dr. D. C. Sircar, Calcutta, 1960, p. 176, এবং History of Orissa—RDB. vol-I, p. 118.

১০. "He (Sasanka) extended his authority over Magadha. He defeated the Māna ruler and made himself master over Dandabhukti, Utkala and Kongoda, corresponding roughly to Midnapore, and northern and southern Orissa"—The Comp. History of Bihar, vol-I, Pt II.

মানদের আধিপত্যে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালেও তারা আর তা থেকে নিরাময় হয়ে, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। এবং সেই বিধ্বংসের ওপরেই শৈলোদ্ভব, বিগ্রহ ও দত্ত-সামন্তেরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

ভাগ্য বিপর্যয় ও রাজ্যহীনতার দুর্ভাগ্য মানদের আচ্ছন্ন করলেও, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজবংশ হিসেবে গুরুত্ব কম ছিল না। বাংলা ও উড়িষ্যার নতুন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক বংশগুলো তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে পরবর্তী সময়েও দীর্ঘকাল ধরে আগ্রহী ছিলেন। দশম শতকের মাঝামাঝি ভৌমকর বংশের রাজা দ্বিতীয় শান্তিকর মানবংশের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সে কন্যা ছিলেন রাজা সিংহমানের মেয়ে হীরামহাদেবী।[১১]

পুরুলিয়া জেলার পূর্বনাম মানভূম। পুরুলিয়া জেলায় ও সংলগ্ন অঞ্চলে মান নামাঙ্কিত একাধিক স্থান ও জনগোষ্ঠী নির্দেশ করে একসময় প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত মানজনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল মানভূম। তারা কোথা থেকে এসেছিলেন, কতদিন এ অঞ্চলে আধিপত্য করেছিলেন, পরবর্তীকালে কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, সেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ অনুমান করেছেন 'মান' একটি রাজবংশের নাম।[১২] রাজবংশটি একসময় মানভূম, সিংভূম ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।[১৩] তাদের নাম অনুসারেই সম্ভবত এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল মানভূমি বা মানভূম।[১৪] অর্থাৎ মান ও মানভূম নাম ছয় ও সাত শতকের

---

১১. Dr. D. C. Sircar—Studies etc, p. 176.

১২. ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, সাক্ষাৎকারে বিবৃত, কলকাতা ২৯. ৮. ১৯৮২। মানভূম বা পুরুলিয়া নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে খুব কম। প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন ড. সরকার ও শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৩. "The Mānas appear to have been ruling over the present Manbhum-Singbhum region together with the adjacent areas of Orissa.—Studies etc, p. 176.

১৪. "The name of the present Mānbhūm or Mānbhūmi seems to have been derived from the rulers of this Māna family, also known from a few other records."—Studies etc, অন্যদিকে, মি. নন্দলাল দে অনুমান করেছেন, "Manbhum is evidently derived its name from Mahavira who was called the "Venerable Ascetic Mahavira"—Indian Historical Qtrly, vol IV, p. 45.

সময়েই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ওড্র জাতির একটি শাখা হিসেবেও মানবংশ অনুমিত হয়েছিল। তাদের আদি বাসভূমি ছিল মানভূম-সিংভূম ও তৎ-সংলগ্ন অঞ্চলে। এ অনুমান যথার্থ বলে গ্রহণ করলে উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চলে ছয় সাত শতকে ওড্র জাতির জনপ্রিয়তার বিষয়টাও সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে মান নাম, মানজাতি ও তাদের উৎপত্তিক্ষেত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান। অধ্যাপক মিরাশি অনুমান করেছিলেন 'মান' পদবীযুক্ত রাজারা ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের একটা শাখা। তারা চার থেকে ছয় শতকের মধ্যে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার কিছু অংশ শাসন করতেন।[১৬] আদি পুরুষ ছিলেন মানাঙ্ক। তাদের তিনটে তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৭] মানাঙ্কের রাজত্বকাল ছিল চার শতকের শেষ দিকে।

প্রায় এক শতাব্দী পরে তার প্রপৌত্র অভিমন্যু সেখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রাজধানীর নাম ছিল মানপুর বা মনপুর। অভিমন্যু প্রপিতা-মহের নাম অনুসারে সম্ভবত রাজধানীর নামকরণ করেছিলেন। মানপুর সাতারা জেলার মান মহকুমায় অবস্থিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভীম নদীর শাখার নাম মানগঙ্গা।

বংশটি সাতারা জেলায় প্রায় আড়াইশো বছর রাজত্ব করেছিলেন। মানাঙ্কের পুত্রের নাম ছিল দেবরাজা। দেবরাজার তিন ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে বড় ছেলের নাম জানা যায় না। শ্রীদীক্ষিত অনুমান করেছিলেন তার নাম ছিল মানরাজা।[১৮] কারণ দেবরাজার পত্নী ও রানী ছিলেন স্যাভলঙ্গী মহাদেবী। তিনি ছিলেন মানরাজার মা।

---

১৫. "If these Mānas may be regarded as belonging to the Uḍra clan, we may explain the popularity of the name Uḍra in the sense of the whole coastal Orissa from the sixth or seventh century."—Studies etc.

১৬. The Rāstrakūtas of Mānpura—Prof. V. V. Mirashi, Baroda Oriental Research Institute, vol XXV, pp. 36-50. মানদের রাজত্বকাল ছিল আ. ৩৭৫ খ্রী থেকে ৫৫০ খ্রী। ডঃ ডি. সি. সরকার অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

১৭. তাম্রপট্টগুলি (১) Uṇḍikavalika grant—JBBRAS, vol XVI (২) Pāṇḍu-rangpalli Plate—Mysore A. R. 1929 ও (৩) Gokak Plate—E. I., vol XXI.

১৮. Hingi Berdi Plates of Rashtrakuta Vibhuraja—M. G. Dikshit, E-I., vol XXIX.

মানাঙ্ক বিদর্ভ, অস্মক ও কুন্তল রাজ্য জয় করেছিলেন।[১৯] অর্থাৎ উত্তর কানাড়া জেলা, মহীশূর, বেলগাঁও ও ধারওয়ারের কিছু অংশ তার অধিকারভুক্ত হয়েছিল। মানপুর নগর কেন্দ্র করে মানাঙ্ক যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মধ্যযুগের প্রথমদিকে সেটা মানদেশ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।[২০] মানদের আধিপত্য সম্ভবত মানভূম, সিংভূম ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। ময়ূরভঞ্জ জেলার উত্তরাংশে খিচিংয়ে অধিষ্ঠিত ছিল তাদের শাসন কেন্দ্র।

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা ও পুরুলিয়া জেলায় মান আধিপত্যের নানা চিহ্ন আজও বিদ্যমান। এক পুরুলিয়া জেলাতেই মানপুর নামে সাতটা গ্রাম আছে।[২১] বারো শতকের শেষ দিকে বীরভূম জেলায় মান-পতি নামে এক রাজাকে পরাজিত ক'রে সে অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে।[২২] বাঁকুড়া জেলার রায়পুর অঞ্চলে মান ছত্রী নামে জনগোষ্ঠী আজও বসবাস করেন।[২৩] মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোনার প্রাচীন নাম ছিল মানা।[২৪] যে চব্বিশটা পরগণা নিয়ে চব্বিশ পরগণা জেলা গঠিত, তাদের মধ্যে একটার নাম ছিল মানপুর।[২৫] বর্ধমান জেলার মান-করের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

---

১৯. A. B. O. R. I. vol XXV. p. 36 & also Studies p. 153. ড. সরকার মানাঙ্কের সময় অনুমান করেছেন ৫ম শতকের শেষদিকে।

২০. 'মানদেশ-সংবন্ধ-ভেলাপুর, মানদেশ-সংবন্ধ-সর্বাধিকারী-ব্রহ্মদেব-রানা'
—ভেলাপুর লিপি (১৩০০-১৩০৫ খ্রী)—ডঃ ডি. সি. সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত।
Studies, p. 159.

২১. নেতুড়িয়া থানা (জে. এল. নং ৩১৭), সাঁতুড়ি থানা (জে. এল. ৩৮২), কাশীপুর থানা (জে. এল, ৫২), হুড়া থানা (জে-এল ৪৮৯), মানবাজার থানা (জে-এল ৩১১), বরাবাজার (জে-এল ৪৪), আড়ষা থানা (জে-এল ১৫৯)—সব ক'টি গ্রামের নাম মানপুর। এছাড়া আছে মানটাঁড়, মানজুড়ি, মানগ্রাম, মানকিয়ারি, মানঝোপড়া, মানএড়া ইত্যাদি।

২২. বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত মাড়গ্রাম অঞ্চলে মানপতির আধিপত্য ছিল বলে কথিত হয়।

২৩. 'বাঁকুড়া'—তরুণদেব ভট্টাচার্য পৃ: ২১৭—২২০।

২৪. 'মেদিনীপুর'—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ: ১৬১।

২৫. ১৭৫৭ সালে মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা বা ২৪ পরগণার যে জমিদারী দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একটি পরগণার নাম ছিল মানপুর—Gazetteers 24pgs, p.44.

পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ও পুঞ্চা থানা এবং বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার বহু গ্রামে মানা-বাউরি নামে এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী বসবাস করেন।[২৬] বুধপুর, টুশামা, পাকবিড়রা ঘিরে একসময় তাদের ঘন সন্নিবেশ ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে মন্দির, মূর্তি ও অসংখ্য পুরাকীর্তির বিস্তীর্ণ ধ্বংসচিহ্ন আজও ছড়িয়ে আছে। উনিশ শতকের শেষদিকেও মানবাজারের রাজারা নিজেদের 'মানাবনীনাথ' বলে পরিচয় দিতেন।[২৭]

উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে উড়িষ্যা রাজ্যের ভঞ্জভূম বা ময়ূরভঞ্জ, পূবে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে অধিষ্ঠিত মল্লভূম এবং পশ্চিমে বিহার রাজ্যভুক্ত সিংভূম ও নাগভূমের মধ্যবর্তী অরণ্য প্রদেশ ভূমযুক্ত অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা ছিলেন ছোট ছোট পৃথক জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের নামের সংগে 'ভূম' যুক্ত হয়ে সেসব অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

তিনটি রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে ঘেরা এই বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলে এতগুলো ভূমযুক্ত অঞ্চল উদ্ভূত হবার কারণ কি? যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো এখানকার অধিবাসী তাদের উদ্ভব হয়েছিল কখন? কিভাবে তারা এখানে এভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিলেন? এরা কি একদা কোন বৃহৎ ও সমৃদ্ধ একাধিক জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তপ্রায় বংশধর? রাজ্যহীন হবার পর পলাতক ও আত্মগোপনকারী রাজবংশের শাখা? দীর্ঘকাল ধরে বন্য জীবনযাপন করার ফলে অধঃপতিত? প্রাচীন ও বৃহৎ আদিমতম অধিবাসীদের সেইসব সচেতন ও অহংকৃত বংশধর যারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য টিঁকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন?—এসব নিয়ে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান আজও পর্যন্ত অনুপস্থিত।[২৮]

---

২৬. মানা-বাউরিদের বসবাস প্রধানত টুশামা, বনগ্রাম, বুধপুর, মানপুর, বনমোহড়া, গুড়ভুপা, ধাধাকিড়ি, রাজাবাগান, মহিষমোড়া, মাধবপুর, উদয়পুর, বাসুচি, পলমি, সৈনিড, দুর্গাপুর, বিসপুরিয়া, জবলা, সিন্দুরপুর ইত্যাদি গ্রামে। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার ভেলাইডিহা, দুবরাজপুর, বাসর্ব প্রভৃতি গ্রামে। মানা বাউরিদের বহু পরিবার এ অঞ্চল থেকে বাস উঠিয়ে বর্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলার চলে গেছেন।—সাক্ষাৎকার, অম্বুজ সিং সর্দার, বয়স ৬২, টুশামা, পুরুলিয়া, তাং ১৪ এপ্রিল ১৯৮২।

২৭. দ্রষ্টব্য, শ্লোকার্থ বোধিকা' গ্রন্থের টাইটেল পেজ। প্রকাশিত হয়েছিল, (চিৎপুর, কলকাতা) ১৭৯২ শকে বা ১৮৭০ খ্রী।

২৮. একমাত্র পরমানন্দ আচার্য তার 'A Note on the 'Bhum' Countries in Eastern India'—প্রবন্ধে (Indian Culture, vol XII, pp. 37—40) কিছুটা আলোচনা করেছেন।

পশ্চিমবাংলার উত্তর পশ্চিমে বীরভূম। বর্তমান বীরভূম জেলা। বীরভূম জেলায় প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে 'বীরভূম' নামটা উদ্ভূত হয়েছিল 'বীর' পদবীযুক্ত প্রাচীন হিন্দু রাজার বংশ অনুসারে। যেমন উদ্ভূত হয়েছিল মানভূম, সিংভূম, ধলভূম ইত্যাদি নাম। মুণ্ডারি ভাষায় 'বিরু' শব্দের অর্থ জঙ্গল। ব্লকম্যান অনুমান করেছিলেন 'বিরভূম' অর্থে বীরভূমের বনাঞ্চলকে চিহ্নিত করত।[২৯] রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণাঞ্চলে 'বিরহড়' নামে একটা উপজাতি আজও বসবাস করেন। তাদের নাম অনুসারেও স্থানটা এক সময় পরিচিত হয়ে উঠতে পারে।

বীরভূমের পাশে ছিল সেনভূম। বীরভূম ও সেনভূম দুটো অঞ্চলের অবস্থিতিই অজয়নদের বামতীরে। বাংলায় সেনরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাট থেকে প্রথম এসেছিলেন বাংলায়। শেষ বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে হোমধূম সুগন্ধী ঋষিদের বাসস্থানে বিচরণ করে বেড়াতেন।[৩০] সামন্ত সেনের পুত্র বিজয়সেন বর্ধমানভুক্তির কোন এক জায়গায় স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সেনভূমিই ছিল সম্ভবত বিজয় সেন প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষুদ্র রাজ্য। সেনদের নামে অঞ্চলটা সেনভূম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

পাল সম্রাট রামপালের সময় তৈলকম্প বা তেলকুপির রাজা ছিলেন রুদ্রশিখর। দামোদরের তীরে তেলকুপির অবস্থিতি বর্তমান পুরুলিয়া জেলায়। শিখরভূম নামে এ অঞ্চল পরিচিত ছিল। এক সময় শিখরভূমের ব্যাপ্তি ছিল বহুদূর জুড়ে। পরবর্তীকালে সংকুচিত অঞ্চল হিসাবে শিখরভূম বর্ধমানের পশ্চিমদিকে দামোদর ও অজয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোণাকুণিভাবে বিস্তীর্ণ ছিল। ব্লকম্যান শেরগড়ের সঙ্গে শিখরভূমকে সনাক্ত করেছিলেন। শেরগড়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এখনকার রাণীগঞ্জ এলাকা।[৩১]

অজয়নদের বামতীরে যেমন ছিল সেনভূম, দক্ষিণতীরে তেমনি ছিল গোপভূম বা গোপীভূম। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যে গোপ রাজা ইচ্ছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রামগঞ্জ তাম্রপট্টে

---

২৯. Ain—I—Akbari, vol-I, p. 554.

৩০. বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮৪—৮৫।

৩১. Contributions to the Geography and History of Bengal—H. Blochmann, p. 16.

৩২. গোপভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—বর্ধমান, তরুণদেব ভট্টাচার্য।

ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত রাজার কথা পাওয়া যায়। তার সময়কাল এগারো শতক বলে অনুমিত হয়েছিল। গোপভূম বলতে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল আজও চিহ্নিত করে। ইচ্ছাই ঘোষের দেউল নামে একটি মন্দির বর্ধমান জেলার গৌরাঙ্গপুরে আজও দাঁড়িয়ে আছে।[৩৩]

বাঁকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমে ক্ষুদ্র ও প্রাচীন রাজ্য ছিল সামন্তভূম। পরবর্তীকালে শিখরভূমের অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল এটা। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চল ও মেদিনীপুর জেলার শিলদা পর্যন্ত এলাকা এক সময় ছিল সামন্তভূমের অন্তর্গত। পুরনো দলিল দস্তাবেজে এই এলাকা এখনও সামন্তভূম নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।[৩৪]

সামন্তভূমের দক্ষিণপূর্বে ছিল মল্লভূম। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুর। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে মল্লভূম বলতে বোঝাত ছাতনা বাদে বাঁকুড়া, ওঁদা, বিষ্ণুপুর, কোটালপুর ও ইন্দাস থাকা এলাকা। ষোল শতকের শেষ ও সতের শতকের প্রথম দিকে মল্লভূম বা মল্লরাজ্যের সীমানা ছিল বহু বিস্তৃত। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহযোগিতায় মল্লরাজা হাম্বির মল্লভূমের আয়তন অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। সাঁওতাল পরগনার দামিন-ই-কোহ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল উত্তরসীমা, দক্ষিণসীমা পরিব্যাপ্ত ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর, উত্তর পশ্চিমাংশ পর্যন্ত, পূর্বে বর্ধমানের কিছুটা অংশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুর সন্নিবিষ্ট পাঁচেট রাজ্য।[৩৫]

মল্লভূমের দক্ষিণপূর্বে ছিল ব্রাহ্মণভূম। একে বলা হত আরাঢ়া বা আড়ঢ়া ব্রাহ্মণভূম। সম্ভবত রাঢ়দেশের বহির্ভূত ছিল এই অঞ্চল। ১৮০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণভূম ছিল বর্ধমান জেলার ভেতর। পরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কুলাখ্যান পত্র অনুসারে উমাপতি ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ নয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এখানে এসে বসবাস সুরু করেছিলেন। এই বংশের ত্রিলোচনদেব ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রাহ্মণভূমের অন্যতম রাজা ছিলেন রঘুনাথ দেব। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

---

৩৩. দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ৩১।

৩৪. সামন্তভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য পৃঃ ৯৯—১০১ ও ৩৭৮—৩৭৯।

৩৫. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

ছিলেন তার অধ্যাপক। রঘুনাথদেবের পিতা রাজা বাঁকুড়া রায়ের সময় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল।[৩৬]

রাঢ় দেশের পূর্বান্তে ছিল শূরভূম রাজ্য। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে দওয়ার সোরভূম, সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত। শূরভূমের কথা অপর তিনটি উৎস থেকেও পাওয়া যায়। রণশূরের কথা পাওয়া যায় রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্-এ পাওয়া যায় লক্ষ্মীশূরের কথা, দামশূরের কথা পাওয়া যায় তার লিপিতে। লিপি অনুসারে অনুমিত হয় হুগলী জেলায় বিশেষত বর্তমান আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বিস্তীর্ণ ছিল শূরভূম রাজ্য।[৩৭]

আইন-ই-আকবরীতে সরকার মান্দারণের অন্তর্গত ভাওয়ালভূমের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্টারলিং বিষ্ণুপুরের অধীন বালভূম বলে উল্লেখ করেছেন। ভূমযুক্ত এই অঞ্চলটার অবস্থিতি এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা যায়নি।

সিংভূম জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে ছিল ধবলভূম রাজ্য। রাজ্যটির মোট আয়তন ছিল এক হাজার একশো সাতাশি বর্গমাইল। তার ভেতর প্রায় তের বর্গমাইল এলাকা ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ভেতর। বারোটা তরফে বিভক্ত ছিল রাজ্যটা। রাজধানী ছিল প্রথমে ঘাটশীলা, পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল নরসিংহ-গড়ে। রাজ্যের উত্তরে ছিল মানভূম, দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ, পূবে মেদিনীপুর জেলা ও পশ্চিমে সরাইকেলা রাজ্য। এখানকার রাজারা ছিলেন ধবল বা ধোপা জাতীয়। ডালটন অনুমান করেছিলেন এরা ভূমিজ। ধলভূম বা ধবলভূম পরবর্তীকালে সম্ভবত পঞ্চকোটের সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে (১৭৬৭ খ্রী) ধলভূমের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়েছিল, ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল তা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ধলভূম ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। পরে মানভূম জেলা গঠিত হলে মানভূমের অন্তর্গত হয়েছিল। ১৮৪৫ সালে ধলভূমকে সিংভূম জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

ধলভূম রাজ্যের যে অংশ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, তা জামবনী রাজবংশ নামে পরিচিত। এদের রাজধানী চিল্‌কিগড়ে।[৩৮]

---

৩৬. ব্রাহ্মণভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ১৯১—১৯২।

৩৭. শূরভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, হুগলী—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

৩৮. জামবনী রাজবংশ ও ধলভূম জমিদারী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ২০০—২০১।

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমসীমান্ত এবং পুরুলিয়া জেলার পূর্বান্ত জড়িয়ে একসময় তুঙ্গভূম নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রোহিতগিরির তুঙ্গদের কোন এক শাখা সম্ভবত এখানে এসে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুঙ্গদের কয়েকটি তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৯]

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে ভূমযুক্ত আরও দুটি অঞ্চলের কথা পাওয়া যায়। একটি আদিত্যভূম অপরটি বাঘভূম বা বাগভূম। ইংরেজদের পুরানো নথিপত্রে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জঙ্গলমহলের একাংশকে আদিতভূম বলে উল্লেখ করা হত যা সম্ভবত আদিত্যভূমেরই অপভ্রংশ। পরমানন্দ আচার্য অনুমান করেছিলেন[৪০] পাতকুমের রাজ পরিবারের এক শাখা এখানে রাজত্ব করতেন। কারণ পাতকুমের 'আদিত্য' পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিক্রম। আদিত্য পরিবারের পদবী অনুসারে অঞ্চলটি আদিত্যভূম নামে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে।

বাঘভূম বা ব্যাঘ্রভূমিও সঠিকভাবে সনাক্ত করা যায়নি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন[৪১] বাঘভূমির অবস্থিতি ছিল মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে উল্লিখিত ব্যাঘ্ররাজের সংগে ব্যাঘ্রভূমির সম্পর্ক ছিল বলেও অনুমান করা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার পুরনো নাম ছিল মানভূম। মান[৪২] নামটি প্রাচীন মান রাজবংশের নাম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে মানঅধিকৃত অঞ্চলের নাম যেমন হয়ে উঠেছিল মানদেশ, এখানেও তেমনি মানদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের নাম হয়েছিল মানবাজার ও মানপুর। ইংরেজ আমলে একদা মান আধিপত্যের সমগ্র অঞ্চলটা মানভূম নামে অধিকতর পরিচিতি লাভ করেছিল।

মানবাজারের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল বরাহভূম রাজ্য। সাম্প্রতিক বরাভূম পরগনা। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের আসানসোল সিনি শাখার বরাভূম রেলস্টেশন থেকে বারো মাইল দক্ষিণ পূর্বে বরাবাজার। পাতকুম রাজবংশের শাখা সম্ভবত ছিলেন বরাভূম পরগণার অধীশ্বর। তাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল বরাবাজারে। পরবর্তীকালে বরাভূম পরগণা পঞ্চকোট রাজার অধীনস্থ জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল।

---

৩৯. তুঙ্গভূম সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৭৯—৩৮০।

৪০. Indian Culture, vol XII.

৪১. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ১১০—১১১।

৪২, তেলেগু লিপি অনুসারে 'মান'—ভূমি মাপের একক।

মানভূম বা পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণে সিংভূম বা সিংহভূমি। সম্ভবত পোড়াহাটের সিংহ রাজাদের পদবী অনুসারে তাদের অধীনস্থ অঞ্চল সিংভূম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। পোড়াহাট, সরাইকেলা ও খারসওয়াঁর রাজারা সকলেই ছিলেন একই বংশোদ্ভূত। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৮২০ খ্রী) পোড়াহাটের রাজা ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, ফলে সিংভূম কোমপানির রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমে ছিল নাগভূম। নাগভূম প্রকৃতপক্ষে ছিল ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় রাজাদের প্রশাসন ক্ষেত্র। কেউ কেউ নাগভূমের সঙ্গে বিহার রাজ্যের বর্তমান রাঁচি জেলাকে সনাক্ত করে থাকেন।[৪৩]

ভূমযুক্ত অঞ্চলগুলোর সর্বোত্তরে যেমন ছিল বীরভূম, সর্ব দক্ষিণে তেমনি ছিল ভঞ্জভূম বা ময়ূরভঞ্জ।

উড়িষ্যা প্রদেশে দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে ময়ূরভঞ্জ ছিল বৃহত্তম। ইংরেজ আমলে আয়তন সঙ্কুচিত হয়ে এলেও মোট এলাকা ছিল চার হাজার দুশো তেতাল্লিশ বর্গমাইল। উত্তরে মেদিনীপুর ও সিংভূম জেলা, পূবে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর, দক্ষিণে বালেশ্বর জেলা ও নীলগিরি এবং কেওঞ্জর রাজ্য, পশ্চিমে কেওঞ্জর ও সিংভূম জেলা।[৪৪]

ময়ূরভঞ্জ যা ভঞ্জভূম নামেও কখনও কখনও পরিচিত হয়ে উঠেছিল, ছিল প্রাচীন রাজ্য। শিলালেখে ভঞ্জবংশের হদিস পাওয়া যায় চার পাঁচ শতকে। জনশ্রুতি অনুসারে ভঞ্জবংশ ময়ূর রাজ্য জয় করে নিলে ময়ূরভঞ্জ নাম ও রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। ময়ূর রাজ্যের প্রতীক ছিল ময়ূর। ভঞ্জদের শীল-মোহরে ষাঁড়, বরাহ ও ময়ূর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত থাকত।

উত্তরে বীরভূম থেকে দক্ষিণে ভঞ্জভূম পর্যন্ত, একদা বিস্তীর্ণ অরণ্য এলাকায় 'ভূমযুক্ত' এই আঠারোটা ক্ষুদ্র বৃহৎ অঞ্চলের হদিস পাওয়া যায়। অঞ্চলগুলো ছিল আদিবাসী ও উপজাতি কোমগুলির আবাসস্থল। তাদের মধ্যে পলাতক রাজবংশের বংশধরেরাও থাকতে পারেন। বিভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাজ্যের নামেমাত্র অধীনতায় থাকত অঞ্চলগুলো। তাম্রপট্ট ও প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে এ অনুমান সমর্থিত হয়।

দ্বিতীয় বিনীত তুঙ্গের তাম্রপট্টে দেখা যায়, তিনি ছিলেন মহারাজা, রাণক

---

৪৩. পরমানন্দ আচার্য, দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ৪০।

৪৪. Feudatory States of Orissa—L. E. B. Cobden Ramsay, 1910 Re. p 1982.

ও অষ্টাদশ গোণ্ডাধিপতি বা আঠারোটা গোণ্ড বা উপজাতির অধীশ্বর।[৪৫] সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্'-এ লক্ষীশূরকে অটবী বা অরণ্যপ্রদেশের সামন্ত-চক্রের চূড়ামণি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৬] যদিও সেখানে সামন্তদের সংখ্যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলো বিশেষত বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমাংশের অধিবাসীদের বসতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা যথাযথভাবে বুঝতে গেলে ভূমযুক্ত এই অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের স্বরূপ ও প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ এদের মিলনমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সমন্বয়ের মধ্যেই বর্তমান অধিবাসীদের আচার আচরণ, ধর্ম ও সংস্কার, আহার ও পোশাক পরিচ্ছদের মূল সূত্রগুলো নিহিত রয়েছে। এবং যেহেতু পুরুলিয়া জেলা সীমান্তের সবচেয়ে সমীপবর্তী, জেলাসহর ছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপ্রবেশ অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত ছিল, এখানে এই সূত্রগুলো এখনও অনেক অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান।

---

৪৫. Two Copper Plates from the State of Bonai—Mm Haraprasad Sastri JB & ORS vol VI, Pp. 236—245.

মানভূম থেকে পুরুলিয়া

"Every child is borne into a cultural environment; the language is both a part of, and an expression of, that environment."—Monographs on Fundamental Education, UNESCO, 1951.

বৈশাখ মাস, তেরশো তেষট্টি সাল।[১] অন্ধকার ছিঁড়ে আকাশের গায়ে সবে আলোর রেখা ফুটতে সুরু করেছিল। একটু একটু করে মাথা তুলছিল সূর্য। কমলারঙের উজ্জ্বল বিচ্ছুরণে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল চারদিক। পুঞ্চ থানার ছোটগ্রাম পাকবিড়রা। গ্রামখানা কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠেছিল। সত্যাগ্রহীরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, দীর্ঘপথ পরিক্রমা করার জন্য প্রস্তুত। পাকবিড়রা গ্রাম থেকে কলকাতা।

সত্যাগ্রহী ছিলেন হাজারের ওপর। দশটি বাহিনীতে বিভক্ত। প্রতি বাহিনী নটি দল নিয়ে গঠিত। দলে শৃংখলা রক্ষার জন্য ছিলেন একজন করে দলপতি। বাহিনীর অধিনায়ক বাহিনী-অধিপতি। এক একটি বাহিনীতে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা একশো। অভিযানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বর্ষীয়ান নেতা অতুলচন্দ্র ঘোষ। পদযাত্রাটির নাম ছিল বঙ্গ-সত্যাগ্রহ অভিযান।[২]

পুরুলিয়া জেলা তখনও গঠিত হয়নি। মানভূম জেলার সদর মহকুমার নাম ছিল পুরুলিয়া। মানভূম ছিল বিহার রাজ্যের ভেতর ছোটনাগপুর ডিভিশন বা ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল থেকে একশো তেইশ বছর আগে জন্ম হয়েছিল বাংলার গর্ভে। বাংলাই তাকে আটাত্তর বছর ধরে লালন করেছিল।

---

১ প্রকৃতপক্ষে ৭ বৈশাখ ১৩৬৩; ইংরেজির ২০ এপ্রিল ১৯৫৬। দিনটি ছিল শুক্রবার।

২, তুলনীয়, সাম্প্রতিক পদযাত্রা, সি. পি. আই (এম) দলের নেতৃত্বে। পুরুলিয়া থেকে যাত্রা সুরু হয়েছিল ২৯ মার্চ ১৯৮২, কলকাতায় অনুপ্রবেশ ৬ এপ্রিল ১৯৮২। দাবী ছিল ষোলটি।

জন্মলগ্নে ঝড় ছিল আকাশে। বাংলার পশ্চিমসীমান্তবর্তী যে বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রদেশ ছোটনাগপুরের মালভূমি জুড়ে পরিব্যাপ্ত, স্থানীয় অধিবাসীদের শৌর্য, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার তীব্র অভিলাষে, থেকে থেকে তা আলোড়িত হয়ে উঠত। অধিবাসীরা ছিলেন দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও যুযুধান। ছোট ছোট সর্দারদ্বারা শাসিত। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাঞ্চলে যে দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ও স্থায়িত্ব সম্ভব করেছিল, এ অঞ্চল ছিল তার অগ্রমুখ ও ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

সুবা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের দুবছরের মাথায় ইস্ট ইনডিয়া কোমপানি অরণ্য অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালিত করেছিল।[৩] মাঝে মধ্যে বিরতিসহ অভিযানের মেয়াদ ছিল প্রায় তেত্রিশ বছর। এর ভেতর কোমপানির স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের অনেক রদবদল ঘটেছিল, রদবদল ঘটেছিল স্থানীয় সর্দারদেরও। তবু অভিযান, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের একেবারে বিরতি ঘটেনি।

উনিশ শতকের প্রথম থেকে কোমপানির দৃষ্টিভঙ্গির দিকবদল সূচিত হয়েছিল। পরিস্থিতিরও রূপান্তর ঘটেছিল। জঙ্গলসর্দারদের মধ্যে অনেকেই কোমপানির অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কোথাও নামে মাত্র, কোথাও শাস্তিমূলক রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। সমগ্র অরণ্যঅঞ্চল প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনের খসড়াও তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

নতুন আইনে তেইশটি পরগণা ও মহল নিয়ে গঠিত হয়েছিল জঙ্গলমহল জেলা।[৪] জেলাটির জন্য পৃথক প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত হয়েছিলেন। তার সদর দপ্তর ছিল বাঁকুড়া সহরে।

জঙ্গলমহল জেলা গঠিত হবার আগে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল ঢিলেঢালা। প্রধানত পাঁচেটের রাজার সঙ্গেই কোমপানির রাজস্ব বিষয়ে বোঝাপড়া চলত। রাজস্ব আদায়ের মূল বিষয়টি তদারকি করা হত বীরভূম

৩. ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানি সুবা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেছিল ১৭৬৫ সালে। এনসাইন জন ফার্গুসনের নেতৃত্বে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল জানুয়ারি ১৭৬৭ সালে।

৪. নতুন আইনটি ছিল Regulation XVIII of 1805. ২৩টি পরগণার মধ্যে পাঁচেটসহ ১৫টি নেওয়া হয়েছিল বীরভূম থেকে, ৩টি বর্ধমান থেকে ও ৫টি, যথা, ছাতনা, বরাভূম, মানভূম, সুপুর-অম্বিকানগর, সিমলাপাল-ভেলাইডিহা—মেদিনীপুর থেকে।

থেকে। আইনশৃংখলা বজায় রাখার জন্য ছোট সামরিক শিবির ছিল দুটি। একটি ঝালদা, অপরটি রঘুনাথপুর।

নতুন আইনে জংগল সর্দার ও জমিদারদের হাতে পুলিস-দারোগার ক্ষমতা ও কার্যভার ন্যস্ত করা হল। আত্মপ্রসাদ লাভ করল কোমপানি।[৫] অরণ্যের অগ্নি নির্বাপিত, যেটুকু আগুন ধিকিধিকি করে ছাইয়ের নিচে প্রজ্বলিত, যে কোন সময় জল ঢেলে নিভিয়ে ফেলা যেতে পারে, এ অনুমান যে কতখানি ভ্রান্ত, আড়াই দশকের মাথায় কোমপানি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

সিংভূম, রাঁচি ও পালামৌ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল কোল বিদ্রোহের দাবানল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বরাভূম অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ইংরেজদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে গংগানারায়ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ইংরেজদের অনুগ্রহপুষ্ট বরাভূমের জমিদার নিহত হলেন তার হাতে। মানভূমের বিস্তীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল অসম সংগ্রামের রণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। নিষ্ফল প্রমাণিত হল জংগলমহল জেলা গঠনের উদ্দেশ্য।

বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখার প্রয়োজন হল। মি. ডেনট সাফল্যের সংগে গংগানারায়ণের বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, তিনি সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলেন। সাধারণ আইন দিয়ে এ অঞ্চলের প্রশাসন চালানো অযৌক্তিক। জংগলমহল জেলা একটি প্রশাসনিক চৌহদ্দির মধ্যে সমস্ত জংগলসর্দারদের একত্র সন্নিবেশিত করেছিল, গংগানারায়ণের বিদ্রোহ শক্তিশালী করে তোলার সেটি ছিল অন্যতম কারণ। ফলে এ অঞ্চল খণ্ড খণ্ড করে অন্যান্য জেলার সংগে জুড়ে, পৃথক জেলা গঠনের প্রস্তাব উঠল।[৬]

জঙ্গলমহল জেলা ভেংগে গেল। নতুন করে বিন্যস্ত হল অরণ্যের অঞ্চল-

---

৫. "......the rules in Regulation XVIII of 1805 seem well adapted to these Jungle Mahals and where the Raja and his Dewan have been duly qualified they have fully answered in practice and crimes in violence and blood had greatly decreased"—Mr. Dent's Report, 1833.

৬. "......the nature of disturbances which recently prevailed in various parts of these districts (রামগড়, জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুর—লেখক) and the character of the inhabitants which render it expedient to separate these tracts from those districts..."—Preamble to Regulation XIII of 1833.

গুলো। জন্ম হল মানভুম জেলার।[৭] মহকুমা দুটি, পুরুলিয়া সদর ও গোবিন্দপুর। সদর দপ্তর ছিল মানবাজার। প্রশাসক ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রধান সহায়ক।

মানভুম জেলা ছিল তখন আয়তনে অনেক বড়।[৮] ধলভুম অন্তর্ভুক্ত। পাঁচ বছর পরে জেলার সদর দপ্তর মানবাজার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল পুরুলিয়ায়। কারণ পুরুলিয়া ছিল জঙ্গল এলাকার কেন্দ্রস্থলে। প্রশাসনের প্রকৃতি ছিল চরিত্রে সামরিক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতেন গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি।

বারো বছর পরে ধলভুম মানভুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সংযুক্ত হল নবগঠিত জেলা সিংভুমের সঙ্গে। নতুন জেলা দুটির সৃষ্টি ও তাঁদের চৌহদ্দি বিন্যাসে কোন আদর্শ বা নীতি সক্রিয় ছিলনা। এমনকি অধিবাসীদের আচার আচরণ, সাংস্কৃতিক ঐক্যবদ্ধতা বা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলিও বিবেচ্য ছিলনা। মূল উদ্দেশ্য ছিল সমভাবাপন্ন অধিবাসীদের খন্ড বিচ্ছিন্ন করে মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়া, যাতে রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক কাজগুলি সুশৃংখল ও অবিঘ্নিতভাবে পরিচালিত হতে পারে।

কিছু পরিমাণে সফল হল উদ্দেশ্য। কারণ জেলাটিকে স্থায়ী করার জন্য প্রণীত হল আইন।[৯] আইনে প্রধান সহায়কের পদের নাম ও প্রকৃতি বদলে গেল। নতুন নাম হল ডেপুটি কমিশনার। সামরিক ধাঁচের প্রশাসনের বদলে অসামরিক প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হল। যদিও কিছু কিছু বিশেষ ক্ষমতা কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারের হাতে ন্যস্ত থাকল।

এ অবস্থা চলল প্রায় আটাত্তর বছর, বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বাংলা, ভারত ও শাসকগোষ্ঠীর দেশ ইংলন্ডে বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। বাংলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কার্জন উত্থাপিত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব।

প্রস্তাবটি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। উনিশ শতকের শেষদিকে

---

৭. মানভুম জেলা গঠিত হয়েছিল Section V, Regulation of 1833 অনুসারে। পরিশিষ্টে, 'ঐতিহাসিক কালপঞ্জী ও বিশিষ্ট ঘটনা' পরিচ্ছেদে পরগণা ও মহলগুলির নাম দ্রষ্টব্য।

৮. ৩১টি জমিদারী নিয়ে মোট এলাকা ৭,৮৯৬ বর্গমাইল (১৮৪৫ সালে)।

৯. Act XX of 1854, এই আইনে Agent to the Governor-General for the South West Frontier Agency পরিণত হলেন ছোটনাগপুরভুক্তির কমিশনারে। Principal Assistant হলেন Deputy Commissioner.

বাংলার অধিবাসিদের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতা, আত্মপ্রত্যয় ও নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, তাকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে কার্জন কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন ইংরেজদের তাড়িয়ে বাঙ্গালী ভারতবর্ষে স্বদেশী সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছে। লাটভবনে থাকতে চায় বাঙ্গালীবাবু।[১০]

প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও আন্দোলনে ফেটে পড়ল। বিক্ষোভ দেখা দেবে, কার্জন জানতেন, চোখ কান দুটিই ঊর্ধ্বে তুলে রাখলেন, সেভাবেই কাটিয়ে গেলেন কার্যকাল। সামান্য রদবদল করে বঙ্গ-ভঙ্গের সরকারি সিদ্ধান্তটি ঘোষিত হয়েছিল ২০ জুলাই ১৯০৫ সালে। তাতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বার্মাফিল্ড ফুলারকে নতুন প্রদেশের লেঃ গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন কার্জন। বঙ্গভঙ্গের মধ্যেই কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর ও মানভূম জেলার বিহারভুক্তির বীজদুটি নিহত ছিল।

বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে ভারতবিষয়ক দুই কর্তাব্যক্তিরই বদল ঘটেছিল। কার্জনের উত্তরসূরি লর্ড মিনটোর বদলে এলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ, লনডনে লর্ড মর্লের জায়গায় ভারতবিষয়ক সচিব হলেন লর্ড ক্রিউই। দুজনেই বাংলা তথা ভারতে অশান্তির অন্যতম কারণ, 'বঙ্গভঙ্গ' নামক অন্যায়টির প্রতিকার করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

সুযোগও জুটে গেল। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারত সফরের কার্যসূচি স্থির হয়েছিল। কাউনসিলের সমস্ত সদস্যদের ঐক্যমত করিয়ে নতুন প্রস্তাব তৈরি করে রেখেছিলেন হার্ডিঞ্জ। সিদ্ধান্ত হিসেবে সম্রাট সেটি দিল্লীর দরবারে ঘোষণা করলেন।[১১] বিহার,

১০. "The Bengalis, who like to think themselves a nation, and who dream of a future, when the English will have been turned out, and a Bengali Babu will be installed in Government House, Calcutta."—Curzon to Brodrick, dated 17 February 1904. লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল, মিঃ ব্রডরিক ছিলেন Secretary of State for India.

১১. ঘোষণাটি হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে। তাতে (১) বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হল (২) চীফ কমিশনারের অধীনে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল আসাম (৩) বাংলা ভাষাভাষী বিচ্ছিন্ন বঙ্গ পুনর্মিলিত করে গভর্নরের অধীনে আনীত হল। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল দিল্লীতে।

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হল। মানভূম সহ ছোটনাগপুরভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হল প্রদেশটি। ফলে মানভূম জেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাংলা থেকে।

মানভূম জেলা ও ধলভূম দুটিই ছিল বাংলা ভাষাভাষী-প্রধান অঞ্চল। বাংলা থেকে তাদের বিচ্ছেদ কেউ খোলা মনে মেনে নিতে পারলেন না। এমনকি বিহারের নেতৃবৃন্দও তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানালেন।[১২] সুযোগমত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সে আশ্বাস আশ্বাসই থেকে গিয়েছিল।

মানভূমের বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীবৃন্দ যেমন বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, বিহারের অধিবাসীরাও তেমনি জেলাটিকে পাকাপাকিভাবে বিহারে রাখার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। প্রথম ধাপ হিসেবে ধানবাদ মহকুমায় রেকর্ডস অব রাইটস লেখার জন্য সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।[১৩]

ভারতে প্রদেশগুলির অভ্যন্তরীণ অসংগতির কথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অবিদিত ছিলনা। বিভিন্ন সময়ে সেকথা তারা ঘোষণাও করেছিলেন।[১৪] যদিও প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা কখনও গৃহীত হয়নি।

পরাধীন ভারতে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল ছিল জাতীয় কংগ্রেস। জনগণের আশা আকাঙ্খা, দাবী ও স্বপ্নের কথা তখন কংগ্রেসের মাধ্যমেই ধ্বনিত হত। নাগপুর অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী কংগ্রেস কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছিল, পরবর্তীকালে বারবার ঘোষিত হয়েছিল দাবীটি।[১৫]

---

১২. "The whole district of Manbhum and Pargana Dhalbhum of Singhbhum district are Bengali speaking and they should go to Bengal."—ড. সচ্চিদানন্দ সিংহ, দীপনারায়ণ সিংহ, পরমেশ্বর লাল, মুহম্মদ ফকরুদ্দিন ও নন্দকিশোর লাল কর্তৃক ১৯১২ সালে ঘোষিত যুক্ত বিবৃতি।

১৩. Government Letter No. 5109, R-S-138 dated 7 August 1918. ইতিমধ্যে গোবিন্দপুর মহকুমা ধানবাদ মহকুমায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৪. "We are impressed with the artificial, and often inconvenient character of existing administrative units."—Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, Para 246.

১৫. নাগপুর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ সালে। পরবর্তীকালে ঘোষিত হয়েছিল লখনৌতে অনুষ্ঠিত (১৯২৮) সর্বদলীয় সম্মেলনে, কলকাতা অধিবেশনে (১৯৩৭), ১৯৩৮ সালে (কেবল প্রদেশ গঠনের কথা) এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনী ইসতেহারে।

মানভূম জেলার বিহারভুক্তির পর থেকেই সুকৌশলে জেলার মধ্যে হিন্দী প্রচারের কাজ সুরু হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের পর থেকে জোরদার হয়ে উঠেছিল উদ্যোগ। কারণ এই বছরেই বিহারে কংগ্রেস দল মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল।[১৬] গঠিত হয়েছিল 'মানভূম বিহারী সমিতি'। সমিতির সভাপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বিহারী সমিতির পাল্টা সংস্থা হিসেবে গঠিত হয়েছিল 'মানভূম সমিতি।'[১৭]

বিহার সরকার প্রাথমিক স্তরে বহু হিন্দী স্কুল খুলতে সুরু করেছিলেন। সেসব স্কুলের অধিকাংশ খোলা হয়েছিল আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে। ফলে মানভূম সমিতি ও মানভূমের বাঙ্গালী অধিবাসীরাও হিন্দী স্কুলের কাছাকাছি বাংলা স্কুল খুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

মানভূম জেলা কংগ্রেসের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শাঁখের করাতের মত। জেলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা, মানভূম ও কাছাকাছি জেলাগুলিতে কংগ্রেসী রাজনীতির প্রবর্তক, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত সদ্য প্রয়াত হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পরে অতুলচন্দ্র ঘোষ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। বিহার সরকার ও বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের হিন্দী প্রচারের উদ্যোগ ও কৌশল জেলার কংগ্রেস সদস্যদের ভেতরে ভেতরে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার উপায় ছিল না। কারণ তা দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের সামিল। অথচ এই উদ্যোগ অব্যাহতভাবে চলতে দিলে মানভূমে বাঙ্গালী অধিবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এমনকি অস্তিত্বও বিপন্ন হবার যে সম্ভাবনা, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করেছিল, সে বিষয়েও তারা পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। ফলে উভয় সংকটে পড়েছিলেন জেলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। ১৯৪১ সালের জনগণনায় হিন্দীর প্রতি বিহার সরকারের পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে আরও একটি আন্দোলন সুরু হয়েছিল। প্রস্তাব উঠেছিল রাঁচি, পালামৌ, সিংভূম ও মানভূম জেলা নিয়ে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের।[১৮]

---

১৬. কংগ্রেস দল বিহারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল ১ আগস্ট ১৯৩৫।

১৭. তাকে 'বাঙ্গালী সমিতি'ও বলা হত। সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার পি. আর. দাস। মানভূম সমিতির মুখপত্র হিসেবে মানভূম সমিতি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮ মে ১৯৩৫। অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন মানভূম ও বাঙ্গালী সমিতির উল্লেখযোগ্য কর্মী। সমিতির মুখপত্রের সম্পাদক।

১৮. প্রস্তাবটির উদ্ভাবক ছিলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। Chotanagpur Separation-এর পুরুলিয়া শাখার সভাপতি ছিলেন নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র সরকার।—সাক্ষাৎকার, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পুরুলিয়া, জুলাই ১৯৮২।

প্রদেশটির প্রস্তাবিত নাম ছোটনাগপুর রাজ্য। কারণ এই অঞ্চল বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ভূপ্রকৃতি ও জনবসতির বিন্যাসে ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত। পৃথক রাজ্য গঠিত না হলে, বাংলার সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করার দাবীও প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত ছিল। কারণ, একদা বাংলারই অংশ ছিল জেলাটি।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছিল পরিস্থিতি। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে সরকার গঠন করেছিল কংগ্রেস। এ যাবৎকাল কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি রূপান্তরিত হবে বলে ভারতের দিকে দিকে নানা দাবী উত্থাপিত হতে সুরু করেছিল। দাবীগুলিকে জড়িয়ে আঞ্চলিকতা এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল যে ভারতের ঐক্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল।

নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে চিন্তা ভাবনার প্রশ্ন দেখা দিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, যা অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সবার আগে বিবেচ্য ভারতের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব।[১৯] প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় ভারত জুড়ে বিক্ষোভ দেখা দিল। বিক্ষোভ দেখা দিল কংগ্রেস দলের ভেতরে ও বাইরেও।

ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হল ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন।[২০] কমিশন জানাল স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস তার অতীত অংগীকারগুলি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে ধরে নেওয়া উচিৎ। শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন অনুচিত। ভারতের ঐক্যবদ্ধতার প্রশ্নটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল, কমিশনের মন্তব্য তাতে ইন্ধন জুগিয়ে দিল। অসন্তোষ আরও তীব্র হয়ে উঠল। কমিশনের সুপারিশ খতিয়ে দেখার জন্য নিয়োজিত হল প্রধানমন্ত্রীসহ উচ্চপর্যায়ের কমিটি[২১]।

---

১৯ "First thing must come first and the first thing is the security and stability of India."—Speech of Jawaharlal Nehru, Prime-Minister of India, before the Constituent Assembly (Legislative), 27 Nov. 1947.

২০. Constituent Assembly-র Drafting Committee-র সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত হয়েছিল Linguistic Provinces Commission যা Dar Commission নামে পরিচিত। কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে।

২১. প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কমিটির অপর দুই সদস্য ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ড. পট্টভি সীতারামাইয়া। কমিটিটি জে. ভি পি কমিটি নামে পরিচিত। নিয়োগ ডিসেমবর, ১৯৪৮। তারা রিপোর্ট দিয়েছিলেন ১ এপ্রিল ১৯৪৯।

ইতিমধ্যে মানভূম জেলায় হিন্দী প্রচারের কাজ পরিকল্পিতভাবে সুরু হয়ে গিয়েছিল। বিহারের নেতৃবৃন্দ জেলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে, বক্তৃতা দিয়ে, প্রচার চালিয়ে চলেছিলেন। বিহারের বিধানসভাতে সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দীর প্রচলন সুপারিশ করে বেসরকারি প্রস্তাব আলোচিত হয়েছিল।[২২] জেলার স্কুল পরিদর্শক সমস্ত সাব-ইনস্পেক্টরদের কাছে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন। তাতে বলা হল, আদিবাসী এলাকায় যেসব স্কুল সরকারি অনুদানে চলে, সেখানে রাষ্ট্রভাষা অর্থাৎ হিন্দীতে শিক্ষা দিতে হবে।[২৩] অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল[২৪] স্কুলগুলির সাইনবোর্ড বদলে স্কুলের নাম লিখতে হবে দেবনাগরীতে, প্রার্থনা হিসাবে গাওয়াতে হবে রামধুন।

জোরজুলুম করে হিন্দী চালাবার বিরুদ্ধে মানভূমের অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। উভয় সংকটে পড়েছিলেন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। জেলায় কংগ্রেসের মুখপাত্র ছিল 'মুক্তি' পত্রিকা। তাতে হিন্দী প্রচার, বাংলা ভাষা-ভাষাভাষীদের বিক্ষোভ ও মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হল।[২৫] বিষয়টি বিচার করার জন্য বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে জেলা কমিটির অধিবেশনও আহ্বান করা হল।[২৬] জেলার বিভিন্ন স্থানের পঁয়তাল্লিশ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিলেন।

সম্মেলনের অষ্টম প্রস্তাব ছিল ভাষা সম্পর্কে। ভাষা ও ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে মানভূমের ভবিষ্যত বিষয়ে প্রতিনিধিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পুরুলিয়ায় একটি অধিবেশন আহূত হল।[২৭] মানভূমের বঙ্গভুক্তি সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি সভাপতি, অতুলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক জিতান সম্মেলনে উত্থাপিত হয়েছিল সেটি ভোটে দেওয়া হল।

ভোটে পরাজয় ঘটল[২৮] সভাপতির। ফলে সভাপতি ও সম্পাদক পদত্যাগ করলেন।

---

২২ ৫ মার্চ ১৯৪৮।

২৩. Circular of District Inspector of Schools, Manbhum under No. 700. IIG—5—48, Purulia, 8 March 1948 to all the Sub-Inspectors of Schools of the District.

২৪. Circular No. 701/5 R—5—48 dt. 18 March 1948.

২৫. মুক্তি, ৮ মার্চ, ১৯৪৮ (৯/১৩), সম্পাদকীয়।

২৬. জিতান সম্মেলন সুরু হয়েছিল ৩০ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ।

২৭. পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহূত হয়েছিল ৩০ ও ৩১ মে, ১৯৪৮।

২৮. প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট পড়েছিল ৪৩টি, বিপক্ষে ৫৫টি। (মুক্তি, ৯/২৫)।

পদত্যাগ করলেন আরও সাঁইত্রিশ জন।[২৯] পুনর্গঠিত হল জেলা কংগ্রেস কমিটি।[৩০] প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক পাকবিড়রা গ্রামে কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন আহ্বান করলেন। কংগ্রেস ভেঙে সৃষ্টি হল লোকসেবক সঙ্ঘের।[৩১] সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীর আদর্শ ও কর্মনীতির আদলে জনগণের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন গঠন। পরবর্তীকালে লোকসেবক সঙ্ঘই মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন বিষয়ে কংগ্রেসের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে।[৩২] ভাষার প্রশ্নটিই কেবলমাত্র নয়, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক প্রশাসনিক সুযোগসুবিধার সঙ্গে ভারতের ঐক্য ও প্রতিরক্ষার বিষয়গুলিও বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন বলে অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও শ্রীপট্টি শ্রীরামুলুর আত্মদানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন ভারতে প্রথম যে প্রদেশটা গঠিত হল, সেটি তেলেগু ভাষাভাষী-প্রধান অন্ধ্র প্রদেশ।[৩৩] ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশটি গঠিত হবে বলে পার্লামেন্টে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল।

যে আগুন এতদিন ধিকি-ধিকি করে জ্বলছিল, ভারত জুড়ে এবার তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলন জোরদার হলে ভাষানুসারী প্রদেশগঠন সহজতর হবে, এ অনুমান অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের ফলে সমর্থিত হল। প্রধানমন্ত্রীর কমিটির (জে. ভি. পি-কমিটি) রিপোর্টের মধ্যেও সেজাতীয় ইঙ্গিত নিহিত ছিল।[৩৪]

---

২৯. তাদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছিল ২০ জুন ১৯৪৮।

৩০. নতুন কমিটিতে সভাপতি হলেন মহেশ্বর মাহাত। সম্পাদক দুজন, রঘুনন্দন সিংহ চৌধুরী ও হরিপদ সিংহ (ঝালদা)।

৩১. পাকবিড়রার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩০ ও ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ বা ১৩ ও ১৪ জুন ১৯৪৮। লোকসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটির প্রস্তাবক ছিলেন, জগবন্ধু ভট্টাচার্য, সমর্থক, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদবরণ চৌবে ও বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত।

৩২. অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জানুয়ারি ১৯৫৩।

৩৩. অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন বিষয়ে লোকসভায় বিল এসেছিল ১০ আগস্ট ১৯৫৩, সৃষ্টি হয়েছিল ১ অকটোবর ১৯৫৩।

৩৪. "The committee admitted that if public sentiment was insistent and overwhelming the practicability of satisfying public demand with its implications and consequences must be examined." Report of SRC, para 62.

ফলে মানভূমে সুরু হল টুসু আন্দোলন। দল বেঁধে স্বেচ্ছাসেবকেরা টুসু ও ঝুমুর গান গেয়ে গেয়ে আন্দালনের প্রচার চালিয়ে চললেন। বড় বড় জনসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হতে লাগল। তাতে গাওয়া হত নানা ধরণের গান যেমন,

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখত্যে লারবি ডাঙ্গ দেখাই।[৩৫]

কিংবা,

(আমার)বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে।
মারবি তোরা কে তারে
বাংলা ভাষা রে॥[৩৬]

ভারতব্যাপী তীব্র বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বেশী-দিন নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হল না। গঠিত হল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন।[৩৭] জনসাধারণ ও জনসমিতিগুলির কাছ থেকে অভিমত ও প্রস্তাব আহ্বান করা হল। জমা পড়ল দেড় লক্ষাধিক প্রস্তাব। ভারতে একশো চারটি স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলেন কমিশনের সদস্যেরা, সাক্ষাৎকারও নেওয়া হল কিছু কিছু।

মানভূম জেলায় মরশুমি ফুলের মত বহু হিন্দী ও বাংলা পত্রপত্রিকা গজিয়ে উঠল।[৩৮] হিন্দী ও বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীবৃন্দ তুমুল প্রচারে নেমে পড়লেন। ১৯৫১ সালের জনগণনায় পরিসংখ্যান যথাসম্ভব বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছিল, কমিশনার সামনে তাও হাজির করা হল।

---

৩৫. গানটি শ্রীভজহরি মাহাত রচিত ছিল।

৩৬. শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত।

৩৭. The States Reorganisation Commission গঠিত হয়েছিল Govt. of India, Home Affairs-এর Resolution No. 53/69/53—Public, dated 29 December 19⁵3 অনুসারে। সদস্য ছিলেন, Saiyad Fazl Ali—Chairman, Hriday Nath Kunzru—Member ও Kavalam Mahava Panikkar—Member. কমিশনের রিপোর্ট দেবার কথা ছিল ৩০ জুন ১৯৫৫। পরে মেয়াদ বাড়িয়ে সেটা করা হয়েছিল ৩০ সেপটেমবর ১৯৫৫।

৩৮. যেসব পত্রিকা গজিয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিন্দী—নিরালা, প্রগতি, নির্মাণ, প্রজাতন্ত্র, জনসেবক, সমবেত ইত্যাদি। হিন্দী ও বাংলা মেশান—জনজাগরণ ও জনবিদ্রোহ। বাংলা—মর্মবীণা, কল্যাণবার্তা, হরিজন কল্যাণ-সংবাদ, পল্লীসেবক, তপোবন, অগ্রগামী, মানভূম ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দাবী খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে কমিশন রিপোর্ট পেশ করলেন। ধানবাদ মহকুমার ওপর পশ্চিমবঙ্গের দাবী নাকচ হল। কমিশন জানালেন দামোদর উপত্যকার কয়লাখনি-অঞ্চল, দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের শিল্পাঞ্চল সমন্বিত ধানবাদ মহকুমাটি বিহার রাজ্যের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শতকরা পয়ষট্টি ভাগ অধিবাসীর কথ্য ভাষা হিন্দী। ফলে মহকুমাটি বিহারে থাকাই যুক্তিযুক্ত।[৩৯]

পুরুলিয়া সদর মহকুমার বঙ্গভুক্তির বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচিত হল। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প হিসেবে কংসাবতী জলাধারের উপকৃত এলাকা পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত, ফলে চাস থানা বাদে পুরুলিয়া মহকুমার সমগ্রাংশ পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ বলে কমিশন সুপারিশ করলেন।[৪০]

ধলভূমের ব্যাপারটি ছিল আলাদা। পরগণাটিতে হো, ওড়িয়া, বাংলা, হিন্দী ও সাঁওতালী ছিল কথ্য ভাষা। প্রধান না হলেও বাংলা ছিল বৃহত্তম গোষ্ঠীর ভাষা। ধলভূমের অন্তর্গত জামশেদপুর সহর প্রকৃতিতে এমন, কোন প্রদেশই তাকে আলাদাভাবে দাবী করতে পারে না। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীরা বসবাস করেন। ফলে জামশেদপুর সহর পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে বা ধলভূম পরগণা ভেঙ্গে কিছু অংশ বাংলায় আনতে কমিশন রাজি হলেন না[৪১]

কমিশনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মানভূমে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠল। বাংলা ভাষীরা বললেন, বাংলায় যাবো, হিন্দীভাষীরা শ্লোগান তুললেন, বিহারমে রহেঙ্গে। বিহার বিক্ষুব্ধ কারণ বিহারের একাংশ পশ্চিমবাংলাকে দেবার সুপারিশ হয়েছিল। বাংলা অসন্তুষ্ট কারণ প্রাপ্য এলাকা থেকে বড় একটা অংশ বহিভূর্ত হয়েছিল। প্রতিবাদ হিসেবে বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন পালন করা হল।

টালমাটাল অবস্থা সামাল দিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার বরলেন।[৪২] তাতে

৩৯. Report of SRC, Para 659.

৪০. "We propose that the Purulia sub-district excluding the Chas thana should be transferred to West Bengal."—Report of the SRC, Para 666.

৪১. Report of the SRC, Para 667.

৪২. বিবৃতিটি প্রচারিত হয়েছিল ২৩ জানুয়ারি ১৯৫৬।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একত্রিত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হল। প্রদেশটির নাম প্রস্তাবিত হল 'পূর্বপ্রদেশ'।[৪৩]

প্রস্তাবিত সংযুক্ত প্রদেশের বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে প্রবল আন্দোলন সুরু হল। প্রতিবাদ উঠল কংগ্রেসের ভেতর থেকেই। প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা অসন্তোষ জানালেন।[৪৪] বিরোধী দল ও সংস্থাগুলিও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।[৪৫] জেলায় জেলায় ও কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হল। প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে ষাটজন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করে চললেন। তবু একই সাথে বিহার ও পশ্চিমবাংলার বিধান সভায় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করার দিন ধার্য করা হল। পাশও হয়ে গেল বিহারের বিধানসভায়।[৪৬] পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেটি আনা হল অন্যভাবে।

অতুলচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত বঙ্গ-সত্যাগ্রহ অভিযান ছিল সংযুক্তি প্রস্তাব-বিরোধী, প্রতিবাদ মিছিল। পুরুলিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পদযাত্রা। অভিযানকারীদের মধ্যে ছিলেন মহিলা,[৪৭] লোকসেবক সঙ্ঘের এম. পি ও এম. এল. এ, গানের দল ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। অভিযানের পথটি আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সমগ্র পথটি সরেজমিনে পরিভ্রমণ করে নিয়েছিলেন।[৪৮]

---

৪৩. ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেছিলেন হিন্দী ও বাংলা দুটিই হবে সংযুক্ত প্রদেশের সরকারি ভাষা। কেবিনেট, বিধানসভা, পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকবে একটি করে, হাইকোর্ট ২টি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত করতে কাউনসিল থাকবে ২টি।

৪৪. কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিমলচন্দ্র সিংহ সাতকড়ি পতি রায় প্রমুখ।

৪৫. রাজনৈতিক দল ও সংস্থার মধ্যে ছিল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (প-ব-শাখা), বামপন্থী দলসমূহ, রাজ্যপুনর্গঠন সমিতি, রাজ্যপুনর্গঠন সংযুক্তি পরিষদ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা।

৪৬. ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ বিহার বিধানসভায় প্রস্তাবটি আনীত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আনা হয়েছিল সংশোধনী প্রস্তাবের জের হিসেবে।

৪৭. মহিলাদের দলে দলপতি ছিলেন বাসন্তী রায়, অন্যান্য অভিযানকারিণী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, লক্ষ্মী, দামিনী, পূর্ণিমা, সারদা, ভামিনী, যশোদা, চাঁপা, শান্ত ও মিথিলা দেবী।

৪৮. পথটি ছিল পাকবিড়রা থেকে বাঁকুড়া সহর হয়ে বেলিয়াতোড়—সোনামুখী—পাত্রসায়ের—বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ—বর্ধমান সহর—পাণ্ডুয়া—মগরা—চুঁচুড়া—চন্দননগর এবং হাওড়া স্টেশন হয়ে কলকাতা। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মুক্তি, ১৯৫৬ সালের সংখ্যাগুলি।

পথের দুইদিক সুসজ্জিত হয়েছিল মালা ফুল ও তোরণে। কাতারে কাতারে মানুষ এই ঐতিহাসিক পদযাত্রা দেখতে পথের দুদিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্রামের স্থানগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীরা আয়োজন করেছিলেন সংবর্ধনার। আয়োজিত হয়েছিল জনসভা। পথের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

হাওড়া সেতু পেরিয়ে পদযাত্রিকেরা কলকাতায় ঢুকেছিলেন ৬ মে। সেদিন ছিল রবিবার। সেখানেও সংবর্ধনার আয়োজন ছিল বিপুল। দলমত নির্বিশেষে অভিযাত্রিকদের মাল্যভূষিত করা হয়েছিল।[৪৯] অপরাহ্নে আয়োজিত হয়েছিল জনসভা। তাতে সভাপতি ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

মানভূমের মত ধলভূমেও বঙ্গভুক্তির দাবী উঠেছিল। গঠিত হয়েছিল 'মুক্তি পরিষদ'।[৫০] একশো পঁচাত্তর জনের একটি দল ধলভূম থেকে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা সুরু করেছিলেন। কলকাতায় পেঁছেছিলেন মানভূম-সত্যাগ্রহীদের একদিন আগে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সভাপতিত্বে হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জনসভা।[৫১] পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, ধলভূমের সত্যাগ্রহীরা গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন।

মানভূমের সত্যাগ্রহীদের কর্মসূচী ছিল রাইটার্স বিলডিংস অবরোধ করার। ৭মে দেশবন্ধু পার্ক থেকে সত্যাগ্রহীরা শোভাযাত্রা ক'রে বর্তমান বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগে পেঁছুলে, পুলিস গতিরোধ করেছিল মিছিলটির। ন'শো পঁয়ষট্টিজন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। মানভূম ও ধলভূমের সত্যাগ্রহীরা কলকাতায় পেঁছুবার আগেই মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।[৫২]

---

৪৯. যারা মালা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার বসু, মোহিত মৈত্র প্রমুখ।

৫০. 'মুক্তি পরিষদে'র সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী। অন্যতম নেতা কিশোরীমোহন উপাধ্যায়।

৫১. সভাপতি ছাড়া সভায় আর যারা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাতকড়িপতি রায়, ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

৫২. গণদাবী মেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছিলেন ৪ঠা মে ১৯৫৬। ইতিমধ্যে সারা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৩০০ স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করেছিলেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি 'বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ হস্তান্তর বিল'টি পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারের দপ্তরে এসে পেঁছেছিল। সেটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য গঠিত হয়েছিল যুক্ত সিলেক্ট কমিটি। কমিটি রিপোর্ট দেবার পর লোকসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবাংলা ও বিহারের সীমানা পুনর্গঠিত ও কার্যকর করা হবে—স্থির হয়েছিল সিদ্ধান্ত।[৫৩]

প্রস্তাবে ষোলটি থানা নিয়ে পুরুলিয়া নামে নতুন জেলা গঠনের ইংগিত ছিল। বিহার থেকে সরিয়ে এনে সেটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে পশ্চিমবাংলার। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ডিভিসন বা ভুক্তি, বর্ধমানের আওতাভুক্ত হবে জেলাটি।[৫৪]

পুরুলিয়া জেলার জন্ম হয়েছিল হেমন্তের প্রত্যুষে। বাতাসে হিম জড়ানো অল্প অল্প শীত। পর্ণমোচী গাছগুলো প্রায় নিষ্পত্র। নদীর বুকে জলের ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে সুরু করেছিল। একদা সমৃদ্ধ বনভূমির কংকালের ওপর সূর্যের অগ্নি-ভ্রূকুটি ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছিল। কি হারিয়েছি, কি পেয়েছি—হিসেবনিকেশে বিরতি পড়েছিল ক্ষণকালের। অধিবাসীরা উৎসাহে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন অংগচ্ছেদের যন্ত্রণা,[৫৫] যা পরবর্তীকালে অহরহ এবং এখনও প্রতিদিন তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতির দিক থেকে অখণ্ড মানভূম জেলার অনিবার্যতা।

---

৫৩. বিলটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের দপ্তরে পেঁছেছিল ১৪ জুন ১৯৫৬। যুক্ত সিলেক্ট কমিটি লোকসভায় রিপোর্ট পেশ করেছিল ১১ আগস্ট ১৯৫৬। ১৭ আগস্ট লোকসভায় গৃহীত হয়েছিল প্রস্তাব।

৫৪. ১৯১১ সালে মানভূম জেলার আয়তন ছিল ৪১৪৭ বর্গমাইল। সদর ও ধানবাদ মহকুমার আয়তন ছিল যথাক্রমে ৩,৩৪৪ ও ৮০৩ বর্গমাইল। সদর মহকুমার থানা ছিল ১০টি, ফাঁড়ি ৬টি। ধানবাদ মহকুমার থানা ২টি, ফাঁড়ি ১টি।

১৯৫১ সালে মানভূম জেলার আয়তন ছিল ৪১১২ বর্গমাইল। ১ নভেমবর ১৯৫৬ পুরুলিয়া জেলার আয়তন কমে দাঁড়িয়েছিল ২৪০৭ বর্গমাইল। বাদ গিয়েছিল সম্পূর্ণ ধানবাদ মহকুমা ও তিনটি থানা। একসময় পুরুলিয়া সদর মহকুমার দুটি থানা—চাষ ও চন্দনকিয়ারী, গোবিন্দপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ধানবাদ মহকুমা গঠিত হলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ধানবাদের। অপর তিনটি থানা পটমদা, চাণ্ডিল ও ইচাগড় ছিল সদর মহকুমার অন্তর্গত। সীমানা পুনর্বন্টনের সময় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সিংভূম জেলার।

৫৫. 'বহু যুগে আজ মানভূমে মোরা / এই শুভ দিনে নিলাম বরি, / ধন্য হলেন জননী আবার / হারানো তনয়ে বক্ষে ধরি। / জয় গৌরবে এসেছে ফিরিয়া / সন্তান তার আপন গেহে / ছিন্ন অঙ্গ দেশমাতৃকা / দেখা দিল পুনঃ পূর্ণ দেহে। / —রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব, মুক্তি ১ নভেমবর ১৯৫৬।

ভূগর্ভ ও ভূপ্রকৃতি

'One of the most noteworthy rocks of Manbhum,
not from its bulk but for its wide distribution,
is a peculiar siliceous and sometimes
ferruginous rock which accompanies lines of
faulting.'—E. W. Vredenburg.

পুরুলিয়ার ভূপ্রকৃতি ছোটনাগপুর মালভূমির বৈশিষ্ট্য জড়ানো। পশ্চিমদিকে বৈশিষ্ট্য যতটা সুচিহ্নিত ও স্পষ্ট, উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে ততটা স্পষ্ট নয়। পশ্চিমে, রাঁচির দিকে উঁচু হয়ে উঠেছে ভূমি। উত্তুঙ্গ অধিত্যকা পূর্বদিকে গড়াতে গড়াতে মেদিনীপুরের সমতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম জুড়ে ছাড়া ছাড়া, দীর্ঘ শৈলশ্রেণীর অবক্ষয়িত প্রাকার। মধ্যাঞ্চলের সমতলে, কোথাও কোথাও হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নাতিউচ্চ ডুংরি।

জেলার সামগ্রিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যটি একসঙ্গে গাঁথলে মনে হয়, আদিমযুগে অতিকায় পাথুরে সরীসৃপের দল পশ্চিম থেকে পূবে নেমে এসেছিল দলবেঁধে। হঠাৎ কোন অজ্ঞাত নিয়ন্ত্রক তাদের থামতে বলেছিলেন; থেমেছিল তারাও। সেইভাবে আজও স্থির।

ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জেলাটিকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন ভ্রেডেনবার্গ।[১] এক, উত্তরে রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনি প্রধান দুটি অঞ্চল,

---

১ Geology—E W. Vredenburg : Appendix to Chapter I ; Bengal District Gazetteers, Manbhum by H. Coupland, 1911.

মি. ভি. বল ভাগ করেছিলেন ৬ ভাগে। (১) রূপান্তরিত শিলায় গঠিত অঞ্চল, সেখানকার গড় উচ্চতা ৪ থেকে ৫ শো ফুট। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা বা ডুংরি বিদ্যমান। (২) কয়লাখনি-প্রধান দামোদর উপত্যকা; সেখানে বড় পাহাড় আছে দুটি, পাচেট ও বিহারীনাথ। (৩) বড় বড় পাহাড় সমন্বিত রূপান্তরিত শিলায় গঠিত অঞ্চল; পাহাড়গুলি—শুশুনিয়া, রঘুনাথপুর ও সিন্দুর পাহাড়। (৪) বাগমুণ্ডি অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমে রূপান্তরিত শিলায় গঠিত অঞ্চল। (৫) টিলা ও ডুংরি সমন্বিত রূপান্তরিত শিলায় গঠিত অঞ্চল। (৬) ধলভূম ও সিংভূমের বিচ্ছিন্ন রেশ, সেখানে মাটি ও অরণ্যের প্রকৃতি পৃথক।—Flora of Manbhum, JASB, 1869, Part II.

অঞ্চল দুটির মাঝখানে স্ফটিক শিলাস্তর তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। দুই, মধ্যবর্তী অঞ্চল, যা জেলাটির মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত এবং সম্পূর্ণভাবে স্ফটিক শিলাদ্বারা গঠিত। তিন, দক্ষিণাঞ্চল, অন্যতম প্রাচীন শিলাস্তর শ্লেট দ্বারা গঠিত এবং তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাচীন আগ্নেয় শিলা—যার বিন্যাস ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদদের কাছে ধারওয়ার বিন্যাস নামে পরিচিত।

জেলার গর্ভস্থিত লক্ষ লক্ষ বছরের বৈচিত্রপূর্ণ শিলাময় যে পৃথিবী, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও রূপান্তরের মাধ্যমে সমৃদ্ধ খনিজ ভাণ্ডারের সৃষ্টি করেছে, তা আজও যথাযথভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি। উত্তরে কয়লাখনি-প্রধান গণ্ডোয়ানা অববাহিকার মধ্যে পাঁচেট অঞ্চলটি অবস্থিত। অঞ্চলটি দুটি ভাগ ও কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত। যেমন,

মধ্য গণ্ডোয়ানা	কার্মথি	
	পাঁচেট	
নিম্ন গণ্ডোয়ানা	দামোদর অঞ্চল	রানীগঞ্জ অঞ্চল
		লোহাপাথর স্তর
	তালচের	বরাকর অঞ্চল

অঞ্চলটি কয়লা ছাড়াও চুন, লোহা ও ম্যাগনেসিয়ামে সমৃদ্ধ। পাঁচেট স্তরটি ঝরিয়া খনি অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে, সেখানেই বিলুপ্ত হয়েছে। রানীগঞ্জ অঞ্চলের ব্যাপ্তি অনেকখানি জুড়ে। পঞ্চকোট পাহারের নিচেও স্তরটি নিহিত। সেখানকার ওপরের স্তরটি কার্মথি বালিপাথরে গঠিত। পাঁচেট স্তরটির গভীরতা দেড় হাজার ফুট, কয়লা বিরল, প্রধানত লালমাটি ও বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। অপেক্ষাকৃত কম গভীরতায়, অর্থাৎ আড়াইশো থেকে তিনশো ফুট নিচে বিন্যস্ত ধূসর ও সবুজাভ ধূসর রঙেব বেলেপাথর ও শ্লেট আকরের কোমল পাথর। তাদের সঙ্গে মেশানো আছে অভ্র।

স্তরটিতে অস্পষ্টভাবে মুদ্রিত বৃক্ষের জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায়। জীবাশ্মগুলির সঙ্গে দামোদর স্তরের জীবাশ্মগুলির মিল আছে। উভচর প্রাণী ও একজাতীয় সরীসৃপের ফসিলও কখনও কখনও চোখে পড়ে।

গণ্ডোয়ানা অববাহিকার অন্তর্গত উত্তরেব পরিমণ্ডলটির মোট এলাকা দুহাজার সাতশো চল্লিশ মিটার।[২] জেলার মধ্যে অবস্থিত কয়লাখনি প্রধানত

---

২. Mineral resources and the possibility of Mineral based industries in the District of Purulia—H. N. Neogi, Senior Geologist (Essay).

নেতুড়িয়া থানার অন্তর্গত।[৩] কয়লা ছাড়াও চুনাপাথরের সঞ্চয়ে পরিমণ্ডলটি সমৃদ্ধ। সঞ্চয়ের সিংহভাগ আছে নেতুড়িয়া থানার হাঁসাপাথর এলাকায়। ঝালদা থানার জাবর পাহাড়ের কাছাকাছি নিহিত দ্বিতীয় সঞ্চয়টি। তৃতীয় সঞ্চয়টি গচ্ছিত পাঁচেট পাহাড়ের কাছে বাগমারা অঞ্চলে।[৪] জাবর-পাহাড়ের সঞ্চয়ে চুনাপাথরের মধ্যে ম্যাগনেসিয়ামের ভাগ কম থাকায় সিমেন্ট তৈরীর পক্ষে উপযোগী। ফলে এ অঞ্চলে একটি ছোট সিমেন্ট কারখানা তৈরির প্রস্তাব অনেকদিন ধরে বিবেচনাধীন।[৫]

উত্তরের পরিমণ্ডলে বড়সিনি থেকে রামকানালি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গ্রাফাইটের সঞ্চয় বিদ্যমান। এই গ্রাফাইটে কার্বনের পরিমাণ বেশী। যে সঞ্চয় আছে, তাতে দিনে পঞ্চাশ টন সংগৃহীত হয়ে কাজে লাগতে পারে। জাতীয় মেটালার্জিকাল ল্যাবোরেটরী খনিজটির বাণিজ্যিক উপযোগিতা সৃষ্টি করতে উদ্যোগ নিয়েছেন।

ভূগর্ভের শিলাবৈচিত্র্য ভূপৃষ্ঠের ওপরেও স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে। আসানসোল থেকে দক্ষিণপূর্ব রেলপথের যে শাখাটি মধুকুণ্ডা, মুরাডি, আনাড়া, ছড়রা স্টেশন হয়ে পুরুলিয়া সহর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, তার উত্তর পশ্চিমাংশের অঞ্চলসমূহ সৃষ্টি করেছে উত্তরের উত্তরতম পরিমণ্ডল। মানচিত্রের ওপর দেখতে লম্বা ফালির মত। ফালিটির সঙ্গে পশ্চিমদিকের আর একটি ফালি যুক্ত হয়েছে। সেটি ছোট এবং আরও শীর্ণ। পুরুলিয়া সহর থেকে যে ছোট রেলপথ মুড়ি জংশন স্টেশন পর্যন্ত প্রসারিত, জাতীয় সড়ক ৩৪ রেলপথটির সঙ্গে পাশাপাশি এসে সিন্ধি বা চাষ মোড়ের কাছে বাঁক নিয়ে বিহারের ধানবাদ জেলায় অনুপ্রবেশ করেছে। জাতীয় সড়কের পূর্বাংশ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে উত্তরের উত্তরতম পরিমণ্ডলটির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। দুটি

---

৩. পরিত্যক্ত ও চালু কোলিয়ারিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাণীপুর, পারবেলিয়া, হীরাকুন, তামুরিয়া ও নেতুড়িয়া। খনিগুলিতে ৯৩০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট, ও ১১০ লক্ষ টন নিম্নমানের কয়লা মজুত আছে বলে অনুমিত।

৪, তিনটি এলাকার মোট সঞ্চয় ১২'৯০ মিলিয়ন টন; জাবরপাহাড় (৪'৮ মি. ট)। বাগমারা (১'৩৮ মিট) ও হাঁসাপাথর (৬'৭৪ মি ট)। প্রতি বছর চুনাপাথর সংগৃহীত হয় ৩০ হাজার টন। এ ছাড়া রঘুনাথপুর ও পুরুলিয়া মফঃস্বল থানা এলাকার মধ্যেও কিছু সঞ্চয় আছে।

৫. The State Directorate of Mines and Geology—West Bengal, প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট দিয়েছেন।

অংশ একত্রে অর্থাৎ নেতুড়িয়া, সাঁতুড়ি, সাঁওতালডি, পাড়া, পুরুলিয়া মফঃস্বল, রঘুনাথপুর ও হুড়া থানার সমগ্র ও অংশবিশেষ এই পরিমণ্ডলটির অন্তর্ভুক্ত। পুরুলিয়া জেলার ভেতর এটিই দামোদর নদের মূল অববাহিকা অঞ্চল। উত্তর পশ্চিমে ভূপৃষ্ঠ কিছুটা বন্ধুর ও শিলাময় হলেও, পূবের দিক অনেকটা সমতল। মাটির স্তর একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, ফলে চাষ আবাদ চলে। কয়লাখনিগুলিও এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত।

উত্তরতম পরিমণ্ডলের পূর্বদিকের সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে পাঁচেট পাহাড়। পোশাকী নাম পঞ্চকোট। সাগরাঙ্ক বা সমুদ্র সমতল থেকে ষোলশো ফুট উঁচু, চৌরাশি পরগণার অন্তর্গত। দূরত্ব পুরুলিয়া সহর থেকে ৩৫ মাইল বা প্রায় ৫৩ কিলোমিটার। পাহাড়টি আকারে দীর্ঘ শৈলশিরায় দাগ কাটা কাটা, শীর্ষ মিলিত হয়েছে পূর্বান্তে। ছোট ছোট ঘন জঙ্গলে ঢাকা উত্তুঙ্গ খাড়াই, মানুষ ও ভারবাহী পশুর পক্ষে গম্য, চাকাওয়ালা শকটের পক্ষে দুর্গম। পাদদেশে আম ও মহুয়ার ছাড়া ছাড়া বন।

পঞ্চকোট পাহাড়ের উত্তরে, দামোদর নদের ওপর, অতিকায় পাঁচেট জলাধার। পূবের পাদদেশে পঞ্চকোট রাজাদের প্রাচীন গড় ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ক'টি ভাঙ্গাচোরা মন্দির। আরও কিছুটা দক্ষিণে কালচে বলিষ্ঠ শিলার পাহাড় গুচ্ছ। কাঁটাগাছের অল্প স্বল্প ঝোপ, ভূপৃষ্ঠ প্রায় অনাবৃত। এদের ভেতর তিনশো ফুট উঁচু প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, নাম ঘাতক পাহাড়-বা একসিকিউশন হিল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের এই পাহাড়ের চূড়া থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হত বলে জনশ্রুতি। পাঁচেট রাজাদের অধীনস্থ ছিল পাহাড়টি।

সমতলভূমির মধ্যে পঞ্চকোট পাহাড়ের আকস্মিক উন্নত রূপ সম্ভবত মধুসূদনের কবিকল্পনা উদ্দীপ্ত করেছিল। লিখেছিলেন,

> কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
> পর্বতকুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি
> সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
> পঞ্চকোট ![৬]

পাঁচেট শৈলগুচ্ছের কাছে কতকগুলি খাতে মোলডিং স্যান্ড বা ঢালাইয়ের

---

৬. পঞ্চকোট গিরি—মধুসূদন দত্ত।

হলদে বালি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চৌরাশি মৌজায় এ ধরনের বালির সঞ্চয় সবচেয়ে বেশী। পরিকল্পিতভাবে বালি সংগ্রহের উদ্যোগ এখনও তেমনভাবে নেওয়া হয়নি। মধুকুণ্ডা স্টেশন ও চৌরাঙ্গি সাইডিংয়ের কাছ থেকে হলদে রঙের বড় বড় বালির চাঁই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ঢালাইয়ের বালি ছাড়াও নদীতটের বালি, রাস্তা ও রেলপথের ব্যালাসট্ এবং কংক্রিটের কাজের জন্য কালো পাথর জেলার প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। কাঁসাইয়ের নদী খাতে যে বালি পাওয়া যায় তার চাহিদাও কম নয়।

জাতীয় সড়ক ৩৪ এর পশ্চিমে, উত্তরে বিহার ও দক্ষিণে রেলপথটির দ্বারা চিহ্নিত মধ্যবর্তী অংশ সৃষ্টি করেছে পুরুলিয়া জেলার উত্তর পশ্চিমের পরিমণ্ডল। প্রকাণ্ড মনোলিথের মত ছোট পাহাড়, উপত্যকা, মাঝে মাঝে হরিৎ শস্যক্ষেত্র পরিমণ্ডলটিকে ছবির মত সাজিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির এই সাজসজ্জার সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা যুক্ত হয়েছে ঝালদা সহরে।

সহরটি সুন্দর। চারদিক দিয়ে ঘেরা পাহাড়, তাদের সানুদেশে চওড়া আলে বাঁধা খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র। মাটির প্রকৃতি শক্ত ও পাথুরে, ঢেউখেলানো বন্ধুর ক্ষেত্র, দেখলেই বোঝা যায় চাষ আবাদের পক্ষে ততখানি উপযোগী নয়। তবু চাষ চলে কারণ জীবিকার বিকল্প পন্থা অনুপস্থিত।

উত্তর পশ্চিমের সমগ্র পরিমণ্ডলটির চেহারা ঝালদা সহরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। পাহাড়ময় ও একদা বসতিবিরল এই অঞ্চলে অরণ্য ছিল নিবিড় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্মূল। পরিমণ্ডলটির জাবর পাহাড় ও মাহতমারা এলাকা খনিজ সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ।

চুনাপাথর ছাড়াও পরিমণ্ডলটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় আছে ফ্লুওরাইট ও চীনামাটির। ইস্পাত ও এনামেল শিল্পে ফ্লুওরাইটের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। খনিজটি ভারতে বিরল, পূর্বভারতের লৌহশিল্পগুলির জন্য গুজরাট রাজ্য থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। ঝালদা থানার বেলামু মৌজায় আছে দশ হাজার টনের মত। দুর্গাপুর, বার্ণপুর ও জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানাগুলি বেলামুর কাছাকাছি অবস্থিত। সেদিক থেকে সঞ্চয়টির উপযোগিতার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

চীনামাটির সঞ্চয় জেলার সর্বত্র কিছু কিছু বিদ্যমান। পরিমাণের নিরিখে পুরুলিয়ার স্থান পশ্চিমবাংলায় তৃতীয়।[৭] ঝালদা থানার মাহাতমারায় সঞ্চিত

---

৭. অনুমিত পরিমাণ (১৯৪৮ সাল)—১০, ১৯, ৬৬৬ টন। বর্তমানে (১৯৮০ সালে)—১৪ লক্ষ টন। প্রধান প্রধান সঞ্চয়—রঘুনাথপুর থানার আমতোড়-ধাতরা, ঝালদা থানার মাহাতমারা, বাগমুণ্ডি থানার শ্রাবণ্ডী, হুড়া থানার কল্যাবণী, বলরামপুর থানার মালতী, মানবাজার থানার খাঁড়দুয়ারা ও শিয়ালডাঙ্গা।

চীনামাটি গুণগত উৎকর্ষে ভারতে এ পর্যন্ত পাওয়া চীনামাটির নমুনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। তেরশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে চমৎকার সাদা রঙ ধরে, ভাল পেয়ালাপিরিচ তৈরির পক্ষে উপযুক্ত। ভালভাবে ধৌত হলে ইনসুলেটার ও নন-সেরামিক শিল্প অর্থাৎ তাঁতবস্ত্র, রবার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হতে পারে।

জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও দুটি এলাকায় চীনামাটির সঞ্চয় অনেকটা ঘনসংবদ্ধ। যথা, ধাতারা-মালতী-কালাজোড়-মাহাতমারা এবং খড়িদুয়ারা-শিয়ালডাঙগা-ধানুডি। প্রথমোক্ত এলাকাটি উত্তরপশ্চিম পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় এলাকায় আমতোড়ের খনিটি থেকে চীনামাটি সংগ্রহের কাজ চালু আছে। এলাকাদুটির কাছাকাছি ওয়াশিং প্ল্যান্ট তৈরির সম্ভাবনা মনোযোগ দাবী করে।

ঝালদা থেকে কুশটাড় পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে পারমাণবিক খনিজের সঞ্চয় বিদ্যমান। সিলিকা বালি ও ফেলস্পারের সঞ্চয়ও আছে উত্তরপশ্চিমের পরিমণ্ডলে।[৮] যদিও এ দুটি খনিজের মজুত সবচেয়ে বেশী পরিব্যাপ্ত জেলার মধ্যাঞ্চলে।

মধ্যাঞ্চলটি আয়তনে সবচেয়ে বড়। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ডুংরি মাথা তুলে দাঁড়ালেও ভূপ্রকৃতি মোটামুটি সমতল। জেলার প্রধান নদীগুলি অঞ্চলটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মাটির ত্বক পুরু, ফলে চাষআবাদের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। জনবসতি ঘন, গ্রামগুলির চেহারা পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামগুলির তুলনায় সমৃদ্ধ। খনিজ সঞ্চয়েও অঞ্চলটি দরিদ্র নয়।

মধ্যাঞ্চলের সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষ্ণকায় যে ডুংরিগুলি হঠাৎ পথিককে চমকে দেয়, ভূতাত্ত্বিকের ভাষায় তাদের বলা হয় 'ডোম নাইস।' আসলে অমার্জিত আগ্নেয় শিলা, কোয়ার্জ অভ্র ও বিশুদ্ধ ফেলস্পার দিয়ে গঠিত। রঙ কোথাও ফ্যাকাসে লাল বা ধূসর, কোথাও ইট লাল।

ডোম নাইসের পরিমণ্ডলটি লম্বালম্বিভাবে দুটি স্তরে বিভক্ত। উত্তরদিকে বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উত্তরপূর্বে, পাঁচেট পাহাড়ের পাঁচ মাইল দক্ষিণে বেড়ো গ্রাম থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণমুখী হয়ে কুড়ি মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে একটি স্তর। চওড়ায় চার থেকে পাঁচ মাইল। অপর স্তরটি লধুড়কা

---

৮. সিলিকা বালির সঞ্চয় আছে ঝালদা থানার জহরহাট বড়রোলা, বেলামু, দিগরাভ প্রভৃতি অঞ্চলে। ফেলস্পারের মজুত আছে ঝালদা থানার ছাকসারা অঞ্চলে।

গ্রামের কাছ থেকে পাঁচ মাইল। অপর স্তরটি লধুড়কা গ্রামের কাছ থেকে সহসা সুরু হয়েছে। লম্বা ফালির মত দীর্ঘ এই স্তরটি চওড়ায় গড়ে চারমাইল, চল্লিশ মাইল দূরে সুবর্ণরেখা নদীর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে।

সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে নাইস শিলা হঠাৎ ডোম বা গোলাকার গম্বুজের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ফলে নাম, ডোম নাইস। ঝালদা সহরের তিনদিকে খাড়া, শঙ্কুর আকারে ডোম নাইসগুলি ছোট বড় ডুংরির সৃষ্টি করেছে।

বেড়োগ্রাম ও রঘুনাথপুর সহরের উত্তরে নানা ধরণের হর্ণব্লেনডিক শিলার দেখা পাওয়া যায়। পুরুলিয়া সহর থেকে বারো মাইল উত্তরপূর্বে, সিন্দুরপুর ও তিলাবনী পাহাড়ও হর্ণব্লেনডিক শিলা বিদ্যমান। মূর্তিগড়ার গ্রানিট পাথরও এখানে লভ্য। বেড়ো গ্রামের ইটলাল গ্রানিট পাথরে পালিশ ধরে চমৎকার। অনুরূপ পাথর পাওয়া যায় মারবেদিরা, ধুনিয়া ও ঝালদা অঞ্চলে। মূর্তিশিল্প ও অলংকরণের কাজে পাথরগুলি জীবিকার নতুন পথ খুলে দিতে পারে।

উত্তরপশ্চিমের পরিমণ্ডল ছাড়াও ফেল্‌সপার ও সিলিকা বালির সঞ্চয় মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল বিদ্যমান।[৯] ফেল্‌সপার এক ধরণের পাথর, বেশী তাপে গলে যায়। চীনা মাটির জিনিসপত্রের ওপর ফেলস্‌পারের প্রলেপ দিলে কাচের মত মসৃণ দেখায়। খনিজটি দামে কম, আহরণ করতেও বেগ পেতে হয়না। ফলে জেলায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা ভাগ্যান্বেষী, সংগ্রহের কাজে লিপ্ত। সংগ্রহের পরিকল্পিত ব্যবস্থাও নেই। রেলপথের কাছাকাছি অঞ্চলগুলি থেকে এলোমেলোভাবে সংগৃহীত হয় পাথর, চূর্ণ করে চালান দেওয়া হয় কলকাতায়। রঘুনাথপুর থানার মধ্যে একটি চালু খাদান আছে।

সিলিকা বালির সঞ্চয়ও জেলার প্রায় সর্বত্র পরিকীর্ণ।[১০] ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগাবার মত সঞ্চয় আছে দুটি অঞ্চলে। পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার

---

৯ রঘুনাথপুর থানার শাঁকা, রাঙ্গামেটিয়া, বড়ানাঁড, বেনাগাড়িয়া, বাঁশগাঁও; কাশীপুর থানার কাদাঁর, জিনমানিপুর; পাড়া থানার পলমা, সনেরা, মপুঁড, বলরামপুর থানার তিলাই; পুঞ্চা থানার দেবগ্রাম ও পুরুলিয়া মফঃ থানার বেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ফেল্‌সপারের সঞ্চয় আছে।

১০. রঘুনাথপুর থানার নতুনডি, ডমরুট; পুরুলিয়া মফঃ থানার বেনজোড়া, কুসুমঝারিয়া; কাশীপুর থানার পলমা, জিনমানিপুর; বলরামপুর থানার কানা, মানবাজার থানার খাড়দুয়ারা ইত্যাদি।

দামুরিয়াকারি ও রাঙ্গামাটিয়া এবং পাড়া থানার সিন্দুরপুর সিরজম স্টেশনের কাছে। দুটি অঞ্চলেই কাচ তৈরির ছোটখাট কারখানা বসতে পারে।

সিলিকা বালির মত কোয়ার্জের বিশুদ্ধ গুচ্ছগুলির মধ্যে কাচ তৈরির উপাদান নিহিত। কোয়ার্জ ও কোয়ার্জাইটের বিপুল মজুত আছে জেলায়। কাচ ছাড়াও সিলিকা ইট তৈরি ও এব্রেসিভ শিল্পে কোয়ার্জ কাজে লাগান যেতে পারে। লোহামেশান কোয়ার্জ রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মধ্যাঞ্চলের পশ্চিমে বাগমুণ্ডি বা অযোধ্যা শৈলশ্রেণীর পরিমণ্ডল। ঝালদা পরগণার গা ঘেঁষে যেসব ছোট ছোট পাহাড়গুচ্ছ ও একক ডুংরি দক্ষিণদিকে প্রসারিত, সেসব অযোধ্যা পাহাড়েরই ভগ্নাবশেষ। পাহাড়টি রূপান্তরিত কেলাসিত শিলার সঙ্গে আধা রূপান্তরিত কেলাসিত ও গ্রানিট নাইসের বড় বড় চাঁই দিয়ে গঠিত। রোদে জলে উপরকার নরম অংশ ধুয়ে অনাবৃত হয়ে পড়েছে অতিকায় কালচে মনোলিথ বা এক শিলাখণ্ড। ঝালদা পরগণা সংলগ্ন বাসন ও দক্ষিণে মাঠাবুরু এ জাতীয় মনোলিথের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পুরুলিয়া সহর থেকে কুড়ি মাইল বা তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অযোধ্যা পাহাড়ের অধিষ্ঠান। সাগরাঙ্ক থেকে পাদদেশের উচ্চতা গড়ে ৭২০ ফুট, ওপরের গড় উচ্চতা ১৫০০ থেকে ২০০০ ফুট। সর্বোচ্চ চূড়া গঙ্গাবুরু বা গজবুরু,[১১] মাঠা মৌজার মধ্যে অবস্থিত। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যে পাহাড়টি জলবিভাজিকার রূপ নিয়েছে, কম-বেশী সর্বত্র জঙ্গলে ঢাকা। দেখতে বিস্তীর্ণ উপত্যকার মত, ছাড়া ছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও উঁচু হয়ে উঠছে টিলা, কোথাও সমতল। দক্ষিণের প্রান্তসীমায়, খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঠাবুরু। কালচে রঙের প্রকাণ্ড মনোলিথ।

সমতল অংশে মাঝে মাঝে গ্রাম বসেছে। অধিবাসীদের অধিকাংশ সাঁওতাল। অযোধ্যা পাহাড় এইভাবেই প্রসারিত হয়েছে পশ্চিমে উপত্যকা সদৃশ রাঁচির শৈলশ্রেণীর সঙ্গে।

উত্তরে পরেশনাথ বা টুণ্ডি শৈলশ্রেণী। দক্ষিণে দলমা এবং কেন্দ্রে সামান্য পশ্চিম ঘেঁষে বাগমুণ্ডি শৈলশ্রেণী ছবির মত সাজিয়ে তুলেছে পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণপশ্চিম ও পরিপার্শ্বের ভূপ্রকৃতি। বাগমুণ্ডি শৈলশ্রেণীর গর্ভে

---

১১. পুরুলিয়া জেলার পাহাড় ও ডুংরিগুলির উচ্চতা যথাক্রমে, গজবুরু ২.২২০ ফুট, বানসা ১,৭৮৯ ফুট পাঁচেট ১৬০০ ফুট, কলাবনী ১৩৬৭ ফুট।

কি কি খনিজ পদার্থ নিহিত আছে সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত যথোপযুক্ত অনুসন্ধান চালান হয়নি।

ধারওয়ার বিন্যাসের উচ্ছিন্ন অংশ দিয়ে পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণতম পরিমণ্ডলটি গঠিত। পরিমণ্ডলটির মধ্যে বাগমুণ্ডি ও বলরামপুর থানার একাংশ, বরাবাজার, মানবাজার ও বান্দোয়ান থানা অন্তর্ভুক্ত। উচ্ছিন্ন অংশ পূবে বাঁকুড়া জেলার ভেলাইডিহা ও পশ্চিমে রাঁচির বাঁধগাঁও পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, মোট এলাকা প্রায় একশো মাইল। বরাভূম গঞ্জটি এই এলাকার মধ্যে পড়লেও, ধারওয়ার বিন্যাসের ওপর অবস্থিত নয়। অন্তর্নিহিত গ্রানিট নাইসের ওপর অধিষ্ঠিত।

বরাভূম থেকে মাইল দশেক দূরে সারিবাঁধা অনেকগুলি ছোট ছোট ডুংরি দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চতা আড়াইশো থেকে তিনশো ফুট, এক জাতীয় কোয়ার্জ শিলায় গঠিত। ডুংরিগুলি আসলে ধারওয়ার বিন্যাসের স্তরচ্যুতির ভগ্নাংশ। প্রকৃতপক্ষে, দলমা শৈলশ্রেণীর কালচে রঙের আগ্নেয় শিলাই দক্ষিণ মানভূম তথা বর্তমান পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশের পাথুরে অঞ্চলের মেরুদণ্ড। এই শৈলভূমি সিংভূম থেকে মানভূমকে পৃথক করেছিল।

ধারওয়ার বিন্যাসের প্রধান উচ্ছিন্ন অংশের দেখা পাওয়া যায় মানবাজারের কাছাকাছি। চ্যুতিগুলি এখানে সুচিহ্নিত, বিভিন্ন গঠনের শিরাগুলি কোথাও কোয়ার্জ জাতীয় শিলা ও বাদামি রঙের লোহাপাথরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, কোথাও বিযুক্ত হয়েছে। ধারওয়ার বিন্যাসের প্রায় মধ্যস্তরে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়।

দক্ষিণ পরিমণ্ডলের প্রধান প্রধান খনিজ সঞ্চয় তামা, কায়নাইট, সীসা, রকফসফেট ও এসবেসটস। সাম্প্রতিককালে রকফসফেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। খনিজটির বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাপাটাইট। আবিষ্কার ছিল আকস্মিক।

পরমাণবিক খনিজের সন্ধানে ভারত সরকারের ভূতত্ত্ববিদ্‌দের দল জেলার বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছিলেন। সেইভাবেই তারা পৌঁছেছিলেন বরবাজার থানার বেলডি গ্রামে। গ্রামটিতে অ্যাপাটাইটের মজুতসহ দুটি টিলা তাদের নজরে এসেছিল। একটি টিলার নিচে ১৫০ মিটার বা ৫০০ ফুট গভীরতায় ১৮টি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছিল। অপর টিলা-টির গর্ভে ১৮৪ মিটার গভীরতায় ৩৫টি স্তর বিদ্যমান বলে অনুমান করা হয়েছিল। স্তরগুলি পুরুও কম নয়, ১ থেকে ২৩ মিটার পর্যন্ত।

টিলা দুটি ছাড়াও, হাথানাডি থেকে পোড়াপাহাড় পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে খনিজটি ছড়িয়ে আছে বলে অনুমান করা হয়।

রক-ফসফেটের প্রধান ব্যবহার সার হিসেবে। গবেষণাগারে ফেলে সারটি তৈরি করে নিতে হয় না। চাঙ চাঙ পাথর কেটে, গুঁড়ো করে সরাসরি মাঠে ব্যবহার করা চলে। ৬ ইঞ্চির মত ছোট ছোট খণ্ড সংগ্রহ করে, বোঝাই করা হয় বাকসে, কাছাকাছি মিলে সেগুলিকে চূর্ণ করে নেওয়া হয়।[১২]

যে জায়গা থেকে খণ্ডগুলি সংগ্রহ করা হয়, সেটি দেখতে গভীর পুকুরের মত। কয়লা সংগ্রহের পুখুরিয়া খাদের মত।

সার ছাড়াও, ইস্পাত কারখানাগুলিতে হাই ফস পিগ আয়রণ তৈরিব জন্য বকফসফেট কাজে লাগে। সম্প্রতি উড়িষ্যা সরকারের অধীন ইস্পাত কারখানাগুলিতে খনিজটির চাহিদা স্বীকৃত হয়েছে।

মানবাজার থানার তামাখুনে তামার একটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। স্তরটি ২০০ মিটার লম্বা, সাড়ে ৫ মিটার চওড়া। অনুমিত মোট মজুত ৮ হাজার টন। বলরামপুর ও বান্দোয়ান থানায় সন্ধান পাওয়া যায় সীসা-আকরের। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খনিজটি সংগ্রহের উপযুক্ত কিনা, সমীক্ষার অপেক্ষা রাখে।

কায়নাইটের শিলাস্তর সাধারণত থাকে এলুমিনিয়াম ও অভ্র মেশান স্ফটিকগুচ্ছে। উত্তরদিক থেকে কৌণিক আকারে একটি স্তর ভূগর্ভে নিহিত। স্তরটি পুবে চওড়া, মজুতের পরিমাণ পশ্চিমাঞ্চলেই বেশী। প্রধানত বলরামপুর ও বাগমুণ্ডি থানায়।[১৩] খনিজটি এতদিন অনাদৃতভাবে পড়েছিল, সম্প্রতি এদিকে সরকারের মনোযোগ পড়েছে।

বলরামপুর ও বাগমুণ্ডি থানায় লালরঙের খনিজ গারনেট বা তামড়িও পাওয়া যায়। খনিজটি দিয়ে উঁচু জাতের এব্রেসিভ বা ঘষলে দাগ উঠে যায়, এ জাতীয় ইরেজর তৈরি হতে পারে।

---

১২. পাথরগুলি চূর্ণ ও বিক্রি ক'রে, 'সাধনা এনটারপ্রাইজ (ইনডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা। প্রতিদিন ১০০ মেট্রিক টন রক ফসফেট আহরিত হয়ে থাকে। তদারকি করে, West Bengal Mineral Development and Trading Corporation. অনুমিত মোট মজুতের পরিমাণ ৭.৫ মিলিয়ন টন। বেলডি থেকে রকফসফেট উত্তোলন প্রথম সুরু হয়েছিল ১৪ জুন ১৯৭৫।

১৩. উভয় থানার ডাভা, ইছাড, সরুড, মাঠা, রসুলডি, বৃন্দাবনপুর, পানড়া ও বাঁধডিতে বিদ্যমান। অনুমিত সঞ্চয় ৫০ হাজার টন।

গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক পরিমাণে মজুত খনিজগুলি ছাড়াও বিভিন্ন খনিজের অল্পস্বল্প সঞ্চয় জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিকীর্ণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এসবেসটস, অভ্র, ব্যারাইটিস, বেরিল, ফায়ারক্লে, ম্যাগনেটাইট, ক্যালসাইট, ইলমেনাইট, পুজোলনা ক্লে ইত্যাদি। অতি মূল্যবান পারমাণবিক খনিজের সঞ্চয়ও জেলায় কম নয়।

জেলাটি খরাপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। খরার মূল কারণটি ভূগর্ভস্থ শিলাবৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত। অপর কারণগুলির মধ্যে প্রধান বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, অরণ্যের বিলুপ্তি ও ভূপৃষ্ঠের উঁচুনিচু বন্ধুর প্রকৃতি।

নুড়ি ও পলি দিয়ে গঠিত যে স্তর জলধারণের পক্ষে উপযুক্ত, জেলায় সে জাতীয় স্তর বিরল। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে মাটির ত্বক শীর্ণ, অধিকাংশ জায়গায় এক থেকে দু মিটার পুরু, নিচে কঠিন শিলাস্তর। সে শিলা অতি জীর্ণ, স্থানীয় নাম পচা পাথর। পচা পাথরের ফোকরগুলি ছোট ছোট, জল ধরে রাখতে পারে না। যেটুকু থাকে তাও পাথরের অন্তর্নিহিত ফাটল বেয়ে আরও নিচে নেমে যায়। জেলায় বৃষ্টিপাত খুব কম হয় না, কারণ মৌসুমি বায়ুর পরিমণ্ডলের মধ্যেই জেলাটির অবস্থিতি। কাছাকাছি জেলাগুলির মতই এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ[১৪], গড়ে ৫০ ইন্‌চি। সমগ্র বৃষ্টিপাতের এক তৃতীয়াংশ বা মাত্র ১৬ ইন্‌চি মাটির নিচে জমা হয়। জমা জলও স্থির থাকে না, উপরিভাগে নদী ও খালের গতির মত, প্রবাহ থাকে উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্বে।

বর্ষাকালে কয়েক হাত খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়, কারণ মাটি ও পচা পাথরের ছোট ছোট ফোকরগুলির মধ্যে বৃষ্টির জল তখন আটকে থাকে। গ্রীষ্মের সুরু থেকে সঞ্চিত জলটুকু ক্রমশ নিচে নামতে থাকে, অবশেষে ৩০ থেকে ৪০ ফুট নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফলে খরার সময় জল পেতে গেলে কুপের গভীরতা কমপক্ষে ৪০ ফুট হওয়া দরকার।

বর্ষাকাল বাদ দিয়ে, পরবর্তী সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর খরার প্রকৃতি নির্ভর করে। যদিও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তখন সামান্য, যেটুকু বৃষ্টি হয় তা বেশী নিচে যেতে পারে না। ফলে বাঁধ, পুকুর ও পাতকুয়োগুলিতে

---

১৪. জেলায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১,৩৬৩·১ মিলিমিটার (৫০ বৎসরের গড়)। বছরে গড়ে বৃষ্টি হয় ৭০·৯ দিন। তুলনায়, বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত, বাঁকুড়ায়—১৩০৩·৭ মিমি, মেদিনীপুরে—১৪২৮ মিমি,

জলশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয় না, বাতাসও আর্দ্র থাকে, ঘাসপাতার সবুজ সতেজভাবও শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে না। বৃষ্টিটুকু না হলে খরার প্রকোপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শীতের শেষ থেকে বৃষ্টিবঞ্চিত প্রকৃতি, নির্মম রুক্ষতার দিকে এগিয়ে চলে, বসন্তে উগ্র হয়ে ওঠে চেহারা, গ্রীষ্মে ভয়ংকর। স্থানীয় ভাষায়,

চৈতমাস আলেই ন
রৌদের বড় ত্যাজ।
বাইদ, বহাল, গাড়হা, পুখর
সবই ভাটিফুটা, গটাই বম্ম টাড়।[১৫]

খরার সময় সবচেয়ে বেশী অভাব দেখা দেয় পানীয় জলের। বর্তমান পরিস্থিতিতে নাতিগভীর কূপের ব্যবস্থা ছাড়া এ সংকটে পরিত্রাণ পাওয়া দুরূহ। ৬০ থেকে ৭০ মিটার গভীর ও আড়াই থেকে ৪ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট কূপ, বর্ষাকাল ও দুই বর্ষাকালের অন্তবর্তী ৮ মাসে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে। কূপগুলিতে ১৫ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত ধাতব নলের বেষ্টনী বা কেঁসিং দিতে পারলে ভাল হয়।[১৬]

নাতিগভীর কূপ ও নলকূপ খুঁড়ে সীমিতভাবে পানীয় জলের যোগান দেওয়া সম্ভব হলেও, জেলার বৃহত্তর পরিব্যাপ্তিতে পন্থাটি সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়, খরচও অত্যাধিক। অন্য উপায় উদ্ভাবনের বিষয়ও এ প্রসঙ্গে ভেবে দেখা যেতে পারে।

জেলার নদী ও জোড়গুলির নিচে জলবাহী স্তর বিদ্যমান। নুড়ি ও বালি দিয়ে গঠিত স্তরগুলির জলধারণের ক্ষমতা সীমিত থাকে, গভীরতাও বেশী নয়, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬ থেকে ১০ মিটার। স্তরগুলি থেকে সারা বছর প্রচুর জল

---

১৫. ই সমরটর—সুবোধ বসু রায়।

১৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছড়রা ও বঙ্গাবাড়িতে এ জাতীয় কূপ খনিত হয়েছিল বলে কথিত হয়। ১৯৭১।৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবার যখন ছড়রা গ্রামে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, সে সময়েও এ জাতীয় কূপ খননের কাজ হাতে দেওয়া হয়েছিল। এ জাতীয় কূপ থেকে ঘণ্টায় ৩০০ থেকে ৫০০ গ্যালন জল আহরণ করা সম্ভব।

আহরণ করা সম্ভব।[১৭] পুরুলিয়া ও আদ্রা সহর দুটিতে কৃত্রিম জলাধার খুঁড়ে যেভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা খরার দিনগুলিতেও অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত আমূল পরিবর্তনসূচক কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হয়, সেইভাবেই ঘন সন্নিবিষ্ট জনবসতিপূর্ণ স্থানগুলিতে জল যোগান দেবার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

অতীতে রাজা ও জমিদারেরা বিষয়টি দেখতেন। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় অসংখ্য বাঁধ ও জোড়, সে প্রচেষ্টার সাক্ষী। বর্তমানে জনসাধারণের গোষ্ঠীবদ্ধ উদ্যোগ ও সরকারি প্রয়াস ছাড়া সে ঘাটতি পূরণ ও পুরনো বাঁধ ও জোড়গুলির সংস্কারসাধন প্রায় অসম্ভব।

---

১৭. প্রকৃতপক্ষে তেলিডি পাম্পিং স্টেশনটি এইভাবেই কার্যকর করা হয়েছে। কাঁসাই নদীর খাতে সছিদ্র ও ইনফিলট্রেশন গ্যালারিযুক্ত ৭৫০ ফুট গভীর কূপ খনিত হয়েছে। বর্ষাকালের পরে কয়েক মাস ধরে কূপটি থেকে প্রতিদিন ৭০ হাজার গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মে যখন নদীখাত শুকিয়ে যায় তখনও সরবরাহ করা হয় প্রতি দিন ৩০০ গ্যালন জল।
শ্রীনরহরি চক্রবর্তী পুরুলিয়া জেলার খরা ও জলাভাব সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। দ্রষ্টব্য, ছত্রাক ৬/২, ৩ ও ৪ সংখ্যা।

নদনদী

'Following the natural slope of the district all the rivers which intersect or take their rise within it, have an easternly or south-easternly course."

—H. Coupland.

খরার দেশ পুরুলিয়া। খরার দেশ হলেও পশ্চিমবাংলার তিনটি প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল এই জেলা। কংসাবতী বা কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর বা ধলকিশোর, শিলাবতী বা শিলাই। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নদীগুলির কথা, তাদের উৎপত্তি ক্ষেত্রের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে, মানভূম জেলাকে পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

নদীগুলির প্রবাহ উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্বে। পাহাড়ি জলধারায় পরিপুষ্ট নদনদীর মত প্রকৃতি। শীতকালের অধিকাংশ সময় এবং গ্রীষ্মে খাতগুলি শুকিয়ে থাকে। বছরের কোন সময়েই নাব্য থাকেনা, একমাত্র দামোদর নদই বর্ষাকালে কিছুদিনের জন্য নাব্য হয়ে ওঠে। কালান্তক প্রাচীরের মত আচমকা নেমে আসে হড়পা বান, বেগ প্রচণ্ড, স্থায়িত্ব স্বল্পকাল।

অনাবৃত, কঠিন শিলার চাটান ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে। খাতগুলি নুড়ি বালি ও বড় বড় পাথরের চাঁইতে পরিপূর্ণ। দুপাশের খাড়াই পাড়; নগ্ন, কঠিন শিলাস্তর কেটে কেটে তৈরি হয়েছে সুগভীর নদীবক্ষ, এলোমেলো ভাঙ্গাভাঙ্গা পাড়ে মাটির দেখা পাওয়া যায় কদাচিৎ। তীরভূমি জুড়ে কোথাও ছাড়া ছাড়া শীর্ণ জঙ্গল, আগাছার ঝোপ, কোথাও ধু ধু শিলাময় প্রান্তর।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল বন্ধুর ভূভাগের গা বেয়ে অজস্র ধারায় নেমে আসে। ধারাগুলি মিলিত হয়ে যখন একটি বড় জলধারার সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় জোড়। অনেকগুলি জোড় মিলে সৃষ্টি হয় নদীর। পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ নদনদীর সৃষ্টি হয়েছে এইভাবে।

অতিকায় দামোদর নদ জেলার উত্তর সীমার সামান্যতম অংশ চিহ্নিত করেছে। একসময় ধানবাদ থেকে পুরুলিয়া সদর মহকুমাকে বিযুক্ত করেছিল নদীটি।

চিহ্নিত করেছিল চাষ থানার উত্তর সীমান্ত। চাষ থানা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে জেলার প্রাকৃতিক সীমারেখা বিলুপ্ত হয়েছে।

দামোদরের জন্ম খামারপৎ পাহাড়ে। ছোটনাগপুরে পালামৌ জেলার ভেতরে টোরি। তার কাছাকাছি এই পাহাড়। সমুদ্রের বুক থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। পাহাড়ের গা বেয়ে যেসব জলধারা সমতলের দিকে নেমে আসে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধারাটির নাম সোনাসাথী। দামোদরের উৎস বলে সেটিই চিহ্নিত। হাজারিবাগ জেলায় হাজার খানেক ফুট উঁচু উপত্যকায় এসে নাম হয়েছে দামোদর।[১]

টোরি থেকে দিশেরগড় পর্যন্ত দামোদরের উচ্চ প্রবাহ। বরাকরের সংগম থেকে বর্ধমান সহরের কাছাকাছি পর্যন্ত মধ্যপ্রবাহ নিম্নমুখী। সাঁওতালডি থেকে পাঁচেট জলাধার পর্যন্ত দামোদর বিহার রাজ্যের সংগে পুরুলিয়া জেলার সীমানা চিহ্নিত করেছে। দামোদরের উচ্চ প্রবাহের অন্তর্গত এই অংশটি, নদীখাত হাজার মিটারের ওপর চওড়া, ঢাল প্রতি মাইলে প্রায় চার ফুট, দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নদীটির তীরে অবস্থিত। সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প ও পাঁচেট জলাধার। পাঁচেট জলাধার থেকে বাঁকুড়া জেলার শিরপুরনামা পর্যন্ত প্রবাহ দক্ষিণপূর্বমুখী, বর্ধমান জেলার সংগে চিহ্নিত করেছে সীমানা। পাঁচেট জলাধারটি তৈরির সময় তেলকুপির অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মন্দির চিরকালের মত জলাধারটির বক্ষে বিলুপ্ত হয়েছে। অধুনালুপ্ত মানভূম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইজরি ও গোবাই সাঁওতালডির পশ্চিমে ও ভজুডির পূর্বে একত্র মিলিত হয়েছে। পরে সংযুক্ত জলধারা মিলিত হয়েছে দামোদরের সংগে। গোবাই বা গোয়াইয়ের উপনদী হাড়াই। সরু খালের মত সংকীর্ণ নদী খাত, প্রবাহপথের অধিকাংশ অংশ পাড়া থানার অন্তর্বর্তী। নওয়াগড় পরগণার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল অপর একটি জলধারা, নাম যমুনিয়া।

দামোদর নদ জেলাটির মধ্যে কোথাও অনুপ্রবেশ করেনি। প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত হয়নি জেলার জনজীবন ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংগে। তবু পরোক্ষভাবে নদীটির প্রভাব অপরিসীম। দামোদর অববাহিকাই প্রধানত পশ্চিমবাংলা ও বিহার রাজ্যের কয়লাখনি-প্রধান অঞ্চল। নদীটির তীরেই গড়ে উঠেছে রানীগঞ্জ ঝরিয়া দিশেরগড় প্রভৃতি কয়লাকেন্দ্রিক সহরাঞ্চল। কয়লার সহজ-লভ্যতার

---

১. দামোদর নদ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য (পৃ ৪২—৫১)

জন্যেই কাছাকাছি গড়ে উঠেছে শিল্পপ্রধান সহরাঞ্চলগুলি যথা আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান। অন্যদিকে সিন্দ্রি রাঁচি জামশেদপুর ইত্যাদি। সহরগুলির প্রভাব জেলাটির ওপর কম নয়।

জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী কাঁসাই। পুরুলিয়ার প্রাণের নদী। জেলার পশ্চিম সীমান্তে, ঝালদা থানার জাবড় পাহাড়ে জন্ম। প্রবাহপথ দক্ষিণপূর্ব মুখী। জেলার মধ্যে দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। খাতড়া থানার ভেদুয়া গ্রাম দিয়ে ঢুকেছে বাঁকুড়া জেলায়। প্রবাহপথ খুব ঢালু। মাইলে প্রায় ৪০ ফুট। চওড়া গড়ে ২,৭০০ ফুট। নদীখাত ১৫ থেকে ২০ ফুট গভীর, মোট দৈর্ঘ্য ১৭১ মাইল।

কাঁসাই প্রাচীন নদী। প্রাচীন নাম সম্ভবত ছিল কপিশা। টলেমি আন্তর্গাঙ্গেয় ভারতবর্ষের নকশায় গঙ্গার যে পাঁচটি মুখ চিহ্নিত করেছিলেন পশ্চিম থেকে পূবে প্রথম মুখটি ছিল ক্যামবিসোন। অনেকের অনুমান সেটি কপিশার সাগরসঙ্গম মুখ।[২] রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় বারানসী ছাড়িয়ে পূর্বদেশের নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোন, লৌহিত্য, গঙ্গা, করতোয়া, কপিশা প্রভৃতি।[৩]

কপিশা বা কাঁসাই সম্ভবত একসময় বঙ্গ ও উৎকলের মধ্যে সীমানা নির্দেশ করত। কালিদাস লিখেছিলেন বঙ্গনৃপতিকে পরাজিত করে, দিগ্বিজয়ী রঘু গজ নির্মিত সেতু তৈরি করেছিলেন কপিশার ওপর। নদী পার হয়ে সসৈন্যে উপনীত হয়েছিলেন উৎকল দেশে। সেখানকার রাজারা সাগ্রহে পথ দেখিয়ে দিলে যাত্রা করেছিলেন কলিঙ্গ অভিমুখে।[৪]

পশ্চিম থেকে পূবে, প্রায় সমগ্র জেলাটি পরিক্রমা করেছে কাঁসাই। প্রবাহিত হয়েছে ঝালদা, জয়পুর, পুরুলিয়া মফস্বল, আড়ষা, পুঞ্চা ও মানবাজার থানার মধ্য দিয়ে। জেলার প্রসিদ্ধ পুরাক্ষেত্রগুলি কাঁসাই ও কাঁসাইয়ের উপনদী কুমারীর তীরে অবস্থিত। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার সীমান্তে, কাঁসাই ও কুমারীর সঙ্গমস্থলে নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত মুকুটমণিপুর জলাধার।

---

২. নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেছিলেন সেটি ছিল তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি গঙ্গাসাগর-মুখ। Cambyson আসলে কপিশার নামান্তর বলে অনেকের অভিমত।

৩. 'শোনল্লৌহিত্যৌ নদৌ গঙ্গাকরতোয়াকপিশাদ্যাশ্চ নদ্যঃ'—কাব্যমীমাংসা (অধ্যায় ১৭)।

৪. 'স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥'—রঘুবংশ ৪/৩৮

কাঁসাইয়ের বন্যা আকস্মিক, ক্ষণস্থায়ী ও বিধ্বংসী। নাম হড়পা বান। স্মরণ-কালের মধ্যে দুটি বড় বড় বন্যা প্রবাদে পরিণত হয়েছে।[৫]

বর্ষাকালে দলমা পাহাড়ের উত্তরদিকের সানুদেশ বেয়ে যে জল নামে কুমারীর দুটি উপনদী তাকে ধারণ করে। টটকো ও নেংসাই, এই দুটি জলধারা কুমারী নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

কুমারীর জন্ম বাগমুণ্ডি থানার অযোধ্যা পাহাড়ে। প্রবাহপথ পশ্চিম থেকে পূবে। কাঁসাইয়ের মত কুমারীও প্রাচীন নদী। মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কুমারীর উল্লেখ দেখা যায়।[৬] যে কটি উপনদীর জলধারায় কুমারী সমৃদ্ধ, তাদের মধ্যে অন্যতম টটকো ও নেংসাই। হনুমতা নদীর উৎপত্তি বলরামপুর থানায়। থানাটি পরিক্রমা করে হনুমতা বরাবাজারের সীমান্তে কুমারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মানবাজার থানায় কুমারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে চাকা ও জাম নদী। প্রকৃতিতে দুটিই জোড়ের মত। কুমারী এই পাঁচটি উপনদীর জলধারাসহ কাঁসাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

কুমারী যেমন কাঁসাইয়ের উপনদী, তেমনি কাঁসাইয়ের আরও ছোট ছোট কটি উপনদী আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পটলই, সন্ধু ইত্যাদি। সন্ধুর উৎপত্তি আড়ষা থানায়। নামে নদী হলেও, চেহারা ও চরিত্রে অনেকটা জোড়, ঝোরা বা খালের মত। পৌষ সংক্রান্তি ও বারুণী স্নানের সময় কাঁসাই ও কুমারীর তীরে তীরে মেলা বসে। টুসু, ভাদু ও ঝুমুর গানে ভরে ওঠে নদীতট।

দামোদর ও কাঁসাইয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল, জেলার পূর্বদিকের সমতলক্ষেত্রের বৃহত্তম অংশ গঠন করেছে। সমতলক্ষেত্রটির চেহারা সর্বত্র একটানা নয়। মধ্যে আচমকা কৃষিজমির বুক ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কালচে বাদামি রঙের আগ্নেয় শিলার সুউচ্চ ডুংরি, কোথাও স্ফটিক ও রূপান্তরিত কেলাসিত শিলায় গঠিত ছোট ছোট পাহাড়। হুড়া থানার লধুড়কা পরগণায় এমনি একটি ছোট পাহাড়ের নাম তিলাবনী। সেখানে দ্বারুক নদ, বা দ্বারকেশ্বরের জন্ম।

---

৫. ১৮৯৮ ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৭৮ সালে বন্যার প্রকৃতি আগের দুটি বন্যার মত বিধ্বংসী ছিল না।

৬. 'কুমারী মুষিকুল্যাশ্চ'—মহাভারত (৬/৯-৩৬)
ঋষিকুল্যা কুমারী চ—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
ঋষিকুল্যা কুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী—ভবিষ্য পুরাণ।

জলধারাটির নানা নাম। দ্বারুক বা দ্বারকেশ্বর, ধলকিশোর বা ঢলকিশোর। নিম্নপ্রবাহে মেদিনীপুর জেলায় গিয়ে নাম হয়েছে রূপনারায়ণ।

পুরুলিয়া জেলায় নদীটির চেহারা ছোট খাট। সত্যিই কিশোর। বেড়ে ওঠার জন্য আপ্রাণভাবে ছুটে চলেছে পূর্বদিকে। ছুটতে ছুটতেই ছাতনা থানার দুমদা গ্রামের কাছ দিয়ে বাঁকুড়া জেলায় ঢুকেছে।

কাশীপুর থানায় দুটি জোড় বা নদী, দ্বারোভাগা ও দুধ্‌ভারিয়া দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অপর যেসব জলধারায় সমৃদ্ধ হয়েছে দ্বারকেশ্বর, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিলাবতী, অড়কষা, কাঁসাচোরা ও ডাংরা। অড়কষার জন্ম বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানায়। কাঁসাচোরা জোড় বা খালের মত। ডাংরা জন্ম নিয়েছে পুরুলিয়া জেলায়, জয়চণ্ডীপুরের কাছাকাছি। ছাতনা থানার সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে, আমডিহা মৌজার কাছে দ্বারকেশ্বরে পড়েছে।

দ্বারকেশ্বরের প্রধান উপনদী শিলাই বা শিলাবতী। জন্ম পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানায়। জেলার মধ্যে সামান্য দৈর্ঘ্যমাত্র পরিক্রমা করেছে, মূল প্রবাহ বাঁকুড়া জেলায়। দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গম ঘটেছে মেদিনীপুর জেলার ভেতর।[৭]

দ্বারকেশ্বর সম্ভবত একসময় জঙ্গলদেশ ঝারি বা বারীখণ্ডের দক্ষিণ সীমানা নির্দেশ করত।[৮] অরণ্য অধ্যুষিত সেই দেশে লৌহধাতু পাওয়া যেত কিছু কিছু। অধিবাসীরা ছিলেন শ্যামবর্ণ ও ধনুর্বিদ্যা বিশারদ। বারীখণ্ড বা ঝারীখণ্ডের সীমানা ও আয়তন কতখানি অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ নির্ভর ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন।[৯] স্থূলভাবে ভবিষ্য পুরাণের সাক্ষ্য মেনে নিলে পুরুলিয়া জেলার পূর্বাঞ্চল ছিল সে অঞ্চলের বহির্ভূত।

ধীর, মন্থরগামিনী সাঁওতাল রমণীর মত সুবর্ণরেখা নদী বয়ে গেছে জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। বিহার রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সীমানা

---

৭. দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী ও তাদের উপনদী ও শাখানদী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, 'বাঁকুড়া'—তরুণদেব ভট্টাচার্য, 'জলধারা বহতা' অধ্যায়।

৮. 'অথেদানীং ঝারীখণ্ড—জাঙ্গলং দেশো বিচাতে।
দারিকেশাদুত্তরে চ দ্ব্যষ্টযোজনমানতঃ।' ১—ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।

৯. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য, বীরভূম—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

নির্দেশ করেছে কিছুটা অংশে। নদীটির উৎপত্তি রাঁচি জেলায় নাগড়া গ্রামের কাছে। গতিপথ আঁকাবাঁকা, উপলবন্ধুর পাথুরে ডাঙ্গার ওপর দিয়ে ৪৫ মাইল বয়ে এসেছে। গরিয়ার কাছে ঢুকেছে পুরুলিয়া জেলায়। জেলার ছোট ছোট ক'টি জলধারা তাদের বারি মোচন করেছে নদীটিতে। যেমন, সেপাহি, সালদা ও রুপাই। আতনা স্টেশনের কাছে সুবর্ণরেখা জেলা ছেড়ে সিংভূমে গিয়ে ঢুকেছে।

একাধিক নদনদীর জন্মস্থান হলেও জল পুরুলিয়া জেলায় দুর্লভ। বিশেষত, শীতের শেষ ও গ্রীষ্মে। সেচের জল পাওয়া যায়না, পানীয় জলেও টান পড়ে যায়। বিশাল আকারের জলাশয় বা সরোবর প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট হয়নি কোথাও। ফলে ঘাটতি মেটাতে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পুরুলিয়া সহর গড়ে উঠেছিল। ক্রম বর্দ্ধমান সহরে অধিবাসীদের পানীয় জলের ঘাটতি মেটাতে খনিত হয়েছিল সাহেববাঁধ। বাঁধটি আকারে বিশাল, সহরের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে বিন্যস্ত। পাড়গুলি ঘিরে জেলাসহরের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি অবস্থিত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, হরিপদ সাহিত্য মন্দির, রবীন্দ্রভবন, সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্র, বনদপ্তর কর্তৃক সৃষ্ট ও সুরক্ষিত 'সুভাষ উদ্যান' ইত্যাদি। বাঁধের নামটিরও বদল ঘটেছে। সাহেব বাঁধের বদলে, জেলার একদা প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী, ঋষিকল্প পুরুষ নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের স্মরণে নামকরণ হয়েছে 'নিবারণ সায়ের।'

পানীয় জলের ঘাটতি মেটাতে ও রেলইঞ্জিনে জল সরবরাহের জন্য অনুরূপ একটি বাঁধ খনিত হয়েছিল আদ্রা সহরের দক্ষিণপ্রান্তে। সেটিরও নাম সাহেব বাঁধ। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোমপানির উদ্যোগে সেটি খনিত হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পানীয় জল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিস্রুত করার যেসব ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে গৃহীত হয়েছিল, সেসব ছাড়াও জেলার প্রায় প্রতিটি থানায় স্থানীয় রাজা ও জমিদারেরা ইংরেজ আমলের আগে ও পরে কিছু কিছু বাঁধ জোড় ও জলাশয় খনন করিয়েছিলেন। যেমন, জয়পুরের রাণীবাঁধ, ঝালদার রাজবাঁধ, বাগমুণ্ডি, চোলিয়ামা বেড়ো ইত্যাদি স্থানে ভূস্বামীদের তৈরী বাঁধ।

পাড়া থানায় বাঁধ, জোড় ও জলাশয়গুলির নাম কৌতূহল উদ্রেক করে। কোথাও বাঁধগুলির নাম 'হা' শব্দটি জুড়ে তৈরি হয়েছে, কোথাও 'খুর' শব্দ জুড়ে। যেমন, পাড়া গ্রামের কাছাকাছি বাঁধগুলির নাম, চাঁপাহা, তালাহা, সেনাহা ইত্যাদি এবং তেলখুর, চুনখুর, ডোমখুর প্রভৃতি।

অরণ্য

"......with effect from 1st November, 1956 and a new Forest Division named Purulia Division (with 4 ranges) was formed with its head quarters at Purulia and was included in the Southern Circle."—West Bengal Forests, 1964.

আদিম মানবের বাসভূমি ছিল অরণ্য। অরণ্য আশ্রয় করে তাদের বিকাশের ধারাটি গড়ে উঠেছিল। প্রত্ন-উদ্ভিদ বা প্যালিও-বোটানিক্যাল সাক্ষ্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের পূর্বাঞ্চলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগেকার বনভূমির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজমহল পাহাড়ে এ জাতীয় বৃক্ষের ফসিল এখনও বিদ্যমান। মধ্যজীবক যুগে আপার জুরাসিক কালে তার সময়কাল নিরূপিত।

দামোদর উপত্যকায় বিস্তীর্ণ কয়লাখনি অঞ্চল একদা পরিব্যাপ্ত অরণ্য অঞ্চলের রূপান্তরিত অবস্থা। আসানসোলের কাছে কুমারপুরে প্রত্নজীবক যুগের অন্তর্গত পার্মিক কালের নানা জাতীয় গাছের শিলীভূত অশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে। সময়ের নিরিখে তাদের বয়স ২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর।[১]

অরণ্যে আদিম মানুষের অবস্থা কেমন ছিল, কিভাবে তাদের বিকাশের ধারাটি এগিয়ে চলেছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করা যায় না। বেদ ও পরবর্তীকালের পালিগ্রন্থে বিক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে অনুমিত হয়, অরণ্যে বসবাসকারী আদি-মানবগোষ্ঠী বহু ছোট ছোট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে একসময় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। নানা জাতীয় টোটেম আশ্রয় করে গোষ্ঠীগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতেন। যেমন, ছাগ-গোষ্ঠী বা অজ, মৎস্য-গোষ্ঠী বা মৎস্য, অশ্বগোষ্ঠী বা শীগ্রু, পক্ষী-গোষ্ঠী বা বয়াংসি, হায়না-গোষ্ঠী বা তরক্ষু, সর্প-গোষ্ঠী বা নাগ, বাজ-গোষ্ঠী বা কুলিঙ্গ, খরগোস-গোষ্ঠী বা লম্বকর্ণ ইত্যাদি। এইসব গোষ্ঠীগুলির উত্তর পুরুষেরা কিছু কিছু বিলুপ্ত

---

১. Records, Geological Survey of India, lxvi. pt IV (1933)
ফসিলটি কলকাতার Indian Museum-এ রক্ষিত আছে।

হয়েছেন। কালের কশাঘাত সহ্য করে এখনও টি'কে আছেন কিছু কিছু। অরণ্য এখনও তাদের আশ্রয়স্থল। প্রাচীন টোটেম-রেশ এখনও কোথাও কোথাও তাদের পরিচয়ের সংগে জড়িয়ে রয়েছে।

আদিম অরণ্যের প্রধান শত্রু ছিল প্রাকৃতিক উপপ্লব। তুষার যুগ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, খরা, প্লাবন অরণ্যের বুকে দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে যেত। পরবর্তীকালে অরণ্যের আরও প্রবল শত্রু হয়ে উঠেছিল মানুষ। বাসগৃহ, ঘরগেরস্থালির সরঞ্জাম ও বসবাসের স্থান ছাড়াও কৃষি-কাজের ক্রম সম্প্রসারণ অরণ্য উৎসাদনে ব্যাপক ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

আদিম যুগে অরণ্যের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এলাকা চিহ্নিত করে নিতেন। বসবাস, আহার্য সংগ্রহের উদ্যম সবই সেই এলাকার মধ্যে সীমিত থাকত। প্রাচীন যুগে অরণ্যের ওপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের হদিস পাওয়া যায় মৌর্য যুগে।[২] বনবিভাগের নিয়ন্ত্রকের উপাধি ছিল 'কুপ্যাধ্যক্ষ', বেতন ১ হাজার পান বা রৌপ্যমুদ্রা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তার কাজের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন যুগে বনের ভাগ ছিল ৮টি। একটু একটু করে আরও বনাঞ্চল যখন নজরে এসেছে, সেসব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মহাকাব্য ও পুরাণে।[৩] পূর্ব-বিহার ও পশ্চিমবাংলার বনাঞ্চল ছিল প্রাচ্য বনের অন্তর্গত। রাজারা শিকারের জন্য বনাঞ্চলের খানিকটা এলাকা সংরক্ষিত রাখতেন।

বর্তমান ব্যবস্থায় বাংলায় অরণ্য নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে।[৪] পাঁচটি ভুক্তি বা বিভাগে বিভক্ত হয়েছিল বনাঞ্চল।[৫] মোট এলাকা

---

২. Forestry in Ancient India—Prof. C. D. Chatterjee (Essay).

৩. (১) প্রাচ্য-বন (২) করূষ-বন (৩) দাশার্ণক-বন (৪) বামন-বন (৫) কালেশ-বন (৬) আপরান্তক-বন (৭) সৌরাস্ট্র-বন (৮) পঞ্চানন্দ-বন—বিষ্ণুধর্মোত্তর-পুরাণ, ১।২৫১।২২-৩৭। মানসোল্লাসে আরও দুটি বনাঞ্চলের হদিস পাওয়া যায় (১) আঙ্গিরেয়-বন ও (২) কালিঙ্গক-বন। আঙ্গিরেয় বন ছিল প্রাচ্যবনের অন্তর্গত এবং কালিঙ্গক-বন, কালেশ-বনের অন্তর্গত।

রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের কথা পাওয়া যায়, মহাভারতে পাওয়া যায় নৈমিষারণ্যের কথা। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে মহাকান্তারের (বনের) উল্লেখ আছে।

৪. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৩৫, পাদটীকা ৯।

৫. (১) কোচবিহার (২) আসাম (৩) ঢাকা (৪) চট্টগ্রাম ও (৫) ভাগলপুর ভুক্তি (১৮৭২-৭৩ সাল)।

ছিল ৬০ হাজার বর্গমাইল। পশ্চিমবাংলা ও দক্ষিণপূর্ব বিহারের বনাঞ্চল ছিল ভাগলপুর ভুক্তির অন্তর্গত। স্বভাবত মানভূমের অরণ্য অঞ্চলও এই ভুক্তির আওতায় পড়ত।

অবশ্য তার আগে বল সাহেব সরেজমিনে মানভূমের অরণ্য অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন।[৬] বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি চারভাগে ভাগ করেছিলেন বনাঞ্চল।[৭] এক, আদিম অরণ্যভূমি; গাছগুলি ছিল বড় বড় কিন্তু প্রায় বিলুপ্তির পথে। দুই, ছাড়া ছাড়া পাতলা বনাঞ্চল; সেখানে নিয়মিত কাটা হত গাছ। ফলে গাছগুলি কখনই তেমনভাবে বেড়ে উঠতে পারত না। তিন, বিশুষ্ক পাথুরে ভূভাগ নুড়ি পাথরে সমাকীর্ণ, মাটি ভাংগা ভাংগা, জল বয়ে যাবার খাদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, অরণ্য সৃষ্টির প্রতিকূল। চার, বনাঞ্চলের প্রান্তিক এলাকা। 'ঝুম' চাষের মাধ্যমে একসময় আবাদী এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চাষ শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ হবার ফলে কয়েকবার চাষের পর পরিত্যক্ত হয়েছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ প্রকৃতির দিক থেকে ছিল প্রায় একরকম।

মানভূমের জনজীবনে অরণ্য একদা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বনভূমি শুধু তাদের বসবাসের ক্ষেত্র ছিল না; জীবিকা, জীবন-বোধ, পুজা-পার্বন, লোক উৎসব, আহার্য, পোশাক পরিচ্ছদ, রুচি—এক কথায় বাহ্যিক ও ও অভ্যন্তরীণ জীবনের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের ধারাটি একটু একটু করে গড়ে তুলেছিল। পুরুলিয়ার জনজীবনেও সে রেশ এখনও একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। অরণ্য বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সংস্কারের ধারাটি কমবেশী এখানকার অধিবাসীদের জীবনে লেগে রয়েছে।

উনিশ শতকের শেষদিকে সৃষ্টি হয়েছিল ছোটনাগপুর বনাঞ্চল ভুক্তির। পূর্বসৃষ্ট পালামৌ, হাজারিবাগ ও সিংভূম বনভুক্তি তার অন্তর্গত হয়েছিল।[৮] প্রধান প্রধান গাছ ছিল শাল, মহুয়া, কুসুম, পলাশ, কেঁদ, সিধা, গলগলি,

---

৬. বরাকর থেকে মি. ভি. বল ফিল্ড ওয়ার্ক সুরু করেছিলেন ২৫ নভেম্বর ১৮৬৫।
—Jungle Life in India or The Journeys and Journals of an Indian Geologist by V. Ball, London, 1880.

৭. Flora of Manbhum—V. Ball, Journal of Asiatic Society, 1869.

৮. ছোটনাগপুর বনাঞ্চলভুক্তি সৃষ্টি হয়েছিল ১. ৪. ১৮৮৪ সাল থেকে। পালামৌ (৩৭ বর্গ মাইল), হাজারিবাগ (৪০ ব. মা.) এবং সিংভূম (৬০ ব. মাইল) বনাঞ্চলভুক্তি সৃষ্ট হয়েছিল ১৮৭৬ সালে।

পিয়াশাল, রহড়া, শিউলি, অর্জুন, হরিতকী, আসন, বহেড়া, চালতা, গামার, বেল, পিয়াল ইত্যাদি। পাহাড় ও ডুংরিগুলির মাথায় কোথাও কোথাও ছিল বাঁশবন। ওষধি গাছ ও গুল্ম ছিল তুলনায় স্বল্প। গাছে গাছে জড়ানো পরগাছা ছিল অজস্র। চেহারা চরিত্র ও প্রকৃতিতে বহু বিচিত্র। তাদের কমলা-লাল ফুল সবুজের সমুদ্রে উজ্জ্বল হয়ে থাকত।

সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসার আগে মানভূম জেলার বনাঞ্চল ছিল স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের কর্তৃত্বাধীনে। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কাশীপুরের রাজা সিংহদেও পরিবার, আড়ষার রাজা সিংসর্দার, বাগমুণ্ডির রাজা সিংহমানকি, ঝালদার রাজা সিংদেও পরিবারসমূহ। এছাড়া ছিলেন মাঠা, কুইলাপাল ও বরাভূমের জমিদার পরিবারগুলি। পরবর্তীকালে, বনাঞ্চল বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল ওয়ার্ডস এনকামবারড্ এস্টেট, বাগমুণ্ডি; বেগুনকোদর এস্টেট, ঝালদা; বরাভূম ওয়ার্ডস এস্টেট, বরাভূম; গোকুলকুমারী এস্টেট, পুরুলিয়া-কাশীপুর; ইকুইটেবল কোল কোমপানি, রঘুনাথপুর, এবং মেদিনীপুর জমিদারী প্রভৃতি কোমপানি ও ওয়ার্ডস এস্টেটের মধ্যে।[৯]

রাজা ও জমিদারেরা বনাঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছিলেন বনের ভেতর দিয়ে পথ বা ঘাটগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। অরণ্য নিয়ন্ত্রণের এই প্রথা পরবর্তীকালে ঘাটোয়ালী প্রথা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর মিলিয়ে বাংলার পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তীর্ণ বনভূমিতে প্রথাটি সুদীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল।[১০]

শিকারের জন্য রাজা ও জমিদারেরা বনাঞ্চলের কিছুটা এলাকা খাস নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। বর্তমান পুরুলিয়া জেলার মধ্যে এ জাতীয় বনাঞ্চল ছিল কুইলাপাল,

---

৯. পুরুলিয়া জেলার অতিরিক্ত বন বিভাগীয় অধিকারিক শ্রীসত্যানন্দ দাস কর্তৃক প্রেরিত রাইট-আপ, ২১ জুন ১৯৮২। রাইট-আপটির জন্য শ্রীদাসের কাছে কৃতজ্ঞ।

১০. "The Zemindars of most parts of Bankura, Birbhum, Midnapore and particularly Purulia held the forests under a particularly loose and undefined form of tenure, known as the Ghatwali tenure—originally granted in lieu of watch and ward duties of the ghats—i.e. the hilly tracts."—The Forests of the Southern Circle—Its History and Management by K. C. Roy Chowdhury, Conservator of Forests.

মাঠা ও বাগমুণ্ডিতে।[১১] কাশীপুর রাজাদের শিকারের জঙ্গলের নাম ছিল রাকাবের জঙ্গল। বরাভূমের বনাঞ্চল তদারকি করতেন সিভিল দপ্তর ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। সেই বছরে এলাকাটি বনদপ্তরের আওতায় আনা হয়েছিল। বাগমুণ্ডির বনাঞ্চল ২০ বছরের লীজে বনদপ্তরের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছিল (১৯৪২ সাল)।

জেলায় মোট বনাঞ্চল এখন ৯০১·১১ বর্গ কিলোমিটার।[১২] পরিমাপটি সরকারি কাগজপত্রে চিহ্নিত। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ এলাকা বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত নয়, লতাগুল্মহীন টাঁড়জমিও এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ বনাঞ্চল গড়ে তোলার এলাকাও পরিমাপটির আওতাধীন ধরে নেওয়া হয়েছে। তবু বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূম নিয়ে পশ্চিমবাংলার সীমান্ত অঞ্চলে একদা যে সুবিশাল অরণ্যভূমি বিরাজ করত, জেলাগত চৌহদ্দির নিরিখে পুরুলিয়ার বনাঞ্চল তাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।[১৩] প্রকৃত বনাঞ্চল, চিহ্নিত এলাকার অর্ধেক পরিমাণ।

অরণ্য একসময় অরণ্য সন্তানদের আহার্য যোগাত, জীবিকারও আশ্রয় ছিল। গ্রামীণ জীবনে যে বিশাল জনসংখ্যা কৃষিকাজে নিয়োজিত, বছরের অনেকগুলি মাস ধরে তারা কর্মহীন হয়ে থাকতে বাধ্য হন। বিকল্প উপজীবিকার উপাদানও যুগিয়ে যেত অরণ্য। জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ এ জাতীয় বিকল্প উপজীবিকায় নিয়োজিত থাকতেন।[১৪] অরণ্য উৎসাদনের ফলে এই জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। জেলার সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে আরও দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। এখনও বনের সঙ্গে যেসব কাজ জড়িয়ে আছে, যেমন, কাঠ ও বিড়িপাতা সংগ্রহ, পশুর খাদ্য,

---

১১. Indian Forest Act-এর ২৯ ও ৩৮ ধারা অনুসারে Protected ও Reserved Forest ছিল পুরুলিয়া জেলায় যথাক্রমে ২৯৮·৪১ ও ৩৯·৮৭ বর্গমাইল। ১৮৯৪ সালে মাঠা ও কুইলাপালে Protected forest ছিল যথাক্রমে ৮·৯০ ও ৪·৩২ বর্গমাইল।

১২. Annual Plan of Action 1980-81, Purulia District—District Agricultural Officer, Purulia. Forest Directorate-এর ১৯৬৪ সালে Commemoration volume, West Bengal Forest-অনুসারে ৮৭৬ বর্গ কিলোমিটার। তার মধ্যে রিজার্ভড—১০৪ বর্গ কি.মি. প্রটেকটেড—১৭৯ বাকি, প্রাইভেট—৫৯৩ বাকি। UBI-এর ১৯৭১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বনাঞ্চল ৮৮৯ বাকি।

১৩. জেলাগুলির মোট ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় বনাঞ্চল—বাঁকুড়া—২০·৩৯%, পুরুলিয়া—১৪·০৮%, মেদিনীপুর—১২·৩৭,% বর্ধমান—৩·২২%, বীরভূম—৩ ০৪% (১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)।

১৪. Purulia People, Problems and Potentialities,—N. Chatterjee, IFS. (20. 9. 1968—Monograph).

ফুল ও বীজ সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাজে বছরে প্রায় ৫০ হাজারের মত মানুষ নিয়োজিত হয়ে থাকেন। এসব কাজে শুধু যে সমর্থ পুরুষেরাই নিয়োজিত হন তা নয়, মহিলা এমনকি দরিদ্র পরিবারগুলির বালক বালিকাদের জন্যেও অর্থোপার্জনের পথ খোলা থাকে।[১৫]

পশ্চিমবাংলার জেলাগুলির মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় মাথা পিছু কৃষিজমির পরিমাণ অত্যন্ত স্বল্প। সব থেকে কম ২৪ পরগণা জেলায়, তার পরেই পুরুলিয়ার স্থান। চব্বিশ পরগণায় বিকল্প জীবিকার সুযোগ পুরুলিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী, ফলে অরণ্য উৎসাদন সেখানকার মানুষের জীবনে এত গভীর ও ব্যাপক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া একর প্রতি ফলনও পশ্চিমবাংলার মধ্যে এই জেলাটিতে সবচেয়ে কম। অধিকাংশ অঞ্চলে চাষের খরচ উৎপন্ন শস্যের আয় থেকে বেশী হয়ে দাঁড়ায়,[১৬] ফলে প্রতি বছর ঋণের বোঝা বেড়ে চলে চাষীদের। জেনেশুনেও সেই অনিবার্য ঋণচক্রের মধ্যে তাদের জড়িয়ে যেতে হয়। কারণ কাটুনি-মজুর হিসেবে ভিন্ জেলায় সামান্য সুযোগ ছাড়া বিকল্প জীবিকার আর কোন পন্থা তাদের সামনে খোলা থাকে না।

বনোন্নয়ন ও ভূমিসংরক্ষণের কাজে জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষেরাও অংশ নিতে পারেন। কারণ কাজটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত থাকে না, জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। বনোন্নয়নের প্রয়োজনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়লাখনি খোলা, রেলপথের সম্প্রসারণ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে কাঠের চাহিদা, এবং ঘরগেরস্থালির আসবাবের প্রতি মানুষের রুচির পরিবর্তন নিষ্ঠুরভাবে বন উৎসাদনের সূত্রপাত করেছিল। সে উৎসাদন অব্যাহতভাবে এখনও চলেছে। মানভূম জেলা যখন পুরুলিয়ায় রূপান্তরিত হতে চলেছিল, কিছুদিনের জন্য প্রশাসনের প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল ঢিলেঢালা। শিথিল প্রশাসনের কোপ পুরুলিয়া জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের দুটি দিকের ওপর এসে পড়েছিল। এক, অরণ্য ; অপরটি খনিজ সম্পদ। বর্তমানে জেলার মানুষের কাঠের চাহিদা যোগানের তুলনায় বেশী।[১৭] আর্থিক সঙ্গতি কম

---

১৫. দ্রষ্টব্য পাদটিকা ১৪।

১৬. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৭. জ্বালানি কাঠের চাহিদা—২,৭৭,৮৮১ কিউবিক মিটার, যোগান—২০,০০০ কিউ.মি. ঘরের খুঁটি ইত্যাদি চাহিদা—৪,৮৬,৩৮৮, যোগান—৩৪,৯৯৯ ; কৃষি যন্ত্রপাতি যথা লাঙল ইত্যাদি চাহিদা—১,২১,২৭৬, যোগান—৫২,৪৯৮ ; অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম জোয়াল, ঈশ প্রভৃতি চাহিদা—৩,৮৭,৮২৮, যোগান—৮৭,৬৯৭—১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী, দ্রষ্টব্য, পাটি ১৪।

থাকায় অসংভাবে কাঠ সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের উপায় থাকেনা। ফলে গাছকাটার মধ্যে এক দিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অন্যদিকে চাহিদা ও যোগানের বিপুল ফারাকের ফলে অসাধু পন্থা বেড়েই চলে। মুষ্টিমেয় পাহারাদারের পক্ষে এই বিপুল এলাকার সুষ্ঠু তদারকি প্রায় অসম্ভব।

পুরুলিয়া জেলা সৃষ্ট হবার পর পুরুলিয়া বনবিভাগও নতুন করে সৃষ্ট হয়েছিল। সরকারি তরফে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ভূমি সংরক্ষণ ও বনসৃজনের।[১৮] দুটি কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল প্রধানত কংসাবতী-কুমারী এবং দামোদর-দ্বারকেশ্বর নদীর অববাহিকা অঞ্চল। ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্গত অনাবাদী জমিতে বনসৃজনে সহায়তা এবং বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে প্রকল্পটি সাম্প্রতিক কালে নেওয়া হয়েছে, জেলায় সেটির উদ্যোক্তা ও প্রবর্তক ছিলেন জেলারই সন্তান ও বনক্ষেত্র আধিকারিক শ্রীবাসুদেব পন্ডা। প্রকল্পটি সোসাল ফরেস্ট্রি স্কীম নামে পরিচিত। প্রকল্পটি ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রকল্পটির সঙ্গে সংগে আরও কিছু সুযোগসুবিধা অরণ্যের নিকটবর্তী অধিবাসীদের মঞ্জুর করা হয়েছিল।[১৯] ব্যবস্থাটি সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।[২০]

বন উৎসাদিত হবার ফলে বনজ সম্পদের পরিমাণ এবং তাদের থেকে আয়ও

---

১৮. (১) পুরুলিয়া বনবিভাগের সৃষ্টি ১ নভেমবর ১৯৫৬ (২) কংসাবতী ভূমিসংরক্ষণ বিভাগ—১ নং, ১৯৬৪-৬৫ (৩) কংসাবতী ভূমিসংরক্ষণ বিভাগ—২নং, ১৯৬৫-৬৬ (৪) পাঞ্চেৎ ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ, ১৯৬৬-৬৭ (৫) একসটেনশন বনবিভাগ, ১৯৮০-৮১, পুরুলিয়া বনবিভাগের আগে বনাঞ্চল মানভূম বনবিভাগের অন্তর্গত ছিল। সেটি সৃষ্টি হয়েছিল জুলাই ১৯৪৬ সালে। সদর দপ্তর ছিল পুরুলিয়া সহরে।

১৯. Social Forestry Scheme চালু হয়েছিল ১৯৮০ সালে। এই বছরেরই জুলাই মাস থেকে সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল। যথা (ক) বিনামূল্যে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বালানি সংগ্রহ (খ) শাল, মহুয়া, পিয়াল, কেঁদ প্রভৃতি গাছের পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি বিনামূল্যে সংগ্রহ (গ) পরিবার পিছু লাঙলের জন্য ১টি করে এবং ৫ বছর অন্তর খুঁটির জন্যে ৩টি করে গাছ সংগ্রহ (ঘ) যে কোন গাছ জাহের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা প্রভৃতি।

২০. দ্রষ্টব্য, পাটি ১৪।

সীমিত হয়ে এসেছে।[২১] একমাত্র কেঁদপাতা এখন সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের মূল উৎস।[২২] প্রকৃতপক্ষে মোট বনাঞ্চলের শতকরা ৫০ ভাগ জুড়ে আছে কেঁদ গাছ। অবশ্য কেঁদের বড় বড় গাছগুলি থেকে পাতা সংগৃহীত হতে পারে না। ফল মূল এবং ওষধি গাছও বনাঞ্চলে অপ্রতুল।

এক সময় বনাঞ্চল জুড়ে নানারকম পাখি ও জন্তু জানোয়ারের প্রাচুর্য ছিল।[২৩] অরণ্য উৎসাদিত হবার ফলে পশু ও পাখিদের প্রাচুর্য কমেছে। মাঝে মধ্যে দলমা পাহাড় থেকে হাতীর দল বা দলছুট হাতী নেমে আসে। হাতীদের কিছু বসবাস আছে অযোধ্যা পাহাড়েও। ভালুকের জন্য একসময় প্রসিদ্ধ ছিল মানভূমের অরণ্য প্রদেশ। এখনও কিছু সংখ্যায় তাদের বসবাস রয়ে গেছে অযোধ্যা, মাঠা, কুইলাপাল ও রাকাবের জঙ্গলে। একসময় রাঁচি ও মানভূমের অরণ্য অঞ্চলে বজ্রকীট নামক অদ্ভুত ধরনের প্রাণীর দেখা পাওয়া যেত। টিকেল সাহেব তাদের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ছোটখাট রোঁয়াওয়ালা এই প্রাণীটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে।

পশ্চিমবাংলার পশ্চিমসীমান্ত ঘেঁষা জেলাগুলিতে মাটি ও ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সমতল বাংলা থেকে পৃথক। ভূমিক্ষয় রোধ, জীবিকার সংস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বসবাসের উপযোগী করে তুলতে গেলে বনসৃজন ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নেই। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে এ কাজ যত ব্যাপক ও দ্রুত পরিসাধিত হবে, জেলা ও পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের কাছে তা ততই কল্যাণপ্রদ ও স্বস্তিময় হয়ে উঠবে।

---

২১. বনজ সম্পদের মধ্যে যে যে দ্রব্য মূল্যবান বলে গণ্য করা হত, যেমন—কাঠ, খুঁটি, জ্বালানি, ঘাস (খড়, পশুখাদ্য, বাবুই, ঝাড়ু), আমলকি, হরিতকি, বহেড়া, ফল (জাম, কেঁদ, পিয়াল, ভুড়ুর, আম, কুল), পাতা (খেজুর, ঘণ্ড, শাল, কেঁদ), মহুয়া ফুল, তৈলবীজ (কুসুম, করঞ্জ, নীস, মহুয়া), লাক্ষা, তসর, গাছের ছাল (Tanning ও Dyeing এর জন্য) ওষধি, বাঁশ ইত্যাদি।

২২. ১৯৭০-৭১ সালে মোট আয় ছিল, ২,৬৮,৩০০ টাকা। তার মধ্যে কেঁদপাতা থেকেই আয় ২,০১,৯০০ টাকা।

২৩. নিম্নবঙ্গ তথা পুরুলিয়ার পাখি সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। বন্যজন্তু সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৩২—৪১।

ইতিহাস

ক. প্রাগৈতিহাসিক যুগ

শ্লাঘ্য স ইভ গুণবান
রাগেদ্বেষ বহিষ্কৃত
ভূতর্থ'কথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী[১]—রাজতরঙ্গিনী, ১/৭

ভারতের মত বাংলাতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আলোচনার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রধানত 'চানস ফাইন্ড' বা হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক দ্রব্যাদির ওপর। সুপরিকল্পিতভাবে উৎখননের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে কদাচিৎ।

ভূগর্ভে নিহিত শিলাস্তরের বয়স বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ধারণ করেছেন ভূতত্ত্ববিদেরা। শিলার গায়ে মুদ্রিত ফসিল বা জীবাশ্ম এবং ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে কুড়িয়ে পাওয়া অজস্র পাথুরে হাতিয়ার থেকে তারা বিভিন্ন যুগে বৃক্ষ লতা ও প্রাণীর প্রকৃতি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ধারা, তাদের ক্রমবিকাশে রূপান্তরের স্বরূপ কিছুটা অনুমান করতে পেরেছেন। এই অনুমানের নিরিখেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা একটু একটু করে দানা বাঁধতে সুরু করেছে।

ভারতে প্লিসটোসীন ম্যান বা অন্ত্যাধুনিক যুগের মানুষের ফসিল আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে খুব কম। নর্মদা উপত্যকায় থিওবোল্ড সাহেবের আবিষ্কৃত হোমো-সেপিয়েন্স, মাদ্রাজের কাছে ফুটে সাহেবের আবিষ্কৃত মানুষের কঙ্কালের হাড় এবং মেদিনীপুর জেলার

---

১. 'তিনিই একমাত্র যোগ্য ও শ্লাঘ্য বা প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক যিনি অতীত উন্মোচন করেন বিচারকের মত, আবেগ সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব বর্জন ক'রে।'

সিজুয়ায় পাওয়া হোমো-সেপিয়েন্‌স-সেপিয়েন্‌সের ফসিল[২]—ভারতে অত্যাধুনিক মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। কারণ এত বড় উপমহাদেশের আয়তনের তুলনায় ফসিলের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। প্রাপ্ত ফসিলগুলির প্রাচীনত্ব ও প্রকৃতিও বৈজ্ঞানিক সংশয়ের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি।

জীবাশ্মের স্বল্পতা পুষিয়ে দিয়েছে পাথুরে আয়ুধের প্রাচুর্য। আয়ুধগুলিই আদিম মানবের অস্তিত্ব ও বসবাসের চিহ্ন। ছোটনাগপুরের মালভূমি এবং তার প্রসারিত পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবাংলা ও কাছাকাছি অঞ্চলসমূহ পাথুরে আয়ুধের স্বর্ণভূমি। সংখ্যায় যদিও আয়ুধগুলি অসংখ্য, পরিকল্পিত উৎখননের মাধ্যমে সংগৃহীত না হওয়ায় তাদের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক এবং ভূগর্ভের কতটা গভীরতায়, কোন স্তরে তাদের জমা থাকা উচিৎ, সে তথ্য অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

প্রাপ্ত আয়ুধগুলি তিন ভাগে ভাগ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এক, প্যালিওলিথিক বা প্রত্নাশ্মর বা প্রত্নপ্রস্তর আয়ুধ; দুই, মাইক্রোলিথ বা ক্ষুদ্রাশ্মর এবং তিন, নিওলিথ বা নবাশ্মর।

ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রত্নাশ্মর সংগ্রহে মি. বল ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। ঝরিয়ার কয়লাখনি, গোবিন্দপুরের কাছে কুনকুনে গ্রাম, হাজারিবাগ জেলায় বোকারো কয়লা খনি, বাঁকুড়া জেলার গোপীনাথপুর, বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ কয়লাখনি, এবং উড়িষ্যার ঢেনকানল থেকে তিনি বহু প্রত্নাশ্মর আয়ুধ সংগ্রহ করেছিলেন।[৩] আয়ধগুলির কোনটি ছিল সবুজাভ কোয়াজের্ তৈরি, কোনটি তৈরি অভ্র মেশানো কোয়াজের্, কোনটি দানা দানা কোয়াজের্, কোনটি শুধুই কোয়াজের্।

---

২. The Siwalik group of the Sub-Himalayan Region (1881)—W. Theobold, G. SI, vol XIV. ফসিলটি পরবর্তীকালে এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম থেকে খোয়া গেছে।

Prehistoric man round Madras,—V.P. Krishnaswami (1938), Indian Academy of Sciences, Madras meeting.

Report of a Fossil man in West Bengal—MVA Sastry, বাঁকুড়া—অমূল্যদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৫২। রিপোর্টটি এখনও সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয় নি।

৩. দ্রষ্টব্য, V. Ball—(1) P.A.S.B, 1865, pp. 127-28, (2) P. A.S.B 1867, p 143 (3) P.A.S.B 1874, P. 96-97, (4) P. A.S.B 1876, pp. 122-23.

আয়ুধগুলির প্রকৃতি ও উপাদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বাংলায় পাওয়া আয়ুধগুলির সঙ্গে মাদ্রাজে পাওয়া প্রত্নাশ্মরগুলির আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করেছিলেন। অনুমান করেছিলেন উভয় ক্ষেত্রে প্রত্নাশ্মরগুলির নির্মাতাদের মধ্যে যোগসূত্র ছিল। এবং বাংলার ক্ষেত্রে সেগুলি তাদের নির্মাণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে নীত হয়েছিল। অর্থাৎ মানুষের হাতে হাতে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৪]

প্রত্নপ্রস্তরগুলি প্রকৃতিতে ছিল ছ রকমের। যথা, (১) চপার বা কর্তরী, (২) চপিং টুল বা কাটার অস্ত্র, (৩) স্ক্র্যাপার বা টুকরা করে কাটার অস্ত্র, (৪) হাতকুড়ুল, (৫) ক্লিভার বা ছেদক, ও (৬) ফ্লেক টুল বা পাত বিশিষ্ট আয়ুধ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বুড়িবালং নদীর উপত্যকায় ও কুলিয়ানা গ্রামে প্রত্নপ্রস্তর আয়ুধের সন্ধানে যে উৎখনন পরিচালিত হয়েছিল,[৫] তাতে ভূগর্ভের স্তরে আয়ুধগুলির অবস্থিতি সম্বন্ধে অনুমান গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যদিও ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে ভূস্তরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সন্দেহাতীত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[৬]

নদী উপত্যকায় টপ সয়েল বা ভূত্বকের গভীরতা উর্ধ্বপ্রবাহে ছিল ৬ ফুট, নিম্নপ্রবাহে ১০ ফুট। তার নিচে, নুড়ি পাথরের উর্ধ্বস্তরে বা আপার বোলডার স্ট্রাটায় পাওয়া গিয়েছিল আয়ুধগুলি। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ ফুট গভীরতায়। টপ সয়েল বা ভূত্বকের নিচে ছিল ক্ষুদ্রাশ্মর ও নবাশ্মর আয়ুধের সঞ্চয়। নবাশ্মরগুলির সঙ্গে যেসব বুনো ঘোড়া বা গাধার মাথার খুলি ও দাঁতের অংশ পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি অন্ত্যাধুনিক যুগের পরবর্তীকালের বলে নিশ্চিতভাবে অনুমিত হয়েছিল।

মাইক্রোলিথ বা ক্ষুদ্রাশ্মর সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন ক্যাপটেন বিচিং।[৭] বিহার রাজ্যের সিংভূম জেলার চাইবাসা ও চক্রধরপুর

---

৪. On the forms and Geographical Distribution of Ancient stone implements in India—V.Ball, P.A.S.B, Second series, vol-I, pp. 388-414.

৫. Excavations in Mayurbhanj—Dr. N. K. Bose & D. Sen, Calcutta, 1948.

৬. Prehistory and Protohistory of Eastern India—A. H. Dani, Calcutta, 1981 (Rep), p. 19.

৭. Notes on some stone implements found in the district of Singbhum—Capt. Beeching, PASB 1868, p. 177.

থেকে তিনি কিছু ক্ষুদ্রাশ্মর সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তী কালে নানা জনের দ্বারা আরও অনেক ক্ষুদ্রাশ্মর সংগৃহীত হয়েছিল। যেমন, ড্রাইভার রাঁচি থেকে, এন. জি. মজুমদার দুর্গাপুর থেকে, মুরে জামশেদপুরের কাছে হয়তোপা থেকে, জি. এস. রায় মানভূম জেলার বনগড়া থেকে, হারাণচন্দ্র চাকলাদার বাঁকুড়া থেকে এবং ভারত সরকারের উদ্যোগে উৎখননের ফলে বর্ধমান জেলার বীরভানপুর থেকেও অজস্র ক্ষুদ্রাশ্মর সংগৃহীত হয়েছিল।

ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধের জায়গাগুলি মানচিত্রের ওপর সাজালে দেখা যায়, গঙ্গার দক্ষিণ তীর জুড়ে তাদের প্রাধান্য। এলাকাটি ছোটনাগপ র মালভূমির ভেতর। অধিবাসী বেশীরভাগ আদিবাসী কোম ও উপজাতি।

কর্ণেল গউন মনে করতেন[৮] তামার খনি ও ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধের মধ্যে যোগসূত্র আছে। কারণ, খনি এলাকা থেকে দূরে গেলে ক্ষুদ্রাশ্মরের সন্ধান পাওয়া যায় না। তার অভিমত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি।[৯] রাঁচি, মানভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া সব জেলায় তামার খনি নেই, অথচ এসব জায়গা থেকে অজস্র প্রত্নাশ্মর আয়ুধ সংগৃহীত হয়েছে।

ক্ষুদ্রাশ্মরের সঙ্গে নবাশ্মরের সহাবস্থানও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক্ষুদ্রাশ্মরের সঙ্গে কোথাও কোথাও হাতে গড়া কালো ও লালরঙের মোটা মাটির পাত্রও পাওয়া গেছে। তামার খনির কাছে, মাটির নিচে, এইসব দ্রব্যের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ কেউ মনে করেন,[১০] তামার খনিতে কাজ চলাকালেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাথুরে হাতিয়ারের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

ক্ষুদ্রাশ্মর ও নবাশ্মর আয়ুধের সহাবস্থানের সবচেয়ে বড় নজির পাওয়া যায় অধুনালুপ্ত মানভূম জেলার বনগড়া নামক জায়গায়। বর্তমান পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ সীমান্তে বলরামপুর থানা। তারপর থেকে সুরু হয়েছে সিংভূম জেলার চাণ্ডিল থানার সীমানা। চাণ্ডিল একসময় পুরুলিয়া সদর মহাকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুই থানার সীমান্তে বনগড়া, বর্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত।

---

৮. The Stone industries of the Holocene in India and Pakistan—D. H. Gordon, Ancient India, No. 6, pp. 64-90.

৯. দ্রষ্টব্য A. H. Dani, p. 34.

১০. The Ancient workers of Western Dhalbhum—E. F. O. Murray. JASB 1940, vol VI, pp. 79-104.

আদ্রা-টাটানগর রেলপথের ওপর পড়ে নিমডি স্টেশন। নিমডি থেকে তিন মাইল দূরে বনগড়া। দুদিকে পাহাড়, মাঝখানে উপত্যকা। একদিকে পাহাড় বেশ উঁচু, প্রায় দুহাজার ফুট। অন্যদিকে ছোট ছোট সারবাঁধা ডুংরি। ডুংরি হলেও তাদের গড় উচ্চতা হাজার ফুট।

দুদিকে পাহাড়সারির মধ্যে উপত্যকাটি সরু, লম্বাটে। দৈর্ঘ্য এক মাইল। বৃক্ষ লতা ও ঝোপে আকীর্ণ। মোটামুটি সেখানে ছিল তিনটি বিভিন্ন স্তর। বিগত ক'বছর ধরে[১১] কাছাকাছি গাঁয়ের মানুষ জঙ্গল কেটে আবাদ সুরু করেছিলেন। লাঙলের মুখে তখন বেরিয়ে পড়েছিল ক'টি ক্ষুদ্রাশ্মর ও নবাশ্মর। নবাশ্মরগুলি সংগ্রহ করেছিলেন ড. সুরজিৎ সিনহা।[১২] তিনি শ্রীগৌতমশংকর রায়কে স্থানটি পরিদর্শন করতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্রীরায়ের অনুসন্ধানের এলাকা ছিল আট বর্গমাইল। এলাকাটির এক এক জায়গা এক এক নামে পরিচিত। যেমন, বনগড়া, মাটলাগাড়া ইত্যাদি। ক্ষুদ্রাশ্মরের সংগ্রহে ঝোলা ভরে উঠেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য, ৬৯টি ফ্লেক বা ছিলকা ও ২৪টি মূল আয়ুধ (Cores)। স্থানটি ক্ষুদ্রাশ্মর তৈরির ফ্যাকটরি ছিল বলে অনুমিত হয়েছিল।

কাছাকাছি নবাশ্মরের ক্ষেত্র থেকে ক'টি নবাশ্মরও সংগৃহীত হয়েছিল। প্রকৃতির দিক থেকে সেসব ছিল, কেল্ট, রিংস্টোন সছিদ্র পাথরের বীড ও পটশার্ড।

নবাশ্মর আয়ুধের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে পাথুরে হাতিয়ার, মাটির পাত্র ও শষ্য-চাষের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল।[১৩] বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে সংগৃহীত নবাশ্মরের প্রাচুর্যও বিস্ময়কর। মূল এলাকাও ব্যাপক। গঙ্গা-ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরস্থ ছোটনাগপুরের অরণ্যপ্রদেশ প্রসারিত করতলের মত বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে খানিকটা ঢুকে পড়েছে।

এই বিস্তীর্ণ এলাকার উত্তর-সীমায় পাটনা জেলার রাজগীর, গয়া জেলার

---

১১. স্থানটি থেকে গৌতমশংকর রায় ক্ষুদ্রাশ্মর সংগ্রহ করেছিলেন ১৯৫৩ সালে। দ্রষ্টব্য, Microlith Industry of Bongara, Manbhum. Man in India, vol. 34, No. 1 (1954).

১২. Discovery of some Prehistoric stone tools in South Manbhum—Dr. Surajit Sinha. Science & Culture, vol. 7, Oct. 1951.

১৩. The Prehistoric Culture of Bengal—H. C. Chakladar, Man in India, 1952.

সাহেবগঞ্জ, ও মুঙ্গের জেলার জামালপুর। পূবের সীমায় সাঁওতাল পরগণার দুমকা মহকুমা, বীরভূম জেলার রানীগঞ্জ, বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর, বাঁকুড়া জেলার কিছু কিছু অঞ্চল ও মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও বামাল। গঙ্গার উত্তর তীরভূমি অঞ্চলে নবাশ্মর আবিষ্কারের হদিস আজ পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়নি।[১৪]

যেসব নদী উপত্যকা নবাশ্মরের সংগ্রহ ক্ষেত্র, সেসব নদী জন্ম নিয়েছে ছোটনাগপুরের উচ্চভূমিতে। যথা, অজয়, দামোদর, কাঁসাই, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা ও তার শাখানদী সঞ্জয় এবং বুড়িবালং। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে পুনরায় পাওয়া যায় নবাশ্মরের সংগ্রহ এলাকা।

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বামাল, বর্ধমান জেলার বীরভানপুর এবং অধুনালুপ্ত মানভূম জেলার বনগড়া সবই উচ্চভূমিতে অবস্থিত। ফলে অনুমিত হয়, নবাশ্মর যারা তৈরি করতেন তারা নদীর প্লাবণ থেকে বাঁচবার জন্য উচ্চভূমি বেছে নিয়েছিলেন। যদিও নদীর কাছাকাছি ছিল তাদের অবস্থিতি।

নবাশ্মর আয়ুধের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে বসবাসকারী সংখ্যাধিক্য জনগোষ্ঠী, অস্ট্রো-এসিয়াটিক বা মুণ্ডা প্রাধান্যের অনুমিত আদিম সূত্রটি পাওয়া যায়। সূত্রের উৎস দুই ধরণের নবাশ্মর। এক, মুখ-বিশিষ্ট হাতিয়ার; দুই, কাঁধওয়ালা আয়ুধ।

মুখবিশিষ্ট হাতিয়ার সবথেকে বেশী পাওয়া গেছে রাঁচি জেলা থেকে। তমলুকে উৎখননের মাধ্যমে যে স্তরে পাওয়া গেছে, তা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বলে অনুমিত। আয়ুধগুলির মধ্যে কিছু কিছু জেড পাথরে তৈরি। মালয়, য়ুনান ও উত্তরচীনের নদীমাতৃক সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলি থেকে এ জাতীয় আয়ুধ প্রচুর সংখ্যায় সংগৃহীত হয়েছিল। জেড পাথরে তৈরি ছোট ছোট আয়ুধগুলি য়ুনান ও রাঁচির মধ্যে একদা যোগসূত্রের ইংগিত দেয়। তেমনি পাতলা পাতের চওড়া কুড়ুল সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে গারো পাহাড়ের যোগসূত্র চিহ্নিত করে। গোল-হাতলের কুড়ুল, যা ভারতীয় ধাঁচের বলে খ্যাত, উলটোভাবে, এই অঞ্চলের সঙ্গে আসামের যোগসূত্র নির্দিষ্ট করে।

কাঁধওয়ালা আয়ুধের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য। আয়ুধগুলির সংগ্রহক্ষেত্রও ব্যাপক। প্রকৃতিও দুরকমের, মসৃণ ও এবড়োখেবড়ো। দুধরণের আয়ুধই আসামের খাসি ও গারো পাহাড়ে পাওয়া গেছে। তেজপুরে পাওয়া

---

১৪. দ্রষ্টব্য, Dr. A. H. Dani

গেছে এবড়োথেবড়ো ধরণের। বনগড়া, বিহারের ধলভূম ও রাজগীর এবং উড়িষ্যার শিশুপালগড় ও ময়ূরভঞ্জে থেকেও সংগৃহীত হয়েছে দুজাতের আয়ুধ।

কাঁধওয়ালা আয়ুধের সঙ্গে অসট্রো-এসিয়াটিক ভাষাভাষী মানুষদের সম্পর্ক ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন। কারণ, মসৃণ কাঁধওয়ালা আয়ুধের আদিভূমি দক্ষিণপূর্ব এসিয়া, প্রধানত বর্মাদেশ। ভারতে প্রচলিত মুণ্ডা ভাষাগুলির উৎপত্তিস্থলও সেখানে।[১৫] ভারতে এই ভাষাভাষী মানুষেরা যখন অনুপ্রবেশ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের আয়ুধের ঐতিহ্যও বাহিত হয় এসেছিল।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে[১৬] ভারতে কোল ভাষা দুটি ধারায় বিভক্ত। একদিকে, সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষা, অন্যদিকে খাসিয়া, নিকোবর ও বর্মার কিছু কিছু ভাষা। ফলে অনুমিত হয় ভারতে অসট্রিক অনুপ্রবেশ দুটি ধারায় সাধিত হয়েছিল। একটি গিয়েছিল উত্তরে কাশ্মীর থেকে হিমালয় উপত্যকা এবং সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলধারা অনুসরণ করে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত। অপরটি গিয়েছিল, উত্তরপূর্ব ভারত, বর্মা ও মালয় উপদ্বীপে।[১৭]

হাইন-গ্লেনডার্ণ অনুমান করেছিলেন দক্ষিণপূর্ব এসিয়া থেকে অসট্রো এসিয়াটিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল দু'হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তথা কথিত আর্য অনুপ্রবেশের অনেক আগে।[১৮] স্থলপথে দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার সঙ্গে ভারতের বরাবর একটা যোগসূত্র ছিল। চৈনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গমস্থল ছিল তুর্কীস্থান ও উত্তর আন্নাম।[১৯] কাঁধওয়ালা ব্রোনজ আয়ুধ সর্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল অনিয়ং থেকে। তখন ইন বংশের যুগ। তার সময়কাল ১৩০০-১০২৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

---

১৫. Prehistoric Research in the Netherlands Indies, New York, 1945

১৬. Peder. W. Schmidt এই অভিমত পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। J & P of Asiatic Society of Bengal, vol. IX, 1913.

১৭. অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, দ্রষ্টব্য ১৬।

১৮. R. Heine—Glendern, দ্রষ্টব্য ১৫। বিশেষজ্ঞদের নিরূপিত ঋক্‌বেদের সময়কাল এ অনুমান সমর্থন করে না। কারণ, আর্য অনুপ্রবেশ এ গণনায় ধরা হয়েছে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

১৯. Geographical Factors in Indian Archaelogy—J.F. Richards, Indian Antiquary, vol LXII, pp. 235-43.

কোল বা মুণ্ডা ভাষাভাষী মানুষেরা ছোটনাগপুর অরণ্য প্রদেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তারা এ অঞ্চলে কতকগুলো বিশিষ্ট ধরণের নবাশ্মর নিয়ে এসেছিলেন। তাদের পূর্ববর্ত্তী ছিলেন ক্ষুদ্রাশ্মর নির্মাতারা। তাম্র-প্রস্তর ও লৌহযুগে এরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আরও নানা জনগোষ্ঠী এখানে এসে তাদের বাসভূমি গড়ে তুলেছিলেন। অধুনালুপ্ত মানভূম ও বর্ত্তমান পুরুলিয়ার জনজীবন এইসব বৈচিত্র্যময় ও বহু জনগোষ্ঠীর মিলনমিশ্রণে এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সঙ্গমের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

খ. ইতিহাসের উষালগ্ন

বৈদিক অ-বৈদিক ও আদিম অধিবাসী

অথেদানীং ঝারীখণ্ড—জাঙ্গলং দেশো বিচ্যতে।
দারিকেশাদুত্তরে চ দ্ব্যণ্ট যোজনমানতঃ ॥
পঞ্চকূট পার্শ্বভাগে ভাগীরথ্যাশ্চ পশ্চিমে।
জাঙ্গলো ঝারীখণ্ডশ্চ দেশঃ কীকটসন্নিধৌ ॥[১]

—ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।

ইতিহাসের উষালগ্নে মানভূম বা পুরুলিয়া জেলার অস্তিত্ব ছিল না। অঞ্চলটি ছিল অংগ বঙ্গ ও কলিংগের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে। প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে জম্বুদ্বীপ বা প্রাচীন ভারতবর্ষ কখনও পাঁচ ভাগে কখনও সাত ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থে পাঁচ ভাগই স্বীকৃত। ভাগগুলি ছিল প্রাচ্য বা পূর্বভারত, পাশ্চাত্য বা পশ্চিম ভারত, উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরাপথ বা উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্যদেশ বা উত্তরভারতের মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। অংগ ও বংগ ছিল প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত, কলিংগ ছিল দক্ষিণাপথের ভেতর।

সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্যদের বসবাসের পূর্বসীমা প্রথমদিকে ছিল মধ্যদেশের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত। কিন্তু সে সীমান্ত স্থির ছিল না। ধীর ও দৃঢ় গতিতে ক্রমশ পূর্বদিকে বেড়ে বেড়ে চলেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল বংগোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত। কুরু, পাঞ্চাল এবং মধ্যদেশের অপর জাতিগুলির কাছে প্রাচ্য বা পূর্বদেশীয় বলতে বোঝাত কোশল বা

১. ঝারীখণ্ড বা ঝাড়খণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে ভবিষ্য পুরাণে বর্তমান পুরুলিয়া জেলার কিছু কিছু অঞ্চল ও নদীর কথা এসে পড়েছে। ঝারীখণ্ডকে বলা হয়েছে জঙ্গল দেশ। দারিকেশ বা দ্বারকেশ্বর নদের উত্তরে, ভাগীরথীর পশ্চিমে ও পঞ্চকূট বা পাঁচেট পাহাড়ের পাশে জঙ্গলময় ঝারীখণ্ড, ছিল কীকট দেশের কাছাকাছি।

বর্তমান অযোধ্যা অঞ্চল, কাশী এবং বিদেহ বা বর্তমান উত্তর বিহার। পরবর্তীকালে মগধ ও অংগ বা দক্ষিণ-বিহারও প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হত।

সংস্কৃত ভাষাভাষী সমস্ত আর্যেরা বৈদিক ধর্ম ও আচার আচরণ অনুসরণ করতেন না। ঋক্‌বেদেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে এমন এক বা একাধিক গোষ্ঠী ছিলেন যাদের ধর্ম ও আচার আচরণ ছিল আলাদা। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর মানুষেরা গংগার প্রবাহপথ ধরে প্রথমে পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।[২] বৈদিক আর্যরা এসেছিলেন তাদের পরে।

পূর্বদেশে বা প্রাচ্যে আদিম অধিবাসী ছিলেন দ্রাবিড় ও কোলেরা। তারা অনার্য। অ-বৈদিক ও বৈদিক উভয় আর্যদের সংগেই তাদের নিদারুণ সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ঋক্‌বেদে কীকট দেশের উল্লেখ আছে।[৩] টিকা লিখতে গিয়ে যাস্ক সেটি অনার্য অধ্যুষিত দেশ বলে বর্ণনা করেছেন।[৪] পরবর্তী সংস্কৃত লেখকেরা কীকটকে মগধের সংগে সনাক্ত করেছেন। অথর্ব বেদে অংগ ও মগধের কথা আছে। তারা দূরের অপরিচিত মানুষ। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্য বাসীদের বলা হয়েছে আসুরীয়।[৫] উত্তর বিহার ততদিনে বৈদিক আর্যদের প্রভাবের আওতায় এসে পড়েছিল। মগধ ছিল বৈদিক আর্য প্রভাবের বাইরে।

শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল ও বুদ্ধদেবের জন্মের[৬] মধ্যবর্তী সময়ে মগধ শক্তিশালী আর্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। তবে সে আর্যেরা বৈদিক আর্য-দের থেকে ধর্মে, ভাষায় ও আচার আচরণে ছিলেন পৃথক। সম্ভবত অনার্যদের ভাবধারা ও আচারআচরণে অভিসিঞ্চিত হয়ে মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়ে-ছিলেন। যদিও ভাষার দিক থেকে আর্যভাষা বা সংস্কৃতকেই তখনও পর্যন্ত

---

২. "Some of these non-Vedic Aryans seem to have preceded the Aryans of the Vedic cults in the east, along the Ganges, where the latter followed them from their Midland head-quarters."—The Origin and Development of the Bengali Language by Dr. Suniti Kumar Chatterji, vol-I.

৩. ঋগ্বেদ, ৩/৫৩, ১৪। ঋগ্বেদের সময় ১৫০০-১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

৪. 'দেশো-নার্য-নিবাস-কীকট'। নিরুক্ত (৬।৩২)—যাস্ক। যাস্কের সময় ৫০০খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

৫. শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় ৭০০ (?) খ্রীস্ট পূর্বাব্দ। ছাপার ভুলে 'বাঁকুড়া' বইটিতে হয়েছে খ্রীস্টের জন্মের দুশো বছর আগে'। দ্রষ্টব্য—বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১।

৬. বুদ্ধদেবের জন্ম ৫৫৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ। মতান্তর আছে।

ধরে রেখেছিলেন। বৈদিক আর্যেরা এদের ব্রাত্য বলে অভিহিত করতেন। মগধেই সম্ভবত ব্রাত্যেরা অধিক সংখ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছিলেন। ফলে মগধ হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের কেন্দ্রভূমি।

অথর্ব বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের মাহাত্ম্য ও মহিমাসূচক দুটি অনুবাক আছে। সেখানে ভ্রাম্যমান ব্রাত্য পুরোহিত দেবত্বে উন্নীত হয়েছেন। সম্ভবত ব্রাত্যদের মধ্যে শৈব সাধনা প্রচলিত ছিল। তবে ধ্যানধারণায় তারা যে বৈদিক আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন একথা নিশ্চিত।[৭]

ঋক্ বেদে দীর্ঘতমস বা দীর্ঘতমা ঋষির অনেকগুলি শ্লোক আছে। তাদের ভেতর দুটি শ্লোক প্রসিদ্ধ।[৮] একটি শ্লোকে বলা হয়েছিল এক গাছে দুটি পাখি বন্ধুভাবে বসবাস করে, তাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল খায়; অপরটি খায়না, চেয়ে চেয়ে দেখে। অপর সূক্তটিতে বলা হয়েছিল, সৎ বা সত্য এক, জ্ঞানীরা তাকে নানা নামে অভিহিত করে থাকেন।

দীর্ঘতমা ঋষির সূক্ত দুটির মধ্যেই যেন পরবর্তীকালের সমন্বয়ের সূত্রটি নিহিত রয়েছে। 'অথর্বন' শব্দটির মধ্যে বুদ্ধিবাদী ধ্যানধারণার বীজ আদি থেকেই উপ্ত ছিল। দীর্ঘতমা ছিলেন অথর্বন বংশের মানুষ।[৯] সমন্বয়ের প্রতি তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি পরবর্তী সাহিত্যে তাকে অনার্য ও অ-বৈদিক আর্যদের বৈদিক আর্যে রূপান্তরের জনক বলে সম্মান জানিয়েছিল।

মহাভারতের আদিপর্বে (১০৪ অধ্যায়) দীর্ঘতমার গল্প সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তার পিতার নাম উতথ্য, মাতা মমতা। তিনি জন্ম থেকে অন্ধ, তাই নাম দীর্ঘতমস। সম্ভবত বৈদিক ধ্যানধারণার প্রতি অন্ধ অনুরাগ না থাকায় তাকে জন্মান্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। বৃহস্পতির অভিশাপে

---

৭. The Vrātya hymns of the Atharva Veda (xv), in which there is a deification of a Vrātya priest, with his strange paraphernalia and his cortege, are a puzzle; they suggest the presence of a Saiva cult among the Vrātyas, and certainly a cult quite different from that presented by the Vedic word."—Suniti Kumar Chatterji, vol-I, p. 46.

৮. 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥'—ঋক্‌বেদ, ১।১৬৪।২০
এবং 'একমসৎ বিপ্রনা বহুধা বদন্তি' (সন্ধি ভেঙে দেওয়া হয়েছে)—ঋক্‌বেদ, ১।১৬৪।৪৬

৯. Vedic Culture—C. Kunhan Raja, The Cultural Heritage of India, vol-I,

তিনি জন্মান্ধ হয়েছিলেন। বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদের গুরু। অর্থাৎ বৈদিক আর্যদের উপদেষ্টা।

দীর্ঘতমার স্ত্রীর নাম ছিল প্রদ্বেষী। তার গর্ভে উৎপাদিত পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন গৌতম। গৌতম ছিলেন বৈদিক আর্যদের বিধিবিধানের প্রণয়নকর্তা। দীর্ঘতমাকে আর্যাবর্ত বা বৈদিক আর্যদের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি বলি রাজার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দীর্ঘতমাই সম্ভবত ছিলেন পূর্বভারতে বা প্রাচ্যে অনার্য ও আর্য বা অবৈদিক আর্য ও বৈদিক আর্যদের মধ্যে সমন্বয়ের আদি পুরুষ।

বলি রাজার রাজ্যে এসে দীর্ঘতমা রাজমহিষীর ধাত্রীর গর্ভে এগারোটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। ধাত্রীর নাম ছিল উশিজ। ঋক্ বেদে বলা হয়েছে 'কক্ষীবন্তং য ঔশিজ', (ঋক্ বেদ ১৷১৮৷১)। পুত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন কক্ষীবান বা কাক্ষীবান। তিনি অনেকগুলি সূক্ত রচনা করেছিলেন। রাজার ক্ষেত্রে বা মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। এই পাঁচ পুত্রই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে প্রসিদ্ধ। তাদের নামে তাদের অধিকৃত দেশগুলি পরিচিতি লাভ করেছিল।[১০] প্রকৃতপক্ষে পূর্বভারত আর্যীকরণের অনেক পরে মহাভারত রচিত হয়েছিল।[১১] তাতে রূপক আকারে পরিবেশিত হয়েছিল আর্যীকরণ সূত্রপাতের গল্পটি।

প্রথম যে এগারোজন পুত্র দীর্ঘতমা উৎপাদন করেছিলেন বলে বলা হয়েছে তারা ছিলেন ছোট ছোট এগারোটি ক্ষেত্রের অধীশ্বর। শিষ্য পুত্রেরই নামান্তর। এগারোজন সামন্ত দীর্ঘতমার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে দীক্ষিত হলে, সম্রাট বলি নতুন ধর্মের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন এবং পাঁচজন প্রাদেশিক অধিকর্তাকে বা পাঁচটি প্রদেশে নতুন ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে দীক্ষিত হয়েছিল অঙ্গ তারপর যথাক্রমে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

সাম্প্রতিক গবেষণা রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বংশগুলি ও ব্যক্তিদের সময় নির্ধারিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে। দীর্ঘতমা

---

১০. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ১৩, পাদটিকা ২১।

১১. মহাভারতের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রীস্টাব্দ ২০০ পর্যন্ত অনুমিত।

ও বলির সময় অনুমিত হয়েছে যথাক্রমে ১২৯৫ ও ১২১০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ।[১২] অর্থাৎ পূর্ব ভারতে আর্যীকরণের সূত্রপাত হয়েছিল ঋকবেদ রচনাকালের শেষ দিকে। পরবর্তীকালে, বংশ বংশ ধরে মুখে মুখে ফেরা প্রাচীন গল্প-গুলি মহাকাব্য ও পুরাণে কিংবদন্তির আকারে লেখা হয়েছিল।

রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমার প্রথম পুত্র অঙ্গ।[১৩] অঙ্গ আসলে এখনকার পূর্ববিহার। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা বা চম্পাপুরী। ভাগলপুরের কাছে। পরবর্তীকালে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অঙ্গ থেকেই আর্য ভাষা বা সংস্কৃত পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। অধুনালুপ্ত মানভূম জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ, বিশেষত দামোদর নদের উত্তর তীরের ভূভাগ ছিল অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত।

অঙ্গের কাছাকাছি মগধও ছিল শক্তিশালী রাজ্য। এবং অনার্য রাজ্য। পরবর্তীকালে মধ্যদেশের সঙ্গে, বিশেষত অযোধ্যার সঙ্গে তাদের বৈবাহিক কাজকর্ম চলত। রঘুবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুর মা সুদক্ষিণা ছিলেন মগধের রাজকন্যা। কোশলের মহারাজা দিলীপ তাকে বিয়ে করেছিলেন।[১৪] রামায়ণের যুগে অঙ্গ ও অযোধ্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। অঙ্গের অধিপতি লোমপাদ ছিলেন অযোধ্যার রাজা অজের পুত্র দশরথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।[১৫] লোমপাদের সময় সম্ভবত বৈদিক আর্যদের বিধি-বিধান অঙ্গে চালু হয়েছিল। বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যানটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। লোমপাদ নিজের কন্যা বা পালিতা কন্যা, শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিয়ে দিয়েছিলেন। রামায়ণে (অযোধ্যা কাণ্ড, ১০/৩৭) বলা হয়েছে দশরথ-অজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল অঙ্গ। মহাভারতে দেখা যায় অঙ্গের রাজা

---

১২. Dates and Dynasties in Earliest India by R. Morton Smith. Delhi, 1973.

১৩. নিরূপিত সময়কাল অঙ্গ—১২১৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ, বঙ্গ ও সুহ্ম—১২১০ খ্রীপূ. কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সময়কাল নির্ধারিত হয়নি। দ্রষ্টব্য, Smith—Index.

১৪. দিলীপের সময় ১২২০ খ্রীপূর্বাব্দ। মতান্তরে ১১০১ খ্রী পূ। দ্রষ্টব্য R. M. Smith.

১৫. দশরথ লোমপাদ, দশরথ অজ ও ঋষ্যশৃঙ্গ—ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। তাদের সময়কাল ১০৯০ খ্রী. পূর্বাব্দ। R. M. Smith, p. 503, বন্ধুত্ব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, মহাভারত বনপর্ব ১১০ অধ্যায়।

ছিলেন কর্ণ। তিনি সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গ জয় করে, বঙ্গ ও অঙ্গকে একটি বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় ব্রহ্মদত্ত ছিলেন অঙ্গের রাজা। বুদ্ধদেব ও মহাবীরের জন্মের আগে থেকে পূর্ব ভারতে আধিপত্যের প্রশ্ন নিয়ে অঙ্গ ও মগধের মধ্যে লড়াই চলেছিল দীর্ঘকাল। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত ও নিহত করে ভাট্টিয়ের পুত্র শ্রেণীয় বিম্বিসার অঙ্গ অধিকার করেছিলেন। মগধের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল অঙ্গ। ভাট্টিয়ের মৃত্যু পর্যন্ত বিম্বিসার অঙ্গের রাজধানী চম্পাপুরীতে থেকে রাজ্য শাসন করতেন। রামায়ণে অঙ্গের প্রাচীন নাম অঙ্গপুর। চম্পার প্রাচীন নাম মালিনী। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে বিন্দুসারের নাম বিন্দুসেন বা বিন্ধ্যসেন। খারবেলের পূর্ব পর্যন্ত অঙ্গ ছিল মগধের অন্তর্গত।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেই দামোদর ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আরও দুটি রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। বা রাজ্য দুটি আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে একটি ছিল সুহ্ম, অপরটি তাম্রলিপ্ত। দুটি রাজ্যই ছিল অনার্য অধ্যুষিত। পঞ্চ পাণ্ডবের পিতা পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে যেসব দেশ জয় করেছিলেন তাদের মধ্যে কাশী, সুহ্ম ও পুণ্ড্র ছিল অন্যতম।[১৬] সম্ভবত তখনও তাম্রলিপ্ত রাজ্য অ-বিজিত ছিল। পাণ্ডুপুত্র ভীম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে মোদাগিরি অর্থাৎ বর্তমান মুঙ্গের, পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, সমুদ্র সেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বটাধিপতি, সুহ্ম ও প্রসুহ্ম দেশ ও অধিপতিদের পরাজিত করেছিলেন।

পুরুলিয়া জেলার পূর্বাংশ, হয়ত একসময় সমগ্রাংশ, তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কারণ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সময়েও তাম্রলিপ্ত নেহাত ছোট রাজ্য ছিল না! আয়তনে ছিল প্রায় ১৪০০ লি বা ২৩৩ মাইল।[১৭] তাম্রলিপ্ত রাজ্যটি কখনও থাকত স্বাধীন কখনও অন্তর্ভুক্ত হত সুহ্মের, কখনও বঙ্গের।[১৮] উত্তরপূর্ব ভারতে তাম্রলিপ্ত ছিল সবচেয়ে বড় বন্দর। পাটালিপুত্র থেকে আসতে হলে, দামোদর পেরিয়ে যে পথটি ধরতে হত, তা ছিল মানভূম বা বর্তমান পুরুলিয়া জেলার ভেতর দিয়ে। ফলে অনুমিত হয়, এ অঞ্চলটি

---

১৬. মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৩ অধ্যায়।

১৭. History of Ancient Bengal—Dr. R.C. Majumdar.

১৮. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৮-১৬।

তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭২-৭৩ সালে মি. জে. ডি. বেগলার পথটি ধরে পাটলিপুত্র থেকে হুগলী এসেছিলেন।[১৯]

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ৩২৬-২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। তখন পূর্ব ভারতে দুটি বড় বড় রাজ্য ছিল। একটি প্রাচী, গ্রীকদের ভাষায় প্রাসই; অপরটি গঙ্গাহৃদি বা গঙ্গারাঢ়ী, গ্রীকদের ভাষায় গঙ্গাহৃদেস বা গঙ্গারিঢ়ি।[২০] টলেমির ভূগোলে গঙ্গার তীরে অধিষ্ঠিত সহরগুলির মধ্যে পালিমবোথরা বা পাটলিপুত্র ছিল প্রাচী রাজ্যের রাজধানী। টম্যালিটস বা তাম্রলিপ্ত ছিল অন্যতম বন্দর। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু 'পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি' গ্রন্থে উল্লিখিত 'গঙ্গে' বন্দরের সঙ্গে তাম্রলিপ্তকে সনাক্ত করেছিলেন।[২১] সনাক্তীকরণ সঠিক বলে মনে হয় না।

অশোকের সময় তাম্রলিপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অশোক নিজে এখানে স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[২২] সিংহল থেকে জাহাজে যেসব বণিক ও তীর্থযাত্রীরা আসতেন, তারা এসে নামতেন তাম্রলিপ্তে। এমনিভাবে এসেছিলেন সিংহলের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ও সঙ্গীরা। বোধিদ্রুমের শাখা নিয়ে তারা যখন সিংহলে ফিরে গিয়েছিলেন, বিশাল সেনাবাহিনী সহ অশোক স্বয়ং তাদের তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।[২৩] অশোকের রাজ্যের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন ও

---

১৯. Report of a tour through Bengal Provinces etc—J. D. Beglar, Calcutta, 1878.

২০. রাজ্য দুটি, বিশেষত গঙ্গাহৃদি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, গঙ্গাসাগর মেলা ও প্রাচীন ঐতিহ্য—তরুণদেব ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৯৮৪, পৃ ৫০-৬৪।

২১. দ্রষ্টব্য, The Geographical Background of Indian Culture—Prof. Nirmal Kumar Bose, Cultural Heritage of India, vol—I, p. 5, এই সনাক্তীকরণ সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ টলেমির ভূগোলে Tamalites a Gange দুটি পৃথক সহর হিসেবে বর্ণিত হয়েছিল।

২২. Buddhist Record of the Western World—S.Beal, vol—II, অশোকের সময় ২৬৯-২৩২ খ্রী পূর্বাব্দ।

২৩. Asoka—V. A. Smith, pp. 166, 168

সমতটও অন্তর্ভুক্ত ছিল ব'লে কেউ কেউ অনুমান করেছেন।[২৪] একমাত্র উত্তর বাংলার মহাস্থান ছাড়া অশোকের সমসাময়িক কোন লিপির সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। রাজত্বের নবম বৎসরে অশোক কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। সুবর্ণরেখা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল যুদ্ধটি। যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ, বন্দী হয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষ। নিহত ও বন্দীর সংখ্যা নির্দেশ করে কলিঙ্গ ছিল মগধের মতই শক্তিশালী রাজ্য। মৌর্য সাম্রাজ্যের ভেতর আসার পর কলিঙ্গ দুটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এক, উত্তর ও পূর্বাংশ নিয়ে একটি বিভাগ যা পরবর্তীকালে তোসল নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। রাজধানী ছিল তোসলি অর্থাৎ বর্তমান পুরী জেলার ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলি। দুই, দক্ষিণ পশ্চিম অংশ নিয়ে অপর বিভাগ, রাজধানী ছিল বর্তমান গঞ্জাম জেলার জুনাগড়ের কাছে সমাপা।[২৫]

অশোকের মৃত্যুর সাঁইত্রিশ বছরের মধ্যে মগধ মৌর্যবংশের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। শুঙ্গবংশের পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্যসম্রাট বৃহদ্রথকে উৎখাত করে শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২৬] অন্তর্কলহের সুযোগ নিয়ে কলিঙ্গও একটু একটু করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চেতা বা চেদি বংশের সন্তান খারবেল চব্বিশ বছর বয়সে কলিঙ্গের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রাজত্বের অষ্টম বৎসরে অভিযান চালিয়েছিলেন রাজগৃহে। রাজগৃহের রাজা পালিয়ে গিয়েছিলেন মথুরায়। বিংশ বৎসরে আক্রমণ করেছিলেন মগধ। অঙ্গ ও মগধ লুণ্ঠন ক'রে বহু ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন। লুণ্ঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান সাহাবাদ বা আরা, পাটনা, গয়া, ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা।[২৭] দামোদরের দক্ষিণাঞ্চল খারবেলের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হয়েছিল। খারবেলের মৃত্যুর পরে,

---

২৪. 'If tradition is to be believed, the dominions of Asoke included the secluded vales of Kashmir and Nepal as well as riparian plains of Pundravardhan (North Bengal) and Samatata (East Bengal)'—An Advanced History of India by Dr. R. C. Majumdar, Dr. H. C. Roychaudhuri and Dr. K. K. Datta, p. 96

২৫. Studies in the Geography of Ancient and Medieval India—Dr. D. C. Sircar,

২৬. পুষ্যমিত্র শুঙ্গের অভ্যুত্থানের সময় ১৭৮ খ্রী পূর্বাব্দ।—Chronology of India, vol-I by M. Duff.

২৭. History of Orissa, vol—I, R. D. Banerjee,

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই কলিঙ্গ, সাতবাহন বংশের আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

খারবেলের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন বিশাল অঞ্চলের মধ্যেই সম্ভবত ত্রি-কলিঙ্গের জন্ম হয়েছিল।[২৮] ত্রি-কলিঙ্গের ব্যাপ্তিও ছিল বিশাল। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূল বা গাঙ্গেয় বদ্বীপ থেকে গোদাবরী পর্যন্ত। প্রথম ভাগ ছিল পাললিক সমভূমি অর্থাৎ দামোদরের দক্ষিণ-তীর থেকে ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জর ও আঙ্গুলের পাহাড়ী অঞ্চল পর্যন্ত। প্রধান নদীগুলি ছিল রূপনারায়ণ, হলদি, সুবর্ণরেখা, বুড়িবালং, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী ও অধুনালুপ্ত প্রাচী। স্বভাবত দামোদরের দক্ষিণতীরস্থ অঞ্চল অর্থাৎ মানভূম জেলার পুরুলিয়া সদর মহকুমার সমগ্রাংশ কলিঙ্গের প্রথমভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯]

উত্তর কলিঙ্গের সমগ্রাংশ ও মধ্যভাগের কিছু অংশ নিয়ে পরবর্তীকালে দুটি রাজ্য গঠিত হয়েছিল, তোসল ও ওড্র। রাজ্য দুটির ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে জন্ম হয়েছিল ভঞ্জ, ভৌম ও উৎকল রাজ্যের। একই ভাষার সূত্রে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে গ্রথিত ক'রে আরও পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত হয়েছিল উড়িষ্যা। মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাসের অনেকখানি উড়িষ্যা রাজ্যের উদ্ভবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

---

২৮. দ্রাবিড় ভাষায় Mudu Kalinga. বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ওড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল কলিঙ্গ। History of Orissa—R. D. Banerjee, vol-I,

২৯. অপর দুটি ভাগ মহানদীর দক্ষিণতীর থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। ঋষিকুল্যা নদী অঞ্চলটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল।

গ. গৌড়ের অভ্যুদয় ও শশাঙ্ক

মানভূম এবং পুরুলিয়া

পুণ্ড্রদেশো সপ্তদেশাস্তেষাং নামানি বৈ শৃণু ।
গৌড়ো বরেন্দ্রী নিবৃতিঃ সুহ্মদেশ প্রকীর্তিতঃ ॥
জাংগলো ঝারিখণ্ডশ্চ বরাহভূমিরের চ ।
বর্দ্ধমানো বিন্ধ্যপার্শ্বে সপ্তেতে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
—ভবিষ্য পুরাণ ।

কলিংগ বিজয়ের পর অশোক কলিংগ সাম্রাজ্যটি দুই ভাগে ভেংগে দিয়েছিলেন। উত্তর তোষলি ও দক্ষিণ তোষলি। দুটি পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভাগ দুটি শাসিত হত। কতকাল সে ব্যবস্থা বজায় ছিল জানা যায় না। অশোকের একশো বছর পরে[১] কলিংগের শক্তিশালী সম্রাট খারবেল বা ভিখুরাজা বিভাগ দুটিকে এক করেছিলেন। এক করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন কলিংগের সীমা। উত্তর পূর্বে তা বিস্তৃত হয়েছিল পরবর্তীকালের গৌড় বিষয়ের উপান্ত পর্যন্ত। কলিংগের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা উত্তর তোষলির মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল উড্র, ওড্র বা ঔড্র রাজ্যটি।[২] গৌড় বংগের জনজীবনের ধারায় অভিসিঞ্চিত হয়েছিল উড্র, উৎকল বা বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের প্রথম অংকুর।

---

১. বিন্দুসারের পরে অশোক পাটলিপুত্রে অধীশ্বর হয়েছিলেন ২৬৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। খারবেল সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১৬৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে।
—Chronology of India, vol-I by C. M. Duff (Rep. 1975)

২. কামসূত্রে (৪/৬) বলা হয়েছে গৌড় বিষয়ের দক্ষিণান্ত থেকে সুরু হয়েছিল কলিঙ্গের সীমা।

খারবেল থেকে সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব পর্যন্ত[৩] প্রায় পাঁচশো বছর, বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ইতিহাস কালো অবগুণ্ঠনের আড়ালে লুকিয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত সে অবগুণ্ঠন অপসারিত হয়নি। ছিটেফোঁটা যে আলোটুকু মাঝে মধ্যে ঘোমটার আড়াল থেকে ছিটকে এসেছে, সে আভায় ইতিহাসের নির্দিষ্ট সূত্র গড়ে তোলা যায় না।[৪]

গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব সূচিত হয়েছিল আনুমানিক ২৯০ খ্রীষ্টাব্দে।[৫] প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজা গুপ্ত বা শ্রীগুপ্ত। গুপ্তদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিঙ জানিয়েছেন চীনাগত ধর্মানুরাগীদের জন্য শ্রীগুপ্ত একটি বিহার তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সেটির নাম ছিল মৃগস্থাপন বা মৃগশিখাবন। নালন্দা থেকে ৪০ যোজন বা ২৪০ মাইল পূর্বে অবস্থিত ছিল বিহারটি। সেটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চল্লিশটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল।

ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন বর্তমান মুর্শিদাবাদ বা মালদা দুটি জেলার কোন একটির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট ছিল ই-সিঙ কথিত চীনা মঠটি। মঠটি ছিল শ্রীগুপ্তের ক্ষুদ্র রাজ্যটির মধ্যে অবস্থিত। এবং রাজ্যটি ছিল বরেন্দ্রের মধ্যে বা কাছে। বর্তমান মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা জড়িয়ে থাকাও অসম্ভব নয়।[৬]

---

৩. খারবেলের হাতীগুম্ফা লিপির সময় আনুমানিক ১৫০ খ্রী. পূর্বাব্দ। সমুদ্রগুপ্তের সময় আনুমানিক ৩৫০ খ্রীস্টাব্দ। —দ্রষ্টব্য, Duff।

৪. যেমন, নাগার্জুনের তিব্বতীয় জীবনীতে পাওয়া যায় তিনি ব্যাপকভাবে দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন ওড়িভিষার (উড়িষ্যা) রাজা মুঞ্জকে। সেখানে এবং অন্যত্র কটি বৌদ্ধ বিহারও তৈরি করিয়েছিলেন। এ ঘটনার সময়কাল ১৬০ খ্রীস্টাব্দ।—Jour. Pali Text Society, 1886.

৫. C. M. Duff, p. 27, উদ্ভব ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সময়কাল ২৫০ থেকে ৩৫০ খ্রীস্টাব্দ।

৬. ড. ডি. সি. গাঙ্গুলী অনুমান করেছেন (IH, xiv, pp. 532-535) গুপ্তদের আদিনিবাস ছিল মুর্শিদাবাদে, মগধে নয়। Allan (Catalogue of Coins in the British Museum, London, XV, XIX)-এর মতে ছিল মগধে। ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের মতে (Early History of North India) ছিল মালদায় (বরেন্দ্র)। ১০১৫ খ্রী রচিত একটি চিত্রিত কেমব্রিজ পুঁথিতে 'বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন স্তূপের' ছবি পাওয়া যায়। ফাউচার সেটিকে ই-সিঙ বর্ণিত Temple of China বলে সনাক্ত করেছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভবের আগে বাংলা কটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।[৭] দক্ষিণপশ্চিম বাংলায় পুষ্করণ বা পোখরণা রাজ্যটি ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। দুটি প্রমাণ দ্বারা রাজ্যটির অস্তিত্ব সমর্থিত হয়। এক, দিল্লীর কুতবমিনারের কাছে মেহেরৌলির লৌহস্তম্ভ লিপি। দুই, এলাহাবাদের পাথরের স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় বিবরণ। দুটি লিপিতেই বঙ্গের একাধিক স্বাধীন রাজ্য ও পুষ্করণ সম্বন্ধে হদিস পাওয়া যায়।[৮]

বঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের অভিযান পরিচালিত হয়েছিল চার শতকের মাঝামাঝি।[৯] সম্রাট স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন অভিযান। পুষ্করণ বা পোখরণ রাজ্যটি বিজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। কোথায় ছিল পুস্করণ বা পোখরণা রাজ্য? ঐতিহাসিকদের মতে বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে যে গিরিলেখটি এখনও বিদ্যমান তাতে পুস্করণ রাজ্যের অধীশ্বর সিংহবর্মা ও তার পুত্র চন্দ্রবর্মার নাম পাওয়া যায়।[১০] এই চন্দ্রবর্মাকেই পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় প্রশস্তিতে সেই চন্দ্রবর্মা নামটিই উৎকীর্ণ

রানীগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে সতের মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে শুশুনিয়া পাহাড়। বাঁকুড়া সহর থেকে চোদ্দ মাইল। শুশুনিয়া পাহাড় থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরপূর্বে পুস্করণ বা পোখরণ। দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ক্ষুদ্র ও প্রাচীন গ্রাম, ধ্বংসাবশেষে আকীর্ণ। ঐতিহাসিকেরা গ্রামটিকে চন্দ্রবর্মার রাজধানী পুস্করণ বলে সনাক্ত করেছেন। রাজ্যটির নামও সম্ভবত ছিল পুস্করণ। কেউ কেউ এমনও অনুমান করেছেন পুস্করণ নামটি থেকেই বাঁকুড়া নামের উদ্ভব।[১১]

---

৭. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৫৫-৬১।

৮. মেহেরৌলি স্তম্ভে আছে চন্দ্রের বঙ্গাভিযানের কথা। চন্দ্রকে নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, History of Ancient Bengal—Dr. R. C. Majumdar, pp. 38-41.

৯. দ্রষ্টব্য, Duff, pp. 28

১০. গিরিলেখটির জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৫৭.

১১. "......Puskarana of the Susunia inscription can easily run into Bakkuram and seems to have survived in the modern name Bankura." —D. R. Bhandarkar, IHQ, June 1925, vol I, No 2, p. 255. V. A. Smith (JRAS, 1897). Bhandarkar, Dr. R. C. Majumdar, Dr. D. C. Sircar—সকলেই পুস্করণ রাজ্য ও রাজধানী বাঁকুড়ার পোখরণের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন।

পুষ্করণ রাজ্যটি বেশ বড় ও শক্তিশালী ছিল বলে অনুমিত হয়। না হলে সম্রাট নিজে আসতেন না বিজয় অভিযানে। কতখানি জুড়ে ছিল রাজ্যটি? ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুমান করেছেন চন্দ্রবর্মা ছিলেন রাঢ়ের রাজা।[১২] অথবা রাঢ়ের ঠিক দক্ষিণে সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল তার আধিপত্য। তাকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গ অভিযানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

ভৌগোলিক সন্নিবেশের দিক থেকে ঠিক এই একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় কালিদাসের রঘুবংশে। কালিদাসের সময়কাল ছিল পাঁচ শতক।[১৩] রঘুবংশে তিনি অযোধ্যার রাজা রঘুর দিগ্বিজয়ের কিংবদন্তি বর্ণনা করেছিলেন। সুবিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে রঘু পূর্ব সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেছিলেন। বিহারের মধ্য দিয়ে এসে রাজমহল পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ঢুকেছিলেন বাংলায়। পূর্ব মহোদধির বেলাভূমি ছিল তালবন সন্নিবেশে শ্যামল। বেলাভূমির মুখেই পড়েছিল সুহ্ম। সুহ্মেরা জেনেছিলেন রঘু রাজবংশ উচ্ছিন্ন করতে আসেন নি। প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত করাও তার লক্ষ্য নয়। ফলে তারা বেতস-বৃত্তি অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ বেতস লতার মত ক্ষণকালের জন্য রঘুর সামনে অবনত করেছিলেন মস্তক।[১৪]

সুহ্মের পরে ছিল বঙ্গ। গঙ্গাপ্রবাহের মধ্যবর্তী দ্বীপসমূহ বঙ্গ নামে রঘুর কাছে পরিচিত ছিল। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কালিদাসের সময় অর্থাৎ খ্রীস্টীয় পাঁচ শতকে বঙ্গ বলতে বোঝাত গাঙ্গেয় দ্বীপ সমূহ। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বাঞ্চল। বঙ্গেরা রণতরী নিয়ে রঘুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের পরাজিত ও উচ্ছিন্ন করে শালিধানের মত পুনরায় সংস্থাপিত করা হয়েছিল। গাঙ্গেয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে রঘু প্রোথিত করেছিলেন বিজয়স্তম্ভ।

---

১২. 'Chandra Varman may thus be regarded as the King of Rādhā or the region immediately to its South, by defeating whom Samudra Gupta paved the way for the conquest of Bengal.''—History of Ancient Bengal, p. 40.

১৩. Prof. Kielhorn অনুমান করেছিলেন ৪৭২ খ্রীস্টাব্দের আগে। কারণ, কুমারগুপ্তের মন্দাশোর লিপিতে 'ঋতুসংহার' এবং মহানমানের বুদ্ধগয়া লিপিতে রঘুবংশের আদলে অনেকখানি অংশ উৎকীর্ণ দেখা যায়।

১৪. 'অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥'—রঘুবংশ, ৪।৩৫

বঙ্গের পরে ছিল উৎকল। বঙ্গ বিজিত হবার পর উৎকলদের দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে রঘু গিয়েছিলেন কলিঙ্গের দিকে। হাতির সারি সাজিয়ে তৈরি করা সেতু ধরে পার হয়েছিলেন কপিশা নদী। কপিশা আসলে কংসাবতী। ডাক নামে কাঁসাই। কপিশা ছিল বঙ্গ ও উৎকলের মধ্যে সীমানা।

অধুনালুপ্ত মানভূম এবং বর্তমান পুরুলিয়া জেলা খ্রীস্টীয় চার পাঁচ শতকে সুহ্ম ও উৎকল বা উড্র রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলে অনুমিত হয়। উড্র সম্ভবত ছিল কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বিশাল কলিঙ্গের অন্তর্গত হলেও আলাদা অস্তিত্ব ছিল উড্র জাতির। সুহ্ম ছিল সুবৃহৎ ও শক্তিশালী রাজ্য।[১৫] দামোদরের দক্ষিণ তীর থেকে কাঁসাইয়ের উত্তর তীর পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল ব্যাপ্তি, পূর্বের সীমানা সম্ভবত ছিল গঙ্গা ভাগীরথী, পশ্চিমের সীমানা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট হদিস পাওয়া যায় না।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় উত্তরপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক সংস্থিতি বিধ্বস্ত করেছিল। বাংলায় গুপ্ত শাসনের মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক শাসিত হত। বঙ্গ বা তখনকার দিনের সমতট এবং রাঢ় শাসিত হত পরোক্ষভাবে। খ্রীস্টীয় ছয় শতকের প্রথম দিকে মহারাজা বৈণ্যগুপ্ত ছিলেন সমতটের শাসক। তার শাসন প্রভাব দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে কতখানি বিস্তৃত ছিল খতিয়ে দেখা দরকার।

বৈণ্যগুপ্তের একটি তাম্রপট্টের সঙ্গে আমরা পরিচিত।[১৬] নাম গুনাইঘর তাম্রপট্ট। সেটি দেওয়া হয়েছিল ৫০৭-৮ খ্রীস্টাব্দে, ক্রিপুরের জয়স্কন্দাবার থেকে। ক্রিপুরকে ত্রিপুরার সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। পট্টটিতে আমরা বৈণ্যগুপ্তের অধীনস্থ উপরিক মহারাজা বিজয় সেনের নাম পাই। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিজয় সেন। যথা, মহাপ্রতিহার, মহাপীলুপতি, পঞ্চাধিকরণ উপরিক, পাট উপরিক ও পুরপাল-উপরিক।[১৭] অর্থাৎ বিজয়সেন ছিলেন বেশ প্রভাবসম্পন্ন ও শক্তিশালী মহারাজা।

---

১৫ মহাভারতের টিকাকার নীলকণ্ঠের মতে সুহ্মও রাঢ় সমার্থক। বৃহৎ সংহিতায় বঙ্গ ও কলিঙ্গের মাঝখানে ছিল সুহ্মদেশ। মৎস্যপুরাণে সুহ্ম ও কলিঙ্গ দুটি দেশই সম্পূর্ণ স্বাধীন, কালিদাসের বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে। দশকুমার চরিতে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত সুহ্মের অন্তর্গত। অর্থাৎ আট শতকে তাম্রলিপ্ত রাজ্য সুহ্মের ভেতরে ছিল এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল তার রাজধানী।

১৬. গুনাইঘর তাম্রপট্ট (৫০৭-৮ খ্রীঃ—IHQ VI.)

১৭. 'মহাপ্রতীহার—মহাপীলুপতি—পঞ্চাধিকরণোপরিক— পাটমুপরিক — পুরপালোপরিক — মহারাজ—শ্রীমহাসামন্ত—বিজয়সেনেনৈ……'—গুনাইঘর তাম্রপট্ট।

ছয় শতকের তৃতীয় দশকে সমতটে এক নতুন রাজবংশের হদিস পাওয়া যায়। সে বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপচন্দ্র।[১৮] গোপচন্দ্রের পিতার নাম ধনচন্দ্র, মাতা গিরিদেবী। ধনচন্দ্রের কোন রাজকীয় উপাধি দেখা যায় না, ফলে অনুমিত হয় গোপচন্দ্রই রাজবংশটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৈণ্যগুপ্ত বা বৈণ্যগুপ্তের উত্তরাধিকারীদের উচ্ছিন্ন ক'রে অধিকার করেছিলেন রাজশক্তি। এর আগেই বৈণ্যগুপ্ত নিজেকে সার্বভৌম রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কারণ, নালন্দা শীলমোহরে নিজেকে তিনি মহারাজাধিরাজ ও দ্বাদশাদিত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন।[১৯]

দক্ষিণপশ্চিম বাংলায় বৈণ্যগুপ্তের শাসন কিভাবে এবং কতখানি বিস্তৃত ছিল? গুপ্তদের লিপি ও মুদ্রা এ অঞ্চলে বিশেষ পাওয়া যায় না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুমান করেছেন বৈণ্যগুপ্তের অধীনস্ত সামন্ত শাসক হিসেবে রাঢ় অঞ্চল শাসন করতেন বিজয়সেন।[২০] যুক্তি ও প্রমাণ দুটি পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই অনুমান।

জয়রামপুর তাম্রপট্ট দেওয়া হয়েছিল গোপচন্দ্রের শাসনকালের প্রথম রাজকীয় বৎসরে। পট্টটিতে দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলে ভূমিদান করা হয়েছিল। দণ্ডভুক্তি-মণ্ডল ছিল তখন বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। বর্ধমান-ভুক্তির সামন্ত মহারাজা ছিলেন বিজয়সেন। গোপচন্দ্রের অধীনস্ত সামন্ত হলেও বিজয়সেন ছিলেন প্রায় স্বাধীন রাজার মত।[২১]

গুনাইঘর ও মল্লসারুল দুটি তাম্রপট্টেই মহারাজ বিজয়সেনের নাম পাওয়া যায়। দুটি ক্ষেত্রেই তিনি সামন্ত মহারাজা। ফলে অনুমিত হয় একই

১৮. দ্রষ্টব্য, গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্রপট্ট। সেটি তার রাজত্বের প্রথম বৎসরে দেওয়া হয়েছিল। "The record states that the King Gopachandra was the son of Dhanachandra by his wife Giridevi. While Dhanachandra does not bear any royal title his son Gopachandra is described as one raised to Supremacy by the people."—Annual Report on Indian Epigraphy, 1964-65, p. 2.

১৯. IHQ IX, p.784 & IHQ XIX, p 275.

২০. History of Ancient Bengal, p. 65 fn 27.

২১. মল্লসারুল তাম্রপট্ট বিজয়সেন দিয়েছিলেন নিজের নামে। পট্টটির প্রারম্ভ 'মহারাজ বিজয়সেনস্য।' গোপচন্দ্রের অধীনস্ত সামন্ত হিসেবে নিজেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'মহারাজাধিরাজ—শ্রী—গোপচন্দ্রে প্রশাসতি।' পট্টটি গোপচন্দ্রের ৩ মতান্তরে ৩৩ রাজকীয় বৎসরে প্রদত্ত হয়েছিল।

বিজয়সেনের কথা দুটি পট্টে উল্লেখিত হয়েছিল। অনুমান সঠিক হলে বিজয়সেন যে বৈণ্যগুপ্ত ও গোপচন্দ্র দুজনেরই অধীনস্ত সামন্ত মহারাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

মল্লসারুল তাম্রপট্টে উল্লেখিত অধিকাংশ স্থান সনাক্ত করা হয়েছে। তাদের অবস্থিতি দামোদর নদের উত্তর তীরে। বর্ধমান শহরের পশ্চিমে।[২২] কেউ কেউ অনুমান করেছেন পট্টটি দেওয়া হয়েছিল বিজয়সেনের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র থেকে। এবং সে ক্ষেত্র ছিল বক্কত্তক অথবা বর্ধমান।

গোপচন্দ্রের মূল শাসনকেন্দ্র ছিল ভারকমণ্ডলে। ভারকমণ্ডল ছিল একটি বিষয় যা আয়তনে প্রায় এখনকার জেলার মত। ভারকমণ্ডলের অবস্থিতি এখনও সন্দেহাতীতভাবে নির্ণীত হয়নি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ মহকুমা দুটি জড়িয়ে ছিল ভারকমণ্ডলের আয়তন।[২৩] দুটি মহকুমাই বর্তমান বাংলাদেশে।

পূর্ববঙ্গ, বিশেষত ফরিদপুর জেলা থেকে গোপচন্দ্রের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। সম্প্রতি পাওয়া একটি তাম্রপট্টে[২৪] দেখা যায় উড়িষ্যার বালেশ্বর অঞ্চলে তার অধীনস্ত সামন্ত অধীশ্বর ছিলেন অচ্যুৎ। সেখানে মহাযান-পন্থী বৌদ্ধেরা আর্য-ভিক্ষু সংঘের মাধ্যমে অবলোকিতেশ্বরের উপাসনার জন্য একটি বিহার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গোপচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে সেজন্য ভূমিদান করেছিলেন অচ্যুৎ।

গোপচন্দ্রের সময়কাল ছিল ছয় শতকের প্রথমার্ধ।[২৫] সে সময় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ, দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ও বর্তমান উড়িষ্যার উত্তরাংশ সমতট থেকে শাসিত হত। সামন্ত অধীশ্বরদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রশাসিত হত এলাকাগুলি। রাজ সরকারে তাদের পরিচয় ছিল ভুক্তি হিসাবে। অধুনালুপ্ত মানভূম ও বর্তমান পুরুলিয়া জেলা বর্ধমান-ভুক্তি দণ্ডভুক্তি ও উৎকলের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল বলে অনুমিত হয়।

---

২২. Some Historical Aspects of the inscriptions of Bengal—B. C. Sen, pp. 239-40.

২৩. Corpus of Bengal Inscriptions—Dr. S K. Maity & Dr. R. R. Mukherjee, p. 78.

২৪. Balasore Copper Plate—edited by S. N. Rajguru, OHRJ vol v, p. 53.

২৫. ৫২৫—৫৫০ খ্রী। দ্রষ্টব্য, Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal—B. M. Morrison,

গোপচন্দ্রের পরে ভারকমণ্ডলে আধিপত্যকারী দুজন মহারাজার নাম পাওয়া যায়। ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। তিনজন মিলে প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।[২৬] তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাম্রপট্টে হদিস পাওয়া যায় না। এবং রাজনৈতিক প্রভাব গোপচন্দ্রের আধিপত্যের মত বালেশ্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল কিনা তাও জানা যায় না। অন্যদিক থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরিখে প্রতীয়মান হয় গোপচন্দ্র বা বিজয়সেনের পরে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ ও উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চল থেকে সমতটের শাসকদের প্রভাব অন্তর্হিত হয়েছিল।

বর্ধমানভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি মণ্ডল ছিল কাছাকছি সংলগ্ন দুটি এলাকা। গোপচন্দ্রের সময় দুটি অঞ্চলে দুজন পৃথক সামন্ত রাজা ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালে দণ্ডভুক্তি, বর্ধমান-ভূক্তির মধ্যে একটি বিষয় বা জেলায় পরিণত হয়েছিল। বর্তমান পুরুলিয়া জেলার দামোদরের দক্ষিণাংশ থেকে কাঁসাই পর্যন্ত বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত ছিল বলে অনুমিত হয়। কাঁসাইয়ের দক্ষিণ তীর থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত ছিল দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত। সম্ভবত এ অবস্থা শশাঙ্কের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল।

গোপচন্দ্রের শাসনকালের পর থেকে সমতটীয় শাসন দণ্ডভুক্তি ও বালেশ্বর অঞ্চলে তেমন প্রভাবশালী না থাকায় উড়িষ্যা থেকে দুটি রাজবংশ উত্তর পূর্বদিকে ক্রমশ প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন তারা। বংশ দুটি ছিল বিগ্রহ ও মানবংশ।

বিগ্রহ বংশের আধিপত্য ছিল উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলে। গঞ্জাম, পুরী ও কটকজেলার কিছু অংশে। এ অঞ্চল তখন কলিঙ্গ-রাষ্ট্র নামে পরিচিত ছিল। পৃথিবী বিগ্রহ ছিলেন অধীশ্বর। সুবৃহৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্ত সামন্ত মহারাজা পৃথিবীবিগ্রহের অধীনস্ত শাসক ছিলেন ধর্মরাজা। তিনি গঞ্জাম জেলার খল্লিকোটে ভূমিদান করেছিলেন।[২৭]

ছয় শতকের শেষদিকেই নতুন করে কলিঙ্গ রাষ্ট্রের বিন্যাস সুরু হয়েছিল। দক্ষিণ তোষলি নামে পরিচিত হতে সুরু করেছিল কলিঙ্গ রাষ্ট্রের

---

২৬. ধর্মাদিত্যের অনুমিত রাজত্বকাল ৫৪০—৫৬০ খ্রী; সমাচারদেবের ৫৬০—৫৭৫ খ্রী। —B. M. Morrison, pp. 159-60. এ ছাড়া মুদ্রা অনুসারে আরও দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়। পৃথুবীর বা পৃথুজবীররাজা ও সুধন্য বা শ্রীসুধন্যাদিত্য—JASB, NS XIX, Num, Suppl. p. 60.

২৭. Sumandala Copper Plate of Dharmaraja—EP. Ind, vol XXVIII, pp. 79-85। পট্টটি দেওয়া হয়েছিল ৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে। দিয়েছিলেন ধর্মরাজা।

উত্তরাংশ। বিগ্রহবংশের লোকবিগ্রহ কলিঙ্গ রাষ্ট্রের অধীশ্বর বলে নিজেকে পরিচিত করান নি, তোষলির অধীশ্বর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।[২৮] তোষলি আসলে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তোষলির সম্মিলন, অর্থাৎ দুই তোষলিরই অধীশ্বর ছিলেন লোকবিগ্রহ।

কলিঙ্গ রাষ্ট্র থেকে লোকবিগ্রহ নিজের রাজ্যের নাম কেন নতুন করে বদলে গিয়েছিলেন? ঐতিহাসিক নিরিখে অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় ছয় শতকের কিছু আগে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় গঙ্গদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এ সময় তারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর, কলিঙ্গনগর নামে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নতুন রাজধানী, নিজেদের ঘোষণা করেছিলেন কলিঙ্গাধিপতি বলে। ফলে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য লোকবিগ্রহকে নতুন নাম খুঁজতে হয়েছিল। সম্রাট অশোকের প্রবর্তিত প্রাচীন বিভাগদুটির ধুলো স্মৃতি ঝেড়ে নতুন করে চালু করতে হয়েছিল। রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধৌলিতে।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে লোকবিগ্রহের ক্রমব্যাপ্তি নিষ্কণ্টক ছিল না। মানবংশের একটি শাখা রাজত্ব করতেন সেখানে। তাদেরও উদ্যোগ ছিল দক্ষিণে প্রভাব বিস্তারের। ফলে ছয় শতকের শেষার্ধে উড়িষ্যার উপকূলে কার আধিপত্য বজায় থাকবে তা নিয়ে বিগ্রহ ও মানবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছিল। বিগ্রহেরা প্রথমদিকে সফল হলেও শেষপর্যন্ত মানেরা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

মানবংশের সন্তান মহারাজা শম্ভুযশের আধিপত্য ছিল উত্তর তোষলিতে। উত্তর তোষলির অন্তর্গত সারেফ বিষয়ে তিনি একটি গ্রাম দান করেছিলেন। গ্রামটির নাম ছিল ঘণ্টাকর্ণক্ষেত্র।[২৯] শম্ভুযশের সামন্ত রাজা সোমদত্ত ছিলেন উত্তর তোষলির প্রত্যক্ষ শাসক। সোমদত্ত নিজেই উত্তর তোষলিতে দুটি গ্রাম দিয়েছিলেন। গ্রাম দুটিই ছিল সারেফ বিষয়ে, নাম আড়িয়ারা ও বাহিরস্বাটক। দুটি আলাদা আলাদা তাম্রপট্টে দেওয়া হয়েছিল গ্রামদুটি।

শম্ভুযশের অপর একটি তাম্রপট্টে দেখা যায় দক্ষিণ তোষলিতে তার

---

২৮. পুরী জেলায় পাওয়া লোকবিগ্রহের তাম্রপট্ট, EP. Ind, vol XXVIII, p. 328. পট্টে দক্ষিণতোষলিতে একটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল। সময়কাল ৫৯৯ খ্রী।

২৯. Four Copper Plates from Soro—N. G. Majumdar, EP. Ind, vol XXII, পট্টটির সময়কাল ৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

অধীনস্ত সামন্ত ছিলেন শিবরাজা।[৩০] সাত শতকের সূচনাতে, উত্তর ও দক্ষিণ তোষলি মিলিয়ে উড়িষ্যার সমগ্র উপকূলভাগ, মানভূম-সিংভূম-মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর মহারাজা শম্ভুযশের শাসনাধীন ছিল। কেউ কেউ অনুমান করেছেন এ সময় উড্র জাতির বসবাস ছিল মানভূম সিংভূম অঞ্চলে।[৩১] রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশে তারা শক্তি সঞ্চয় করে চলেছিলেন।

উত্তরবাংলায় বিশেষত গৌড়ে তখন রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার আর এক নাটক অভিনীত হয়ে চলেছিল। সুবিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্ন দশা। রঙ ওঠা, জীর্ণ সাম্রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ জাজিমটি যে যেদিক থেকে পেরেছিলেন কেটেকুটে ঘরে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী ছিলেন কামরূপের রাজপরিবার। উত্তরবাংলার একদিক, সম্ভবত করতোয়া নদীর পূর্বাংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের একদা কেন্দ্রভূমি মগধের ওপরেও অপর রাজশক্তির ছোবল পড়েছিল। শক্তিশালী মৌখরিরাজ ঈশানবর্মন মগধের বুক থেকে এক অংশ খুবলে নিয়েছিলেন। সেখানে গ্রাম দান করেছিলেন তার উত্তরাধিকারী সর্ববর্মন ও অবন্তীবর্মন।[৩২] গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্ত ছিন্নভিন্ন জাজিমটিকে গুছিয়ে তুলে আর একবার রঙ ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। বিধ্বস্ত করেছিলেন লোহিত্যের তীরে সুস্থিত বর্মনের কামরূপ-সৈন্য, বন্দী করেছিলেন তার দুই পুত্রকে।[৩৩] পশ্চিমে মৌখরি পূবে কামরূপ দুই রাজশক্তির মাঝখানে থেকে মহাসেনগুপ্তকে অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। শশাঙ্ক যখন স্বীয় প্রতিভাবলে ছিন্নভিন্ন গুপ্ত সাম্রাজ্য অধিকার করেছিলেন, পশ্চিম ও পূবের নিরবচ্ছিন্ন সামরিক আঘাত তাকেও জড়িয়ে রেখেছিল।

গৌড়ের আকাশে শশাঙ্কের অভ্যুদয় বাংলার সুদীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রথম অত্যুজ্জ্বল আলোকের ছটা। কি তার পূর্ব পরিচয়, কোন

---

৩০. পট্টটি পাওয়া গিয়েছিল কটক জেলার পাতিয়াকেল্লায়। সময়কাল ৬০২ খ্রী। দ্রষ্টব্য, EP. Ind, vol IX, p. 287.

৩১. Studies etc—Dr. D. C. Sircar, p. 145.

৩২. Deo-Boranark Ins. of Jivitagupta II, CII pp. 203, 206, সর্ববর্মণ ও অবন্তী বর্মণের সময়কাল যথাক্রমে ৫৫৩-৫৪ ও ৫৬৯-৭০ খ্রী।

৩৩. IHQ, vol XXVI, p. 224.

রাজবংশের শাখা ছিন্ন করে তিনি নতুন করে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা এখনও সিদ্ধমত হতে পারেননি।[৩৪]

রোটাসগড়ের পাথুরে দুর্গে একটি শীলমোহর মুদ্রিত আছে। তাতে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' কথাটি উৎকীর্ণ দেখা যায়! এ অঞ্চল গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শীলমোহরে উৎকীর্ণ শশাঙ্ক এবং গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে যদি এক ব্যক্তি বলে ধরা যায়, মহাসেন-গুপ্তের সামন্ত রাজা হিসেবে শশাঙ্কের পরিচয় অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্ব পরিচয়ের অনিশ্চয়তার মধ্যে শশাঙ্কের যে রহস্যই জড়ান থাকুক না কেন, ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে গৌড়ের রাজা হিসাবে তিনি কর্ণসুবর্ণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উত্তর ও পশ্চিমবাংলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার অধিকারের। দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় কতখানি পরিব্যাপ্ত ও সুদৃঢ় ছিল আধিপত্য এখনও পর্যন্ত সাক্ষ্য প্রমাণের নিরিখে নির্ণীত হয়নি। স্বল্প-কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা শশাঙ্কের অসাধারণ সামরিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে। অনেকে মনে করেন সেই প্রতিভার তীব্র দীপ্তি দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গেও প্রসারিত হয়েছিল।

দণ্ডভুক্তি ও উৎকল নিঃসন্দেহে শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। দুটি তাম্রপট্টে সে প্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে সমর্থিত।[৩৫] দণ্ডভুক্তি ও উৎকলে শশাঙ্কের অধীনস্ত সামন্ত মহারাজা ছিলেন সোমদত্ত। মহারাজা শম্ভুযশের অধীনস্ত উত্তর তোষলির অধীশ্বর হিসেবে আমরা সোমদত্ত নামটির সঙ্গে পরিচিত। বেশ বোঝা যায় দণ্ডভুক্তি ও উৎকলদেশ নিয়ে ছিল উত্তর তোষলি এবং শশাঙ্কের হাতে শম্ভুযশের সার্বভৌমত্ব উচ্ছিন্ন হলে সোমদত্ত শশাঙ্কের অধীনস্ত সামন্ত মহারাজা হিসেবে এ অঞ্চলের শাসনকর্তারূপে বিদ্যমান ছিলেন।

দণ্ডভুক্তির দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন শুভকীর্তি। তিনি ছিলেন মহাপ্রতিহার। শশাঙ্কের অধীনস্ত তো বটেই, সম্ভবত সোম-দত্তের সহায়কও ছিলেন তিনি। অর্থাৎ মেদিনীপুর-মানভূম-সিংভূম অঞ্চলের

---

৩৪. কেউ কেউ অনুমান করেছেন তিনি ছিলেন মহাসেনগুপ্তের অধীনস্ত সামন্ত রাজা—Dr. R. C. Majumdar. p.49. কেউ অনুমান করেছেন মৌখরিরাজ অবন্তীবর্মার অধীনস্ত সামন্ত—Dr. D. C. Ganguly, IHQ, XII, p. 457. শশাঙ্ক সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মুর্শিদাবাদ—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

৩৫. শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি, JRASBL XI, পট্টদুটির সময়কাল ৬০০ খ্রীস্টাব্দের আগে।

তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ শাসনকর্তা। দুটি পট্টই দেওয়া হয়েছিল তবীরা অধিকরণ থেকে। একটি পট্টে শুভকীর্তি চল্লিশ দ্রোণ ও এক দ্রোণব্যাপ বস্তু জমি কুম্ভারপদ্রক গ্রামে ক্রয় করেছিলেন। অপর পট্টটিতে মহাকুম্ভারপদ্রক নামে একটি গ্রাম দান করেছিলেন সোমদত্ত। তবীরা অধিকরণ সম্ভবত ছিল দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের হেডকোয়ার্টার্স বা সদর দপ্তর। কারণ বালেশ্বর জেলায় সোরোয় পাওয়া সোমদত্তের অপর দুটি তাম্রপট্ট দেওয়া হয়েছিল অস্থায়ী শিবির থেকে। ফলে অনুমিত হয় তবীরা অধিকরণ ছিল সোমদত্ত বা তার সহায়ক শুভকীর্তির প্রশাসনিক কাজের স্থায়ী দপ্তর।

তবীরাকে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মেদিনীপুর সহর থেকে পনের মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত ডেবরার সঙ্গে সনাক্ত করেছেন। শশাঙ্কের গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলার সদর দপ্তর বহরমপুর থেকে ছয় মাইল দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তীর্ণ ধ্বংসক্ষেত্র এখনও গৌড়ের সেই প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিদ্যমান। বর্তমান ছোট্ট রেলস্টেশন চিরুটির কাছে রাজ-বাড়িডাঙ্গা নামের মধ্যে রাজার রেশটুকু শুধু নিহিত, বাংলার একদা মহাপ্রতিভা-ধর রাজা ও তার রাজ্যটি কবেই বিলুপ্ত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ থেকে শশাঙ্কের রাজ্য বিস্তীর্ণ ছিল উড়িষ্যায় অবস্থিত চিল্কা হ্রদের পরিধি পর্যন্ত। গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত প্রসারিত থাকাও অসম্ভব নয়। কারণ একটি তাম্রপট্টে দেখা যায় কঙ্গোদ মণ্ডলের অধীশ্বর, শৈলোদ্ভব বংশের মহারাজা-মহাসামন্ত শ্রীমাধবরাজা শশাঙ্কের অধীনস্থ সামন্ত হিসাবে নিজেকে পরিচিত করিয়েছেন।[৩৬]

এপর্যন্ত পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণের নিরিখে প্রতীয়মান হয় দক্ষিণপশ্চিমবাংলা, বিশেষত বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বর্ধমান-ঘেঁষা দামোদরের উত্তরাংশ প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল শশাঙ্কের। দামোদরের দক্ষিণাংশ থেকে চিল্কা পর্যন্ত আধিপত্য ছিল পরোক্ষ। দ্বিতীয় অংশের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় পরবর্তীকালে যে ঐক্যসূত্র গ্রথিত হয়েছিল, ভাঙ্গাগড়া এবং সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণের মধ্যে যে একাত্মবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, উৎকল বা উড়িষ্যা রাজ্যের প্রথম ভিত্ তার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দামোদরের দক্ষিণাংশে জনবিন্যাসের ধারায় গৌড়-বঙ্গের যে প্রভাব আজও চিহ্নিত, ঐতিহাসিককালে তার সূত্রপাত করেছিলেন গোপচন্দ্র, বিজয়সেন ও মহারাজা শশাঙ্ক।

---

৩৬. Ganjam Copper Plate, Ep Ind. Vol VI.

পুরাণগুলির মধ্যে ভবিষ্য পুরাণ সর্বপ্রথম রাজবংশগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। লিপিবদ্ধ হয়েছিল ছন্দবদ্ধ পালিভাষায়। গুপ্ত আমলে মগধের কাছাকাছি অঞ্চলে পালি থেকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছিল শ্লোকগুলি। ফলে, পরবর্ত্তীকালে অনুলিখিত পুরাণগুলিতে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসৃত হয়েছে দেখতে পাই। এই ঐতিহ্যের জন্ম হয়েছিল সম্ভবত চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে সাতটি দেশ নিয়ে গঠিত ছিল পুণ্ড্রদেশ। গুপ্ত আমলে বাংলায় গুপ্ত শাসনের প্রত্যক্ষ কেন্দ্রভূমি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। পুণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃতি, সুহ্ম, ঝারিখণ্ড, বরাহভূমি ও বর্ধমান।

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার অংশবিশেষ নিয়ে জড়িয়ে ছিল গৌড়। বরেন্দ্রের মধ্যে ছিল মালদার অংশবিশেষ এবং রাজশাহী ও বগুড়া। নিবৃতি দেশের অবস্থিতি এখনও সন্দেহাতীতভাবে নির্ণীত হয়নি। বর্ধনকোট ও কোচবিহার বা কাছাড় ও রংপুর নিয়ে সম্ভবত পরিব্যাপ্ত ছিল নিবৃতি দেশ। সুহ্ম আসলে রাঢ়দেশ। ঝারিখণ্ড বা ঝাড়খণ্ড, বর্তমান সাঁওতাল পরগণা জেলা। অঞ্চলটি এখনও জঙ্গলাকীর্ণ। বরাহভূমি পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বরাভূম। বর্ধমান বর্ত্তমান বর্ধমান জেলা।

উত্তরবাংলার কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র এলাকা শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শশাঙ্কের শাসনকালে স্বল্পকালের জন্য হলেও, উত্তর ও পশ্চিমবাংলা মিলিয়ে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে চলেছিল, গৌড় বলতে গৌড়-বঙ্গের সমগ্র ভূমি যে পরিচিতি লাভ করেছিল, সচেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক না কেন, শশাঙ্ক ছিলেন সে বোধের জন্মদাতা।

ঘ. শিখরভূম ও পাতকুম বাংলার সীমান্ত রাজ্য

বন্দ্যগণ—সিংহবিক্রম শূরশিখর—ভাস্করপ্রতাপৈ—স্তৈঃ।
স মহাবলৈ—রূপেতো জেতু জগতী—মলম্ভুষ্ণু ॥[১]
—রামচরিতম ২।৫

শশাঙ্কের অভ্যুদয়[২] বিদ্যুৎ রেখার মত গৌড়ের আকাশ ক্ষণকালের জন্য অত্যুজ্জ্বল করে তুলেছিল। প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাংলার সামরিক প্রতিভার প্রথম ভিত্তিক্ষেত্র। এক শতাব্দী পরে পাল সাম্রাজ্যের সুবিশাল কাঠামোটি সেই ক্ষেত্রের ওপর বিন্যস্ত হয়েছিল।

একদিকে থানেশ্বর অন্যদিকে কামরূপ, দুইদিকে দুই মহাশত্রুর মধ্যে শশাঙ্ক ছিলেন প্রদীপ্ত সূর্যের মত। দুদিকেই প্রসারিত হয়েছিল তার অধিকারের সীমা। একে একে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ, দণ্ডভুক্তি ও উৎকল, কঙ্গোদ ও কাণ্যকুব্জ, মগধ ও বারানসী। গৌড় নামটি ভারতবাসীর হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রবল দুই শত্রু দুদিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন তার সাম্রাজ্য। কামরূপ থেকে এগিয়ে এসেছিলেন ভাস্করবর্মা, সঙ্গে সুবিশাল সেনাবাহিনী, কুড়ি হাজার হস্তী, তিরিশ হাজার রণতরী। গৌড় সাম্রাজ্যের একেবারে

---

১. তিনি (রামপাল) এইসব যোদ্ধবর্গের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পৃথিবী বিজয়ের সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন। এরা ছিলেন বন্দ্য (ভীমযশ), গুণ (বীরগুণ), সিংহ (জয়সিংহ), বিক্রম (বিক্রমরাজা), শূর (লক্ষীশূর), শিখর (রুদ্রশিখর), ভাস্কর (ময়গলসিহ) এবং প্রতাপ (প্রতাপসিহ)।

২. শশাঙ্কের শাসনকাল ৫৯৫-৬০৯ খ্রীস্টাব্দ (বা মতান্তরে ৬৩৭-৩৮ খ্রী.)।

বুকের ওপর এসে উপনীত হয়েছিলেন। বিজয়ী শিবির সংস্থাপিত হয়েছিল কর্ণসুবর্ণে। সেখানে বসেই দান করেছিলেন গ্রাম। গ্রামটির নাম ছিল ময়ূর-শালমল, অবস্থিতি চন্দ্রপুর বিষয়ে। চন্দ্রপুর বিষয় ছিল পুণ্ডবর্ধনভুক্তির ভেতর শ্রীহট্ট মণ্ডলের অন্তর্গত।[৩]

দক্ষিণপূর্ব থেকে ছিল সম্রাট হর্ষবর্ধনের অভিযান। শশাঙ্কের অধীনস্থ কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশের সামন্ত শাসককে পরাজিত করে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন উৎকল ও দণ্ডভুক্তির ভিতর দিয়ে। অস্থায়ী শিবির তুলেছিলেন কাজঙ্গলে। কাজঙ্গল আসলে রাজমহল। পূর্বে নাম ছিল কাঁকজোল। রেভেনিউ রেকর্ডে প্রধান সামরিক বিভাগ।[৪]

হর্ষবর্ধনের সময় কাজঙ্গল ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্ন যত্র তত্র ছড়ানো, তবু না ছিল রাজা, না রাজ্য, না রাজধানী। বুনো ঘাসের পাহাড় কেটে সৈন্যদের ছাউনি উঠেছিল। ঘাস ও লতাপাতার আচ্ছাদনে তৈরি হয়েছিল দরবারগৃহ। সেই দরবারে মিলিত হয়েছিলেন উত্তরভারতের দুই বিজয়ী সম্রাট, হর্ষবধন ও ভাস্করবর্মা।

কাজঙ্গলেই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সে ছিল পোষের রাত, গঙ্গার বুক ঢেকে নিরুদ্বেগ আকাশে ভাসছিল শত সহস্র রণতরী, আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল দুই তীর। অরণ্যের স্তব্ধতা ছিঁড়ে সহসা শত শত বাদ্যভাণ্ড বেজে উঠেছিল, সংকেতে জানিয়ে দিয়েছিল সম্রাট হর্ষবর্ধন শিবির ছেড়ে বেরিয়েছেন, হিউয়েন সাঙের তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থী।

তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন ভাস্করবর্মা ও হিউয়েন সাঙ। কারণ হিউয়েন সাঙ তখন ছিলেন ভাস্করবর্মার শিবিরে। প্রণত হয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধন বলেছিলেন,—বহুবার এই ভক্ত আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আজও সে অনুরোধ রক্ষিত হয়নি কেন জানতে পারি?

—বহুদূর থেকে হিউয়েন সাঙ এখানে এসেছেন বুদ্ধের নীতি অনুসন্ধান করতে, এবং সেইসঙ্গে যোগ-ভূমি-শাস্ত্র, অধ্যয়ন করতে, হিউয়েন সাঙ বলেছিলেন, আপনার আদেশ যখন পৌঁছেছিল, তখন সম্পূর্ণ হয়নি আমার শিক্ষা, ফলে যাওয়াও হয়ে উঠেনি।[৫]

---

৩. Political Center and Cultural Organisations of Early Bengal—Barrie M. Morrison.

৪. The Ancient Geography of India—Alexandar Cunningham.

৫. The Life of Hiuen-TSiang—S. Beal.

দুই নক্ষত্র সে রাতে একত্র মিলিত হয়েছিল। একজন সামরিক সার্থকতায় উজ্জ্বল, অন্যজন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় স্নিগ্ধ।

বাংলার দিকে হিউয়েন সাঙ যাত্রা সুরু করেছিলেন হিরণ্যপর্বত থেকে। হিরণ্য পর্বত আসলে মহাভারতের মোদাগিরি বা মুঙ্গের। দক্ষিণে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতমালার মধ্যে ছিল পরেশনাথ পাহাড়। মুঙ্গের থেকে পঞ্চাশ মাইল পূর্বে এসে পৌঁছেছিলেন চম্পা রাজ্যে।

বর্তমান ভাগলপুরের প্রাচীন নাম ছিলা চম্পা। রাজধানী চম্পানগরী অধিষ্ঠিত ছিল গঙ্গার তীরে। বর্তমানে তাকে সনাক্ত করা হয় পাথরঘাটার সঙ্গে। রাজ্য হিসাবে চম্পা ছিল বেশ বড়, আয়তনে ৬৬৭ মাইল, দক্ষিণে তার সীমা বিস্তীর্ণ ছিল একদিকে দামোদরের তীরে পাঁচেট পাহাড়, অন্যদিকে ভাগীরথীর তীরে কালনা পর্যন্ত।[৬] ৪২০ মাইল ধরে ছিল সীমান্ত। ধানবাদ-সহ পুরনো মানভূম জেলার উত্তরাংশ ছিল চম্পা রাজ্যের ভেতর।

চম্পা থেকে কাজঙ্গল হয়ে হিউয়েন সাঙ গিয়েছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ ও সমতট হয়ে তাম্রলিপ্তে। সমতট থেকে তাম্রলিপ্তের দূরত্ব ছিল দেড়শো মাইল। ভূমি নিচু, আবহাওয়া আর্দ্র। রাজ্য ও রাজধানী—উভয়ের নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। আয়তন ১৪০০ লি বা ২৩৩ মাইল। বন্দর রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামডাক ছিল। চীন থেকে তাঙ বংশের রাজত্বকালে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের যে সূচনা হয়েছিল, চৈনিক বণিক ও ধর্মপিপাসুরা সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে প্রথমে এসে তাম্রলিপ্তে নামতেন। সমুদ্রপথটি ছিল জাভা—সুমাত্রা—মালাক্কা অন্তরীপ—বর্মা ও আরাকানের উপকূল ধরে।

বর্তমানের নিরিখে বলা যায় দামোদরের দক্ষিণতীর থেকে পরিব্যাপ্ত ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্য। দক্ষিণে সীমা ছিল সুবর্ণরেখা পর্যন্ত। দণ্ডভুক্তি মণ্ডল সম্ভবত সে সময় তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ হয়ে হিউয়েন সাঙ গিয়েছিলেন ওড্র বা উড়িষ্যায়। কর্ণসুবর্ণে ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। রাজ্য ও রাজধানী দুয়েরই নামই ছিল কর্ণসুবর্ণ। সম্ভবত ভাস্করবর্মার সঙ্গে গিয়েছিলেন হিউয়েন সাঙ। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, শশাঙ্কপুত্র মানব মাত্র কিছুদিনের জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাকে উচ্ছিন্ন করে কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন মহারাজাধিরাজ

---

৬. A. Cunninghum, pp. 402-3

জয়নাগ।[৭] জয়নাগের কাছ থেকে কর্ণসুবর্ণ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ভাস্করবর্মা, সেখানে স্থাপিত হয়েছিল বিজয়ী শিবির।

তখন ছিল বৈশাখ মাস। গ্রীষ্মের আবির্ভাবে রাঢ়ের প্রকৃতি রুক্ষ। হীনযানী বৌদ্ধদের সমতটীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল কর্ণসুবর্ণে। রাজধানীর কাছেই ছিল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। মহাবিহারের কাছাকাছি সম্রাট অশোক একটি স্তূপ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ লোকে বলত, সেই জায়গায় বসে বুদ্ধদেব একদা সাতদিন ধরে তার নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ আসলে মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি স্টেশনের কাছে রাঙামাটি-কানসোনা গ্রাম।

তাম্রলিপ্ত থাকাকালীন সিংহলের কথা শুনেছিলেন হিউয়েন সাঙ। মহা-সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত দেশটি, স্থবির সম্প্রদায় ও যোগশাস্ত্রের চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দক্ষিণ ভারতের একজন ভিক্ষু তাকে বলেছিলেন,—সিংহলে যেতে হলে সমুদ্রপথ ধরে না যাওয়াই ভাল। আবহাওয়া খারাপ সমুদ্রে ঢেউ প্রবল তাছাড়া আছে যক্ষেরা। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণপূর্বে একটি স্থান থেকে মাত্র তিন দিনের যাত্রা।...সে পথে গেলে উড়িষ্যা দেশটিও দেখা হবে।[৭]

দক্ষিণী ভিক্ষুর পরামর্শ গ্রহণ ক'রে হিউয়েন সাঙ উড়িষ্যার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। বিবরণে দেখা যায় তাম্রলিপ্তের পরেই ছিল উড়িষ্যা। মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল সেখানে, তাদের সংঘারাম ছিল একশো, ভিক্ষু দশহাজার। দেবদেবীর পুজো করেন এমন উপাসকদের সংখ্যাও কম ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণের সময় চারটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত ছিল বর্তমান বাংলা। পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত। শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্মার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সমতট ছিল বেশ বড় রাজ্য। উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন উপত্যকা, পূর্বে চট্টগ্রাম পর্বতমালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে প্রাচীন গঙ্গা বা বর্তমান নিরিখে গোরাই ও মধুমতী নদী পর্যন্ত। মোট পরিধি তিন হাজার লি। হিউয়েন সাঙ ইংগিত দিয়েছেন সাত শতকের প্রথম দিকে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার সেখানে রাজত্ব করতেন। নালন্দার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন সেই বংশের সন্তান। বংশটিকে উচ্ছিন্ন করে খড়্গবংশ সমতটে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

---

৭. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৬২-৬৫। Life..., S. Beal, p. 133.

ছয়শো পঁয়তাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তের দিনে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন হিউয়েন সাঙ। তার পরের বছর মারা গিয়েছিলেন হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর ফলে উত্তর ভারতে অরাজক রাজনৈতিক অবস্থার সূচনা দেখা দিয়েছিল। ওয়াং সুয়ান-সে নামে চীন সম্রাট যে দূত পাঠিয়েছিলেন (৬৪৮ খ্রী) তিনি এসে দেখেছিলেন সারাদেশ অসন্তোষে বিক্ষুব্ধ, থানেশ্বরে সমস্ত ক্ষমতা সেনাপতি অর্জুনের হাতে। অর্জুন তাকে তাড়া করেছিলেন, তিব্বতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলো সুয়ান-সে, পরে বিরাট বাহিনীসহ ফিরে এসে অর্জুনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে চলেছিল রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গৌড়ের দক্ষিণপূর্ব সীমান্ত, অর্থাৎ দামোদরের দক্ষিণতীর থেকে পুরীর সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল পাহাড় ও জঙ্গলে আকীর্ণ। শশাঙ্ক এবং হর্ষবর্ধনের সময় এ অঞ্চলে বিগ্রহ, মান ও শৈলোদ্ভব বংশগুলির প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের হদিস পাওয়া যায়। এ ছাড়া ছোট ছোট আরও অনেকগুলি রাজ্যের হদিস পাওয়া যায় তাদের মুদ্রা, উৎকীর্ণ লিপি, প্রাচীন কাব্য, রাজপ্রাসাদ এবং অসংখ্য মন্দির ও মূর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। নিদর্শনগুলি খাপছাড়া ও অসম্পূর্ণ। কোন্ রাজ্য কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা, সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। ফলে গতানুগতিক ইতিহাস চর্চার প্রশস্ত প্রবাহের মধ্যে তাদের স্থান ও ভূমিকা নথিভুক্ত হয়নি।

মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণায় বেলাডি গ্রাম। বলরামপুর বাজার থেকে দূরত্ব সাত মাইল। বর্তমানে সেখান থেকে খনিজ সার রকফসফেট সংগ্রহের কাজ চলছে। ১৯১৯ সালে চুনীলাল রায় বেলাডির শ্মশান টাঁড় থেকে বারোটি তামার মুদ্রা পেয়েছিলেন। স্থানীয় লোকে তাদের বলত গেঁডি পয়সা। মুদ্রাগুলির ছটি দেওয়া হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায়, ছটি পাটনা মিউজিয়মে।

শ্মশানটাঁড় কাউরি গোত্রীয় ভূমিজদের সমাধিস্থান। মুদ্রাগুলি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ত্রিরথ মন্দির ছিল একটি, সমাধিস্থলের মাঝখানে পোঁতা ছিল নিশান। অনুরূপ নিশান পোঁতা ছিল বেলাডি থেকে বারো মাইল দক্ষিণপূর্বে ভুলাগ্রামের সমাধিস্থলে। সেটি ছিল কাহন গোত্রীয় ভূমিজদের সমাধিস্থল।

মুদ্রাগুলির ব্যবহার নিয়ে অভিমত ছিল নানারকম। ভিনসেন্ট স্মিথ

অনুমান করেছিলেন সেগুলি পুরীর মন্দিরে পুজো দেওয়া ও প্রণামীর জন্য ব্যবহৃত হত। র‍্যাপসরের মতে ছিল অলংকারের উপকরণ ও উপাদান। সময়কাল নিয়েও মতভেদ ও অনুমান ছিল নানারকম। র‍্যাপসনের মতে সময়কাল খ্রীস্টীয় তিন শতক, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ছয় শতক, ওয়ালশের মতে সাত শতক। আরও নির্দিষ্টভাবে নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত খ্রীস্টীয় তিন থেকে সাত শতকের মধ্যে মোটামুটি তাদের সময়কাল ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এই সময়ের মধ্যে কারা এই মুদ্রাগুলি এ অঞ্চলে প্রচলিত করেছিলেন? বেলডির মুদ্রাগুলি আকস্মিক, খেয়ালের সঞ্চয় ছিল না। কারণ এ জাতীয় বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল পুরী, সিংভূম, গঞ্জাম ও মাদ্রাজে।[৮] বেশীর ভাগ অক্ষরবিহীন, তামা পিতল এবং অন্যান্য ধাতুতে তৈরি। একদিকে কণিষ্কের বা কুষাণ রাজা, অন্যদিকে চন্দ্রদেবের দাঁড়ানো মূর্তি। কণিষ্কের মুখে দাড়ি, মাথায় টোপরের মত টুপি, গায়ে কোট, পরণে পেন টুলেনের মত পাজামা, কোমরে খাপবদ্ধ তরবারি, পায়ে শিকারীদের মত বুট জুতো। চন্দ্রদেবের গায়ে চাপকান, বাঁ ও ডান হাত প্রসারিত, আধখানা চাঁদ ভাগাভাগি হয়ে কাঁধের দুদিক ঘেঁষে বেরিয়েছে, একদিকে তরবারি। কণিষ্কের মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এবং পুরী জেলায় বেশী সংখ্যায় পাওয়া গিয়েছিল বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'পুরী-কুষাণ মুদ্রা'।

রাঁচি মানভূম সিংভূম বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে অসুরদের নাম জড়িয়ে অনেক গ্রাম ও স্থানের নাম পাওয়া যায়। যেমন অসুরগড়, অসুরপাঞ্জ, বনআসুরিয়া, কোটাসুর ইত্যাদি। স্থানীয় মানুষদের স্মৃতি ও উপকাহিনীতে অসুরদের নানা কথা আজও বেয়ে চলেছে। তারা দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ ও ধাতব কাজে দক্ষ। স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় শুধু রাঁচি জেলা থেকেই পঁচিশটি অসুরদের পুরাক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন।[৯] অধিকাংশ ক্ষেত্র থেকেই পাথর, তামা, লোহা ও সোনার অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা ও অলংকার পাওয়া গিয়েছিল।

---

৮. পুরীতে (১৮৯৩ সাল) পাওয়া গিয়েছিল ৫৪৮ টি, সিংভূমে ৩৬০ (১৯১৭ সাল), ময়ূরভঞ্জে ২৮২, গঞ্জামে পাওয়া গিয়েছিল ১৮৫৮ সালে। মুদ্রাগুলির ওজন ৪৫.৫ থেকে ৮২ গ্রেণ এবং ১০৬ থেকে ২১১ গ্রেণ। দ্রষ্টব্য, JBORS, 1919 : Proc, ASB 1895; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৮/১।

৯. Antiquarian Remains in Bihar—Dr. D. R. Patil, Patna, 1963.

মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে শরৎচন্দ্রের মত কেউ এত ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালান নি। ফলে এসব অঞ্চলে অসুরদের বসবাসের নিদর্শন আছে বা ছিল কিনা, সুনিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়নি।

লৌহ আকরে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে বসবাস ছিল অসুরদের। কাজ ছিল লোহা গলানো। পুরাণ ও মহাকাব্যে সুবিশাল নাগজাতির সঙ্গে এদের সনাক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে নাম আগোরিয়া। সিরগুজা, যশপুর ও পালামৌয়ের অধিত্যকা অঞ্চলে উপজাতিদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রূপান্তরিত হয়েছেন নতুন সম্প্রদায়ে। নাম 'করোয়া'।

মুণ্ডাদের উপকথায় অসুরদের সঙ্গে তাদের চূড়ান্ত সংঘর্ষ রূপক আকারে বর্ণিত হয়েছে। সিঙ বোঙার পরিচারক ছিলেন অসুরেরা। একদিন আয়নায় দেখলেন সিঙ বোঙার সঙ্গে চেহারায় তফাৎ নেই, ফলে কাজে কামাই করলেন। ক্রুদ্ধ সিঙ বোঙা পদাঘাত করে ফেলে দিলেন মর্ত্যে। ছিটকে এসে তারা পড়লেন বরওয়ার একাশিতে। সেখানে লৌহ আকর ছিল প্রচুর। সঙ্গে সঙ্গে সাতটি চুল্লী জ্বালিয়ে সুরু করে দিলেন লোহা গলানোর কাজ। দিনরাত চুল্লীর আগুন ও ধোঁয়ায় স্থানটি ভরে থাকত। সিঙ বোঙা আপত্তি জানালেন। বললেন, সারাদিন কাজ চললে বিরাম দিতে হবে রাত্রে। সারা রাত চললে বিরাম হবে গোটা দিন। সিঙ বোঙার নির্দেশ অগ্রাহ্য করলেন অসুরেরা। দেবতা এবার নিজে নেমে এলেন শাস্তি দিতে। কৌশলে অসুরদের চুল্লীর মধ্যে পুরে তাদের স্ত্রীদের দিয়ে চালিত করালেন হাঁপর। পুড়ে মারা গেলেন অসুরেরা। ঝোপ ঝাড় নদী ও ডুংরিতে অসুর রমণীরা হয়ে থাকলেন ছোট ছোট দেবী ও ভূত।[১০]

মুণ্ডাদের এই উপকথায় তিনটি ইংগিত নিহিত রয়েছে। এক, মুণ্ডাদের রাজ্যে বা ব্যাপক বসতির মধ্যে অসুরদের আগমন ঘটেছিল হঠাৎ। দুই, তারা মুণ্ডাদের দেবতা সিঙ বোঙার উপাসক ছিলেন না। তিন, লোহা গলানো বা চুল্লীর কাজে মুণ্ডাদেরই উদয়াস্ত খাটিয়ে নিতেন, ফলে তারা বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রায় নির্মূল করে ছেড়েছিলেন সংখ্যালঘিষ্ট অসুরদের। হতাবশিষ্টেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন ঝোপঝাড়, নদী ও পাহাড়ী উপত্যকায়। তবু তাদের প্রভাব বিভীষিকার মত জড়িয়ে গিয়েছিল মুণ্ডাদের স্মৃতিতে। উপকথাটির মধ্যে ব্যাপকহারে প্রথম জনসংমিশ্রনের ইংগিতটি নিহিত রয়ে গেছে। অসুর ও পুরী-কুষাণ মুদ্রার মধ্যে যোগসূত্র আছে কিনা, বিষয়টিও ব্যাপক অনুসন্ধান ও গভীর বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

---

১০. Descriptive Ethnology of Bengal—Edward Tuite Dalton, 1872.

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কোল-মুণ্ডা জাতির যে প্রবাহ দফায় দফায় উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে মধ্য ও দক্ষিণভারতে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছিল[১১] তখন থেকে সূচিত হয়েছিল ভেড্ডিড বা নিগ্রোবটুদের সঙ্গে কোল-মুণ্ডা সংমিশ্রনের প্রথম পর্যায়টি। দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়েছিল কোল-মুণ্ডাদের সঙ্গে ব্রাত্যদের সংমিশ্রনে। অবৈদিক ধ্যানধারণায় অভিসিঞ্চিত সেই সমাজে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রাধান্য পেয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বড় বড় রাজ্য। উত্তর ও দক্ষিণপশ্চিম বাংলায় জৈনধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশী। বিশেষত বিহারের হাজারিবাগ জেলা ও বাংলার মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চলে। বাংলা থেকেই সম্ভবত উড়িষ্যায় প্রসারিত হয়েছিল জৈনধর্মের প্রভাব।

জৈন গ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে উনিশ জন[১২] নির্বাণ লাভ করেছিলেন সমেত, সংকেত বা সমেতশিখরে। তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নির্বাণলাভ করায় পাহাড়টির নাম হয়েছিল তার নামে। অর্থাৎ পার্শ্বনাথ পর্বত। চলতি কথায় পরেশনাথ পাহাড়। পাহাড়টিকে ঘিরে জৈনধর্মের সুদৃঢ় পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। পার্শ্বনাথ ছিলেন নিগ্রন্থ ধর্মের প্রবর্তক। তার ওপর ভিত্তি ক'রে মহাবীর বর্ধমান প্রবর্তিত জৈনধর্মের মূল কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। পার্শ্বনাথের সময় ছিল আটশো খ্রীস্টপূর্বাব্দ। পার্শ্বনাথের আড়াইশো বছর পরে জন্ম হয়েছিল মহাবীর বর্ধমানের।

মহাবীর বজ্জভূমি ও সুব্‌ভভূমি পরিভ্রমণ করেছিলেন। অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম বাংলার অনেক জায়গার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। তার জীবদ্দশাতেই তাম্রলিপ্তের প্রসিদ্ধ বণিক তাম্রলি মোরিয়পুত্ত সব ছেড়েছুড়ে জৈন যতির জীবন বেছে নিয়েছিলেন।[১৩]

কল্পসূত্রের অঙ্গীভূত থেরাবলীতে দেখা যায় ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস থেকে জৈনধর্মের চারটি শাখা উদ্ভূত হয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনটি বাংলার তিনটি স্থানের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া ও পুণ্ড্রবর্ধনীয়া।[১৪]

---

১১. দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' অধ্যায়।

১২. সমেতশিখরে যারা নির্বাণ লাভ করেছিলেন—অজিতনাথ, শম্ভুনাথ, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, পুষ্পদণ্ড বা সুবিধি, শীতলনাথ, শ্রেয়াংশ, বিমল, অনন্ত, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থু, অরনাথ, মল্লি, সুবর্ত, নমিনাথ ও পার্শ্বনাথ। বিশেষজ্ঞদের মতে এদের অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। পার্শ্বনাথ ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। •

১৩. ভাগবতী সূত্র—আগমোদ্যগ সমিতি, বম্বে ১৯১৮-২১, খণ্ড—২। মোরিয়পুত্তকে সনাক্ত করা নিয়ে মতান্তর আছে।

১৪. Sacred Book of the East, vol 22.

ভদ্রবাহুর সময় চতুর্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। কেউ কেউ বলেছেন ভদ্রবাহু ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত দেবকোট্ট সহরের অধিবাসী।[১৫]

পরেশনাথ পাহাড়টি ঘিরে জৈনধর্মের যে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, সম্ভবত সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি জৈন রাজ্য বিন্যস্ত হয়েছিল। রাজ্যের নাম ছিল শিখরভূম। আকবরের সময় শেরগড় পরগণা প্রকৃতপক্ষে শিখরভূমকে চিহ্নিত করত। পরগণাটি ছিল বিশাল। অজয় ও দামোদর নদের মধ্যে পশ্চিমদিকে কোণাকুণিভাবে প্রসারিত।[১৬] জৈন ধর্মের আওতায় মানভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের জনজীবনের একাংশ প্রভাবিত হয়েছিল। প্রভাব সব থেকে বেশি পড়েছিল মানভূম অঞ্চলে। মানভূমে অসংখ্য জৈনমূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এই সত্যটির দিকে নির্দেশ করে।

সাত শতকের শেষ থেকে আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ গোপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত, দক্ষিণ বিহার এবং বাংলা সামরিক যশোলিপ্সুদের শিকারক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। সামরিক অভিযানগুলি পরিচালিত হত দুদিক থেকে। উত্তর ও দক্ষিণ। পরেশনাথ পাহাড়কে ঘিরে জৈন রাজ্যটি আগে থেকেই সম্ভবত একটু একটু ক'রে বিধ্বস্ত হতে সুরু করেছিল। পরে সেটি সরে এসেছিল দামোদরের দক্ষিণে। তৈলকম্প রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জৈন প্রভাব রাজবংশটির ওপর আদৌ ছিল কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ তৈলকম্পের যে মন্দিরগুচ্ছ পাঁচেট জলাধারের মধ্যে নিমজ্জিত, সেগুলি ছিল হিন্দুধর্ম প্রভাবিত।

শিখরভূমের জৈনরাজ্যটি বিধ্বংসের দিকে এগুতে থাকলে জৈন ধর্মাবলম্বীরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের একটি বড় অংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সুইসা, সাফারণ ও দলমিতে। সম্ভবত বসতির মূলকেন্দ্র দক্ষিণে ক্রমাগত সরে সরে গিয়েছিল। জৈন মন্দির ও অসংখ্য মূর্তির ধ্বংসাবশেষ এবং তাদের সংস্থান এ জাতীয় অনুমানের দিকে ইংগিত করে।

মানভূম জেলার দক্ষিণপশ্চিমে ইছাগড়। বর্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত। ১৯১৭ সালে স্বর্গত হরিনাথ ঘোষ সেখানে একটি স্তূপ খুঁড়িয়েছিলেন। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে দুটি উৎকীর্ণ লিপি বেরিয়ে পড়েছিল।[১৭] লিপিদুটিতে

১৫. হরিসেন (৯৩১ খ্রীস্টাব্দ), দ্রষ্টব্য, বৃহৎকথাকোষ।

১৬. JRAS 1896.

১৭. মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি—হরিনাথ ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৮/২।

সময় দেওয়া ছিলনা। অক্ষরের ছাঁদ দেখে সাত শতকের শেষ দিকে (৬৬৯-৭০ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়েছিল। অর্থাৎ শশাঙ্কের লিপির পঞ্চাশ বছর পরে।

প্রথম লিপিটিতে ছত্র ছিল দুটি। তাতে একটি নাম পাওয়া যায়।[১৮] বৃহৎ পদ্মবনের বলবান বরাহ। দ্বিতীয় লিপিটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। লিপি দুটির সময়কাল সম্বন্ধে অনুমান যদি সঠিক বলে গ্রহণ করা যায়, সাত শতকের শেষ দিকে পাতকুম অঞ্চলে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, হদিস পাওয়া যায়। রাজবংশটি জৈনধর্মী ছিল না।

দীর্ঘকাল ধরে পাতকুম পরগণার জমিদারদের বসবাস ছিল ইছাগড়ে। বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। পারিবারিক উপাধি আদিত্য বা আদিত্যদেব। হরিনাথ ঘোষকে যিনি স্তূপ খুঁড়তে সাহায্য করেছিলেন তিনি ছিলেন তৎকালীন জমিদারের বড় ছেলে, রামগোপাল আদিত্যদেব।

বরাহভূম পরগণা ও জমিদার পরিবারটির সঙ্গে বরাহ নামটি সম্পৃক্ত। কিংবদন্তি অনুসারে নাথবরাহ ও কেশবরাহ ছিলেন বিরাট রাজার দুইপুত্র। পিতার সঙ্গে গোলমাল হওয়ায় দুজনে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্যের দরবারে। বিক্রমাদিত্য বলতে এখানে পাতকুমের রাজ পরিবারটির দিকে ইংগিত করেছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে কেশ ছিলেন ছোট, নাথ বড়। ছোট ভাইকে দ্বিখণ্ডিত করে নাথ তার রক্তে টিকা পরেছিলেন। পরে দুটি ছাতা নিয়ে আরোহণ করেছিলেন ঘোড়ায়। একদিনে আট যোজন পথ পরিক্রমা করেছিলেন। পরিক্রমার সেই পরিধিই পরবর্তীকালে বরাহভূম পরগণা ও রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পাহাড় ও ডুংরিগুলির দক্ষিণ সানুদেশে এখনও নাকি সেই অশ্বখুরের চিহ্ন বিদ্যমান।[১৯]

---

১৮. লিপির জন্য দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্টে 'পুরুলিয়া ও মানভূমে ঐতিহাসিক সূত্র।'

১৯. Descriptive Ethnology of Bengal—Edward Tuite Dalton, 1872.
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মেদিনীপুর সহর থেকে দুই মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে সেটি গোপগড় বা বিরাট রাজার গড় নামে পরিচিত। ইংরেজ আমলে ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি কোঠা তৈরি হয়েছিল। ধ্বংসস্তূপের নিচে লুকানো ধনরত্ন আছে বলে জনশ্রুতি শোনা যায়। কেশ ও নাথ এখানকার সন্তান হতে পারেন। দ্রষ্টব্য, মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

কিংবদন্তির মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলে যদি গ্রহণ করা যায়, বরাহভূমের উদ্ভব ঘটেছিল পাতকুমের সামন্তরাজ্য হিসাবে। সাত শতকের শেষ দিকে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা এবং বিহার ও উড়িষ্যা জুড়িয়ে শশাঙ্কের যে রাজ্য পরিব্যাপ্ত ছিল, সেখানে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রবল হয়ে উঠেছিলেন দত্ত-সামন্ত ও শৈলোদ্ভবেরা, দক্ষিণপূর্ব বিহারে আদিত্য ও বরাহেরা। দামোদরের দক্ষিণ তীর জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল শিখরবংশের প্রভুত্ব। রাজনৈতিক এই খণ্ড-বিছিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে সূচিত হয়েছিল 'মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতা।' পরাক্রমশালী এক রাজবংশের উদ্ভব ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিভাবে সেই বংশের প্রথম অঙ্কুরটি প্রোথিত হবে, বিহার ও বঙ্গ রক্তাক্ত অঙ্গে তারই প্রতীক্ষা করে চলেছিল।

৬. তৈলকম্প ও অন্যান্য সামন্ত রাজ্য

শিখর ইতি সমরপরিসর বিসরদরিরাজ-রাজিগণ্ড গব্ব' গহন
দহন দাবানলস্তৈলকম্পীয় কল্পতরু রুদ্রশিখর।[১]
—রামচরিতম, ২।৫ টিকা

সংস্কৃত ভাষায় তৈল শব্দের অর্থ তেল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তৈল এক জাতীয় শুল্ক বা কর।[২] কানাড়ি ভাষায় কম্প শব্দটির অর্থ বৃত্তিকর, কম্পন কথাটির অর্থ পরগণা।[৩] বেশ বোঝা যায় তৈলকম্প এক সময় শুল্ক প্রদানকারী পরগণা বা সামন্ত রাজ্য ছিল। কাদের দেওয়া হত শুল্ক? নির্দিষ্ট সূত্র না পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক ইংগিত নির্দেশ করে ত্রি-কলিঙ্গ বা তৈলঙ্গদের দেওয়া হত শুল্ক। তৈলঙ্গ-কম্পন থেকেও তৈলকম্প রাজ্যটির উদ্ভব হতে পারে।

মোগল যুগে রাজপুত জাতি ভারতের সামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শৌর্য বীর্য ও সংগ্রামে তাদের গৌরবদীপ্ত নেতৃত্ব কিংবদন্তির আকারে ছোট ছোট উপকথায় পরিণত হয়েছিল। ইংরেজ আমলে, বিশেষত উনিশ শতকের মাঝামাঝি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন গুরুভার পাহাড়ের

---

১. —শিখর অর্থাৎ যুদ্ধে যার (প্রভাব) নদী পর্বত ও উপান্তভূমি জুড়ে বিস্তীর্ণ, পর্বত-কন্দরের রাজবর্গের (বা ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষের) যিনি দর্প দহনকারী দাবানলের মত, (সেই) তৈলকম্পের কল্পতরু রুদ্রশিখর।

২. Contributions to the History of the Hindu Revenue System—U. N. Ghosal, 1929.

৩. কম্ম বা কম্ব—ভূমি মাপের একক; কম্প (তামিল, তেলেগু ও কানাড়ি ভাষায়)—বৃত্তিকর। প্রাচীন কাশ্মীরে কম্পন শব্দটি বলতে বোঝাত সেনাবাহিনী, আঞ্চলিক বিভাগ বা পরগণা, সেনাপতি বা অধিপতি।—Indian Epigraphical Glossary by Dr. D. C. Sircar, 1966.

মত সারা ভারতের ওপর চেপে বসতে চলেছিল, ক্ষত্রিয় গর্বী ছোট ছোট রাজ্য ও উপজাতিগুলি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন রাজপুত জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য। দক্ষিণপূর্ব বিহার, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং উড়িষ্যার গড়জাত মহলের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে উপজাতি ও ছোট ছোট রাজ্যগুলি ছিল অসংগঠিত। মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্যম এসব অঞ্চলে অধিকতর তীব্রতায় নিয়োজিত হয়েছিল। তারই পাশাপাশি 'হিন্দুধর্ম' পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগটিও অনুসৃত হয়েছিল সমান তীব্রতায়।

ছোট ছোট রাজ্যের অধিপতিরা পণ্ডিতদের দিয়ে, নিজেদের বংশের উদ্ভব ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। রাজপুত জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাড়া করিয়েছিলেন কিংবদন্তির উপকাহিনী। কাহিনীগুলির সবই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা।[8] পাঁচেটের রাজবংশ উদ্ভবের কাহিনীটিও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়।

রাজপুত জাতির চারটি শাখা। পস্মার, চোহান, শলুঙ্কি ও পড়িহার। শাখা চারটি যজ্ঞের আগুন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বলে ভবিষ্য পুরাণে বলা হয়েছে।[৫] যজ্ঞটি নাকি অনুষ্ঠিত হয়েছিল অর্ব্বুদ শিখরে। রাজপুতানার অন্তর্গত 'মাউনট আবু' বা আবুপাহাড়ই অর্বুদ পর্বত। যজ্ঞক্ষেত্রটি বর্তমানে বশিষ্ঠাশ্রম নামে অভিহিত হয়ে থাকে। পঞ্চকোট রাজবংশ সর্বজ্যেষ্ঠ শাখা পস্মার বা প্রমর থেকে উদ্ভূত বলে দাবী করে থাকেন।

কিংবদন্তি অনুসারে প্রমর অবন্তীদেশে বা বর্তমান উজ্জয়িনীতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার রাজধানীর নাম ছিল অম্বাবতী। প্রমরবংশেই কিংবদন্তিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়েছিল। মহারাজা জগদ্দেও সিংহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিক্রমাদিত্যের বংশে। তিনি ছিলেন ধার রাজ্যের অধীশ্বর, রাজধানীর নাম ছিল ধারানগরী। জগদ্দেও কে জড়িয়ে নানা কাহিনী ভট্টকবিদের গাথায় গাথায় রাজপুতানার গ্রামেগঞ্জে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। তাদের কিছু কিছু এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান।

---

৪. ছোটনাগপুরের রাজবংশ, লোহারডাঙ্গার রাজবংশ, মল্লভূম, বরাভূম, পাতকুম, নয়াগড়, ছাতনা ও কাতিয়াড়ের রাজবংশে এই একই ধরণের কাহিনী চালু আছে।—দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৭০।

৫. 'অর্ব্বুদ শিখরং প্রাপ্য ব্রহ্মহোমমথাকরোৎ।
বেদমন্ত্রপ্রভাবচ্চ জাতশ্চত্বারঃ ক্ষত্রিয়াঃ॥
প্রমরঃ সামবেদীচ চপহানি যজুর্বেদঃ।
ত্রিবেদীচ তথা শুক্লেষ্ছথর্ব্বা সঃ পরিহারকঃ॥'—ভবিষ্য পুরাণ।

পঞ্চকোট রাজ্যের উদ্ভবের কাহিনীটিও মহারাজা জগদ্দেও সিংহকে জড়িয়ে প্রচলিত। মহারাজা মহিষীকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শন।[৬] চতুরঙ্গ বলের সঙ্গে রাজগুরু বনমালী উপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। রাজমহিষী বীরমতী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। সৈন্যসামন্ত সহ মহারাজা যখন বর্তমান পুরুলিয়া জেলার ঝলদার কাছে শিবির খাটিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন, শিবিরেই একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন বীরমতী।

সন্তানটি ছিল মৃতকল্প। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ রাজগুরুর কাছে এ ঘটনা অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। গণনায় পুত্রটি শুভলক্ষণযুক্ত ও অসাধারণ হবার কথা। অথচ সে মৃত, বিষয়টি কিছুতেই তিনি মেলাতে পারছিলেন না। তীর্থ সেরে ফেরার পথে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনেছিলেন, শিশুটি জীবিত। স্থানীয় সর্দারদের ঘরে পালিত হয়ে চলছেন। সেই শিশুই পরবর্তীকালে দামোদর শেখর নাম পরিচিত হয়ে পঞ্চকোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭]

কুপল্যাণ্ডের গেজেটিয়ারে গল্পটি একটু আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজার নাম ছিল অনন্তলাল। পঞ্চকোট এলাকার নাম ছিল তখন অরুণবন। সেখানে শিশুটি জন্মের পরে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। কারও কারও মতে মাতাপিতার অলক্ষ্যে হাতীর পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। কপিলাগাই দুধের ধারা বইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল শিশুটিকে। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলে স্থানীয় লোকেরা প্রধানত কুর্মী সম্প্রদায় তাকে মাঝি বা সর্দার বলে মেনে নিয়েছিলেন। নির্বাচিত করেছিলেন চৌরাশি বা শিখরভূমি পরগণার রাজা হিসাবে। তৈরী হয়েছিল পঞ্চকোট দুর্গ। রাজাকে সবাই বলত জটা রাজা। কপিলগাই মারা গেলে লেজটি কেটে জটারাজা নিজের ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। ফলে লোকে তাকে বলতেন 'ছাঁওয়ার বান্ধা'। পঞ্চকোটের রাজারা দীর্ঘকালধরে 'ছাঁওয়ার' বা গরুর লেজ তাদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে এসেছেন।[৮]

কপিলাগাই যেখানে দুধের ধারা বইয়ে শিশু অনন্তলালকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, সে স্থানটি এখনও কপিলা পাহাড় নামে পরিচিত। ঝালদার

---

৬. পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রাচীনতা বিষয়ে আলোচনা ; দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৭০-৭১।

৭. পঞ্চকোট ইতিহাস—রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী। বইটির ঐতিহাসিক মূল্য কম, বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে লিখিত হয়নি।

৮. Bengal Dislrict Gazetteers, Manbhum—H. Coupland, 1911.

উত্তরে অবস্থিত এই পাহাড়টি। গরুর দুধের ধারায় প্রতিপালিত হবার ফলে অনন্তলাল 'গোমুখী' রাজা নামেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কপিলাগাই পরিণত হয়েছিল পাহাড়ে।

পঞ্চকোট রাজপরিবারের বংশতালিকা অনুসারে প্রথম রাজা দামোদর শিখর দেও। সময়কাল ৮০ খ্রীস্টাব্দ। তিনি ছিলেন উজ্জয়িনীর দ্বাদশ মহারাজা। দামোদর শিখর থেকে বংশের তেত্রিশতম রাজা, অভয়নাথ শেখর দেও পর্যন্ত রাজারা কিংবদন্তির পুরুষ বলে মনে হয়।

কিংবদন্তির উপকাহিনী পঞ্চকোট রাজ্যের উদ্ভব সম্বন্ধে তিনটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

এক, পঞ্চকোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বহিরাগত বা, ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। সম্ভবত গোপ ও কোন দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর মিশ্রিত সন্তান।

দুই, রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত বা নতুন ক'রে সংগঠিত হবার আগে দামোদর নদের লাগোয়া উত্তর ও দক্ষিণাংশে পাঁচ বা সাতটি উপজাতি কোম বসবাস করতেন। কোমগুলি সম্মিলিতভাবে সম্মতি দিয়েছিলেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা পুনর্গঠনে।

তিন, একই ক্ষেত্রে বা এলাকায় পরিব্যপ্ত হলেও তৈলকম্প ও পঞ্চকোট রাজ্য দুটি প্রকৃতির দিক থেকে ছিল ভিন্ন, দুটি পৃথক রাজবংশ দ্বারা প্রশাসিত হয়েছিল। তৈলকম্প রাজ্যের বিলুপ্তির বেশ কিছুকাল পরে উদ্ভূত হয়েছিল পঞ্চকোট রাজ্য।

ডাল্টন অনুমান করেছিলেন পাঁচেট রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল কুর্মী থেকে।[৯] উল্টো দিক থেকে বিশ্লেষণ করে উপনীত হয়েছিলেন সিদ্ধান্তটিতে। ডালটনের সময় পর্যন্ত মানভূমের পশ্চিমাঞ্চলে কুর্মীদের বসবাস ছিল বাহান্ন পুরুষ ধরে। তথাকথিত রাজপুত রাজার পরিত্যক্ত সন্তানটি কুর্মীদের ঘরেই লালিত ও প্রতিপালিত হয়েছিলেন। রাজ্যবংশটি যে ভূমিজ ও মুণ্ডা গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত নয় সে বিষয়ে দৃঢ় ছিল তার অভিমত।

কিংবদন্তির উপকাহিনীর মধ্যে যদি কিছুমাত্র সত্য নিহিত থাকে, গোয়ালা ও কুর্মীদের সংমিশ্রণে রাজ্যবংশটির উদ্ভব ঘটেছিল বলে মনে হয়। বংশটি নিজেদের গো-বংশী রাজপুত বলে পরিচয় দিতেন। প্রতীক ছিল 'ছাঁওয়ার' বা গরুর লেজ। ছাঁওয়ার শব্দের অপর অর্থ গো-বৎস। গোয়ালাদের সাতটি প্রধান শাখার মধ্যে গোয়ালবংশী অন্যতম।

---

৯. Descriptive Ethnology of Bengal—E. T. Dalton, 1872

পৌরাণিক কালে মানভূম ও সিংভূম অঞ্চলে, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের উত্তরাঞ্চল থেকে আর্যমিশ্রিত জনবসতির যে সন্নিবেশ ঘটেছিল সাত ও আট শতকের মধ্যে তারা এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ওপর তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে দ্রাবিড় গোষ্ঠীগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে একটু একটু করে প্রসারিত করে চলেছিলেন অধিকারের চৌহদ্দি। এই শক্তি সংগঠনের পরিমণ্ডলের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল দামোদরের তীরে তৈলকম্প বা তেলকুপি রাজ্যটি।

তৈলকম্প রাজ্যের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম' কাব্যে। কাব্যটি দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, অলঙ্কারে শ্লেষ। একদিকে অযোধ্যার রঘুপতি রাম অন্যদিকে পালসম্রাট রামপালের কীর্তিকাহিনী প্রতিটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছিল। কাব্য হলেও গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। কারণ, কবির পিতা প্রজাপতি নন্দী ছিলেন পালসম্রাটদের সান্ধিবিগ্রহিক। বসবাস ছিল পুণ্ড্রবর্ধনে বা রাজধানীর কাছাকাছি। রামপালের রাজত্বকালে রাজবংশের উত্থানপতন ও মূল ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে পরিচিত ছিলেন কবি। যদিও রামপালের দ্বিতীয় পুত্র মদনপাল দেবের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ সালে নেপাল থেকে তালপাতার ওপর লেখা কাব্যটির একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন।[১০] পাণ্ডুলিপিটি ছিল মূল কাব্যের অনুলিপি। অনুলিপির লিপিকার ছিলেন শীলচন্দ্র। ধর্মে বৌদ্ধ। সংস্কৃত ভাষায় যথোপযুক্ত বুৎপত্তি না থাকায়, লিপিকালে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। যদিও কাব্যটির হরফ ছিল দ্বাদশ শতকের বাংলা এবং ভাষা সংস্কৃত।

কাব্যটির সঙ্গে কিছু অংশের টিকাও সন্নিবেশিত ছিল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঁয়ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত, তারপর অকস্মাৎ ছেদ পড়েছিল টিকায়।

রামচরিতমের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে শিখরের উল্লেখ পাওয়া যায়। টিকায় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে এই শিখর ছিলেন তৈলকম্পের রাজা রুদ্র শিখর।[১১] মূল কাব্য রচিত হবার অল্পকালের মধ্যে রচিত হয়েছিল

১০. ১৯১০ সালে মম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাব্যটিকে প্রথম প্রকাশিত করেছিলেন। দ্রষ্টব্য, Memoirs vol—III, No 1 of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1910.

১১. মূল শ্লোক ও টিকার জন্য দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের 'শিখরভূম ও পাতকুম, বাংলার সীমান্ত রাজ্য' এবং 'তৈলকম্প ও অন্যান্য সামন্ত রাজ্য'—অধ্যায় দুটির প্রারম্ভ।

টিকা।[১২] ফলে টিকায় বর্ণিত তথ্য সমসাময়িক ও প্রমাণিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাল সম্রাট দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের সময়[১৩] পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। সুরু হয়েছিল নানা দিক থেকে ক্রমাগত সামরিক আক্রমণ। ছিন্নভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে ছোট ছোট বহু রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। এই অবস্থার মধ্যে প্রথম মহীপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তার রাজত্বকাল ছিল সুদীর্ঘ।[১৪] যে সব অঞ্চলের ওপর থেকে অধিকার বিলুপ্ত হয়েছিল, তিনি তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, ধীরে ধীরে সংগঠিত করে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন পালবংশের গৌরব।

সামরিক আক্রমণ থেমে ছিল না। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিলেন চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল। চোলেরা অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী। ভেংকট গিরিশ্রেণীর সুদূর দক্ষিণে যীশু খ্রীস্টের জন্মের বহু আগে থেকেই ছিল তাদের বসবাস। বর্তমান নিরিখে যা তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপলি জেলা ও তাদের সংলগ্ন এলাকা বলে চিহ্নিত করা যায়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চোল সম্রাট ইলার সিংহল জয় করেছিলেন।

খ্রীস্টীয় এগারো শতকের তৃতীয় দশকে চোল সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র চোল সুদূর দক্ষিণ থেকে, উড়িষ্যার উপকূল বরাবর, গঙ্গা ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত এক সফল সামরিক অভিযান পরিচালিত করিয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলা তখন চারটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তণ্ডভুক্তি বা দণ্ডভুক্তি, তক্কনলাড়ম বা দক্ষিণারাঢ় উত্তিরলাড়ম বা উত্তররাঢ় এবং বঙ্গালদেশ।

দণ্ডভুক্তির অধীশ্বর ছিলেন ধর্মপাল, রণশূর দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি, গোবিন্দ-চন্দ্র বাংলার রাজা এবং মহীপাল ছিলেন পালসম্রাট। রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতি মহীপালের মুখোমুখি হয়েছিলেন উত্তররাঢ়ে। উড়িষ্যার উপকূল বরাবর রাজগুলির কথা রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে বর্ণিত হয়েছিল। দক্ষিণরাঢ়ের

১২. Ramacaritam—ed. by Mm Haraprasad Sastri, Revised by Dr. Radhagobinda Basak, Calcutta, 1969.

১৩. দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ৯৬০—৯৮৮ খ্রীস্টাব্দ।

১৪. প্রথম মহীপালের রাজত্বকাল ৯৮৮-১০৩৮ খ্রীস্টাব্দ।

পশ্চিমাঞ্চলে কোন রাজ্য ছিল কিনা, তার অধীশ্বর কে ছিলেন, সে হদিস লিপিটিতে পাওয়া যায়না।

রামচরিতে বর্ণিত রুদ্রশিখর যে সন্ধ্যাকর নন্দীর কপোল-কল্পিত নন, সে প্রমাণ পাওয়া যায় বোড়ামের মন্দির লিপিতে। লিপিটি বোড়ামের একটি মন্দিরে পাওয়া গিয়েছিল। কংসাবতী নদীর তীরে বোড়াম বা দেউলঘাট আড়শা থানার অন্তর্গত। গড় জয়পুর থেকে চার মাইল দক্ষিণে। পাথর ও ইঁটের পরিকীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বড় বড় তিনটি ইঁটের মন্দির এখনও বিদ্যমান। লিপিটির ভাষা ছিল ভুলেভরা সংস্কৃত। অক্ষর প্রোটো-বাংলা, বা প্রায় বাংলা ছাঁদের মত। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সেটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন।[১৫]

পাল সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহপালের তিনটি পুত্র ছিল। দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় সুরপাল ও রামপাল।[১৬] বিগ্রহপালের পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সিংহাসন কেন্দ্র করে পারিবারিক চক্রান্ত সুরু হয়ে গিয়েছিল। উচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কায় মহীপাল, সুরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সূচিত হয়েছিল, সম্রাট ও সাম্রাজ্যকে তা গভীর বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের অন্যতম কৈবর্ত প্রধান দিব্য অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন দ্বিতীয় মহীপাল। বিদ্রোহ, মহীপালের রাজ্যচ্যুতি ও রামপাল কর্তৃক পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার, প্রধানত সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত কাব্যটির বিষয়বস্তু। বর্ণিত কাল মোটামুটি ১০৭০-১১২০ খ্রীস্টাব্দ বা পঞ্চাশ বছর।

রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে পালদের জনকভূ বা পিতৃভূমি পালবংশের অধিকারচ্যুত হয়েছিল, নতুন রাজবংশের পত্তন করে দিব্য অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বরেন্দ্রীতে। মগধের একাংশ এবং রাঢ়ে তখনও আধিপত্য বজায় ছিল পাল বংশের। ঘটনাবিহীন, বিবর্ণ বৈচিত্র্যে সুরপাল দুবছরের মত এই

---

১৫. পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্টে, 'পুরুলিয়া ও মানভূমে ঐতিহাসিক সূত্র'।

১৬. তিনজনেই সম্রাট হয়েছিলেন। রাজত্বকাল ছিল, তৃতীয় বিগ্রহপালের ১০৫৪—১০৭২ খ্রীস্টাব্দ, দ্বিতীয় মহীপালের ১০৭২—১০৭৫ খ্রী, দ্বিতীয় সুরপালের ১০৭৫—১০৭৭, রামপালের ১০৭৭—১১৩০ খ্রীস্টাব্দ। দ্রষ্টব্য, History of Ancient Bengal—Dr. R. C. Majumdar, Calcutta, 1974.

অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। সেই নিস্তরঙ্গ রাজ-অধিকারের নেপথ্যে পিতৃভূমি উদ্ধারের জন্য তোড়জোড় চালিয়ে চলেছিলেন রামপাল।

মগধ ও রাঢ়ের অরণ্যময় পার্বত্যপ্রদেশে স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন যেসব ক্ষুদ্র বৃহৎ নৃপতি অহংকার ও স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, রামপাল তাদের দরজায় দরজায় গিয়ে শক্তি ভিক্ষা করেছিলেন। পরিবর্তে প্রভূত ঐশ্বর্য ও ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল রামপালের। বিপুল বাহিনী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দিব্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

মগধ ও রাঢ়ে যেসব নৃপতিবর্গের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রামপাল, রামচরিতমের টিকায় তাদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। আধিপত্যের দিক থেকে বহুধা বিভক্ত বাংলার একটি খণ্ড চিত্রও সেই বর্ণনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রামপালের মৈত্রী সমস্ত রাজন্যবর্গের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ বিহার ও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ। তাদের অধিকারের চৌহদ্দি সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত না হলেও, বর্তমান পুরুলিয়া, অধুনালুপ্ত মানভূম, প্রাক্তন পঞ্চকোট এবং রামপালের সমসাময়িক তৈলকম্প রাজ্যের চারিদিকে বিন্যস্ত রাজ্যগুলি সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

তৈলকম্প রাজ্যের উত্তরে ছিল অঙ্গ ও কয়ঙ্গল-মণ্ডল। রামপালের মাতুল ও অন্যতম সহায় রাষ্ট্রকূট প্রধান মথন বা মহণ ছিলেন অঙ্গের অধীশ্বর। কয়ঙ্গল-মণ্গল বা কাজঙ্গলের অধীশ্বর ছিলেন নরসিংহার্জুন। উত্তরপূর্ব ও পূর্ব দক্ষিণে ছিল আরও ছ'টি রাজ্য। উচ্ছাল, ঢেক্করী, অপর-মন্দার, কোটাটবী, দেবগ্রাম ও দণ্ডভুক্তি।[১৭] বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্য পৃথক স্বাতন্ত্র্যে তখনও পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি।

পিতৃরাজ্য উদ্ধারের উদ্যোগে রামপালকে সামরিক সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেছিলেন তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখরও। অরণ্য প্রদেশের পর্বতকন্দর, নদী পর্বত ও উপান্তভূমি জুড়ে বিস্তীর্ণ রাজন্যবর্গের দর্প হরণকারী ছিলেন রুদ্রশিখর। শক্তির মত ছিল তার বদান্যতা। রামচরিতমের টিকাকার তাকে তৈলকম্পের কল্পতরু বলে বন্দিত করেছেন।

বোড়ামের লিপিটিতে খ্যাতনামা রুদ্রের পুত্রের কথা বলা হয়েছে। পুত্র যুবরাজ। লিপিতে যুবরাজের নাম নেই। তিনি শক্তিশালী, অক্ষয়কীর্তি ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিপির ছাঁদ দেখে অনুমান

১৭. রাজ্যগুলির অবস্থিতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৮১-৮৩।

করেছিলেন সেটি তের-চোদ্দ খ্রীস্টাব্দের আগেকার নয়। সম্ভবত রামচরিতমের রুদ্রশিখর এবং বোড়াম লিপির রুদ্র একই ব্যক্তি। যদিও কাব্য ও লিপির মধ্যে সময়ের পার্থক্য প্রায় দেড়শো থেকে দু'শো বছর। মন্দিরটি তৈরি হবার অনেক পরে সম্ভবত লিপিটি সংযোজিত হয়েছিল, ফলে প্রতিষ্ঠাতা যুবরাজের নামটি ততখানি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি, প্রসিদ্ধ পিতার নামটিই উল্লেখিত হয়েছিল। কোন মন্দির থেকে লিপিটি সংগৃহীত হয়েছিল, ড. মজুমদার হদিস পাননি।

বোড়ামের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ক'টি বীরস্তম্ভও পাওয়া গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটিতে উৎকীর্ণ ছিল লিপি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন[১৮] লিপিটিতে 'শ্রী রুদ্র শিখা যুয়ারাজা'র সিংহাসনে আরোহণের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। হরফের ছাঁদ অনুসারে এটিও তের-চোদ্দ শতকের বলে অনুমিত। বীরস্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপি ও মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি সমসাময়িক। মন্দির লিপির 'রুদ্র শিশু' প্রকৃতপক্ষে 'রুদ্র শিখা'ও হতে পারে।

উনিশ শতকের শেষদিকে বেগলার যখন বোড়াম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি উৎকীর্ণ পাথরের স্ল্যাব দেখেছিলেন। তাতে দুটি অক্ষর উৎকীর্ণ ছিল: বু ও ক। অক্ষরের ছাঁদ দেখে তিনি তা নবম-দশম খ্রীস্টাব্দের বলে অনুমান করেছিলেন।[১৯]

বোড়ামে যে মূর্তিগুলি ডালটন[২০] ও বেগলার দেখেছিলেন এবং এখনও যেগুলি বিদ্যমান, তাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত, প্রধানত শৈব। পাঁচেট জলাধারে নিমজ্জিত অধিকাংশ মন্দিরও ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত। মূর্তিগুলির সঙ্গে কাছাকাছি প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে পাওয়া মন্দির ও মূর্তিগুলির সঙ্গে আশ্চর্য মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন, পাড়া, কোশজুড়ি, বান্দা, বুধপুর, দুলমি ও বরাকর। এক জাতীয় মূর্তিগুলির মধ্যে প্রধানত উল্লেখ্য মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ, গজলক্ষ্মী ও যোনিপট্টসহ শিবলিঙ্গ।

মন্দির, মূর্তি এবং উৎকীর্ণ লিপিগুলির সাক্ষ্য থেকে মনে হয় তৈলকম্প রাজ্যটি দামোদরের দক্ষিণতীর থেকে কাঁসাইয়ের উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। পশ্চিমে বালদা থেকে পূর্ব দক্ষিণে বুধপুর পর্যন্ত ছিল সীমানা।

---

১৮. Notes on the Temples of Purulia District—David McCutchion.

১৯. Report of a tour through the Bengal Provinces etc.—J. D. Beglar, 1878.

২০. Notes on a tour in Manbhoom in 1864-65 by Lt. Col. E.T. Dalton, JASB—XXV, 1866. এপ্রসঙ্গে স্বর্গত বিনয় ঘোষের মন্তব্য, যুক্তিও প্রমাণবিহীন।—দ্রষ্টব্য, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; ১ম খণ্ড, বোড়াম (দেউলঘাটা), পৃ. ৪০১—৪৪১।

বুধপুরে পাওয়া সীমানা নির্দেশক পাথরের স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি এই অনুমান সমর্থন করে। লিপিটিতে বলা হয়েছিল, 'রাঢ়ের বেষ্টনী ঘেরা পঞ্চাদ্রিশ্বরের সীমা কেউ যেন খর্ব না করে।'[২১]

লিপিটির সময়কাল অনুমিত হয়েছে এগারো শতক। সম্ভবত তখনও পঞ্চকোটে অধিষ্ঠিত হয়নি রাজপাট। তৈলকম্পের অধীশ্বরের পঞ্চাদ্রিশ্বর হওয়া অসম্ভব নয়, বরং এ অনুমান অধিকতর যুক্তিসংগত।

বুধপুরে আরও দুটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটি সতীস্তম্ভে, অপরটি বীরস্তম্ভে। সতীস্তম্ভে একজন রাজপুত্রের নাম পাওয়া যায়—'রাজপুত্র শ্রীবড়ধুগ' (বা চড়ধুগ); বীরস্তম্ভে নামটি—'রাজপুত্র শ্রী আতন্দ্রী চন্দ্র'।[২২] দুটি লিপিই দশ খ্রীস্টাব্দের বলে অনুমিত। যদি ধরা যায়, বুধপুরের সঙ্গে তৈলকম্পের রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল এবং উভয়ক্ষেত্র একই অধীশ্বরের শাসনাধীন ছিল, তা সে প্রত্যক্ষই হোক বা রাজপুত্র বা রাজপুত্রদের দ্বারাই হোক, তাহলে নয় বা দশ থেকে তের-চোদ্দ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, এই অঞ্চলে, এক বা একাধিক রাজবংশের আধিপত্যের ইংগিত দেয়। সম্ভবত, একটিই রাজবংশ ছিল এবং তারা বরাকর থেকে সুরু করে বুধপুর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা শাসন করতেন। এ অনুমানের সপক্ষে বরাকর, তৈলকম্প, বোড়াম, কোশজুড়ি ও বুধপুরের মন্দির ও মূর্তির সাদৃশ্য অনেকখানি সাক্ষ্য দেয়।

বাংলার বর্তমান সীমান্ত অঞ্চলে এই রাজবংশ কারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাদের পূর্ব নিবাস কোথায় ছিল, কখন নতুন করে উদ্ভূত হয়েছিল রাজ্যটি, কেন এবং কখন বিলুপ্ত হয়েছিল—এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে উঁকিঝুঁকি দেয়। এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সূত্র না থাকায়, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক নির্দেশ গ্রথিত ক'রে, আনুমানিক সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

শশাংক, হর্ষবর্ধন এবং ভাস্করবর্মার অভিযানে দক্ষিণপূর্ব বিহার, দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা এবং উড়িষ্যার উত্তরপূর্ব অঞ্চলে যে রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল, সম্ভবত সেই সময়েই পরেশনাথ পাহাড় ঘিরে এবং হাজারিবাগ

---

২১. 'রাঢ়ম বারম পঞ্চ (I) দ্রিশ্বর সীমা জীব ধ যে না বা গ্রাস অরি।'—Ptana Museum Catalogue of Antiquities Ed. by P. Gupta, 1965.

২২. দ্রষ্টব্য পাদটিকা ২১।

জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা জুড়ে যে জৈন রাজ্যটি ছিল, বিধ্বস্ত হয়েছিল। কারণ, এরা কেউ জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। এই সময়ে তাম্রলিপ্তও উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যতম বন্দর হিসাবে গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে একদিকে রাজনৈতিক নির্যাতন, অন্যদিকে জৈন বণিকদের বাণিজ্যের বিঘ্ন, তাদের এ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র বসবাস গড়ে তুলতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। কৃষিকাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, তাদের এভাবে স্থানান্তরে যাত্রা সম্ভব ছিল না, ফলে মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়ে গিয়েছিলেন। বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী সেই প্রাচীন জনসম্প্রদায় এখনও শরাক নামে পরিচিত। দামোদরের উত্তরে নতুন করে রাজশক্তি বিন্যস্ত হবার ফলে, সমেত শিখর বা পার্শ্বনাথ পর্বতের সঙ্গেও তাদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। কয়েক পুরুষ ধরে বিচ্ছিন্নতা প্রচলিত থাকার ফলে, একদা অতি সম্মানিত তীর্থ-ক্ষেত্রটিও তাদের কাছে বর্জিত রয়ে গিয়েছিল।

খ্রীস্টীয় দশ শতকে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যগ্রহণের আগে ও প্রথম-দিকে যেসব সামরিক অভিযান বাংলার দিকে পরিচালিত হয়েছিল, সেগুলির নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানত রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, চান্দেল্ল ও কলচুরিরা। এদের সঙ্গে যেসব সেনাপতিরা এসেছিলেন, সুযোগমত তারা এক একটি ক্ষেত্রে সৈন্যসহ বসে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক অব্যবস্থা, শৈথিল্য এবং শক্তিশালী রাজশক্তির অনুপস্থিতির ফলে নিজেরাই এক একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। যেমন, মিথিলায় নান্যদেব, মেদিনীপুর গড়বেতা অঞ্চলে কম্বোজবংশীয় রাজ্য-পাল, রাঢ়ে বিজয় সেন, সম্ভবত তেমনি তৈলকম্পেও একটি রাজ্য উদ্ভূত হয়েছিল।

রাস্ট্রকূটদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ দীর্ঘকালের।[২৩] পাল আমলে তা বৈবাহিক সম্পর্কে উন্নীত হয়েছিল। ধর্মপাল বিয়ে করেছিলেন রাস্ট্রকূট কন্যা রন্নাদেবীকে। রাজ্যপালও বিয়ে করেছিলেন রাস্ট্রকূট কন্যা। রামপালের মামা ছিলেন মহন, অঙ্গের অধীশ্বর এবং রাস্ট্রকুট অর্থাৎ তৃতীয় বিগ্রহ-পালের এক মহিষীও ছিলেন রাস্ট্রকুট কন্যা।

ছয় সাত শতক থেকেই বাংলার সঙ্গে দ্রাবিড়ীয় সংযোগ ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। সম্ভবত এর আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল মিলনমিশ্রণের ধারা। কোল এবং দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মিলন মিশ্রণের ফলে খ্রীস্টীয় ছয় সাত শতক থেকেই মানভূম ও বিহার অঞ্চলে নতুন একটি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব সূচিত হয়েছিল। দক্ষিণাঞ্চলে এই মিলিত জনগোষ্ঠী, দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করার

---

২৩. দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের 'মান মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল', পৃ ৬-১২।

ফলে, ভূমিজ দেশোয়ালি মাঝি, মানা বাউরি, বাগদী ইত্যাদি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। দ্রাবিড় ও কোল, উভয় গোষ্ঠীর ভাষা, আচার আচরণ, ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা রূপান্তরিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত ছিল এই মিলনমিশ্রণের ধারা। ফলে, জনজীবনের ধারাটি নির্দিষ্ট আকার নিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। কারণ আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দ্রাবিড়ীয় অভিযান অব্যাহত ছিল। এ প্রসঙ্গে বর্গীর আক্রমণ স্মরণীয়।

খ্রীস্টীয় দশ-এগারো শতকে দামোদরের দক্ষিণতীরে যে রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল সম্ভবত সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাস্ট্রকূট—চালুক্য শাখার কোন সেনাপতি। যে সেনবংশ পরবর্তীকালে বাংলায় স্থায়ী ও বৃহৎ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারাও এসেছিলেন কর্নাট দেশ থেকে, দ্বিতীয় তৈল কর্তৃক কর্নাট দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হবার পরে। চোল-চালুক্য সম্মিলিত করে তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল প্রথম কুলতুঙ্গ নামে দুটি সাম্রাজ্যেরই অধীশ্বর হয়েছিলেন। বঙ্গের দিকে কুলতুঙ্গের অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ১০৭০—১১১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

তৈলকম্প ও পাতকুম রাজ্যদুটি রাস্ট্রকূট-চালুক্য এবং চালুক্য-চোলদের দ্বারা অধিকৃত ও শাসিত হয়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। রাস্ট্রকূট চালুক্যেরা এসেছিলেন উত্তরপশ্চিম থেকে, চালুক্য-চোলেরা এসে-ছিলেন দক্ষিণপূর্ব থেকে। কুলতুঙ্গের সেনাপতি সমগ্র কলিঙ্গদেশ ভস্মে পরিণত করেছিলেন এবং বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেছিলেন ওড্র দেশের সীমান্তে। সম্ভবত কুলতুঙ্গ নিজেও পরিচালিত করেছিলেন অভিযান, পরাজিত করে-ছিলেন বহু স্থানীয় অধীশ্বরদের, অধিকার করেছিলেন সপ্ত কলিঙ্গ।[২৪] এই অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে বর্তমান মানভূম অঞ্চল থাকা স্বাভাবিক। কারণ, কুলতুঙ্গকে বঙ্গ, বঙ্গাল ও মগধের রাজারা কর দিতেন বলেও বলা হয়েছে।

কর্নাট দেশ থেকে আগত সেনবংশ এগারো শতকের শেষদিকে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বংশের প্রথম পুরুষ সামন্তসেন

২৪. কুলতুঙ্গের সেনাপতি বিজয় অভিযান পরিচালিত করেছিলেন ১০৯৬ খ্রীস্টাব্দের আগে। দ্রষ্টব্য, Drākshārama Ins, Ep. Ind XXII. কুলতুঙ্গ নিজে ১০৯৬ খ্রীস্টাব্দের পরে পরিচালনা করেছিলেন অভিযান।

বৃদ্ধ বয়সে বর্ধমান-ভুক্তির ভেতর কোন এক জায়গায় সুরু করেছিলেন বসবাস। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন সেখানে রাজ্যটি গড়ে তুলেছিলেন। রাজ্যটি কত বড় ছিল, হেমন্তসেন স্বাধীনরাজা ছিলেন কিনা, সে হদিস সেনবংশের উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রপট্টে তাকে মহারাজাধিরাজ বলে পরিচিত করান হয়েছে। পুত্রের সাফল্য পিতার ওপর অর্পিত হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়ে গেছে।

হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেনই সেন রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।[২৫] তিনি শূর বংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। দীর্ঘকালধরে শূরেরা ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি। অটবী বা অরণ্য প্রদেশের সামন্তচক্রের চূড়ামণি। ফলে বৈবাহিক সূত্রে বিজয়সেন শক্তি ও প্রভাব অর্জন করেছিলেন। সম্ভবত কর্নাট সেনাপতি আচের নেতৃত্বে বঙ্গাভিযান তাকে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।[২৬] দেওপাড়া লিপিতে বলা হয়েছে নান্য, বীর, রাঘব, বর্ধন, গৌড়েব রাজা, কলিঙ্গ ও কামরূপের রাজাদের সঙ্গে তাকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এসব নৃপতিবর্গকে তিনি জয় করেছিলেন।

নান্য ছিলেন মিথিলার রাজা। মিথিলা অর্থাৎ উত্তর বিহার। তিনি গৌড় ও বঙ্গের শক্তি খর্ব করেছিলেন বলে কথিত।[২৭] পরে বিজয়সেন মিথিলা আক্রমণ করেছিলেন এবং সম্ভবত নিজের প্রশাসনিক চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

বীর বা বীরগুণ এবং দর্পবর্ধনের কথা আমরা রামপালের মিত্র হিসেবে রামচরিতমে পেয়েছি। দর্পবর্ধনের রাজ্য ছিল কৌশাম্বী।[২৮] উত্তরবঙ্গের রাজশাহী বা বগুড়ায়। রাঘব ছিলেন কলিঙ্গের রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র (১১৫৬-১১৭০খ্রী)। পালেরা সম্ভবত তখনও গৌড়ের কিছু অংশের অধীশ্বর ছিলেন। একদা বিশাল পাল সাম্রাজ্যের দুর্বল বংশধর মদনপাল নিশ্চিতভাবে সে অংশ শাসন করতেন।

---

২৫. বিজয় সেনের রাজত্বকাল ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

২৬. History of Ancient Bengal—Dr. R.C. Majumdar, P 224

২৭. IHQ: vol. VII.

২৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি রাজশহী জেলার কুসুম্বা পরগণার সঙ্গে সনাক্ত করেছিলেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সনাক্ত করেছিলেন বগুড়া জেলার টপে কুসুম্বীর সঙ্গে। কেউ সেটি কলকাতার দক্ষিণে, কেউ কালনা মহকুমার কুসুমগ্রামের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন।

রাঢ়েরই বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, মেদিনীপুর—এক কথায় দক্ষিণরাঢ়ের সমগ্র অঞ্চল বিজয়সেনের সময়েই অধিকৃত হয়েছিল। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের সময় আরও বেড়ে গিয়েছিল পরিধি। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জগদেকমল্লের কন্যা রামদেবীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তার সময়েও কর্নাটের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল বল্লালের প্রশাসিত রাজ্য। বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগড়ী ও মিথিলা। প্রথম তিনটি প্রদেশ ছিল খোদ বাংলার মধ্যে। বাগড়ী ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ। তৎকালীন রাঢ় ও উৎকলের মধ্যবর্তী প্রদেশ। অধুনালুপ্ত মানভূম জেলা সম্ভবত সেনরাজ্যের বহির্ভূত ছিল এবং অর্ধ স্বাধীন পৃথক অস্তিত্ব ছিল তৈলকম্প রাজ্যের। বল্লালসেন বিরচিত দানসাগরের মন্তব্য যদি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায়, বিজয়সেন ও বল্লালসেনের সময়েও শেখররাজ্য সেনদের সামন্তরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরও বড় কোনও রাজা, সম্ভবত চালুক্য বা অঙ্গের রাস্ট্রকুটদের অধীনস্ত ছিল বলে অনুমিত হয়।[২৯]

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের প্রধান কৃতিত্ব ছিল বাংলার পশ্চিমসীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহ সেনরাজ্যের আওতাধীনে আনা। বিজয়সেনের সময়েই বিহারে আর একটি রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এরা ছিলেন গাড়হবাল বা গাড়োয়াল। মগধ, সাসারাম, বুদ্ধগয়া, গয়া এবং কাশী—সমগ্র অঞ্চল তারা অধিকার করে নিয়েছিলেন। এদের বিরুদ্ধেই বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন লক্ষ্মণসেন। মগধ থেকে গাড়োয়ালদের তাড়িয়ে, গাড়োয়াল-রাজ্যের বুকের ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন লক্ষ্মণসেন। মগধ অধিকার করে জয় করেছিলেন কাশী। কাশীর অধীশ্বর ছিলেন তখন গাড়োয়াল রাজা জয়চন্দ্র। গয়াও লক্ষ্মণসেন কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। কাশী এবং এলাহাবাদে লক্ষ্মণসেন বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেছিলেন। বেশ বোঝা যায়, বিহারের সমগ্রাংশ এবং উড়িষ্যার উত্তরাংশ সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তৈলকম্পের শিখররাজ্য প্রথমে পালদের, পরে সেনদের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

এ পর্যন্ত পাওয়া ঐতিহাসিক সূত্রের পরিপ্রেক্ষিত উপসংহারে বলা যায়, পরেশনাথ পাহাড় বা সমেত শিখরকে কেন্দ্র করে একদা যে জৈন রাজ্যটির

---

২৯. 'তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদবরেন্দ্র দিশাবদেশি ভজতে যস্য বীরধ্বজত্বং। শেখরবীনীহিতাজ্ঞা বৈজবন্তীং বহন্তঃ প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ।
—বল্লালসেনের দানসাগর, উপক্রম।

উদ্ভব ঘটেছিল। উত্তর ভারত থেকে আগত, বার বার বিদেশী আক্রমণের ধাক্কায়, তা ক্রমাগত দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আট নয় খ্রীস্টাব্দে নতুন করে রাজধানী গড়ে উঠেছিল দামোদরের দক্ষিণ তীরভূমিতে। প্রধানত জৈন বণিকদের বাণিজ্যের পথটিকে অবিঘ্নিত রাখাই ছিল লক্ষ্য। কাঁসাই, শিলাবতী, কুমারী ও দামোদরের প্রবাহপথ ধরে চলত পণ্য আদান-প্রদানের ধারা। দশ-এগারো খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণভারত থেকে পরিচালিত সামরিক অভিযানের সঙ্গে আসা কোন সেনাপতি অধিকার করে নিয়েছিলেন এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাজ্যটি। সম্ভবত তিনি ছিলেন রাস্ট্রকূট—চালুক্য অভিযানকারীর অধীনস্থ সেনাপতি। পাল আমলে পালদের সামন্ত শাসক হিসেবে শাসন করতেন রাজ্যটি। রামপালের সময় তৈলকম্প রাজ্যের পরিধি কতখানি ছিল, নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় না। সম্ভবত দামোদর বা বরাকর ছিল উত্তর সীমা। বরাকর হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হয়। কারণ রামপালের মাতুল মহণ ছিলেন অঙ্গের অধীশ্বর। এবং তিনি ছিলেন বেশ শক্তিশালী এবং পাল-সম্রাটের ঘনিষ্ঠ মিত্র। তার রাজ্য দক্ষিণ বিহারের অনেকখানি জুড়েই পরিব্যাপ্ত ছিল।

তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখর ছিলেন অরণ্যময় গিরিকন্দর সমন্বিত উপান্তভূমির অধীশ্বর। কতদিন তার বংশধরেরা এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের সময়েও সেনদের সামন্ত রাজ্য হিসেবে বজায় ছিল সেটি। মানভূমে পাওয়া পাল-সেনযুগের অসংখ্য মূর্তি এই অনুমানের স্বপক্ষে রায় দেয়। মুসলমান আক্রমণের পর সেনদের রাজধানী যখন পূর্ববঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তখন বা তার কিছুকাল পরে দক্ষিণভারতীয় এই রাজবংশটির বিলুপ্তি ঘটেছিল এবং নতুন করে বিন্যস্ত হয়েছিল পঞ্চকোট রাজ্য। গৌড়ের বদলে সেটি অধীনস্থ ছিল উড়িষ্যার। পরে নাগপুরের রাজাদের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজ আমলের আগে পর্যন্ত এই অবস্থাই বজায় ছিল বলে মনে হয়।

বর্তমান সিংভূম জেলার ইছাগড়ে পাওয়া লিপি দুটির সম্বন্ধে যদি স্বর্গত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুমিত সময়কাল সঠিক বলে গ্রহণ করা যায়, ইছাগড়, দুলমি, দেউলি, সুইসা, চান্ডিল ও জৈদা মিলিয়ে একটি রাজ্যের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩০] রাজ্যটি উদ্ভূত হয়েছিল শশাঙ্কের

৩০. এই গ্রন্থের 'শিখরভূম ও পাতকুম বাংলার সামন্ত রাজ্য' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে। এবং বেশ কিছুকাল বিদ্যমান ছিল। পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ, ব্যাপক এলাকা জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মেনহির, জনশ্রুতির দীর্ঘস্থায়ী প্রবাহ—রাজ্যটির যৌক্তিকতা নির্দিষ্ট করে। চান্ডিল ও ইছাগড়ে পাওয়া একাধিক মূর্তির নিচে উৎকীর্ণ লিপি দৃঢ় ভাবে সমর্থন করে যৌক্তিকতা। জৈদায় পাওয়া পাথুরে লিপি সুস্পষ্টভাবে ইংগত করে খ্রীস্টীয় আট-নয় শতকে এ অঞ্চলে দক্ষিণভারত থেকে সমৃদ্ধ পরিবারের আগমনের।[৩১]

পরবর্তীকালে তৈলকম্প ও পাতকুম, দুটি রাজ্যই এক শাসকের কর্তৃত্বাধীনে এসেছিল এবং উৎকলে শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলে পরিণত হয়েছিল উৎকলের সামন্ত রাজ্যে।

---

৩১. পরিশিষ্টে 'পুরুলিয়া ও মানভূমে ঐতিহাসিক সূত্র', দ্রষ্টব্য।

চ. মধ্যযুগ, পঞ্চকোটবৃত্ত

"Bir Nārayān, Zaminder of Panchet, a country attached to Subah Bihar, was a commander of 300 horse and died in the sixth year, (AH 1042-43)"—Padishanama. [AH 1042-43=1632-33 A D.]

খ্রীষ্টীয় তের শতকের প্রারম্ভ থেকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাঁক নিতে সুরু করেছিল। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছিল সেনবংশ, সংকুচিত হয়েছিল তাদের রাজ্য, রাজধানী পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। তুর্কমান জাতির একটি শাখা, খিলজিরা অধিকার করে নিয়েছিলেন রাঢ় ও উত্তরবঙ্গ। খিলজিদের নেতা ছিলেন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি। অতর্কিত আক্রমণে তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন নদীয়ায় সেনদের অস্থায়ী রাজধানী।

বর্তমান উত্তর প্রদেশ ও বিহারের একাংশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বিহারের উত্তরাংশে মিথিলা অঞ্চলে কর্ণাট বংশের আধিপত্য তখনও পর্যন্ত বজায় ছিল। ফলে বখতিয়ারকে নদীয়া বিজয়ের জন্য আসতে হয়েছিল ঘুরপথে, তেলিয়াগাড়ির দক্ষিণে অরণ্যময় বিস্তীর্ণ পার্বত্য প্রদেশের ভেতর দিয়ে। লোকমুখে সে অঞ্চলের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। বিহার-শরীফ থেকে বেরিয়ে গয়া ও বীরভূম জেলার ভেতর দিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন নদীয়ায়। বীরভূম জেলার নগর বা রাজনগরের কাছে লক্ষ্ণুর বা লখনৌরে বাংলার মুসলমান শক্তি-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল [১]। দিনাজপুর জেলার বর্তমান গঙ্গানারায়ণ পুরের কাছে দেবকোটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রধান রাজধানী।

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসের স্রষ্টা ছিলেন বখতিয়ার খিলজি। তার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের আয়তন ছিল—উত্তরে, পূর্ণিয়া সহর থেকে উত্তরপূর্বে দেবকোট ছুঁয়ে রংপুর সহর পর্যন্ত, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্বে তিস্তা এবং করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূল প্রবাহ, পশ্চিমে কোশীর নিম্নপ্রবাহে গঙ্গার মুখ থেকে

---

১. বখতিয়ার খিলজির অভিযান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—গুরুদেব ভট্টাচার্য। লখনৌর সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, বীরভূম—গুরুদেব ভট্টাচার্য।

রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত।[২] এই সীমানার বাইরে ছিল সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণে কহলগাঁও থেকে বরাকর ও পাঁচেট পর্যন্ত এলাকা।[৩] সেনবংশের বিজয়সেন ও বল্লাল সেনের সময় এলাকাটির কিছু অংশ তৈলকম্প রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শিখরবংশ কর্তৃক প্রশাসিত হত।

লক্ষণসেন কর্তৃক গয়া, কাশী ও মগধ বিজিত হবার ফলে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিংবদন্তি অনুসারে মুসলমান আক্রমনের প্রায় আড়াইশো বছর আগে শিখর বংশের তেত্রিশতম রাজা অভয়নাথ শেখর[৪] সেরগড় পরগণা অধিকার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেরগড় পরগণাই শিখর-ভূম নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে শিখরভূম বলতে ব্যাপক এলাকা চিহ্নিত করত। অভয়নাথের পিতা কীর্তিনাথ পঞ্চকোট গড়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে জনশ্রুতি প্রচলিত। জনশ্রুতি আরও বলে ভট্টনারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ কীর্তিনাথ শেখরের কাছে বাসভূমি প্রার্থনা করলে তিনি মানভূম নামে একটি গ্রাম দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে শিখরভূমের বিভিন্ন স্থানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের আবাসভূমি গড়ে উঠেছিল।[৫] অবশ্য কাহিনীটি কুলজি-গ্রন্থগুলি দ্বারা সমর্থিত হয়না।

জনশ্রুতি অনুসারে বখতিয়ার খিলজির আকস্মিক নদীয়া লুণ্ঠনের সময় পঞ্চকোট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন হরিশচন্দ্র শেখর।[৬] বরাকরের মন্দির লিপিতে আমরা এক হরিশচন্দ্রের নাম পাই। সম্ভবত তিনি ছিলেন রাজা। প্রিয়তমার জন্য তৈরি করেছিলেন মন্দিরটি। লিপিটিতে নির্মাণকাল দেওয়া ছিল না। বেগলার অনুমান করেছিলেন সেটি মুসলমান আমলে তৈরি

---

২. History of Bengal, vol II,

৩. Contributions to the Geography and History of Bengal—H. Blochmann, Calcutta, JASB 1873-1875 (Rep, 1968)

৪. অভয়নাথ শেখরের রাজত্বকাল খ্রীস্টীয় ৯৫১ থেকে ৯৬৬ পর্যন্ত অনুমিত।

৫. যথা, মৌতড়, নাডিহা, লধুড়কা, সাঁকড়া, শালুকচাপড়া, উনানশিলা, চিনশিনা, কোটালডি, যশপুর, মুরাডি, প্রচন্দপুর, তিলুড়ি প্রভৃতি। অবশ্য নগেন্দ্রনাথ বসুর তালিকায় গ্রামটির নাম ঘোষল। ভট্টনারায়নের বংশের 'গণকে' দেওয়া হয়েছিল। অবস্থিতি বরাকর নদের দক্ষিণে। দ্রষ্টব্য—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড।

৬. রাজত্বকাল ১১৮০ থেকে ১২২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত। দ্রষ্টব্য, পঞ্চকোট ইতিহাস—রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী। শিলালিপির অনুমিত তারিখ অনুযায়ী হরিশ্চন্দ্রের সময় ১০৮২ শকাব্দ (ফাল্গুন) বা ১৪৬১-৬২ খ্রী।

হয়েছিল, যদিও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি।[৭] মানভূম ও তেলকুপির মন্দিরগুলির সঙ্গে মন্দিরটির আশ্চর্য সাদৃশ্যও লক্ষ্য করেছিলেন। বরাকর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র ও পঞ্চকোটের অধীশ্বর মহারাজা হরিশ্চন্দ্র একই ব্যক্তি হতে পারেন। আরও তথ্য প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে নির্দেশ করা যায় না।[৮]

বরাকরের মন্দিরগুলির দক্ষিণে একটি উঁচু ঢিবি ছিল। বেগলার সেটি অপর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে সনাক্ত করেছিলেন। মন্দিরটি ছিল বিশাল, মহামণ্ডপ ও নানা রকমের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত। মন্দিরটির নির্মাণকাল নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না। ধ্বংসাবশেষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অনুমান করেছিলেন সেটি খ্রীষ্টীয় ছয় বা সাত শতকে নির্মিত হয়েছিল। একই স্থানে সন্নিবেশিত প্রাচীন ও পরবর্তীকালে নির্মিত মন্দিরগুলির সহাবস্থান তাকে যে সমস্যার ভেতর ফেলেছিল, সেটির সমাধান কল্পে অনুমান করেছিলেন বরাকরের সমস্ত মন্দির সম্ভবত মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে নির্মিত হয়েছিল।[৯] এ অনুমান সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, মুসলমান আমলের অনেক আগে অন্তত একটি মন্দির বরাকরে নির্মিত হয়েছিল। মন্দির লিপিতে সে সমর্থন পাওয়া যায়।

রাঢ় অঞ্চলে ও উড়িষ্যায় প্রথম মুসলমান অভিযান পরিচালিত হয়েছিল নদীয়া বিজয়ের চার বছর পরে।[১০] তিব্বত অভিযানের তোড়জোড় করেছিলেন বখতিয়ার। কাছাকাছি হিন্দু রাজ্যগুলিকে ব্যস্ত রাখার জন্য ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরাজ খিলজী ও তার ভাই আহমদ শিরাজকে পাঠিয়েছিলেন লক্ষ্নুর বা লখনোর ও জাজনগর বিজয়ে। লক্ষ্নুর আসলে বীরভূম জেলার নগর বা রাজনগর। জাজনগর উড়িষ্যায়। তিব্বত অভিযান

---

৭. "I am inclined to ascribe these temples to a period posterior to the Muhammadan Conquest of Northern India, from the circumstances that a temple of this type, existing at Telcupi…"—J.D. Beglar, P 151

৮. বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বর্ধমান—তরুণদেব ভট্টাচর্য।

৯. "There is but one solution,—to ascribe all the Barakar temples to a date prior (but not by much) to the Muhammadan Conquest."—J.D. Beglar, P 152.

১০. Dr. Jadunath Sarkar, P 10. মতান্তরে লখনৌতি বিজয়ের দুই বছর পরে, বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ—ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত।

বখতিয়ারের জীবনে চূড়ান্তভাবে নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল। ভগ্নহৃদয়ে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিন মাস পরে, নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী দেবকোটেই আলি মর্দান খিলজি নামে এক আমীরের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

মুহম্মদ শিরাজ লখনৌর জয় করেছিলেন।[১১] কারণ পরবর্তীকালে মুসলমান আধিপত্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল লখনৌর। জাজনগর অবিজিত থেকে গিয়েছিল। শক্তিশালী গঙ্গবংশীয়েরা সেখানে রাজত্ব করতেন। বখতিয়ারের সময়েই সমগ্র দক্ষিণ বিহার লখনৌতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মুহম্মদ শিরাজের পর থেকে প্রায় উনিশ বছর (১২২১-২৬ খ্রী) মুসলমান আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাঢ় অঞ্চল। যে দুটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল বখতিয়ারের লখনৌতি রাজ্য, তাদের মধ্যে একটি ছিল রাঢ়, অপরটি বারিন্দ।[১২] রাঢ় বলতে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা দক্ষিণরাঢকেই নির্দেশ করতেন।

বখতিয়ারের মত আলি মর্দানও ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন। নিজসৃষ্ট লখনৌতির মসনদে বখতিয়ার ছিলেন তিন বছর, মতান্তরে পাঁচ বছর, মুহম্মদ শিরাণ দু'বছর এবং আলি মর্দান প্রায় তিন বছর। আলি মর্দানকে নিহত ক'রে খিলজি আমীরেরা হুসেনের পুত্র হুসামুদ্দিন ইউয়জকে তাদের নেতা নির্বাচিত করেছিলেন। ইউয়জ সুলতান গিয়াসুদ্দিন খিলজি নাম নিয়ে বসেছিলেন লখনৌতির মসনদে।[১৩]

রাঢ় অঞ্চল থেকে সেনবংশের কর্তৃত্ব উচ্ছিন্ন হবার ফলে কোন শক্তিশালী রাজশক্তি এ অঞ্চলে নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট ছিলনা। তৈলকম্প ও অন্যান্য অরণ্য অধুষিত রাজ্যগুলি ছিল ক্ষুদ্র ও দুর্বল। ফলে সমগ্র এলাকা ছত্রহীন মহাকান্তারে পরিণত হয়েছিল। নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজ্যটির অন্তর্কলহের প্রবাহ তখনও অব্যাহত ছিল। এ সময় উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের সেনাপতি বিষ্ণু রাঢ় আক্রমণ করেছিলেন। অধিকার করে নিয়েছিলেন লখনৌতির শাসকদের সীমান্ত ঘাঁটি, লক্ষ্মুর। বিষ্ণুর অভিযান পরিচালিত হয়েছিল সম্ভবত দণ্ডভুক্তি, মল্লরাজ্য ও শিখরভূমের ভেতর দিয়ে। মুসমান আধিপত্য তখনও

---

১১. আনুমানিক ১২০৬ খ্রীস্টাব্দ।

১২. Tabaqāt-i-Nāsiri, (Bil Ind.) P 578, 585.

১৩. আনুমানিক ১২১০ খ্রী।

পর্যন্ত অজয় নদ অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত ছিলনা। বিষ্ণু তার সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৈতরনী নদীর তীরে যাজপুরে।

লক্ষ্মুর পুনরুদ্ধারের জন্য গিয়াসুদ্দিন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে।[১৪] প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মুর পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন। মুসলমান আমীরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেখানে। লখনৌতি রাজ্যের সীমানা অজয় ছাড়িয়ে দামোদর নদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্য এ সময় তত প্রবল হয়ে ওঠেনি। পঞ্চকোট পৃথক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিদামান ছিল। গিয়াসুদ্দিনের সময় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্রাংশ, বীরভূম, বর্ধমান বাঁকুড়া ও হুগলীজেলার অনেকখানি জাজনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মল্লরাজ্য এবং পঞ্চকোট রাজ্যের একাংশ, প্রধানত দামোদরের দক্ষিণতীরস্থ ভূভাগ, জাজনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে অনুমিত হয়।[১৫]

গিয়াসুদ্দিনের রাজত্বকাল ছিল প্রায় চোদ্দ বছর। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের বড় ছেলে নাসিরুদ্দিন মহামুদ লখনৌতি অধিকার করলে গৌড়ের প্রান্তসীমায় যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে প্রথমে পরাজিত ও পরে বন্দী অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন গিয়াসুদ্দিন।[১৬] গিয়াসুদ্দিন ছিলেন লখনৌতির স্বাধীন সুলতান। তার মৃত্যুর পরে ষাট বছর পর্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়েছিল লখনৌতি। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর একজন আমীর লখনৌতি অধিকার করেছিলেন। ইলতুৎমিস স্বয়ং তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন অভিযান। আমীরকে পরাজিত ও নিহত করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন লখনৌতির প্রশাসন।

কিংবদন্তি অনুসারে হরিশচন্দ্র শেখরের পুত্র বিশ্বম্ভর শেখর ছিলেন এ সময় পঞ্চকোটের অধীশ্বর। ক্রম বর্ধমান মুসলমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয়েরা। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সুলতানা রিজিয়া। বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খান তার আগেই অধিকার করে নিয়েছিলেন লখনৌতি। তবকাত-ই-নাসিরীর লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তুগানের। তার আহ্বানে বাংলায় এসেছিলেন মীনহাজ। ছিলেন প্রায় তিন বছর।

---

১৪. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বীরভূম—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

১৫. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৯৪।

১৬. হিজরী সন ৬২৪=১২২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দ।

তৃতীয় অনঙ্গভীমের উত্তরাধিকারী হিসেবে উড়িষ্যার শাসনকর্তা হয়েছিলেন প্রথম নরসিংহদেব। সময়কাল আনুমানিক ১২৬৮ খ্রীস্টাব্দ। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর থেকে ভাগীরথীর পূর্ব তীর ছিল অরক্ষিত। সপ্তগ্রাম ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে অর্ধস্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য তখনও পর্যন্ত বিদ্যামান ছিল। ঝটিকা অভিযানে নরসিংহ সেগুলি অধিকার করে নিয়েছিলেন (১২৪৩ খ্রী)। পরের বছর, ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন তুগান। সঙ্গে ছিলেন মীনহাজ। বিষ্ণুপুরের সীমান্তে, কাটাসঙ্গার প্রান্তরে মুসলমান বাহিনী চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। নরসিংহদেবের সৈন্য তাদের তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল কাটাসিন বা কাটাসঙ্গা থেকে সত্তর মাইল উত্তর পশ্চিমে লক্ষ্মুরের দুর্গ পর্যন্ত। অধিকৃত হয়েছিল লক্ষ্মুর। নিহত হয়েছিলেন স্থানীয় সামন্ত শাসনকর্তা। নিহত অধিবাসীদের মৃতদেহে ভরে গিয়েছিল লক্ষ্মুরের পথঘাট।[১৭] আক্রান্ত হয়েছিল বরেন্দ্র। লখনৌতির দ্বারদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তুগানকে। সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন দিল্লী সম্রাটের কাছে। বিহারের মধ্য দিয়ে মালিক তামার খান-ই-খিরানের নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনী। রক্ষক লখনৌতিতে এসে ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অধিকার করে নিয়েছিলেন লখনৌতি। নিজের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তুগান। প্রায় দশ বছর প্রথম নরসিংহদেবের অধীনস্ত ছিল লক্ষ্মুর। উমর্দন বা মদারণে তার অধীনস্ত সামন্ত রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পঞ্চকোট রাজ্য এ সময় নিঃসন্দেহে প্রথম নরসিংহদেবের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মদারণ বা হুগলীর আরামবাগ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হত রাজ্যটি। পঞ্চকোট রাজ ছিলেন উড়িষ্যা রাজের সামন্ত শাসক। অযোধ্যার শাসনকর্তা, ইখতিয়ার-উদ্দিনয়ুজবক লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। উপর্যুপরি তিনবার যুদ্ধের শেষে ইখতিয়ারের সৈন্য নিদারুণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। দিল্লীর সাহায্য ভিক্ষা করতে হয়েছিল তাকেও। দু'বছর পরে পুনরায় আক্রমণে (নভেম্বর—ডিসেম্বর ১২৫৫ খ্রী) বিজয়ী হয়েছিলেন ইখতিয়ার। রাঢ় অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মুসলমান আধিপত্য। লখনৌতি রাজ্যের সীমানা মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার উত্তরাংশ ছুঁয়ে ফেলেছিল।

---

১৭. প্রথম নরসিংহদেবের অভিযান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৯২-৯৩। এবং বীরভূম—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

বাংলায় বলবনদের শাসকাল বিস্তৃত ছিল প্রায় বিয়াল্লিশ বছর।[১৮] এ সময় হুগলী-পাণ্ডুয়ার পাণ্ডু রাজা বিজিত হয়েছিলেন। বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। যথা, বিহার, সাতগাঁও, বঙ্গ ও দেবকোট। রাঢ়ের সীমান্তে মুসলমান কর্তৃত্ব ছিল ঢিলেঢালা। কিংবদন্তি অনুসারে পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন তখন কল্যাণশেখর।[১৯] বরাকরের সাত মাইল উত্তরে কল্যাণেশ্বরী বা দেবীস্থানে দুটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছিল। লিপিদুটির একটিতে রাজা ও দুর্গের নাম পাওয়া যায়। দুর্গের নাম ছিল কল্যাণকোট। দেবী কল্যাণেশ্বরীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র হিসেবে দুর্গের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। অপর লিপিটিতে বাংলা হরফে উৎকীর্ণ ছিল "শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরী চরণ পরায়ণ শ্রীযুক্ত দেব নাথ দেব শর্মা।"[২০]

কিংবদন্তি অনুসারে কাশীপুরের রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে বলা হয়। রাজার নাম ছিল কল্যাণ সিংহ। পঞ্চকোট রাজাদের বংশ তালিকায় কল্যানশেখরের সময়কাল প্রামাণ্য ধরলে কাশীপুরে রাজধানী হওয়া অসম্ভব। তখনও রাজধানী স্থানান্তরিত হয়নি কাশীপুরে। তাছাড়া সময়ের নিরিখে লিপিটি অনেক পরবর্তীকালের। ফলে রাজবংশের কুর্শিনামা ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

টুকরো টুকরো ভাবে, ঐতিহাসিক দিক থেকে, রুদ্রশিখর, হরিশচন্দ্র ও কল্যাণ শেখরের নাম পাওয়া যায়। পঞ্চকোটের রাজবংশ তালিকায় রুদ্রশিখরের নাম নেই, হরিশচন্দ্র দুজন, কিন্তু তাদের সময়কাল ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত সময়কালের সঙ্গে মেলেনা।[২১] কল্যাণশেখরের ক্ষেত্রেও সময়ের এই ব্যবধান অত্যন্ত স্পষ্ট। অথচ পঞ্চকোট, তৈলকম্প এবং পরবর্তীকালে কাশীপুরে যেসব নিদর্শণ এখনও কমবেশি কিছু পরিমাণে বিদ্যমান, তা কপোল কল্পিত বংশতালিকার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব ও পরিদৃশ্যমান। কুর্শিনামা এক পাশে সরিয়ে রেখে ঐতিহাসিক নিদর্শনের আদলে এ বিষয়ে আলোচনা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

খ্রীস্টীয় পনের শতক থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত পাঁচেটের কাছাকাছি

---

১৮. ১২০৬ থেকে ১৩২৮ খ্রী পর্যন্ত।

১৯. তার রাজত্বকাল ১২৯১—১৩১৬ পর্যন্ত ছিল, কথিত হয়।

২০. Beglar, P155.

২১. পরিশিষ্টে রাজবংশতালিকা দ্রষ্টব্য।

তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যের হদিস পাওয়া যায়। এক, পঞ্চকোট বা পাঁচেট; রাজধানী তেলকুপি পরবর্তীকালে কাশীপুর। দুই, মল্লরাজ্য; রাজধানী বনবিষ্ণুপুর। তিন, ছত্রিনা বা ছাতনা।

রাজ্য তিনটির মধ্যে ছাতনা ছিল ক্ষুদ্রতম। সামন্ত রাজ্য হিসাবে কখনও অন্তর্ভুক্ত হত পাঁচেটের, কখনও বা মল্লরাজ্যের। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা, বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গ্রন্থকার, বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান মতান্তরে বাসস্থান হিসেবে ছাতনা সুবিদিত এবং বহু আলোচিত।

আর্কেওলজিকাল সার্ভে পরিচালনার সময় বেগলার যখন ছাতনায় গিয়েছিলেন, বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশের মধ্যে তিনি কতকগুলি উৎকীর্ণ ইঁট দেখেছিলেন। ইঁটগুলির গায়ে লেখা ছিল 'কোন্হ উত্তর রাজা'। বেগলারের সঙ্গে যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি পড়েছিলেন 'হামির উত্তর রাজা। শক ১৪৭৬'।[২২] দ্বিতীয় পাঠটিই অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হয়। অপর একটি ইঁটেও শ্রী উত্তর রায়ের কথা পাওয়া যায়।[২৩] সম্ভবত হামির নামে, ছাতনার কোন রাজা খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। প্রথম নরসিংহদেব যখন লক্ষ্ণৌর আক্রমণ করেছিলেন, হামির নামে একজন মুসলমান আমীরকে পরাজিত করেছিলেন বলে বিদ্যাধর রচিত 'একাবলী'তে উল্লেখ করা হয়েছিল।[২৪] বাঁকুড়া জেলার উত্তরাংশ, মহিষাড়া, ভুলুই, ছাতনা একসময় পঞ্চকোট রাজ্যের অধীন ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৫]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অনুমান করেছিলেন ছাতনার প্রথম ছত্রী রাজা ছিলেন উত্তর হামীর। তার সময় ছিল ১২৭৫ শক বা ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দ।[২৬] কিংবদন্তি অনুসারে ছাতনার আদি রাজা শঙ্খ রায়। কৃষ্ণপ্রসাদ গাতাইত বিরচিত ছাতনার রাজবংশ পরিচয়ে কিংবদন্তির প্রতিধ্বনি

---

২২. Beglar, P 198-200.

২৩. ইটখানিতে লেখা ছিল "শ্রী ২ ছাতনানগরেস শ্রী উত্তর রায় সক ১৪৭৬"—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪। শক ১৪৭৬=১৫৫৪ খ্রী।

২৪. বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ১০১, পাদটিকা।

২৫. 'শিখর-বংশের রাজ্য পঞ্চকোট খ্যাতি পূর্বপঞ্চ মহিষাড়া ভুলুই বসতি।'—আত্মবোধ, জগদ্রাম রায় বিরচিত। 'আত্মবোধ' রচনাকাল ১৭৮৭ খ্রী।

২৬. ছাতনার রাজবংশ পরিচয় ও চণ্ডীদাস—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৩। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হামির উত্তরের সময়কাল নিরূপণ করেছিলেন ১৩৭০—১৪৩৩ খ্রী। —সা. প. প. ৬৫/২

পাওয়া যায়।[২৭] শঙ্খ রায়ের সময় থেকেই ছাতনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শিখর-ভূমের। পদ্মলোচন শর্মা বিরচিত 'বাসলী মাহাত্ম্য' পুঁথিটি রচিত হয়েছিল ১৩৮৭ শকাব্দে (১৪৬২ খ্রী)। তাতে দেবীদাসের ভাই কবিবর চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হামীর উত্তরের উল্লেখও দেখা যায়।[২৮] 'বাসালী মাহাত্ম্য' পুঁথি এবং ইটে উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে ব্যবধান প্রায় নব্বই বছরের। দুটিতেই হামীর উত্তর উল্লেখিত। ফলে অনুমিত হয় ছাতনার রাজবংশে হামির উত্তর হয়ত একসময় ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজার নাম ছিল। পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছিল উপাধি নামে।

বিদ্যাবিনোদ সত্যকিঙ্কর সাহানা অনুমান করেছিলেন হামির উত্তর রায়ের পর তার পুত্র বীর হাম্বীর রাজা হয়েছিলেন।[২৯] ইঁটে লেখা হামির উত্তর রায়ের সময়কাল যদি প্রামাণ্য বলে ধরা যায়, অনুমান অসঙ্গত মনে হয়না। ছাতনা, পাঁচেট ও বাঁকুড়ায় যেসব উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে, সেসবের ভিত্তিতে এই তিনটি এলাকার অধীশ্বরদের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাঁচেটের রাজবংশ এবং পঞ্চকোট রাজ্য অতি প্রাচীন। নির্দিষ্টভাবে না হলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে সে ইংগিত স্পষ্ট। পাঠান ও মুঘল শাসন মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের মুসলমান আধিপত্যের মাঝামাঝি সময়ে, রাজা গনেশের অভ্যুদয় অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তার অনুমিত রাজত্বকাল ১৪১০-১৪১৮ খ্রীস্টাব্দ। এ সময় পঞ্চকোট রাজ্য যে বিদ্যমান ছিল সে ইংগিত পাওয়া যায় জীব গোস্বামী রচিত লঘু বৈষ্ণবতোষনীর শেষে পূর্বপুরুষদের পরিচয়ের বিবরণে। গ্রন্থটির রচনাকাল যদিও ১৪৭৬ খ্রী, পরিচয়ের বিবরণে আরও আগেকার সময়ের কথা বলা হয়েছে।

জীব গোস্বামীর বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম ছিল পদ্মনাভ। শিখরভূমির রাজ-বংশের গুরু ছিলেন তিনি, কিংবা রাজ-সভাপণ্ডিত। বসবাস ছিল শিখরভূমে। সেখান থেকে বাস উঠিয়ে রাজা দনুজমর্দন বা গনেশের রাজ্যের অন্তর্গত, গঙ্গা

---

২৭. 'সামন্তের অধিরাজা—সংখ রায় মহাতেজা/শিখরভূপেন্দ্র তায় জিনিল সমরে/বসাইল অকপটে সামন্তের রাজপাটে/ভবানী ঋরাং নামে ব্রাহ্মণ কুমারে।'/

২৮. 'ধন্যাঃ সোহবনীমগুণে নববরঃ শ্রীহামীরশ্চোত্তরঃ।' এবং 'ধন্বিকবংশে বিলুপ্তে যজ্জন-ভজ্জনমোহ'নিমালোক্য রাজা/শ্রীহামীরোত্তরাখ্যো নিপততি সভরং মন্দিরান্তঃ প্রবিশ্য'। পাদটিকা ২৪ দ্রষ্টব্য

২৯. চণ্ডীদাস প্রসংগ—সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ, পৃ ২৭-৩০।

তীরবর্তী নবহট্টকে বসতি গড়ে তুলেছিলেন।[৩০] পদ্মনাভের বসতি বদলের পিছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক, রাজবংশের পারিবারিক কলহের জন্য শিখরভূমে অভ্যন্তরীন অরাজকতা। দুই, মুসলমান আক্রমনের ফলে অধিবাসীদের মধ্যে প্রসারিত সন্ত্রাস। তিন, নেহাত ব্যক্তিগত ইচ্ছা। পরবর্তীকালে ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিশ্লেষণ করলে প্রথম দুটি কারণই বসতি বদলের দিকে ইংগিত করে।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্য সম্ভবত এক সময় শিখরভূমের সামন্ত রাজ্য ছিল। মানসিংহের উড়িষ্যা অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে, কুমার জগৎসিংহ আফগানদের অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের জমিদার বীর হাম্বির তাকে এ ধরণের আক্রমণের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন। কর্ণপাত করেননি জগৎ সিংহ। মুঘল বাহিনী পরাজিত হলে হাম্বির জগৎ সিংহকে উদ্ধার করে নিজের রাজধানীতে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৩১] ক্ষুদ্র জমিদারের এ উপকার মানসিংহ বিস্মৃত হননি, মাঝে মধ্যে বিরতিসহ প্রায় চোদ্দ বছর বাংলায় অবস্থিতি কালে ক্ষুদ্র জমিদারটিকে রূপান্তরিত করিয়েছিলেন রাজায়। বিশাল আয়তন নিয়ে, হাম্বির অরণ্যময় পার্বত্যপ্রদেশের আদিবাসী ও উপজাতি কোমদের সমন্বয়ে গড়ে তুলেছিলেন মল্লরাজ্য।

মুঘলবাহিনীর সহায়তায় হাম্বির কোন এক সময় পঞ্চকোট দুর্গ অধিকার করেছিলেন। বীরভূম পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন রাজ্যসীমা। পঞ্চকোট গড় পরিদর্শনের সময় বেগলার দুয়ারবান্ধ ও খড়িবাড়ি তোরণের গায়ে

---

৩০. 'বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং/স্ফুরৎসুরতরঙ্গিনী—তটনিবাস পর্যুৎসুকঃ ॥/ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা—/দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভ কৃতীঃ ॥'—লঘু বৈষ্ণবতোষণী। রচনাকাল ১৪৭৬ খ্রী। অর্থ—'রাজা দনুজমর্দন নিত্য যার পাদপূজা করতেন, সেই গুনীশ্রেষ্ঠ কৃতী পদ্মনাভ শিখরভূমি বাসের স্পৃহা পরিত্যাগ করে গঙ্গাতীরে বাস করতে উৎসুক হয়ে নবহট্টকে (নৈহাটিতে) বসতি করেছিলেন'—অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর।

৩১. 'Though the landholder Hamir warned Jagat of Bahādur's craft and of the dispatch of an army to his assistance, he did not accept the news." "Though the imperial army was defeated, yet 'Umar k., Miru, and the sons of Humayun Quli with some of their relations were killed, Hamir brought away that infatnated young man and took him to his quarters at Bishanpur."—Akbaraāma, vol, III, tr by H. Beveridge, P 879. যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচর্য, পৃ ১০৪—১০৭।

দুই লাইনের যে উৎকীর্ণ লিপি দেখেছিলেন, তাতে শ্রী বীর হাম্বিরের উল্লেখ ছিল। লিপির সময়কাল খ্রীস্টাব্দের নিরিখে ১৬০০। সময়কাল যদি সঠিক বলে গ্রহণ করা যায়, মানসিংহের দ্বিতীয়বার উড়িষ্যা অভিযানের পরে পঞ্চকোট গড় অধিকার করে নিয়েছিলেন হাম্বির। কারণ দ্বিতীয় অভিযান সংঘটিত হয়েছিল ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে, নভেম্বর মাসে।[৩২]

মুঘলদের প্রতি হাম্বিরের আনুগত্য আফগানেরা সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। মানসিংহ বিহারের যেতেই আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেছিলেন মল্লরাজ্য ও পুরীর মন্দির।[৩৩] মানসিংহের দ্বিতীয় অভিযান ছিল এই আক্রমন ও লুণ্ঠনের প্রত্যাঘাত হিসাবে।

কতদিন মল্লরাজ্যের অধীন ছিল পঞ্চকোট, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও কিছু কিছু ইংগিত বিদ্যমান। দ্বিতীয় অভিযানের পর দুবছরের মধ্যে উড়িষ্যা বিজয় সম্পূর্ণ করেছিলেন মানসিংহ (জানুয়ারি ১৫৯৩ খ্রী)। অবদমিত হয়েছিল আফগানেরা। ফিরে এসেছিল শান্তি। বীর হাম্বির মুঘল সৈন্যের সহযোগিতায় কিংবা নিজের বাহুবলে অধিকার করে নিয়েছিলেন পঞ্চকোট দুর্গ। অধিকার করার পর সংস্কার করেছিলেন দুর্গটির। লিপিদুটি ছিল তারই সাক্ষ্য।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সময় মানসিংহ ছিলেন আগ্রায়। আকবর মারা গিয়েছিলেন ১৫ অকটোবর ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে। সম্রাট হবার পর পক্ষকালের মধ্যে জাহাঙ্গীর মানসিংহকে পুনরায় পাঠিয়েছিলেন বাংলায়। প্রায় তিনবছর পরে পাকাপাকিভাবে তিনি আগ্রায় ফিরে গিয়েছিলেন। বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা থাকাকালে বীর হাম্বির তার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। ফলে বাঁকুড়া, পাঁচেট ও বীরভূম নিয়ে বিরাট এলাকা মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে তিনটি রাজ্যের হদিস পাওয়া যায়। বাঁকুড়া ও বীরভূম জুড়ে ছিল মল্লরাজ্য, রাজা বীর হাম্বির। পঞ্চকোট রাজ্য, অধিপতি শামস খান। পাঁচেটের দক্ষিণপূর্বে হিজলি রাজ্য, অধীশ্বর সলিম খান। তিনজনেই তৎকালীন বাংলার শাসনকর্তা ইসলাম খানের নামেমাত্র অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। তিনজন বড় জমিদার ছাড়াও আরও দুজন ছোট ছোট জমিদারের হদিস পাওয়া যায় মীর্জা নাথানের গ্রন্থে।

---

৩২. History of Bengal, vol-II, Dacca.

৩৩. Akbarnama, vol-III, P 934.

তারা ছিলেন চন্দ্রকোনার জমিদার বীরভান বা চন্দ্রভান এবং বরদা ও ঝাকরার (ঝাড়গ্রাম) জমিদার দলপত।

বিখ্যাত পীর সেখ সলিম চিস্তির পৌত্র সেখ আলাউদ্দিন, ইসলাম নামে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৩৪] নতুন সুবাদারকে প্রথমে মেনে নেননি পশ্চিমবঙ্গের জমিদারেরা। ফলে ইসলাম খান তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। বিনা যুদ্ধে সুবাদারের অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন হাম্বির।

অধীনতা মেনে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি হাম্বির, পূর্ব আনুগত্যের কথা স্মরণ করে ইসলাম খানের সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শামস খানের জমিদারী পাঁচেটে। বুঝিয়েসুঝিয়ে তাকে অধীনতা মেনে নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করারও চেষ্টা করেছিলেন। শামস খান সে কথায় কর্ণপাত করেননি, ইসলাম খানের সৈন্যের সঙ্গে পক্ষকালধরে দারুণ যুদ্ধ করেছিলেন। শেষে মুঘলবাহিনী দর্ণি (Darni) পাহাড় ঘিরে ফেললে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। হাম্বিরের মত বিনা যুদ্ধে অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন হিজলীর জমিদার সলিমখান।[৩৫]

মির্জা নাথানের বিবরণ থেকে বোঝা যায় শামস খানের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পাঁচেট পাহাড়ে ছিল না, ছিল দর্ণি পাহাড়ে। শিখরবংশের আধিপত্যও ছিল না পঞ্চকোট দুর্গে।[৩৬] পঞ্চকোট গড়ে পাওয়া উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্যে বোঝা যায় সে সময় দুর্গটির অধীশ্বর ছিলেন বীর হাম্বির। হাম্বির, শামস ও সলিম খানের বিরুদ্ধে ইসলাম খানের অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে। শেখ কামালের সঙ্গে আলাইপুরে গিয়ে তারা ইসলাম খানের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অধীনতা জ্ঞাপন করেছিলেন। ইসলাম খান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের জায়গীর। এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

---

৩৪. ইসলাম খান বাংলার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন মে, ১৬০৮। কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন জুন মাসে। তার আগেই জাহাংগীর সুবা উড়িষ্যাকে পৃথক করেছিলেন সুবা বাংলা থেকে। প্রথম সুবাদার ছিলেন হাশিম খান, ২৬ সেপটেমবর ১৬০৭ থেকে মে ১৬১১ খ্রী পর্যন্ত।

৩৫. Bahāristan-i-Ghaibi by Shitab khan (Mirzā Nathan), Eng tr by Dr. Borah, 1936.

৩৬. শিখরবংশের কুর্শিনামা অনুসারে পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন তখন দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্র শেখর (১৫৮৮-১৬২৪ খ্রী)। উপাধি নাম হরিনাম শেখর। পাদিশানামায় তাকেই বীরনারায়ণ নামে উল্লেখ করা হয়েছিল বলে দাবী জানান হয়েছে। এ দাবী সঠিক মনে হয় না।

ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বাংলার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন তার ভাই কাসিম খান। ইসলামের জীবিতকালে তিনি ছিলেন মুঙ্গেরের শাসনকর্তা। কাসিম ছিলেন অলস, অকর্মণ্য ও কলহপ্রিয়। দেওয়ান মির্জা হুসেন বেগের সঙ্গে তার কলহ দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। নতুন সুবাদারের অধীনতা স্বীকারে সম্মত ছিলেন না বাংলার জমিদারেরা। ফলে কাসিমকে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান পরিচালিত করতে হয়েছিল। হাম্বির ও শামস খানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি শেখ কামাল। অভিযানটি উদ্দেশ্য সাধনে সফল ছিল না। তেমনি সফল ছিল না হিজলি ও চন্দ্রকোনার জমিদারদের বিরুদ্ধে মির্জা মকির অভিযান। মির্জা মকি ছিলেন বর্ধমানের ফৌজদার ইফতিকার খানের পুত্র। হিজলির শাসনকর্তা ইতিমধ্যে বদলে গিয়েছিল। সলিমের জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বাহাদুর খান। দুটি অভিযানই পরিচালিত হয়েছিল ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে। জনশ্রুতি অনুসারে বীর হাম্বির মারা গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে, ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে। তার মৃত্যুর পর পঞ্চকোট দুর্গ কার অধিকারে ছিল খতিয়ে দেখা দরকার।

ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দ গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে হাম্বিরের উত্তরাধিকারী ছিলেন ধাড়ী হাম্বির। বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মন্দিরগুলির গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে হাম্বিরের পুত্র রঘুনাথ সিংহের নাম রাজা হিসাবে পাওয়া যায়।[৩৭] প্রথম যে মন্দিরটিতে নির্দিষ্ট হদিস পাওয়া যায় তার সময়কাল ১৬৫০ খ্রী।[৩৮] বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে রঘুনাথ সম্ভবত ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দেই মল্লরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন।

হাম্বিরের মৃত্যুর পর থেকে (১৬১৬ খ্রী?) প্রথম রঘুনাথ পর্যন্ত, মধ্যবর্তী সময়ে কে রাজা ছিলেন মল্লরাজ্যে? মন্দির লিপি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় প্রথম বীর সিংহের আধিপত্যের। ড. সুকুমার সেন অনুমান করেছিলেন ধাড়ী শব্দের অর্থ সর্দার (বা জ্যেষ্ঠ) বা প্রধান।[৩৯] বীর হাম্বিরের অনেকগুলি পুত্র ছিল।

---

৩৭. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, "উল্লেখযোগ্য মন্দিরলিপি" পৃ. ৪১০।

৩৮. বাদ্যনগরের মন্দিরলিপি। অবশ্য তার আগেকার যে তারিখ পাওয়া যায় সেটি বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে"...শ্রীবীর হম্বীর। নরেশ সুনন্দনো নৃপ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ॥ মল্ল সকে ৯৪৯। শ্রী রাজা বীর সিংহ।'—দ্রষ্টব্য, পাদটিকা ৩৭। মনে হয় ১৬৪৩ সালেই রঘুনাথ রাজা হয়ে গিয়েছিলেন।

৩৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ-সুকুমার সেন।

তাদের মধ্যে বড় সম্ভবত ধাড়ী হাম্বির নামে পরিচিত ছিলেন। তার ব্যক্তিগত নাম কি ছিল জানা যায়না। বীর সিংহ নিঃসন্দেহে উপাধি নাম। ১৬২২ খ্রী প্রথম বীর সিংহ মল্লেশ্বর মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন। বাসুদেবপুরের মন্দিরটিও (১৬২৬ খ্রী) সম্ভবত তারই তৈরি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে নির্মাতার নাম তুলে ফেলা হয়েছিল। ফলে নামটি নির্দিষ্টভাবে জানা যায়না। বীর সিংহ সম্ভবত পরে পঞ্চকোট অধিকার করেছিলেন এবং বীর নারায়ণ উপাধি ধারণ করেছিলেন। পাদিশানামায় (১৬৩২-৩৩ খ্রী) তারই উল্লেখ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরে (ওন্দা) বীর সিংহের জননী একটি মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন (১৬৫৪ খ্রী)। এ সময় বীর সিংহ জীবিত ছিলেন না। ফলে প্রতিষ্ঠা-লিপিটি প্রথম রঘুনাথ সিংহ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। পাদিশানামাতেও এ বিষয় সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বীরনারায়ণ ১৬৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে।

বীরসিংহের পর মল্লরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন রঘুনাথ সিংহ। পাঁচেট রাজ্যটিও তার অধিকারে এসেছিল। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর সহরটি তার সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মনে হয়। অবশ্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ অনুপস্থিত। রঘুনাথপুরের কাছাকাছি গদী বেড়োয় রঘুবর জীউয়ের মন্দির চত্বরে বিষ্ণুপুর ধাঁচের যে জোড়বাংলা মন্দিরটি জরাজীর্ণ অবস্থায় বিদ্যামান, সেটিও রঘুনাথ সিংহের সময়ে তৈরি হয়ে থাকতে পারে। এ মন্দিরটিও বিষ্ণুপুরে ঐ সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলির মত মাকড় পাথরে তৈরি। মানভূম জেলায় পঞ্চকোট পাহাড় ও গদী বেড়ো ছাড়া খুব কম জায়গায় বিষ্ণুপুরের মন্দির স্থাপত্যশৈলী অনুসৃত হয়েছিল দেখা যায়।

বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তী জানিয়েছেন[৪০] বীর হাম্বিরের সমসাময়িক শিখরভূমির রাজা ছিলেন হরিনারায়ণ। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষা নিতে চাইলে শ্রীনিবাস, ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে চিঠি দিয়ে আনিয়েছিলেন। সেই পুত্রই রামমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন হরিনারায়ণকে।[৪১] এ তথ্য সঠিক বলে মনে হয়না। কারণ, এক, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি-

---

৪০. ভক্তিরত্নাকর (নবম তরঙ্গ)—নরহরি চক্রবর্তী। চৈতন্যাব্দ ৪০২, বহরমপুর, ২য় সং।

৪১. 'শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ/আচার্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন ॥/ তেঁহো শিষ্য হইবেন শ্রীরাম-মন্ত্রেতে ।/ স্বাভাবিক প্রীতি তার শ্রীরামচন্দ্রেতে ॥ এবং 'রঙ্গ ক্ষেত্রে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র ছিল ।/ পত্রীম্বারে অতি শীঘ্র তারে আনাইলা ॥/ তেঁহো পঞ্চকুটে আসি স্নেহাবিষ্ট মনে ।/ রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে ॥/—ভক্তিরত্নাকর (নবম তরঙ্গ)।

রত্নাকর রচিত হয়েছিল আঠারো শতকের প্রথম পাদে[৪২], বীর হাম্বিরের প্রায় একশো বছর পরে। দুই, শিখরবংশের বংশাবলীতে হরিনারায়ণ উপাধিধারী কোন রাজাকে ১৫৮৮ থেকে ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যায় না। তিন, গদী-বেড়োর মোহান্তদের বিবরণ অনুসারে ত্রিমল্ল ভট্টের ভাই রঙ্গরাজ ভট্ট প্রথম পঞ্চকোট রাজাকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র নন। চার, প্রথম কোন রাজা দীক্ষা নিয়েছিলেন সে বিষয়েও গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান। পাঁচ, মোহান্ত হবার সময় মোহান্তেরা মহারাজের কাছে যে একরার দিতেন, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম লক্ষ্মণাচার্যের সম্পাদিত একরার, বাংলা সন ১২১৯ সালের ২৪শে বৈশাখ গরুঢ় নারায়ণের কাছে প্রদত্ত হয়েছিল। এসব তথ্যের ভিত্তিতে নরহরি চক্রবর্তীর বিবরণ প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায় না।

বীরহাম্বিরের সমসাময়িক বা কিছু পরে হরিনারায়ণ নামে রাজা ছিলেন চন্দ্রকোনায়। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায় লালজী মন্দিরটি তার স্ত্রী লক্ষ্মণাবতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪৩] হরিনারায়ণের ব্যক্তিগত নাম ছিল বীরভান। লক্ষ্মণাবতী ছিলেন সম্ভবত বীর হাম্বিরের কন্যা ও তৎকালীন মল্লরাজার বোন। বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবিতে এই বীরভানের কথা উল্লেখিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে মল্লরাজ হাম্বির কর্তৃক পঞ্চকোট দুর্গ অধিকৃত হবার পর শিখর রাজাদের হদিস অনেকদিন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে বা তার কিছু আগে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত বা বিন্যস্ত হয়েছিল কাশীপুরের রাজবংশটি। এ সময় সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষও নতুন অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের দিকে অজ্ঞাতভাবেই অগ্রসর হয়ে চলেছিল।

---

৪২. সুকুমার সেন-বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, পৃ ১৮০।

৪৩. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৪১১.

ছ. রাজা বদল :

নতুন দিনের সূচনা

"Times are since altered, the King is now dependent on our Bounty, his whole hopes of protection and even subsistence rest upon us."
—Select Committee to Lord R. Clive (21.6.1765).

ইংরেজ আমলের নথিপত্রে পঞ্চকোট রাজ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু সুস্পষ্ট হদিস পাওয়া যায়। পঞ্চকোট ইংরেজি কায়দায় হয়ে উঠেছিল পাঁচেট। রাজা টোডর মলের[১] (১৫৮২ খ্রী) রাজস্ব খতিয়ানে উড়িষ্যা ছিল পাঁচটি সরকারে বিভক্ত। সরকারগুলি ভেঙ্গে ও পুনর্বিন্যস্ত করে পরবর্তীকালে ১৯টি সরকার গঠিত হয়েছিল। পরগণা ৬৮২টি। সরকার মদারুণ বা মান্দারণ ছিল উনিশটির মধ্যে একটি। সরিফাবাদ ও সেলিমাবাদ সরকার দুটির সীমান্ত জুড়ে ছিল সরকার মদারুন। সেটি অর্ধ-গোলাকারে বেষ্টন করেছিল বীরভূম থেকে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদীর সঙ্গমস্থল মঙ্গলঘাট পর্যন্ত। বিষ্ণুপুর ও পাঁচেট ছিল এই এলাকার বাইরে। সেখানকার রাজারা তখনও পর্যন্ত অধীনতা স্বীকার করেননি মুঘলদের। হুগলী নদী ছিল মুঘল সাম্রাজ্য ও স্বাধীন রাজাদের এলাকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখা। উভয় দিক থেকে সহসা বা অতর্কিত আক্রমণের প্রতিবন্ধক।[২]

---

১. Ausil Toomar Jumma as settled in behalf of the Mughal Emperor Akbar about the year 1582 by Raja Toorel Mull etc—Appendix to the Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons etc Edited by W. K. Firminger vol-II, (1917), P 178-179.

২. Fifth Report, P 179.

সুজার শাসনকালে সরকার মদারুণের পশ্চিমাঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অধীন হয়েছিল পাঁচেট, বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রকোনা রাজ্য। তিনটি রাজ্যই পেশকুশ বা নির্দিষ্ট খাজনা পাঠাত সম্রাটের দরবারে।

আঠারো শতকের প্রথম দিকে (১৭২৮ খ্রী) 'জমা তুমারি তেশখের' বা বাংলার সংশোধিত রাজস্ব খতিয়ান অনুযায়ী ২৫টি এতসম বা জমিদারী ট্রাস্ট সৃষ্ট হয়েছিল। পাঁচেট ছিল তাদের মধ্যে পঞ্চদশতম। জমিদারীটি ছিল বেশ বড়, জমিদার গরুঢ়নারায়ণ।[৩] পাঁচেটের দুটি মাত্র পরগণা ইংরেজ অধিকারে এসেছিল।

শাহজাহানের সময় পাঁচেট ছিল সুবা বিহারের মধ্যে। শুধু বিহারের একাংশ জুড়েই পাঁচেট রাজ্যটি সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেকগুলি মহল ছিল উড়িষ্যায় অন্তর্গত। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আলাদা আলাদা সুবা ছিল তিনটি। সুজার সময় তিনটি সুবাই এক শাসনকর্তার অধীনে আনা হয়েছিল। যেহেতু সুজা প্রধানত ছিলেন বাংলার সুবাদার, অপর দুটি সুবা স্বভাবতই বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[৪] এ ব্যবস্থা সামান্য অদলবদল করে ব্রিটিস আমলের প্রথমদিক পর্যন্ত বজায় ছিল।

সতের শতকের শেষদিকে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে মুঘল শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দুর্বল কাঠামোটিকে সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন চিতুয়া—বরদার জমিদার শোভা সিংহ।[৫] সেই ঢিলেঢালা প্রশাসনের মধ্যে কাশীপুর রাজবংশটির উদ্ভব ঘটেছিল বলে মনে হয়। এর আগেই, শাহজাহানের অসুস্থতার প্রারম্ভে,

---

৩. Pacheet, the large and most westerly Zemindary of Bengal, on the same parallel with the foregoing, but rather more productive in all the necessaries of life…being imperfectly reduced,…of the name of Goorp Narrain, was at first in great past only subject to fixed peshcush on account of…pergunnahs 2…rated at 28,203.—Fifth Report P198.

৪. উড়িষ্যা মুঘলদের দ্বারা বিজিত হবার পর প্রথমদিকে বাংলা থেকেই শাসিত হত। জাহাঙ্গীরের সময় প্রথম সুবাদার নিয়োজিত হন উড়িষ্যায়, নাম হাসিম খান, ২৬ সেপটেম্বর ১৬০৭—২৪ মে ১৬১১ খ্রী। সুজা উড়িষ্যার সুবাদার হয়েছিলেন মে ১৬৪২ খ্রী, পুনরায় জুলাই ১৬৪৮। বিহারের সুবাদার—জুলাই ১৬৫৮।

৫. শোভাসিংহের বিদ্রোহ, ১৬৯৫-১৬৯৬ খ্রী। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ১১৮-১২১।

তার ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকারের দাবী নিয়ে যে সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল, বাংলার কাছাকাছি সে সংঘর্ষের মূল ক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ পূর্ব বিহার। প্রধানত পালামৌ, রাজমহল, মুঙ্গের, বীরভূম ও ছোট নাগপুরের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চল। কারণ শাহজাহানের পুত্র সুজার অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল রাজমহলে।

সুজার বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়েছিল, সাহজাদা মুহম্মদ সুলতান নামে মাত্র অধিনায়ক ছিলেন সে বাহিনীর। প্রকৃত নেতৃত্বে ছিলেন মীর জুমলা। মীর জুমলা বীরভূমের জমিদার খাজা কামাল আফগানের সহায়তা লাভ করেছিলেন। পাঁচেট জমিদারীর একাংশ তখন খাজা কামালের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬]

মুঘল বাহিনীর অন্তর্কলহের প্রধান ধাক্কা গিয়ে পড়েছিল রাজমহল, পালামৌ ও মুঙ্গের অঞ্চলে। এ অঞ্চলে, বিশেষত রাজমহল ও পালামৌয়ের অরণ্যময় পার্বত্যপ্রদেশে বসবাস করতেন অনেকগুলি উপজাতি। চের, কোল, মুণ্ডা, খারওয়ার প্রভৃতি। এদের ভেতর চেরেরা ছিলেন প্রধান। দীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলের শাসনকর্তা। দুই পক্ষের লক্ষ লক্ষ মুঘলসৈন্যের ক্রমাগত অভিযান তাদের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। উপজাতিগুলি দক্ষিণদিকে সরতে সুরু করেছিলেন। জলস্রোতের মত বিপুল জনপ্রবাহ অজয়, বরাকর ও দামোদরের দক্ষিণে নতুন করে জনবসতি গড়ে তুলেছিল।

জনস্রোতের প্রধান প্রবাহটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল কোল উপজাতিদের দ্বারা। তারা একে একে অধিকার করে নিয়েছিলেন বাগমুণ্ডি, বেগুনকোদর ও জয়পুর।[৭] পঞ্চকোটের পরিত্যক্ত দুর্গটিও সম্ভবত অধিকৃত হয়েছিল।

জনশ্রুতি আশ্রিত পঞ্চকোটের ইতিহাসে দেখা যায়, গরুড়নারায়ণ ছিলেন পঞ্চকোটের রাজা। তার ব্যক্তিগত নাম ছিল শত্রুঘ্নশেখর। প্রজাদের কাছে

---

৬. অপরাংশ ছিল মল্লরাজ্যের অন্তর্গত। Sterling এক অজ্ঞাত উৎস থেকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিলেন সাতটি কিল্লাজাত মহলের সর্দারেরা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন (১৫৯২ খ্রী)। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল বিষ্ণুপুর। মানভূম ছিল বিষ্ণুপুর জমিদারীর অন্তর্গত— History of Orissa, vol—II, RD Banerjee, P 24.

৭. জনশ্রুতি অনুসারে বাগমুণ্ডি অধিকার করেছিলেন জগৎ সিং, বেগুনকোদর অর্জুন সিং এবং জয়পুর-নারায়ণ সিং। তিনজনেই ছিলেন কোল উপজাতির মানুষ।

জটল্যা গরুঢ়নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। সংক্ষেপে বলা হত জটা রাজা। এ প্রসঙ্গে বেগলারের মন্তব্য স্মরণীয়।[৮]

শত্রুঘ্নশেখরের বাবার নাম ছিল বাঁকেড়া রায়। তিনি রাজা ছিলেন না। পিতামহ বলভদ্রশেখর ছিলেন রাজা। তিনি প্রথম রামমন্দ্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন বলে কথিত। মানভূমের কাছাকাছি জমিদারীগুলির মধ্যে নয়াগ্রাম জমিদারীতে এক বলভদ্র সিংহের নাম পাওয়া যায়। দাঁতন থেকে ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে চন্দ্ররেখ গড়ের নির্মানকার্য তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। পরবর্তী-কালে দুর্গটি মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের অধিকারে গিয়েছিল। গড়টি এখনও বিদ্যমান। গড়টির ভেতরে নীল পাথরে দুটি অদ্ভুত মূর্তি আছে, ঘোড়ার পিঠে একজন নারী ও পুরুষ। মানভূমে অনেক মন্দিরের সামনে এ ধরণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। মূর্তিগুলি বেশী প্রাচীন নয়।[৯]

নয়াগ্রামের জমিদার পরিবারটি সম্ভবত পরবর্তীকালে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কারণ বলভদ্রের বংশধর রাজা চন্দ্রকেতু স্বপ্নে শিবের মন্দির তৈরি করিয়ে দেবার জন্য রামচন্দ্রের নির্দেশ পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। চন্দ্ররেখ গড় থেকে ১ মাইল পূর্বে রামেশ্বরনাথ শিবের মন্দির তৈরি হয়েছিল। সে মন্দির এখনও বিদ্যমান। অপর একটি বিশাল গড়ও তৈরি করিয়েছিলেন চন্দ্রকেতু। গড়টিও জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়ে গেছে। এই বংশের কোন সন্তানের পক্ষে পাঁচেটে এসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়।

স্বর্গত বিনয় ঘোষ অনুমান করেছিলেন বর্ধমানের অমরাগড়ের রাজা মহেন্দ্রের রাজ্য এক সময় কাটোয়া থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। সে বংশের কোন সন্তানের পক্ষেও পরবর্তীকালে একটি রাজ্য গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। মহেন্দ্র ছিলেন গোপ রাজা। পাঁচেটের রাজবংশটিও গোপ-সন্তান থেকে উদ্ভূত

---

৮. "...when he (the child—author) grew up, the people made him Manjhi (chief of a clan or village) and finally in want of a King, determined to elect him, and he was accordingly elected King of pargana Chaurasi (Sikharbhum) ; they built him the Pânchet fort and named him Jata Raja."—Beglar

৯. "Similar Stones with rude Carvings of horsemen and attendants are found before temples in Manbhum district, and are of no great age." Gazetteer of the Midnapore District—L. S.S O' Malley.

হয়েছিল বলে মনে হয়। অবশ্য এ দুটি অনুমানের স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

আঠারো শতকের প্রথম অর্ধে পাঁচেট রাজ্যের আয়তন ছিল ২,৭৭৯ বর্গ মাইল। গরুড়নারায়ণের শাসনকালে (১৭২৮-৪৩ খ্রী) আলিবর্দী গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার মসনদ অধিকার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ অধিকৃত হয়েছিল ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। পরের বছর জানুয়ারি মাসে বিজিত হয়েছিল উড়িষ্যা। এ সময় অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বর্গীর আক্রমণ।[১০]

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রী) মারাঠা শক্তি ভারত জুড়ে প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। বাজী রাও সাহুজীকে জানিয়েছিলেন, 'মরা গাছটির (মুঘল সাম্রাজ্য) গোড়ায় যদি আমরা আঘাত করি, ডালগুলো আপনিই ভেঙ্গে পড়বে। কৃষ্ণা থেকে সিন্ধু পর্যন্ত উড়বে মারাঠা নিশান।'[১১] মারাঠাদের স্বপ্নে ইন্ধন যুগিয়েছিল নাদির সাহের অভিযান (১৭৩৯ খ্রী)।

মারাঠা সম্রাট সাহু ছিলেন দুর্বল। রঘুজী ভোঁসলাকে পূর্বদিকে, বাংলাসহ চৌথ আদায়ের অধিকার দিয়েছিলেন।[১২] রঘুজী ছিলেন নাগপুরের স্বাধীন রাজা। প্রধানমন্ত্রী ভাস্কররামের সঙ্গে পরামর্শ অনুযায়ী ১৭৪১ সালে নভেম্বর মাসে ৪০ হাজার সৈন্যসহ বাংলার দিকে যাত্রা করেছিলেন। রামগড়ের ভেতর দিয়ে এসে লুণ্ঠন করেছিলেন পাঁচেট। পাঁচেটে বর্গীর আক্রমণের আংশিক বিবরণ পাওয়া যায় গঙ্গারামের 'মহারাস্ত্রপুরাণে'। গঙ্গারাম লিখেছেন নাগপুর থেকে তারা এসেছিলেন পঞ্চকোটে।

গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ যত
নাগপুর আসি উপনিত।
সেখানে ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত।

---

১০. বাঁকুড়া জেলায় বর্গীর আক্রমণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য পৃ ১২২-১২৯।

১১. Later Mughals—William Irvine—vol II, Calcutta 1922, P 165,

১২. "...the Subahas of Lucknow, Maksudabad, Bundelkhand, Allahabad, Patna, Dacca and Bihar were made over as Ragheji's field of activity."—New History of Maratha by G S. Sardesai, vol-II, P 208.

ডাক দিয়া দূতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি দূত চলে সিগ্রগতি
নবাব আছে জেইখানে॥[১৩]১০০

সেবার পরাজিত হয়েছিলেন ভাস্কর। আলিবর্দীর জামাই জৈনুদ্দিন ছিলেন তখন বিহারের ডেপুটি গভর্নর। এই জৈনুদ্দিনই ছিলেন সিরাজদৌল্লার পিতা। জৈনুদ্দিন ও পূর্ণিয়ার ডেপুটি সইফ খান সফলভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন বর্গীর অভিযান। চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত বিতাড়িত করে নিয়ে গিয়েছিলেন (ডিসে. ১৭৪২ খ্রী) মারাঠা বাহিনীকে।

পরের বছর মার্চ মাসে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলে স্বয়ং এসেছিলেন ভাস্কররামের সঙ্গে। তার আগেই দিল্লীর বাদশাহের আহ্বানে ফেব্রুয়ারি মাসে এসেছিলেন পেশোয়া বালাজি রাও। অঙ্গীকার করেছিলেন বাংলা থেকে সবলে উৎখাত করবেন রঘুজীকে। রঘুজী কাটোয়ায় ফেলেছিলেন শিবির। বাদশাহের সঙ্গে পেশোয়ার অঙ্গীকারের কথা শুনে কাটোয়া থেকে শিবির তুলে গিয়েছিলেন বীরভূমে। পেশোয়া সেখানেই তাকে আক্রমণ করেছিলেন। ফলে মানভূমের ভেতর দিয়ে রঘুজী পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সম্বলপুরে। পেশোয়া তাকে অনুসরণ করেছিলেন পাঁচেটের ভেতর দিয়ে, শেষে ফিরে গিয়েছিলেন পুনায়।

দুই মারাঠা বাহিনীর অভিযানে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল মানভূমের জনজীবন। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি উচ্ছন্ন হয়েছিল, লুণ্ঠিত হয়েছিল ঐশ্বর্য। নতুন এক জনগোষ্ঠীর উদ্ভব সূচিত হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসী ও মারাঠাদের সংমিশ্রণে। এই জনগোষ্ঠী এখনও পুরুলিয়ায় প্রধান জনগোষ্ঠী হিসাবে বিদ্যমান। প্রথম আক্রমণ থেকে সুরু করে প্রায় আট বছর ধরে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে মারাঠাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশেষে বাংলার নামে মাত্র অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে উড়িষ্যা পরিণত হয়েছিল মারাঠাদের সামন্ত রাজ্যে (১৭৫২ খ্রী)। যে পথ ধরে মারাঠাদের আক্রমণ পরিচালিত হত, পরবর্তীকালে সেই পথ ধরেই পরিচালিত হয়েছিল সন্ন্যাসীদের অভিযান। পশ্চিমবাংলায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বলতে কিছুই ছিল না।

---

১৩. মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব।—গঙ্গারাম, সবাব্দা ১৬৭২ (১৭৫০ খ্রী)।

দ্বিতীয় বর্গীয় আক্রমণের সময় সম্ভবত পঞ্চকোটের রাজা জটল্যা গরুড়-নারায়ণের মৃত্যু হয়েছিল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে অন্তর্কলহের সৃষ্টি হয়েছিল পঞ্চকোটের রাজ পরিবারে। এই অন্তর্কলহে মারাঠারাও অংশ নিয়েছিল বলে মনে হয়। শত্রুঘ্নশেখর বা জটল্যা গরুড়নারায়ণের বড় ছেলে ভীষ্ম বা ভীখমলাল পিতার জীবিতকালেই মারা গিয়েছিলেন।[১৪] ভীখমলালের জ্যেষ্ঠপুত্র মণিলাল তখন নাবালক। শত্রুঘ্নশেখর মণিলালকে নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন বলে জনশ্রুতি।

মণিলালের মায়ের নাম ছিল অলকানন্দা দেবী। তার পিতা ভীখমদেও কর্ণাট দেশের সামন্ত রাজা ছিলেন কথিত হয়। পুত্রের সঙ্গে ভীখমদেওয়ের কন্যার বিয়ে দিয়ে শত্রুঘ্নশেখর তাকে ৮৪ টি মৌজা ও ডুমুরকলা গ্রামে বাসভবন তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। পঞ্চকোট জমিদারীর উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে ভীখমদেও ও তার পুত্র গোপালদেওয়ের অনেকখানি ভূমিকা ছিল। গৃহবিবাদের সময় মণিলাল প্রথমে শিয়ালডাঙ্গা গ্রাম ও পরে ছাতনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ছাতনায় রাজা ছিলেন তখন বিবেকনারায়ণ।[১৫]

আশি বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন আলিবর্দী। ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল, ভোর ৫ টায়। মৃত্যুর আগে একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যু বুক ভেঙ্গে দিয়েছিল। বিকারের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন প্রায় তিন মাস। সিরাজদৌল্লাকে ডেকে বলেছিলেন, 'মৃত্যু এগিয়ে আসছে, যৌবনের শক্তি বার্ধক্যের দুর্বলতা ঘুচিয়ে দিক। আল্লার দোয়ায় তোমার জন্য এক সমৃদ্ধ রাজ্য রেখে যাচ্ছি আমি। শাসকের শুভেচ্ছা দৃঢ় করে তুলবে শাসনের বনিয়াদ। যদি হিংসা ও ক্রুরতার আশ্রয় নাও শুকিয়ে যাবে সমৃদ্ধির গুলবাগ।' মৃত্যুর এক বছর আড়াই মাসের মাথায় সে ভবিষ্যৎ বাণী অদ্ভুতভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল। ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মুসলমান শাসনের শেষ রশ্মিটুকু নিভে গিয়েছিল বাংলায়। সূচিত হয়েছিল এক নতুন যুগের অভ্যুদয়। বাংলার হাত ধরে সমগ্র ভারত একটু একটু করে এগিয়ে এসেছিল আধুনিক যুগের প্রাণস্পন্দনে।

---

১৪. শত্রুঘ্নশেখরের ৪ জন মহিষী ও ১২ পুত্র ছিল। প্রথম রানীর ৪ পুত্র, যথা (১) ভীষ্ম বা ভীখমলাল (২) ফতেলাল (৩) প্যারীলাল ও (৪) কানাইলাল। দ্বিতীয় রানীর ১ পুত্র অনন্তলাল। তৃতীয় রানীর ৫ পুত্র, যথা (১) আনন্দ (২) মোহন (৩) জগমোহন (৪) ব্রজমোহন ও (৫) শ্যামলাল। চতুর্থ রানীর ২ পুত্র, যথা, (১) কাঞ্চন ও (২) কুঞ্জলাল।

১৫. পরিশিষ্টে 'মানভূম ও পুরুলিয়ার ঐতিহাসিক সূত্র' দ্রষ্টব্য।

আলিবর্দীর মৃত্যুর আগেই বিদেশী বণিক গোষ্ঠীগুলি বাংলায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী ছিল ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানি। আলিবর্দীর আমলেই ক'লকাতাকে কেন্দ্র করে তারা তাদের বাণিজ্যের অধিষ্ঠানক্ষেত্রটি সাজিয়ে তুলেছিল। শেঠ বসাকদের একদা ব্যাপারীর গঞ্জটি ইংরেজদের স্বার্থে একটু একটু সহরে চেহারা নিতে সুরু করেছিল। তৈরি হয়েছিল দুর্গ ও পরিখা। হুগলী—ভাগীরথীর নদীতটে জাহাজ চলাচলেরও কমতি ছিলনা।

পলাশীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার তাড়নায়। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিলনা তার পেছনে। যুদ্ধের ফলাফল ভারতে ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে নতুনভাবে সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের নবাবের রাজকোষে হঠাৎ পাওয়া অতুল ঐশ্বর্য।

নবাবীর দাম হিসাবে মীর জাফর ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা বা চব্বিশ পরগণার জমিদারী দান করেছিলেন।[১৬] মীরজাফরকে সরিয়ে কোম্পানি যখন মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসিয়েছিল, আর্থিক উপঢৌকন ছাড়াও বিরাট এলাকা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এবার শুধু জমিদারী স্বত্ব ছিলনা, সমগ্র এলাকা পুরোপুরি কোম্পানির প্রশাসনের আওতাভুক্ত হয়েছিল। তিনটি চাকলা নিয়ে গঠিত ছিল সেই এলাকা। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম।[১৭]

চাকলা মেদিনীপুরের মধ্যে বর্তমান পুরুলিয়া ও অধুনালুপ্ত মানভূম জেলার অনেকাংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষত বরাভূম ও মানভূম পরগণা। প্রকৃতপক্ষে মানভূম জেলা দুটি প্রাচীন রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত ছিল। কাঁসাই বা কংসাবতী নদী ছিল রাজ্য দুটির সীমারেখা। স্থূলভাবে কাঁসাইয়ের উত্তরে ছিল পাঁচেট বা পঞ্চকোট রাজ্য, দক্ষিণে বরাভূম রাজ্য। কাঁসাইয়ের দক্ষিণাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কোমপানির প্রশাসনের। বরাভূম পরগণার এলাকা ছিল তখন ৬৪২

---

১৬. জমিদারীটি দান করা হয়েছিল ২০ ডিসেমবর ১৭৫৭। মোট পরগণার সংখ্যা ছিল ২৪টি। ফলে, নাম হয়েছিল ২৪ পরগণা। আয়তন ৮৮২ বর্গ মাইল।

১৭. ২৭ সেপটেমবর ১৭৬০। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ১৩২—১৩৫।

বর্গমাইল এবং মানভূমের ২৫৮ বর্গমাইল। পাতকুম ও বাগমুণ্ডি ছিল রামগড় রাজার অধীন।[১৮] পাণ্ড্রা ছিল বীরভূম জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ও গৃহবিবাদের ফলে পঞ্চকোটে তখন স্বীকৃত রাজা বলতে কেউ ছিলেন না। দ্বিতীয় রাণীর একমাত্র পুত্র অনন্তলাল মুর্শিদাবাদে নবাবের অনুগ্রহ লাভে সফল হয়েছিলেন। নবাবী সনদ ও নবাবী সৈন্যের সহায়তার পরিবর্তে এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ইস্ট ইনডিয়া কোমপানিকে।[১৯] গৃহযুদ্ধে সাফল্য লাভ করার পরেই নিহত হয়েছিলেন গুপ্ত ঘাতকের হাতে। উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি পুনরায় অমীমাংসিত হয়ে উঠেছিল।

বাংলার মসনদেও স্থায়িত্ব ছিলনা নবাবীর। ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফেরার কিছু দিনের মধ্যেই আচমকা বদলে গিয়েছিল বাংলার নবাব। মীরজাফরের বদলে কোমপানির কর্তৃপক্ষ মীরকাশিমকে বসিয়েছিলেন মসনদে। প্রশাসনের দিক থেকে মীরজাফরের মত ঢিলেঢালা ছিলেন না মীরকাশিম। বাণিজ্যের শুল্ক আদায় নিয়ে প্রথম থেকেই ইস্ট ইনডিয়া কোমপানির সঙ্গে তার বিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিহারের জমিদারেরা না মীরকাশিম না কোমপানি কারও অধীনতা মেনে নিতে সম্মত ছিলেন না। উভয়ের আধিপত্য ঘুচিয়ে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিলেন তারা।[২০] রামগড়ের রাজার আশ্রয়ে গিয়ে সব বিদ্রোহী জমিদারেরা সমবেত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন খড়কপুরের রাজা মুজাফর আলি, পাঁচেটের রাজা রঘুনাথ নারায়ণ, নরহাট ও সাময়ের জমিদার কামগার খান এবং বীরভূমের জমিদার বাদেকল রাম খান।

শক্তির দম্ভ মীরকাশিমের কাছে ইংরেজদের অসহ্য করে তুলেছিল। দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গিয়ে মারাঠাদের সহায়তায় নবাব কোমপানির কর্তৃত্ব উচিছন্ন করতে চান বলে আশংকা করেছিল কোমপানি। পাঁচেটের কাছে তাকে প্রতিহত করার জন্য নির্দেশ

---

১৮. সম্ভবত নয়াগড়, কাতরাস, ঝরিয়া এবং টুণ্ডিও ছিল রামগড় রাজার অধীন।—Bengal District Gazetters, Manbhum by H. Coupland, P 55.

১৯. Selections from Unpublished Records of the Govt—Rev. J. Long, No 569.

২০. Proceedings of the Indian Historical Records Commission, 1942.

দেওয়া হয়েছিল মেজর এডামসকে।[২১] কোমপানির সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকে চলেছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে মুঙ্গেরে বসবাস সুরু করেছিলেন নবাব। সুরু হয়েছিল মুখোমুখি সংঘর্ষও। বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে মীরকাশিম ইস্ট ইনডিয়া কোমপানি ও দেশীয় বণিকদের এক করে দিয়েছিলেন। ইংরেজরা এই ঘোষণা যুদ্ধের ইংগিত বলে গ্রহণ করেছিলেন। অতর্কিতে পাটনা অধিকার করে নিয়েছিলেন মি. এলিস। পুনরায় পাটনা অধিকার করে সেখানকার সমস্ত ইংরেজ বন্দীদের নিহত করেছিলেন মীরকাশিম। ফলে নবাব বদল অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। রোগগ্রস্ত মীরজাফরকে টেনেটুনে এনে ফের বসানো হয়েছিল মসনদে।[২২] অপসারিত নবাবের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া প্রতিকার বিধানের আর কোন পথ খোলা ছিল না। অস্ত্র হাতে মীরকাশিম ইংরেজদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীরকাশিম শেষে উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন মুঙ্গের। সেখান থেকে পাটনা।

পাটনা পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্য তাকে তাড়া করে গেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন অযোধ্যায়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ছিলেন সেখানে। শেষবার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বুঝিয়ে সুঝিয়ে শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলাকে রাজী করিয়েছিলেন। দুই পক্ষে সৈন্যবল বিন্যস্ত হয়েছিল। একদিকে তিন মৈত্রী, শাহ আলম, সুজা-উদ-দৌলা ও মীরকাশিম। অন্যদিকে মেজর মানরোর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্য। ২৩ অকটোবর ১৭৬৪ বকসারে দুই পক্ষ চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখি হয়েছিল। বিজয়লক্ষী জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজদের কপালে। পলাসীর যুদ্ধে ব্রিটিশ তরবারির শক্তিমত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাণিজ্যিক স্বার্থে বিজিত হয়েছিল বাংলা। বকসারের যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের প্রথম ইঁটটি রক্ত দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। বাংলা ছাড়িয়ে ভারতে তা প্রসারিত হবার

২১, Pachete hill is near the Barakur beyond Raniganj···The hill is in a Commanding position and Mir Kasim Ali was suspected of intending to retire to the Deccan, Major Adams was ordered to march there to intercept him.—Select Committee's, Proceedings, October 8, 1761. Long No. 569. footnote.

২২. মি-এলিস অতর্কিতে পাটনা দখল করেছিলেন ২৪ জুন ১৭৬৩। মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাব করা হয়েছিল ৭ জুলাই ১৭৬৩।

সূচনা দেখা দিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাংলার নবাব নির্ধারিত করতে সুরু করেছিল কোমপানি, বকসারের যুদ্ধের ফলে গোটা ভারতের সম্রাট নির্ধারণ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল।[২৩] সম্রাট শাহ আলমও ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

দ্বিতীয়বার গভর্নর হয়ে ক্লাইভ বাংলায় এসেছিলেন ১৭৬৫ সালের মে মাসে। সে বছরেই ১২ আগসট দিল্লীতে ক্লাইভের টেনটে আর একটি দূরপ্রসারী নাটক অভিনীত হয়েছিল। হীরে জহরতে সাজান সুবিখ্যাত বাদশাহী তখ্‌ত রাখা হয়েছিল একটি ডাইনিং টেবিলে। একদা সুবিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ছায়ামাত্র, হতভাগ্য সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম তাতে বসে ফারমান পড়েছিলেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী চিরস্থায়ী স্বত্বে দেওয়া হয়েছিল ইস্‌ট ইনডিয়া কোমপানিকে। পরিবর্তে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা সাম্রাটকে দেবার অঙ্গীকার করেছিল কোমপানি। গাধার মত একটি ভারবাহী পশু বা একটি গরুর মাথা বেচতে যত সময় লাগে তার চেয়েও কম সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল বেচাকেনা।[২৪] দশ বছর আগেও যা ছিল কোন ইংরেজের কাছে পাগলের উদ্ভট কল্পনার মত, পরিণত হয়েছিল দৃঢ় বাস্তবে।

দেওয়ানি বলতে কি বোঝাত তখন? দেওয়ানি পাবার পর ৩০ সেপটেমবর ক্লাইভ সে সম্পর্কে কোর্ট অব ডাইরেকটরসের কাছে লিখেছিলেন, 'I mean the dewanee which is the Superintendency of all the lands and the Collections of all revenues of the provinces of Bengal, Bihar and Orisa." দেওয়ানি বলতে ভ্যানসিটার্ট বুঝেছিলেন, সুবার দ্বিতীয় কর্মকর্তা বা দেওয়ান। যার প্রধান কাজ রাজস্ব আদায় ও ভূ-সম্পত্তির তদারকি। দিল্লী বা সম্রাট কর্তৃক তিনি নিয়োজিত, এবং নাজিম বা নবাবের মতই নিজস্ব এক্তিয়ারে স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যে দেওয়ান বলতে বোঝাত অর্থ-

---

২৩. বকসারের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় শাহ আলম বেনারস থেকে মেজর মানরোর কাছে কোম্পানির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, মানরো তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'I will write to the Gentlemen of Council, and will act agreeably to their Directions. By the blessing of God we will put your Majesty in possesion of the throne of Hindusthan."—Bengal: Past and Present, 1951. vol LXX.

২৪. Siyar-ul-Mutakherin—Ghulam Husain, vol—III, P 9.

দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ, তিনি সুবার রাজস্ব বিষয়ের জন্য দায়ী থাকতেন। কখনও কখনও দেওয়ানি মামলাও পরিচালনা করতেন।[২৫]

দেওয়ানি লাভের সময় বিহারের পাটনা ও গয়া ছিল মুসলমান শাসনাধীন সুবা বিহারের অন্তর্গত। তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল সেই এলাকা :

পাটনা বিভাগ—গয়া, সাহাবাদ, মুজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, সরণ ও চমপারণ। মুজফ্‌রপুর ও দ্বারভাঙ্গা মিলিয়ে ছিল প্রাচীন তিরহুট জেলা।

ভাগলপুর বিভাগ—মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্নিয়া, মালদা ও সাঁওতাল পরগণা। ছোটনাগপুর বিভাগ—হাজারিবাগ, লোহারডাঙ্গা, মানভূম ও সিংভূম।

উড়িষ্যার মধ্যে দেওয়ানির পরিধি পরিব্যাপ্ত ছিল সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত। অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একাংশে।[২৬]

দিল্লীর দরবার এর আগে তিনবার কোমপানিকে সুবা বাংলার দেওয়ানি উপহার দিতে চেয়েছিল[২৭] তিনবারই প্রত্যাখ্যান করেছিল কোমপানি। আশংকা ছিল বাংলার নবাবের চোখে সন্দেহের রেখা ফুটে উঠবে, বিষিয়ে যাবে সম্পর্ক, বিঘ্নিত হবে বাণিজ্য। অবস্থার বদল ঘটে গিয়েছিল দ্রুত। ভারতের সম্রাট ঘরছাড়া ভবঘুরের মত আশ্রয়হীন, বাংলার নবাব নাবালক, অযোধ্যা ইংরেজদের মুখাপেক্ষী, আফগানদের দখলে দিল্লী। ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোটি কেবল যে নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল তাই নয়, একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সেই ধূলোর মধ্যে ইংরেজরা প্রোথিত করেছিল তীক্ষ্নধার তরবারি, ভারতবাসীর রক্তরক্ষণের জন্য যা পরবর্তী দুশো বছর ধরে বার বার উত্তোলিত হয়ে উঠেছিল।

অতি দ্রুত ও নিঃশব্দে প্রকৃত রাজশক্তির হস্তান্তর ঘটে গিয়েছিল ভারতে। এত বড় একটি ঘটনা ঘটতে যতখানি রক্তপাতের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল যতখানি ত্যাগ, যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া, তার কোন কিছুই ভোগ করেনি ভারতবাসী। যা দেবার ছিল, না দেবার ফলে, শতাব্দীকাল ধরে দফায় দফায় পরিশোধ করতে হয়েছিল ঋণ। কখনও রক্তের অঞ্জলি দিয়ে, কখনও

---

২৫. History of Bihar—Shree Govind Misra, New Delhi, 1970.

২৬. S. G. Misra, P 135.

২৭. ১৭৫৮, ১৭৬১ ও ১৭৬৪ সালে।

অবমাননায়, কখনও মনুষ্যত্বের বিপরীতমুখী নির্যাতনে। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীরা রক্তের অঞ্জলি নিয়ে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। প্রায় নব্বই বছর ধরে ক্রমাগত ক্ষরণ করে চলেছিলেন শোণিত। সে ইতিহাস এখনও উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে গ্রথিত হয়নি। সংযুক্ত হয়নি ভারতের জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়।

জ. অরণ্যে আগুন ও রক্ত

"Sword which gave us the dominion of Bengal must be the instrument of its preservation."

—Warren Hastings to Sir Robert Barkar.

বাংলায় বৃটিশ শক্তির কাছে দেওয়ানি লাভ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাজস্ব আদায় ছাড়াও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তিনটি সুবা সামরিক শক্তি দিয়ে রক্ষা করার অধিকার অর্জন করেছিল কোমপানি। বিনা খাজনায় লাভ করেছিল কলকাতা। নবাব ছিলেন নাবালক, ফলে নায়েব সুবাদার নিয়োজিত হয়েছিল কোমপানি। আদায় ও নিয়ন্ত্রণ করতে সুরু করেছিল শুল্ক, বাণিজ্যিক ব্যাপারে হয়ে উঠেছিল সর্বেসর্বা।

অভ্যন্তরীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রথমদিকে ছিল অপারিবর্তিত। মুঘল আমলের প্রশাসনিক কাঠামোটি বজায় ছিল। বড় বড় রাজা ও জমিদারেরা নিজ নিজ এলাকায় ছিলেন স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন। তারা খাজনা আদায় করতেন, পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন নবাবের দরবারে, তদারকি করতেন অভ্যন্তরীণ প্রশাসন। জেলায় জেলায় বা চাকলায় জমিদারদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন নবাব কর্তৃক নিয়োজিত সামরিক কর্তৃপক্ষ বা ফৌজদার। তার অধীনে থাকত সৈন্য। জমিদারী-গুলিতে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল ফৌজদারের।

পলাশী যুদ্ধের সময় মেদিনীপুরের ফৌজদার ছিলেন রাজারাম সিংহ, সিরাজদৌল্লার প্রধান গুপ্তচর। মীরকাশিমের সময় ফৌজদার ছিলেন খুশিয়াল সিংহ। বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন খুশিয়াল এবং তাদের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। দেওয়ানি লাভের সময় বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত জঙ্গল এলাকা সম্বন্ধে কোমপানির কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল সীমাবদ্ধ।

পাঁচেটের জমিদারের কথা তারা শুনেছিলেন, কিন্তু জমিদারীর প্রকৃত আয়তন, ভৌগোলিক সংস্থান, ছোট ছোট জমিদারদের সঙ্গে পঞ্চকোট রাজার সম্পর্ক, কর্তৃপক্ষের কাছে পরিজ্ঞাত ছিল না।

চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল মানভূম ও বরাভূম পরগণা দুটি। নামে মাত্র অধীন ছিল মেদিনীপুর জমিদারীর। মেদিনীপুরের জমিদার ছিলেন কর্ণগড়ের রানী শিরোমনি। ১৭৬০ সালে মেদিনীপুর কোমপানির কর্তৃত্বাধীনে আসার পর রাণীর অধিকার খর্ব হয়েছিল। দেওয়ানি লাভের পর থেকে নামে এবং কার্যত, কোমপানিই হয়ে উঠেছিল মেদিনীপুরের প্রকৃত প্রভু।

১৭৬৬ সালের মার্চ মাসে মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটি সামরিক অভিযান পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোমপানির কর্তৃপক্ষ। পরের বছর জানুয়ারি মাসে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছিল। মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট ছিলেন জন গ্রাহাম। তিন থেকে চার কোমপানি সিপাহি ও কয়েকজন ইউরোপীয় সার্জেন্টসহ তিনি এনসাইন জন ফার্গুসনকে অভিযান পরিচালনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] ঝাড়গ্রাম ও বলরামপুর হয়ে ফার্গুসন মানভূমে পৌঁছেছিলেন ৬ মার্চ ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে।[২] পাঁচেটেও অন্যদিক থেকে পাঠান হয়েছিল অভিযান। সেটির নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপটেন আপটন।

ফার্গুসনের অভিযান ছিল ওপর ওপর। জঙ্গল এলাকার পথ ঘাট, নদী পর্বত, জনজীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণা ছিলনা বললেই হয়। এলাকার সঙ্গে পরিচিতি ও জমিদারদের অধীনতার মধ্যে নিয়ে আসা ছিল অভিযানটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অবশ্য অবাধ্য জমিদারদের গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন গ্রাহাম। নির্দেশ কাগজে কলমে থাকলেও কাজটি অত সহজ ছিল না। মানভূম ও বরাভূমের জমিদারেরা গ্রাহামের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা ফার্গুসনের কাছেই হাজির হননি। অভিযান প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তারা সৈন্য সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবু এক তরফাভাবে খাজনা ধার্য হয়ে গিয়েছিল পরগণা দুটির।[৩]

১. মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ১৩০—১৪৫।

২. Bengal District Records, Midnapore vol—1, No 139 (6. 3. 1767) এবং BDR, Mid, vol—1, No 134 (25.2.1767).

৩. মানভূমের বাৎসরিক খাজনা ধার্য হয়েছিল ৪৪১ টাকা, বরাভূমের ৩১৬ টাকা।—BDR, Mid, vol—I, No 139 (6.3.1767).

পাঁচেট ও মানভূমে অভিযানকারী দুই সেনাধ্যক্ষের মধ্যে অধিকারের চৌহদ্দি নিয়েও গোলমাল দেখা দিয়েছিল। গ্রাহাম জানিয়েছিলেন যদিও পাঁচেট ছিল সুবা উড়িষ্যার অন্তর্গত, সাম্প্রতিককালে সেখানকার খাজনা দেওয়া হত মেদিনীপুরের ফৌজদারের কাছে। রায়পুর ও ফুলকুসমা ছিল বর্ধমানের মধ্যে।

ঘাটশীলার জমিদারীও ছিল মেদিনীপুরের অন্তর্গত। জমিদার ছিলেন বৃদ্ধ। ফাগুর্সনের নেতৃত্বে ঘাটশীলার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে তোড়জোড় কম ছিল না। ঝাঁটিবনীর জমিদার, মঙ্গল রায় পথ দেখিয়েছিলেন, পাইক ও ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করেছিলেন গোবিন্দরাম বকসি, কার্তিকরাম, ও গোপীনাথ। রসদ যুগিয়েছিলেন কল্যাণপুর এবং জামবনীর জমিদার।[৪] ঘাটশীলা দুর্গ অধিকার করেছিলেন ফাগুর্সন, কিন্তু সে দুর্গ ছিল পরিত্যক্ত, তাতে জনমানবের চিহ্ন ছিল না। মেদিনীপুর চাকলার কোন জমিদার ঘাটশীলা জমিদারীর দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হন নি। অবশেষে বৃদ্ধ জমিদারের ভাইপো জগন্নাথ ধলের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছিল ফাগুর্সনের। মাসিক তিরিশ টাকা হারে মাসোহারার বন্দোবস্ত হয়েছিল বৃদ্ধ জমিদারের জন্যে। মেদিনীপুরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।[৫]

ঘাটশীলা দুর্গে থাকতেই মোহনলাল ও মণিলালের তিনজন উকিল ফাগুর্সনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। উকিল ত্রয় জানিয়েছিলেন তাদের প্রভু, মণিলাল ও মোহনলাল পঞ্চকোট জমিদারী থেকে বলপূর্বক উচ্ছিন্ন, বঞ্চিত উত্তরাধিকার থেকে।[৬] সরকারি প্রতিনিধি বলতে তারা ফাগুর্সনকে হাতের কাছে পেয়েছিলেন, প্রতিকার বিধানের জন্য তার কাছেই জানিয়াছিলেন আবেদন। দরকার হলে মেদিনীপুরে রেসিডেনট বা কলকাতায় গভর্নরের কাছে আবেদন জানাতেও দ্বিধা ছিলনা তাদের।

ঘটনাটির পেছনে সংক্ষিপ্ত প্রাক ইতিহাস ছিল। শত্রুঘ্নশেখর বা

---

৪. BDR, Mid vol—I, No 152 (17. 3. 1767).

৫. Fergusson to Vansittart 30. 4. 1767.

৬. They proceeded to explain that both their masters Mounal (Mohanlal) and his nephew and colegue (sic) Mounila (Monilal) deemed themselves hardly dealt with in being drove from their inhertiance, without inquirnig into their right settlements…." Fergusson to Vansittart BDR, Mid vol—I, No 172 (10. 4. 1767).

গরুড়নারায়ণের মৃত্যুর পর পঞ্চকোট রাজ পরিবারে যে অন্তর্কলহের ঢেউ উঠেছিল, প্রায় দশ বছর ধরে ছিল তার স্থিতিকাল।[৭] সম্ভবত সেই সময় বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেন রায় পঞ্চকোটের অন্তর্গত শেরগড় পরগণা দখল করে নিয়েছিলেন। নাগপুর ও রামগড়ের রাজার হস্তক্ষেপে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল পঞ্চকোট রাজ্য। মোহনলাল ও মণিলাল ছিলেন দুই বিভাগের দুই রাজা। ছাতনা থেকে এসে মণিলাল পঞ্চকোট পাহাড় থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে মহারাজনগরে নতুন বাসস্থান তৈরি করে বসবাস সুরু করেছিলেন ! রাজ্য বিভক্ত হবার পর বর্তমান কাশীপুরের কাছে রামবনীর জঙ্গল কেটে নতুন রাজধানী তৈরি করিয়েছিলেন। মোহনলালের রাজধানী হয়েছিল বাগমুণ্ডির অন্তর্গত অযোধ্যা পাহাড়ে। সে রাজধানীর বিলুপ্ত প্রায় নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

এসময় পঞ্চকোট জমিদারীর আর একজন দাবীদার উদ্ভূত হয়েছিলেন। বহুরাম নামে একজন অনন্তলাল বলে নিজের পরিচয় দিয়ে মুর্শিদাবাদের দরবার থেকে রাজসনদ লাভ করেছিলেন।[৮] এ কাজে তাকে সহায়তা করেছিলেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান কান্ত পাল, যিনি পরবর্তীকালে কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ বহুরাম তাকে শেরগড় পরগণাটি উপহার দিয়েছিলেন।[৯] এই জাল অনন্তলাল কর্তৃক উচ্ছিন্ন হয়েছিলেন মোহনলাল ও মণিলাল। প্রতিকারের জন্য তাই ফার্গুসনের কাছে উকিলদের পাঠান হয়েছিল। পরবর্তীকালে বহুরামের দাবী নামঞ্জুর হয়েছিল এবং নিহত হয়েছিলেন তিনি।

---

৭. গরুড়নারায়ণের মৃত্যু হয়েছিল ১৭৪২-৪৩ সালে। মণিলাল বা রঘুনাথ নারায়ণের রাজত্বকাল ছিল ১৭৫০—১৭৯১ খ্রী।

৮. "About 1688 Sak (1767 AD) one Bahuram gave himself out as Ananta Lal, an uncle of the then Raja Mani Lal alias Raghunath, who had become a religious medicant, and with the help of Kanta Pal, Dewan of Murshidabad, got himself recognised as Raja of Panchet .." Quoted in B. D. G, Manbhum by H. Coupland, 1911, P 281.

৯. শেরগড় পরগণা তখন ২৭টি মৌজা নিয়ে গঠিত ছিল। যথা, বেল্যাপুর, নিশ্চিন্তা, গোবিন্দপুর, শ্রীরামপুর, বড়াবনী, লছমনপুর, বড়ধেনুয়া, ভানুয়াড়া, চিরকুড়া, জনার্দনপুর, ভালুকসুন্দা, বোলকুন্দা, কাঁথরা, মাঝিয়াড়া, ডিহিকা, বড়তোড়িয়া, নপাড়া, বারণপুর, নুনী, গম্পুঠা, পাটমহুলা, ভামরা, চাপুই, পানিকলা, পাতান, আলুয়াড়া-এথোড়া ও বেগুনিয়া।

ফাগুর্সনের ঘাটশীলায় অবস্থিতিকালেই জঙ্গল এলাকা একটু একটু করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। যেসব জমিদারেরা মৌখিক অধীনতা স্বীকার করেছিলেন, খাজনা দেবার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল না। প্রথমদিকে ধারণা হয়েছিল ফাগুর্সনের অভিযান ঝড়ো হাওয়ার মত ওপর ওপর বয়ে যাবে, গাছ-পালা ভাঙবে কিছু, স্থায়ী প্রভুত্ব কায়েম করার দিকে যাবে না। সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে দেরী হয় নি। জমিদারেরা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘাটশীলার জমিদার জগন্নাথ ধল খোলাখুলি উপেক্ষা দেখিয়েছিলেন ফার্গুসনের প্রতি। সাধারণ পাইক, যাদের চুয়াড় বা চোয়াড় বলে ইংরেজদের নথিপত্রে পরিচিত করা হয়েছিল, অস্ত্র হাতে ক্রমশ বেরিয়ে আসতে সুরু করেছিলেন। একটু একটু করে ঝড়ো মেঘ জমতে সুরু করেছিল জঙ্গলের মাথায়।

পরের বছর জানুয়ারি মাসে মানভূমে ফের তাঁবু ফেলেছিলেন ফাগুর্সন। মেদিনীপুরে প্রধান বদলে গিয়েছিলেন। গ্রাহামের বদলে এসেছিলেন জর্জ ভ্যানসিটার্ট। মানভূমের জমিদার ছিলেন তখন হরিনারায়ণ। পাঁচেটে আপটনের জায়গায় প্রেরিত হয়েছিলেন লে. লামসডেন। পাঁচেটের প্রাক্তন রাজা মোহনলাল মানভূমের কিছু কিছু এলাকায় লুণ্ঠন সুরু করেছিলেন।[১০] ফাগুর্সনের সহযাত্রী গোবিন্দরামের আত্মীয় ও পরিবারের ওপর অত্যাচার সুরু করেছিলেন জগন্নাথ ধল। ফাগুর্সনের মেয়াদও বেশীদিন ছিল না। লে রুক নিয়োজিত হয়েছিলেন তার বদলে। কিছুদিন পরে রুকের জায়গায় নিযুক্ত হয়েছিলেন ক্যাপটেন চার্লস মরগাণ।

জঙ্গল এলাকায় সর্দার ও অনুচরদের যুদ্ধের কায়দা ছিল গেরিলা যুদ্ধের মত। অতর্কিতে তারা কোমপানির সিপাইদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। গাছ, পাথর ফেলে বন্ধ করে দিতেন রাস্তা। বর্ষাকালে সুবর্ণরেখা নদী জলে ভরে উঠত। যাতায়াত সহজ ছিল না। চাকুলিয়ার জমিদার অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত করেছিলেন কোমপানির পলটন। মাথা কেটে ফেলেছিলেন সার্জেণ্ট বাসকম্বের।[১১]

অন্যদিক থেকে আর এক বিপদ এগিয়ে এসেছিল। ময়ূরভঞ্জের রাজার মাধ্যমে মারাঠারা চৌথ আদায়ের জন্য এত্তালা পাঠিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কটকের উত্তরে

১০. BDR, Mid, vol—II No. 318 (15. 3. 1768).

১১. BDR, Mid, vol—II, No 359 (8. 7, 1768).

তারা ছাউনি ফেলেছিল। নেতৃত্বে ছিলেন শম্ভজী।[১২] চৌথ না পেলে নিমু পণ্ডিতের অধীনে রামগড় ও পাঁচেটের মধ্য দিয়ে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত লুণ্ঠন পরিচালনা করার পরিকল্পনাও ছিল তাদের।

জগন্নাথ ধলের সঙ্গে জঙ্গল এলাকার সমস্ত জমিদারেরা যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মানভূম, বরাভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, ও চাকুলিয়ার জমিদার। জগন্নাথকে খর্ব করতে না পেরে ভ্যানসিটার্ট নতুন কৌশল ঠিক করেছিলেন। তাঁর বড় ভাই নিমু ধলকে ঘাটশীলার রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।[১৩] নিমুর অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। রাজাগিরির পোশাকটিও কোমপানিকে কিনে দিতে হয়েছিল। প্রতিবাদে শীতের সময় আবার সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন অরণ্যের মানুষ। নতুন করে যেসব জমি বন্দোবস্ত দেওয়া সুরু হয়েছিল, তাতে ধান পেকে উঠেছিল। ডুংরির মাথা থেকে দলে দলে সশস্ত্র মানুষ নেমে এসেছিলেন বীরভূম ও ঘাটশীলার সমতল অঞ্চলে। মোকাবিলার জন্য পাঁচ কোমপানি সিপাহিসহ ক্যাপটেন ফরবেস ও লেঃ নানকে পাঠিয়েছিলেন ভ্যানসিটার্ট। ফরবেস গিয়েছিলেন ঘাটশীলায়, নান বরাভূমে।[১৪] দুজনেই বিদ্রোহীদের অবদমিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও, কৃষিকাজের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়িয়ে তোলাও ছিল কোমপানির অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে, পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভ্যানসিটার্ট নিজে বেরিয়েছিলেন জঙ্গল এলাকা পরিদর্শনে। ফিরে এসে তৎকালীন কালেকটর জেনারেল জেমস আলেকজাণ্ডারকে লিখেছিলেন, 'এই এলাকা আয়তনে বিশাল কিন্তু পাহাড় ও অরণ্যে পরিব্যাপ্ত। জনবসতি স্বল্প, যা আছে তাদের অধিকাংশ পাইক, কৃষিকাজে বিমুখ'।[১৫] জঙ্গল কেটে আবাদ পত্তনে

---

১২. Summajee Gumnya,—তার সঙ্গে ছিল ১২,০০০ অশ্বারোহী, ৬০০০ বরকন্দাজ, ও ১০০০ বন্দুকধারী।—BDR, Mid, vol—II, No 366 (15. 7. 1768).

১৩. "Juggernaut Doll, the Zemindar of Ghatseela, having obstinately persisted in his disobedience, I have been obliged to appoint his elder Brother N moodoll to the Zemindary in his room."—G. Vansittart to Richard Becher (28. 7. 1768).

১৪. BDR, Mid, vol—II, No 431 (20. 12. 1768).

১৫. BDR, Mid, vol—II No 447 (10. 4. 1769).

উৎসাহ দেবার জন্য নতুন করে জঙ্গল এলাকায় জমি বিলি বন্দোবস্ত সুরু হয়েছিল। স্থায়ী শান্তি থিতু না হওয়া পর্যন্ত সে প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা ছিল না।

জঙ্গল সর্দারেরা বুঝেছিলেন নতুন প্রভুদের মুঠি নবাব আমলের ফৌজদারদের মত ঢিলেঢালা নয়। কড়ায় গণ্ডায় তারা বুঝে নিতে চায় খাজনা। খাজনা বাড়াবার জন্য ভিনদেশী লোকদেরও আবাদ পত্তনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল, বিলি বন্দোবস্ত সুরু হয়েছিল জমি। এ অবস্থা চলতে থাকলে অরণ্য অঞ্চলের সংহতি বিনষ্ট হবার আশংকা ছিল। সম্ভাবনা ছিল জন বিন্যাসের প্রকৃতি বদলে যাবার! ফলে লালমুখো টুপিওয়ালাদের জঙ্গল এলাকা থেকে হটিয়ে দেবার জন্য সর্দারেরা বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছিলেন। পুরনো প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল, নতুন ব্যবস্থা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্রমাগত হানাহানির ফলে যেটুকু চাষ আবাদ ছিল, তাও উপেক্ষিত হয়েছিল। অনাবৃষ্টির ফলে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে। দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল সারা দেশ জুড়ে! দেখতে দেখতে এসে পড়েছিল মন্বন্তর। বাংলার অর্ধেক মানুষ তাতে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

জঙ্গল এলাকায় মন্বন্তরের প্রকোপ ততটা ভয়ানক ছিল না। অন্নসংস্থানের মুখ্য উপায় ছিলনা কৃষি। সুবিস্তীর্ণ অরণ্যে ফলমূল ও পশুর মাংস মুষ্টিমেয় মানুষের আহার্যের পক্ষে অকুলান ছিল না। তবু দুর্ভিক্ষের ফলে সাময়িক যে শৈথিল্য জঙ্গল সর্দারদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তাতে ভ্যানসিটার্টের ধারণা হয়েছিল বাঙ সিং ও লালসিংকে সংহত করতে পারলে, জঙ্গল এলাকায় শান্তি ফিরে আসবে।[১৬] ক'দিনের মধ্যে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল সে ধারণা। লেঃ নানের হেফাজতে যে সৈন্যদের কুচংয়ে রেখে এসেছিলেন ফরবেস, অতর্কিত আক্রমণে তাদের অনেকেই নিহত হয়েছিল। অবশিষ্টরা নানকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল আতংকে।[১৭]

জঙ্গল এলাকা অবদমিত করতে আরও একটি নতুন কৌশল স্থির করেছিল কোমপানি। জঙ্গল এলাকার শক্ত সমর্থ ও বলিষ্ঠ যুবকদের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল।[১৮]

---

১৬. J. Vansittart to Cap. Forbes. dt 8. 1. 1770.

১৭. BDR, vol—II, No 513 (19. 1. 1774).

১৮. Vansittart to Cap. Forbes dt. 10. 8. 1770.

বিদ্রোহ ক্রমশ সংহত ও পরিব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছিল। একে একে সমস্ত জমিদারেরা তাতে যোগ দিয়েছিলেন।[১৯] তিনদিকে তিনজন মান্য জমিদার এগিয়ে এসেছিলেন নেতৃত্বে। যথা, মেদিনীপুরে কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, বাঁকুড়ায় রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহ এবং ঘাটশীলার রাজা জগন্নাথ ধল। সংহতি বেশীদিন বজায় ছিল না। অস্থায়ী সামরিক শিবির স্থাপিত হয়েছিল বরাভূম, মানভূম ও পাঁচেটে। জঙ্গল এলাকা সম্বন্ধে কোমপানির জ্ঞানও বেড়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের কালেক্টর এডওয়ার্ড বেবার ওয়ারেন হেসটিংসকে জানিয়েছিলেন, পশ্চিমের জঙ্গল এলাকা লম্বায় ৮০ মাইল, চওড়ায় ৬০ মাইল। পূর্বে মেদিনীপুর, পশ্চিমে সিংভূম, উত্তরে পাঁচেট ও দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবাদী জমির এলাকা স্বল্প, আনুপাতিক চাষযোগ্য এলাকাও কম ; মাটি পাথুরে, ভূভাগ পর্বতময় ও ঘন অরণ্যে ঢাকা।[২০] মেদিনীপুর থেকে তদারকি করা হত বলে মেদিনীপুর শহর ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দূরত্বও পরিমাপ করা হয়েছিল।[২১]

প্রাক্তন মানভূম জেলার দক্ষিণাংশ যেমন জঙ্গল মহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, উত্তরাংশ তেমনি ছিল জঙ্গল তরাইয়ের অন্তর্গত। মেজর জেমস ব্রাউনে ছিলেন কালেক্টর। জঙ্গল তরাই উত্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল ভাগলপুর ও কোলংসহ ভাগীরথী নদী, উত্তর-পশ্চিমে খড়কপুর শৈলমালা, পশ্চিমে গিধওয়ার ও বিহারের সমতল, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রামগড় ও পাঁচেট, দক্ষিণ-পূর্বে বীরভূম, পূর্বে রাজমহল পর্বতশ্রেণী এবং উত্তরপূর্বে গঙ্গা ও রাজমহল পর্বতশ্রেণীর কিছু অংশে।[২২] জঙ্গল

---

১৯. যথা, বরাভূমের জমিদার বিবেকনারায়ন ও তার বড় ছেলে দুবরাজ (বা যুবরাজ), কইলাপালের জমিদার সুবল সিংহ, মানভূমের জমিদার হরিনারায়ণ, শিলদার জমিদার মানগোবিন্দ সিংহ, ধাদকির জমিদার শ্যামগঞ্জন ও তার ভাই ত্রিভুবন সিংহ, ডোমপাড়ার জমিদার জগন্নাথ পাতর (পাত্র), ফুলকুসমার জমিদার সুন্দরনারায়ণ, ভেলাইডিহার—মোহনদাস চৌধুরী, ঘাটশীলার রাজা জগন্নাথ ধল, পাঁচেটের রাজা রঘুনাথ নারায়ণ এবং রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহ।

২০. Edward Baber to Warren Hastings, BDR, Mid vol—IV, No. 163 .

২১. মেদিনীপুর শহর থেকে দূরত্ব—মানভূম ৩২ ক্রোশ (উঃ পশ্চিম) ছাতনা ৪০ ক্রোশ, (উত্তর) বরাভূম ৪০ ক্রোশ (পশ্চিম), পাতকুম ৪৮ ক্রোশ (দক্ষিণ) —BDR, Mid—IV No. 200. ব্রিটিশ ক্রোশ ২ মাইলের কিছু বেশি।

২২. Indian Tracts—Major James Browne (1788)

তরাইয়ের প্রথম সামরিক অধিকর্তা ছিলেন ক্যাপটেন ব্রুক। তিনি পর্বতচারী উপজাতিদের সঙ্গে সৌহাদ্য' স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে দাবী করেছিলেন। কোমপানির শাসনের বিরুদ্ধে তাদের প্রবল বিরূপতা দূর করেছিলেন কিছু পরিমাণে, এবং সমতলে এসে উপজাতিদের চাষ আবাদ ও কৃষিক্ষেত্রসহ গ্রাম গড়ে তোলার উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

পাঁচেট বা মানভূমের উত্তরাংশ ছিল ছোটনাগভুক্তির অন্তর্গত। ছোটনাগপুরের রাজা দ্রিপনাথ শাহীর অধীন। ক্যাপটেন ক্যামাকের নেতৃত্বে সামরিক অভিযানের পরিণতি হিসাবে রাজা কোমপানির অধীনতা স্বীকার, এবং কোমপানিকে রাজস্ব ও নজরানা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জঙ্গল মহলের সর্দারদের সংবদ্ধতা যে প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছিল, তাতে প্রথমে ক্যাপটেন গুড়ইয়ার ও পরে একসঙ্গে ক্যাপটেন কার্টার, লে. গল ও লে. ইয়ংকে পাঠান হয়েছিল। তাদের অভিযান সাময়িক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ঘাটশীলার রাজা জগন্নাথ ধলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল রাজপদে।

উপজাতিদের ওপর কোমপানির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ ঝালদা ও পাতকুমে নতুন করে বিক্ষোভের ইন্ধন যুগিয়েছিল। অরণ্য অঞ্চলের বৃহত্তর এলাকা আবাদী ক্ষেত্রে পরিণত করা বিঘ্নিত হয়ে চলেছিল। কৃষকেরা নতুনভাবে জমি বন্দোবস্ত নিতে অনাগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি কোন কোন অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় রামকান্ত বিশ্বাস নামে জনৈক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল দেওয়ান।[২৩]

সৈন্য ও রসদ চলাচলের সুবিধার জন্য পাঁচেটের মধ্য দিয়ে একদা বিন্যস্ত প্রাচীন বেনারস-সড়কটি সংস্কারের কাজও হাতে নিয়েছিল কোমপানি। পাঁচেটের রাজাদের নতুন বাসস্থান কাশীপুরের ভেতর দিয়ে না গেলেও তার কাছাকাছি রঘুনাথপুরের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল সড়কটি। পঞ্চকোটের পারিবারিক গোলমাল তখনও অব্যাহত ছিল। একদিকে কিছুটা নিষ্পত্তির আভাস দেখা গেলেও, অন্যদিকে বেড়ে উঠেছিল বিবাদ।

মোহনলালের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী ও পঞ্চকোট রাজ্যের বিভাজ্যতা নিয়ে পুনরায় দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। মোহনলালের বৈমাত্রেয় ভাই কাঞ্চনলাল

২২ক. BDG, Manbhum, P 56.

আবেদন করেছিলেন যে তার ছেলে বাহাদুরলালকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন মোহনলাল। ফলে মৃতের উত্তরাধিকারী হিসাবে বাহাদুরলাল পঞ্চকোট রাজ্যের অর্ধাংশের জমিদার। বিষয়টি তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল মি. হিগিনসনকে। তদন্ত শেষে হিগিনসন জানিয়েছিলেন, পঞ্চকোট রাজ্য অবিভাজ্য। কুলপ্রথা অনুসারে মহারাজা শত্রুঘ্নশেখরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র মনিলাল পঞ্চকোট রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকাবী। বাহাদুরলাল মোহনলালেব পোষ্যপুত্র হলেও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারেন না, খোরপোষ পেতে পারেন।[২৩] কোমপানির কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাটি অনুমোদন করেছিলেন। কাঞ্চনলাল ও বাহাদুরলালকে কাঁসাইপার পরগণা দান কবা হয়েছিল। তারা পরগণাটির অন্তর্গত চাকলতোড়ে গড় তৈরি কবে বসবাস সুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে কাঞ্চনলালের দ্বিতীয়-পুত্র শত্রুঘ্নশেখরকে মনিলাল পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। চাকলতোড়ের রাজবংশটি শত্রুঘ্নশেখর থেকে উদ্ভুত।

পঞ্চকোটের পারিবারিক গোলযোগের সুযোগে তামার ও ঝালদার উপজাতি সর্দার মঙ্গল শাহ পাঁচেট জমিদারীর বিভিন্ন অঞ্চলে লুণ্ঠন চালিয়ে চলেছিলেন। প্রতিকারের জন্য গঠিত হয়েছিল পাঁচেট। পাঁচেট ও রামগড় জেলা দুটি একই কালেকটরের অধীন ছিল। সেই বছরেই মনিলাল বা রঘুনাথ নারায়ণ দুই পুত্র ভবতশেখর ও ভীমলালকে সঙ্গে নিয়ে পুরী গিয়েছিলেন রথযাত্রা দেখতে।[২৪] মঙ্গল শাহের বিরুদ্ধে মেজর ক্রফোর্ড প্রেরিত হয়েছিলেন রামগড় থেকে (১৭৮২ খ্রী)। অবদমিত হয়েছিলেন মঙ্গল শাহ। পাঁচেট ও তার পূর্ব ও পশ্চিমে সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ক্রফোর্ড। উদ্যোগটি ব্যর্থ করে দেবার জন্য সর্দারেরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে কোমপানির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। তরবারির সাহায্যে তাদের অবদমিত করেছিল কোমপানি।

বড় বড় জমিদারীগুলির আধিপত্য খর্ব করার পরিকল্পনা আগেই কোমপানির কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারীগুলি ভেঙ্গে ভেঙে ছোট করা, বিদেশী আক্রমণের সময় যাতে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রাধাণ্য প্রবল হয়ে উঠতে না পারে, সেবিষয়েও বিচার বিবেচনা চলছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কোমপানি চড়া হারে খাজনা ধার্য করার কৌশল অবলম্বন করেছিল। ফলে অধিকাংশ জমিদারী

---

২৩. Mr. HigginSon's Report, 21. 1. 1771

২৪. গিয়েছিলেন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য, মানভূম ও পুরুলিয়ায় ঐতিহাসিক সূত্র।

বকেয়া খাজনার দায়ে নীলাম হতে সুরু হয়েছিল।[২৫] পঞ্চকোট জমিদারীও এই প্রক্রিয়ার বাইরে ছিলনা। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে নীলামে উঠেছিল পাঁচেট জমিদারী, কিনে নিয়েছিলেন নীলাম্বর মিত্র।

ইতিমধ্যে মনিলাল গত হয়েছিলেন (১৭৯২ খ্রী)। কুমার ভরতশেখর গরুড়-নারায়ণ উপাধি নিয়ে রাজা হয়েছিলেন পঞ্চকোটের। নতুন রাজধানী হয়েছিল কেশরগড়ে। নীলামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়েছিল, কর্ণপাত করেননি কোমপানির কর্তৃপক্ষ। ফলে পঞ্চকোটের প্রজাবৃন্দসহ রাজা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। খণ্ড খণ্ড ভাবে পুনরায় সওয়া ৮৬ টি মৌজা নীলাম করেছিল কোমপানি।[২৬] যারা কিনেছিলেন, মৌজাগুলির দখল নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সমগ্র জঙ্গমহল আলোড়িত হয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভে। পাঁচেট ছাড়াও রায়পুর অম্বিকানগর, সুপুর, মানভুম, বরাভুম ও বাগমুণ্ডিতে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের দাবানল। রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিদ্রোহে। ধৃত হয়েছিলেন, দুর্জন সিংহ। তার বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করা হয়েছিল, কিন্তু সাক্ষীর অভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছিল মামলা। পাঁচেটের ক্ষেত্রেও কোমপানিকে কর্তৃত্বের উঁচু শিখরটি থেকে নেমে আসতে হয়েছিল। গরুড়নারায়ণকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল তার জমিদারী। এই বিদ্রোহে বাগমুণ্ডির জমিদার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ফলে কোমপানি বাজেয়াপ্ত করেছিল তার জমিদারী। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভুম, মেদিনীপুর ও পাঁচেটের জঙ্গল এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি নতুন জেলা। নাম জঙ্গল মহল।[২৭]

পাঁচেটের মত বরাভুমেও ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দিয়েছিল। গোপনে গোপনে বিরোধে ইন্ধন যুগিয়েছিল কোমপানির অনুচরেরা। বরাভুমের রাজা

---

২৫. ১৭৬৩ সালে পাচেট ও শেরগড় মিলিয়ে খাজনা ছিল টা. ২৩,৫৪৪=০০; ১৭৬৬ সালে টা. ৩০,০০০=০০; ১৭৭৭ সালে টা. ৬৯,০২৭=০০; ১৭৮৩ সালে টা. ৭৫,৫৩২=০০, ১৭৯৩ সালে টা. ৫৫,৭৯৪=০০।

২৬. যে যে মৌজা যে যে খরিদ্দার কিনেছিলেন, যথা, লধুড়কা—হরিশচন্দ্র বসু, চৌরাশী ও চেলেমা—জানকীরাম চট্টোপাধ্যায়, ছড়রা—জগনাথ চট্টোপাধ্যায়, নাখদা—নীলমাধব বসু, মহীসরা—লছমন শঙ্কর, বনচাষ—মকারুল্লা খাঁ, শেরগড়—লোকনাথ নদী।

২৭. Regulation XVIII of 1805—অনুসারে সৃষ্ট হয়েছিল জেলাটি। জঙ্গল এলাকার ২৩টি মহল ও পরগণা নিয়ে সেটি গঠিত হয়েছিল।

বিবেকানারায়ণ দীর্ঘকাল ধরে কোমপানির সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, অবশেষে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে পরাজিত হলে, রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন। দুটি ছেলে ছিল বিবেকনারায়ণের। বড় রঘুনাথ নারায়ণ, ছোট লছমন। রঘুনাথ ছিলেন দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত, লছমন প্রধান মহিষীর সন্তান।

পরাজিত হবার পর ইংরেজরা যখন রঘুনাথের সংগে বরাভূম জমিদারীর বন্দোবস্ত করেছিল, তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন বিবেকনারায়ণ।[২৮] স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন রাজ্য। অরণ্য অঞ্চলের প্রথা অনুসারে প্রধান মহিষীর পুত্র বয়সে ছোট হলেও রাজ্যের অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হতেন, এক্ষেত্রে প্রথাটি লঙ্ঘিত হয়েছিল।[২৯] ফলে লছমন সিংহ সৈন্য সংগ্রহ করে রঘুনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্য রঘুনাথের পক্ষে থাকায় লছমণ সিংহ শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন। বন্দী অবস্থায় জেলেই তার দেহান্তর ঘটেছিল। লছমন সিংহের পুত্র ছিলেন গংগানারায়ণ।

রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর পর পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। রঘুনাথেরও দুই পুত্র ছিল, মাধব বা মাধো সিংহ ও গংগাগোবিন্দ। প্রধান মহিষীর গর্ভজাত মাধব ছিলেন বয়সে ছোট, দ্বিতীয় মহিষীর সন্তান গংগাগোবিন্দ ছিলেন বয়সে বড়। দুজনেই ছিলেন নাবালক। মাধবের বয়স ১৫, গংগাগোবিন্দের ১৬। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে দুজন সদর দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলায় জয়ী হয়েছিলেন গংগাগোবিন্দ। বরাভূমের রাজা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন, দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন মাধব সিংহ।

দেওয়ান হবার পর অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন মাধব সিংহ। নানা ধরণের

---

২৮. "Bibek Narain, who had long been in arms against Government, having been obliged to give up his Zemindary in the Year 1182, Raghonath Narain, the late Zemindar…was with his concurrence acknowleged as Successor.—Mr. Ernst's report to the Board of Revenue, 1800 AD.

২৯. ব্রিটিশ দরবারে গেলে পাছে লছমন সিংহের ক্ষতি হয়, এই ভয়ে বিবেকনারায়ণ রঘুনাথকে পাঠিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। একজন দাবীদার পেয়ে ইংরেজরা তাঁর সঙ্গেই জমিদারীর বন্দোবস্ত করেছিল। দ্র, লাল সিংহ—হরিনাথ ঘোষ।

কর ও খাজনা আদায় করতে সুরু করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ঘতুর্কী বা বাড়ির ওপর কর। এ ছাড়া মহাজনী কারবারও ছিল। কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র বরাভূমে তিনি অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি লছমনের উত্তরাধিকারী হিসাবে গঙ্গানারায়ণ[৩০] পঞ্চসর্দারী নামে যে তরফটির ভোগদখল করে আসছিলেন, সেটি থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

ইস্‌ট ইনডিয়া কোমপানি অরণ্যপ্রদেশে উত্তরাধিকারের প্রাচীন প্রথাটিকে উপেক্ষা করে যে অবিচার গঙ্গানারায়ণের ওপর আরোপ করেছিলেন এতদিনে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত সময় এসে পড়েছিল। ১৮৩২ সালের বৈশাখ মাসে মাধব বেরিয়েছিলেন গোলাঘর দেখতে। পঞ্চসর্দারী ও সতেরখানির দুই সর্দারসহ, বিরাট বাহিনী নিয়ে গঙ্গানারায়ণ সহসা আক্রমণ করেছিলেন তাকে। ধৃত হয়েছিলেন মাধব। বার্মানি নামে ছোট একটি ডুংরির কাছে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টাঙ্গির এক কোপে ধড় থেকে মাথাটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছিলেন গঙ্গানারায়ণ। সর্দারদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন এক একটি করে তীর বিঁধিয়ে ছিলেন মাধবের শরীরে। সূত্রপাত হয়েছিল গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহের।

বার্মানির ক্ষুদ্র ডুংরিটির পাদদেশে নিষ্ঠুরতার চরম অনুষ্ঠানে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছিল, দাবানলের মত ক্ষণকালের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েছিল পার্শ্ববর্তী এলাকায়। একে একে লুণ্ঠিত হয়েছিল বরাবাজারের মুনসেফের কাছারি, থানা, নিমক—দারোগার কার্যালয় এবং রাজবাড়ি। পঞ্চসর্দারী নামে যে তরফটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সেটি প্রত্যর্পণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ইংরেজদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয়েছিল বিদ্রোহের বহ্নিতে। সমগ্র বরাভূমে একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গঙ্গানারায়নের।[৩১] ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির চিহ্ন পর্যন্ত ছিলনা।

---

৩০. "Lakhman, the son of the Patrani alluded to above, continuing to oppose his brother, was arrested, and died in Jail leaving a son Ganganarayan."—Descriptive Ethnology of Bengal by E. T. Dalton.

৩১. "...The whole of the Government force had to retire to Bankura, leaving Barabhum in the undisturbed possession of Ganga Nārāyan."—H. Coupland.

ধান রোপার সময় কিছুদিনের জন্য মন্দা পড়েছিল বিদ্রোহে। আগসটে গংগানারায়নের নেতৃত্বে পুনরায় সংবদ্ধ হয়েছিলেন অরণ্যের মানুষ। আকরো, অম্বিকানগর, রায়পুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, বরাভূম, শিলদা ও কইলাপাল উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহে। নভেমবর মাসে নেটিভ ইনফ্যানট্রির ৩৪ তম রেজিমেনট পেঁাছেছিল রায়পুরে। মি ব্রাডন ও লে. ট্রিমারের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছিলেন গংগানারায়ণ। আক্রমণ কোনমতে প্রতিহত করেছিলেন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষেরা। প্রত্যাক্রমণের শক্তি ছিলনা। বরাবাজার পুনরাধিকারের জন্য মি. ব্রাডন উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বলরামপুরে স্থাপিত হয়েছিল থানা। নভেমবর মাসেই মি, ডেনট চাকলতোড়ের চার্জ নিয়েছিলেন। মার্জনা ঘোষণা করেছিলেন দশ জন সর্দারের। তাতে ফল না হওয়ায় গংগানারায়ণের ঘাঁটি বানধিড আক্রমণ করেছিলেন। আক্রান্ত হয়েছিল অপর দুই সর্দারের ঘাঁটি বারুডি ও বাওনি। বিক্ষুব্ধ অরণ্য এলাকার প্রায় সর্বত্র প্রেরিত হয়েছিল সামরিক বাহিনী। কয়েকজন অনুচর সহ গংগানারায়ণ সিংভূমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে খারসওঁয়ার ঠাকুরদের বিরুদ্ধে অভিযানে নিহত হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। গংগানারায়ণের সহযোগী সর্দারদের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিলেন লাল সিংহ ও তার পুত্র পঞ্চানন সিংহ। ফাগুসনের অভিযানের সময় থেকে নানাভাবে তিনি ইংরেজ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। গংগানারায়ণের বিদ্রোহের সময় সংবদ্ধ আক্রমনে তার শক্তি ও কৌশল বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

গঙ্গানারায়ণের সময় বরাভূম পরগণা ছিল চারটি তরফে বিভক্ত। সতেরখানি, পঞ্চসর্দারী, ধাদকি ও তিনসওয়া। চারটি তরফের সর্দারেরা বরাহভূমের রাজাকে তাদের প্রভু বলে মনে করতেন! সতেরখানি তরফের সর্দার ছিলেন লালসিংহ। উওরে খাঁড়িপাড়ি দক্ষিণে কাটারঞ্জা, দুটি পাহাড়শ্রেনীর মধ্যে ছোট একটি গ্রাম ছিল, নাম বাটালুকা। ঘন শালগাছের জঙ্গলের মধ্যে ছাড়া ছাড়া জনবসতি। গ্রামখানার উত্তরে ছিল একটি ডুংরি, নাম কিতাডুংরি। কিতাডুংরীতেই ছিল লালসিংহের পিতা ত্রিভন সিংহের দুর্গ বা গড়। সেই দুর্গ বা কিতাগড়ে জন্ম হয়েছিল লালসিংহের।

লালসিংহের শৈশবেই ত্রিভন শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকে প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে লালসিংহ হয়ে উঠেছিলেন দুর্ধর্ষ। বাটালুকা থেকে এসে সারিগ্রামে স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করিয়েছিলেন। সেখানেই ছিলেন আজীবন। সারিগ্রামের চারদিকেও ছিল বড় বড় পাহাড়। পাহাড় ঘেরা উপত্যকার মধ্যে ছিল গ্রামখানা। বাইরের মানুষের কাছে স্থানটি ছিল দুর্গম।

আঠারোশো খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন হেনরি স্ট্র্যাচি। তার নোটে লালসিংহ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। জঙ্গল সর্দারদের মধ্যে সতেরখানি তরফের সর্দার হিসাবে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পরাক্রান্ত।[৩২] তরফটির আয়তন ছিল ১০০ বর্গ মাইল। প্রকৃতপক্ষে লাল সিংহের প্রভাব প্রসারিত হয়েছিল আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এই অঞ্চলের জমিদারদের চোখের ঘুম তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন। সুখেশান্তিতে বসবাস করার জন্য জমিদার ও প্রজারা তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রতি গ্রাম থেকে নির্দিষ্ট দিনে তাকে কর দিতে হত, করটির নাম ছিল 'সুখনিদি' অর্থাৎ শান্তিতে নিদ্রা যাবার নিশ্চয়তা। কর না দিলে বা দিতে দেরী হলে অবশ্যই গ্রামটি লুণ্ঠিত হত।[৩৩] লালসিংহের সমসাময়িক পঞ্চসর্দারীর সর্দার ছিলেন কিশন পাত্র (পাত্র), এবং ধাদীকর সর্দার শ্যামগঞ্জন সিংহ।

গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে জঙ্গল এলাকা পুনর্বিন্যস্ত করেছিল কোমপানি। প্রনীত হয়েছিল আইন। বিস্তীর্ন অরণ্য প্রদেশটি ভেঙেচুরে নতুন জেলা গঠিত হয়েছিল, নাম মানভূম। মানভূম জেলার সদর দপ্তর প্রথমে ছিল মানবাজার, পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল পুরুলিয়ায়।[৩৪]

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বিহার ও উড়িষ্যার একাংশ ইরেজদের অধীনতা বিনা রক্তপাতে মেনে নেয়নি। বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে নিববচ্ছিন্ন ঢেউয়ের মত বিদ্রোহের তরঙ্গ থেকে থেকে আলোড়িত করে তুলেছিল ইংরেজদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি। বিদ্রোহীদের অধিকাংশ ছিলেন অরণ্যের সন্তান, গাছপালা ও বনানীর অকৃত্রিম আশ্রয়ে লালিত, বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক! অস্ত্র বলতে ছিল তীর ধনুক তরবারি ও বল্লম। বাঁশ দিয়ে তৈরি ধনুকের দণ্ড, বাঁশের ছালে তৈরি ছিলা, বেতের শর ও কঞ্চির মুখে লোহার ফলা বসিয়ে তৈরি তীর। চামড়ায় তৈরি তূণ, তাতে তীর থাকত প্রায় দুশো। লক্ষ্যভেদে তীরন্দাজদের জুড়ি ছিলনা। গঙ্গানারায়ণের অন্যতম সহচর জিরপা

---

৩২. "Lal Singh appears to be the most powerful of these Sardârs."—Notes on Burrabhum by Henry Strachey, 13. 4. 1800.

৩৩. "In case of refusal or the least delay in the payment of Sooknudi, So the contribution is called, the Village is infallibly Plundered."—H. Strachey.

৩৪. দ্রষ্টব্য, 'মানভূম থেকে পুরুলিয়া' অধ্যায়, পৃঃ ২১—২২

লায়ার তীরন্দাজ হিসাবে প্রসিদ্ধি ছিল। তবু এসব অস্ত্রশস্ত্র পরিমার্জিত ইউরোপীয় অস্ত্র ও রণকৌশলের সমকক্ষ ছিলনা। আধুনিক হাতিয়ার বলতে দেশীয়দের কাছে সবচেয়ে চমকদার অস্ত্র ছিল পলিতাদার বন্দুক।

অস্ত্র শস্ত্র ও রণকৌশলে সমকক্ষ না হলেও বীরত্ব ও সাহসিকতায় তারা ইংরেজদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন। পোশাক পরিচ্ছদেও জাঁকজমক ছিলনা তাদের। পরণে মোটা ধুতি বা কাচা, মাথায় মোটা কাপড়ের পাগড়ি. পদস্থ সৈন্যেরা পরতেন হাতকাটা জামা বা কোর্তা।

বিদ্রোহীদের সিংহভাগ ছিলেন ভূমিজ। কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো প্রভৃতি। উপজাতির মানুষেরাও যোগ দিয়েছিলেন বিদ্রোহে। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ দেশ জুড়ে যে অসন্তোষ ও বহ্নি জ্বালিয়ে তুলেছিল, এক সময় তা দাবানলের মত মহাবিদ্রোহের আকাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবাসীর বুকে প্রোথিত করেছিল জাতীয়তাবাদের প্রথম অংকুর।

ঝ. মহাবিদ্রোহ, নীলমণি সিংহ ও জাতীয়তাবাদ

'Captain Oakes reported from Purulia that the Sonthals in Manbhum were in a state of high excitement, whilst Nilmani Sing Deo, the Zemindar of Pachete,...was said to be arming his retainers and in other ways assuming a warlike attitude."
—Minute of Sir Frederick Halliday, Lt. Governor of Bengal.

ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ধর্মীয় চেতনার হাত ধরে। ইংরেজদের উগ্র জাতীয়তাবাদ বিপরীতমুখি প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইন্ধন যুগিয়েছিল। মেকলে ছিলেন এই প্রতিক্রিয়ার অনেকাংশে জন্মদাতা।[১] মার্শম্যান, কেরি, ও উইলসন প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রাচ্য বিশারদেরা ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, মেকলে শুধু যে তা বাতিল করেছিলেন তাই নয়, ইউরোপীয় সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে তাকে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।[২] নব-জাগরিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে

---

১. "...the English have become the greatest and most highly civilized people ever the world saw,"—Sir James Mackintosh by B. Thomas Macaulay (Essay, 1835). ১৮৩৪ সালে মেকলে কিছুদিনের জন্য ভারতে এসেছিলেন।

২. "It is I believe no exaggerntion to say, that all the historical information which has been collected to form all the books written in the Sanskrit language is less valuable than that what may be found in the paltry abridgements used at preparatory schools, in England."
—Macaulay, Minute of February 2, 1835.

এই মনোভাব গভীর বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধিজীবীদের মূল অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল কলকাতা। সেখানে তাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল।

এক গোষ্ঠীর নায়ক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কর্ণওয়ালিস কর্তৃক দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত হবার ফলে[৩] জীবিকার সন্ধানে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় আসার পর অর্থ উপার্জনের প্রধান পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সিভিল সার্ভেন্টদের টাকা ধার দেওয়া ও বেনিয়ানের কাজ। কাজ বেশ জমেও উঠেছিল। দুটি তালুক কিনেছিলেন বর্ধমানে।[৪] পাশ্চাত্য আদবকায়দায় অনুপ্রাণিত হলেও ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা রামমোহনকে বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল। অবশ্য এই অধিষ্ঠান বিযুক্তও করেছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজের সঙ্গে।

অপর গোষ্ঠীর নায়ক ছিলেন রাধাকান্ত দেব। জীবিকার জন্য রামমোহনকে যেমন ইংরেজদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল, পেশা বা অর্থ উপার্জনের তাগিদে সেভাবে ইংরেজদের নিকটস্থ হতে হয়নি রাধাকান্তকে। তার পিতা গোপীমোহন দেব ছিলেন অসাধারণ ধনী। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দত্তক পুত্র। জন্মসূত্রেই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিলেন রাধাকান্ত। নিজে আরবী, পারসী, উর্দু, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। আচার-আচরণ ও আদব কায়দায় ছিলেন সনাতনপন্থী এবং বৃহত্তর জনসমাজের অধিকতর কাছাকাছি, যদিও মূল লক্ষ্যের দিক থেকে রামমোহন ও রাধাকান্তের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল খুব কম।

মেকলের শিক্ষানীতি উভয় গোষ্ঠীর অনুগামীদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নব-উদ্ভূত জমিদার সম্প্রদায় ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট হলেও ভেতরে ভেতরে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের এক ভয়ানক ইংগিত অনুমান করে সংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। সহরাঞ্চলের বাইরে বৃহত্তম জনসমাজ তখনও আঁকড়ে ধরেছিলেন ধর্মীয় বন্ধনের রঙওঠা, জরাজীর্ণ ঐক্যসূত্রটি। সিপাহি বিদ্রোহের নায়কেরা সেটিকেই এগিয়ে দিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন।

---

৩. Native Exclusion Act, 1791 ও Permanent Settlement Act, 1793.

৪. রামমোহন কলকাতায় এসেছিলেন সম্ভবত ১৭৯৭—১৮০২ সালের মধ্যে। বর্ধমানে তালুক কিনেছিলেন ১৭৯৯ সালে।

ওয়ারেন হেসটিংস প্রবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী নীতি কর্ণওয়ালিসের আমলে সুস্পষ্ট আকার নিয়ে বেড়ে বেড়ে চলেছিল। প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সুবিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার। মুঘল, মারাঠা, ও দেশীয় রাজা ও জমিদারদের ভেঙ্গে দেওয়া সেনাবাহিনী নতুনকরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কোমপানির সেনাবাহিনীর মধ্যে। কিন্তু তার চেয়েও সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল গ্রামাঞ্চলের বলিষ্ঠ যুব সম্প্রদায়। তারা তাদের গ্রামীণ ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ ও ধর্মীয় বোধসহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কোমপানির সেনাবাহিনীর।

ক্লাইভের গড়ে তোলা বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির মূল কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল বিহার, উড়িষ্যা ও অযোধ্যা থেকে সংগৃহীত যুবকবৃন্দের সমন্বয়ে। পরবর্তীকালেও সৈন্য সংগ্রহে সে ধারা বর্জিত হয়নি। সৈন্যদের তিন চতুর্থাংশ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং এক-তৃতীয়াংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতেরা ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ। মহাবিদ্রোহের আগে পশ্চিমবাংলায় একাধিক ছাউনি ছিল দেশীয় সৈনিকদের। তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ছাউনি ছিল ফোর্ট উইলিয়ম, আলিপুর, বালিগঞ্জ, দমদম, বারাকপুর, চুঁচুড়া, বহরমপুর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়।[৫]

মহাবিদ্রোহের দুবছর আগে বাংলার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল আর একটি বিদ্রোহে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। সেটি সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ভাগলপুরে গঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে উড়িষ্যার বৈতরণী নদী পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল এলাকায়, কোল উপজাতির বসবাস ছিল সুদূর অতীতকাল থেকে। হাজারিবাগ ও বীরভূমের একাংশেও তাদের বসবাস ছিল বেশ প্রাচীন। আঠারো শতকের মাঝামাঝি দলে দলে তারা দক্ষিণাঞ্চলে এসে জঙ্গল হাসিল করে বসবাস ও কৃষিক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেন। দামিন-ই-কোহ বা পাহাড়ের সানুদেশ ঘিরে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল বসতি। ক্রমশ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠতে চলেছিল চৌহদ্দি। এই অবস্থার মধ্যে ১৮৩২ সালে, এলাকাটি ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম, তিনটি জেলার মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ছিল দূরে দূরে, ভাষা ও সামাজিক আচার আচরণের বৈশিষ্ট্য, সাঁওতাল সমাজকে সুচতুর ও কৌশলী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর শিকারে পরিণত

---

৫. Bengal under the Lieutenant—Governors by C. E. Buckland, Vol—1, 1902. বঙ্গপ্রদেশে ১৮৫৪ সালে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২,৪০০ এবং দেশীয় সৈন্য ছিল ২৯,০০০।

করেছিল। উপেক্ষিত হয়েছিল ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা, ব্রিটিশ আইনের জটিল পদ্ধতি শোষণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হতে সুরু হয়েছিল। বিদ্রোহটি ছিল এই শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে।[৬]

মানভূম ও পুরুলিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না। মহাবিদ্রোহেব সময় পাঁচেটের রাজা নীলমণি সিংহ যখন বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন, সাঁওতাল সমাজ তার নেতৃত্ব উত্তেজিত হযে উঠেছিল।

পাঁচেটের রাজা ভরতশেখর বা গরুঢ়নারায়ণের ছিল তিন পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রদের মধ্যে বড় ছিলেন চেৎসিংহ। ভরতশেখরের মৃত্যুর পর চেৎসিংহ রঘুনাথ নারায়ণ উপাধি নামে রাজা হয়েছিলেন পঞ্চকোটের।[৭] রাজা হবার মাত্র তিন বছর পরে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

চেৎ বা চেৎলাল সিংহের ছিল চার ছেলে।[৮] তাদের মধ্যে বড় ছিলেন জগজীবন। চেৎসিংহের মৃত্যুর পর তিনিই রাজা হয়েছিলেন। উপাধি নাম হয়েছিল গরুঢ়নারায়ণ। মহিষাড়া পরগণা নিযে এ সময় চেৎসিংহের সঙ্গে ভরতশেখরের ছোট ছেলে ভূপতিনাথের সঙ্গে মামলা হয়েছিল। মহিষাড়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পঞ্চকোট রাজ্যের।

জগজীবনের সঙ্গে কেন্তুঞ্জরের রাজকন্যার বিয়ে হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই রাজমহিষী রাজ্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জগজীবনের সময় রাজার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বা রাজ্যের রাজধানী ছিল কেশরগড়! জগজীবনের দেওয়ান ছিলেন তার সবচেযে ছোট ভাই রামজীবন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাজকার্য দেখাশুনা করতেন।

কেশরগড়েই জন্ম হয়েছিল নীলমণির সিংহের (১৮২৩ সালে)। মায়ের অভিভাবকত্বে তিনি বড় হয়ে ডঠেছিলেন। কেন্তুঞ্জরের রাজকন্যা, নীলমণির মাতা ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী ও বহু সদগুণের অধিকারিণী। মায়ের গুণাবলীর অধিকারী হয়েছিলেন নীলমণি। স্বাধীনতাস্পৃহা, দানশীলতা, ঔদার্য প্রভৃতি

---

৬. সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বীরভূম—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

৭. পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে চেৎসিংহ, শম্ভুনাথ ও ভূপতিনাথ। কন্যার নাম, পঞ্চমকুমারী। শম্ভুনাথ বাল্যকালে মারা গিয়েছিলেন। চেৎসিংহ রাজা হয়েছিলেন ১৮১৫ খ্রী, মারা গিয়েছিলেন ১৮১৮ খ্রী। ভূপতিনাথ প্রথমে পৈরী পরে কটরা ও কুশটাঁড় এবং শেষে নওড়াগড়ে বসবাস করেছিলেন। সব জায়গাতেই রাজকীয় বসবাসের চিহ্ন বিদ্যমান।

৮. জগজীবন, জগভূষণ, জগমোহন ও রামজীবন

গুণগুলি তিনি জন্মসূত্রে ও মায়ের সান্নিধ্যে থেকে লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। জমিদারীর কাজে জগজীবনের ঔদাসীন্যের ফলে রামজীবনের নেতৃত্বে পারিবারিক চক্রান্ত ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছিল। রাজমহিষীর চাপে রামজীবন দেওয়ানের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবু কেশরগড়ে রাণী ও শিশুপুত্রের নিরাপত্তা ছিল না। কাশীপুরে নতুন রাজভবন তৈরি করতে সুরু করেছিলেন রাজমহিষী। ১৮৩২ সালে সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল রাজধানী। কাশীপুরে এসে রাজমহিষী নিজেই জমিদারীর কাজকর্ম তদারকি সুরু করেছিলেন।

জঙ্গলমহল জেলারও পরিবর্তন হয়েছিল। বিন্যস্ত হয়েছিল নতুন করে। সৃষ্ট হয়েছিল মানভূম জেলা। ১৮৪১ সাল থেকে নীলমণি নিজেই জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশুনা করতে সুরু করেছিলেন। তখন তার বয়স আঠারো বছর। জমিদারীর কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে অবসর নিয়েছিলেন রাজমহিষী এবং বেড়ো গ্রামে গিয়ে বসবাস সুরু করেছিলেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

জমিদারীর কাজ অধিগ্রহণ করার পর নীলমণি সিংহ সেই বছরেই দুটি বিবাহ করেছিলেন।[৯] দশবছর পরে জগজীবন বা গরুড়নারায়ণের মৃত্যু হলে রঘুনাথ নারায়ণ উপাধি ধারণ করে রাজা হয়েছিলেন।[১০] কৈশোর থেকে জমিদারীর কাজ পরিচালনা করার ফলে এ বিষয় তিনি যথোপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতাই তাকে পরিপক্ক করে তুলেছিল। মহাবিদ্রোহে তার ভূমিকা সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে।

ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো এ সময় দ্রুত ও নির্দিষ্টভাবে রূপান্তরিত হয়ে চলেছিল। রূপান্তর প্রধানত ছিল অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাঠামোর। ১৮৩৩ সালের ভারত আইন অনুযায়ী বাংলার গভর্নর-জেনারেল রূপান্তরিত হয়েছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল ও বাংলার গভর্নরে। লর্ড ডালহৌসীর আমলে সৃষ্ট হয়েছিল বাংলার লেফটেনানট গভর্নরের পদ।[১১]

---

৯. প্রথম স্ত্রী ছিলেন সুরগুজার রাজকুমারী, নাম অনুপকুমারী। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন গিঞ্জাঠাকুর গ্রামের ঠাকুরসাহেবের বড়মেয়ে, নাম চিত্রকুমারী। পরবর্তীকালে আরও একটি বিয়ে করেছিলেন, তিনি ছিলেন সারোইকলার রাজকন্যা লাবণ্যকুমারী।

১০. ১৮৫১ খ্রী (পৌষ ১২৫৮ বাং) জগজ্জীবন মারা গিয়েছিলেন। সেই বছরেই অভিষেক হয়েছিল নীলমণি সিংহের।

১১. Sir Frederick James Halliday ছিলেন বাংলার প্রথম লে. গভর্নর। এই পদে তিনি ছিলেন ২৮ এপ্রিল ১৮৫৪ থেকে মে ১৮৫৯।

লে. গভর্নরের প্রশাসিত এলাকার আয়তন ছিল দুই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।[১২] উড়িষ্যাসহ ছোটনাগপুরের সমস্ত অঞ্চল মহাবিদ্রোহে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। রামগড় বাটালিয়নের সেনাদল বিভিন্ন বাহিনীতে ছড়িয়ে ছিল হাজারিবাগ, রাঁচি, পুরুলিয়া, চাইবাসা ও সম্বলপুরে। পদাতিক, অশ্বারোহী গোলন্দাজদের নিয়ে গঠিত ছিল সেসব বাহিনী।

১৮৫৭ সালের ৫ আগসট পুরুলিয়া ফেটে পড়েছিল বিদ্রোহে। ট্রেজারীতে ছিল এক লক্ষেরও বেশি টাকা, জেলখানায় কয়েদি ছিল দুই থেকে তিনশো। লুণ্ঠিত হয়েছিল ট্রেজারী, জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদিদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।[১৩] ইউরোপীয় অফিসারেরা পালিয়ে গিয়েছিলেন রানীগঞ্জে।

পুরুলিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তেইশ দিন পরে। সাঁওতাল ও কোলদের নিয়ে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল সেনাবাহিনী। বিভিন্ন সেনাদলে ছড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছাসেবক শিখদের নিয়ে ক্যাপটেন জি. এন. ওকস পুরুলিয়ায় অভিযান চালিয়েছিলেন ১, সেপ্টেম্বর। বিনা বাধায় পুনরায় অধিকৃত হয়েছিল পুরুলিয়া।

হাজারিবাগ জেলে ছিলেন ঝালদার রাজা। মহাবিদ্রোহের তরঙ্গ হাজারিবাগে ছড়িয়ে পড়লে জেল ভেঙ্গে রাজাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন বিদ্রোহীরা। ঝালদা ও রাঁচির মধ্যে পথটি রক্ষা করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছিল। পুরুলিয়া অধিকৃত হলে তিনি ক্যাপটেন ওকসের কাছে হাজির হয়েছিলেন। ছোট একটি বাহিনীসহ সাহায্যের অঙ্গীকার করেছিলেন ব্রিটিশদের। কিছু অর্থও তাকে দেওয়া হয়েছিল। জঙ্গলের পথগুলি দিয়ে বিদ্রোহীরা যাতে পুরুলিয়ায় ঢুকতে না পারে সেজন্য তদারকির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।

বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করেছিল পাঁচেট ও পাঁচেটের কাছাকাছি অঞ্চল সমূহে। ক্যাপটেন ওকস জানিয়েছিলেন মানভূমে সাঁওতালেরা উত্তেজিত, পাঁচেটের রাজা, নীলমণি সিংহ দেও অস্ত্র দিয়ে তাদের সজ্জিত করে তুলেছিলেন।

---

১২. বাংলার লে. গভর্নরের প্রশাসিত এলাকার মধ্যে ছিল বিহার (৪২ হাজার বর্গমাইল), বাংলা (৮৫ হাজার ব. মা), উড়িষ্যা (৭ হাজার ব, মা.), উড়িষ্যা করদ মহল (১৫,৫০০ ব. মা), ছোটনাগপুর ও করদরাজ্যসমূহ (৬২ হাজার ব. মা), আসাম (২৭,৫০০ ব. মা), আরাকান (১৪ হাজার ব. মা)।

১৩. Buckland, Vol—I, P 100.

প্রস্তুতি চলেছিল যুদ্ধের জন্য। রঘুনাথপুরে আদালত গৃহ ভস্মীভূত হয়েছিল, পুরনো দলিল-দস্তাবেজ ছাই হয়েছিল পুড়ে।

মহাবিদ্রোহের আগে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে ছিল সেখায়তী ব্যাটালিয়নের একাংশ। রামগড় ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করলে তারাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। অকটোবর মাসে রাণীগঞ্জে অস্থায়ী সামরিক শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল। নভেমবরে সেখায়তী ব্যাটালিয়নের একাংশ সহ কর্ণেল ফসটারকে পাঠান হয়েছিল মানভূমে। তিনি অর্তাকে'তে কাশীপুর অবরোধ করলে বন্দী হয়েছিলেন নীলমনি সিংহ। প্রাসাদ ও দুর্গে তল্লাসী চালান হয়েছিল, অধিকৃত হয়েছিল চারটি কামান।

বন্দী অবস্থায় নীলমনিকে প্রথমে পাঠান হয়েছিল শান্তিপুর। সেখান থেকে কলকাতায়। কলকাতায় তিনি ছিলেন ১৮৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। বিদ্রোহী সাঁওতালদের একাংশ জয়পুরে জমিদারকে আক্রমণ করেছিলেন। প্রতিহত হয়েছিল আক্রমণ।

মহাবিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহিদের বিদ্রোহ হিসাবে কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। দুই অভিমতই দুটি বিপরীত মেরুবিন্দুতে অবস্থিত। মহাবিদ্রোহের সূত্রপাতে পুরুলিয়ায় ছিল রামগড় ব্যাটালিয়নের ৬৪ জন সিপাহি ও ১২ জন সোওয়ার। বিদ্রোহে তাদের ভূমিকা ছিল নগন্য। মূল বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল নীলমনি সিংহ দেওয়ের নেতৃত্বে। মানভূমের উপজাতিবৃন্দ, বিশেষত সাঁওতাল সমাজ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পুরুলিয়ার অরণ্য অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে ধুমায়িত অসন্তোষ বিস্ফোরিত হয়েছিল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

ফাগুসনের অভিযানের পর থেকে অরণ্য অঞ্চলে বসতি বিন্যাসের দ্রুত রূপান্তর ঘটে চলেছিল। ছোটনাগপুরের রাজা ও স্থানীয় জমিদারেরা জমি বন্দোবস্ত দিতে সুরু করেছিলেন পাঞ্জাবী, মুসলমান, বিহারী ও বাঙ্গালীদের। বসতি ক্রমশ বেড়ে বেড়ে চলেছিল। উপজাতিদের সহজ, সরল ও অকৃত্রিম জীবন যাত্রায় নতুন মানুষদের প্রভাব শুভকর ছিল না। ছল, চাতুরী ও বঞ্চনা ক্রমশ গ্রাস করতে সুরু করেছিল। স্থানীয় জমিদারদের মধ্যেও বিক্ষোভ ঘন হয়ে উঠেছিল। চড়া হারে ধার্য হয়েছিল খাজনা, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সেনা বাহিনী, বকেয়া খাজনায় দায়ে কোমপানি খণ্ড খণ্ড করে নীলাম করতে সুরু করেছিল জমিদারী। সাধারণ মানুষ ও জমিদারেরা স্বার্থ রক্ষায় এক জোট হয়ে গিয়েছিলেন। উভয়ের

শত্রু আপাতভাবে এক না হলেও কোমপানি ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট নতুন শ্রেণী বিদ্রোহীদের চোখে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

নিষ্ঠুরভাবে মহাবিদ্রোহ দমিত হলেও, বিদ্রোহের চেতনা সম্পূর্ণভাবে স্তিমিত হয়নি কখনও। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ত। ১৮৬৯-৭০ সালে টুণ্ডির জমিদাব ও তার সাঁওতাল প্রজাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। ছোট-নাগপুরের তৎকালীন কমিশনার কর্ণেল ডালটন সযত্নে মিটিয়েছিলেন সে সংঘর্ষ। ১৮৮৪ সালে বরাভূমের ঘাটোয়ালদের সঙ্গে মেসার্স ওয়াটসন এণ্ড কোমপানির বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। উপক্রম দেখা দিয়েছিল মুখোমুখি সংঘর্ষের। বিরোধ মিটিয়েছিলেন রিজলে সাহেব।

মহাবিদ্রোহের কিছুদিন পরে ভূতত্ত্ববিদ মি. ভি. বল গিয়েছিলন মানভূমে।[১৪] পাঁচেটের রাজার আবাসস্থল ছিল তখন কাশীপুর। নীলমনি সিংহ দেও সেখানে থাকতেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে রাজার মনোভাব অনুকূল ছিল না।[১৫] বাংলায় একদা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত মানুষের তৈরি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল উড়িষ্যায়। এর আগেও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল কয়েকবার,[১৬] কিন্তু কখনও এমন বিধ্বংসী প্রকৃতি ছিলনা। দ্বিতীয়বার বাঁকুড়া ও মানভূম পরিভ্রমণের সময় বল স্বচক্ষে দেখেছিলেন সেই দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক পরিণতি।

দলে দলে মানুষ উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় এসেছিলেন দু'মুঠো আহার্যের সন্ধানে। অনশন ও ক্ষুধায় শীর্ণ, নিঃশব্দ মানুষগুলি ভিক্ষা চাইতেন কদাচিৎ। পথের ওপর বা পথের পাশে উন্মুক্ত প্রান্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন দলে দলে। মৃত্যুর পর মৃত্যু জমে উঠত, কংকালসার মানুষের মৃতদেহে তৈরি হয়ে যেত দুর্বিসহ নরক।[১৭] পুরীর

১৪, Jungle life in India—V. Ball, London. 1880. প্রথমবার গিয়েছিলেন নভেম্বর ১৮৬৫, দ্বিতীয়বার ১৮৬৬।

১৫. "He has on various occassions, especially during the mutiny, shown himself to be a mauvais Sujet, and not very amenable to the Constituted authorities."—V. Ball, P 59—60.

১৬. মারাঠাদের অধিকৃত থাকা কালে ১৭৭০, ১৭৮০ এবং ১৭৯২ খ্রী। ইংরেজদের অধীনে আসার পর ১৮০৩ সালে।

১৭, "They come in only to drop and expire, and increase the number of skeleton which in a field close by, constituted a Golgotha."—V. Ball,

রাজা দিব্য সিংহ দেবের নবম রাজকীয় বৎসরে বা অংকে ঘটেছিল এই দুর্ভিক্ষ, ফলে উড়িষ্যায় এটি ন-অংক-কাল নামে পরিচিত। অপব এক প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক, প্যারীমোহন আচার্য, দুর্ভিক্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'অনশনক্লিষ্ট শিশু সন্তানদের বন্য জন্তুর সামনে ছুঁড়ে দিতেন পিতামাতা। কেউ কেউ রাক্ষসের মত নিজেদের সন্তানকেই আহার করতেন।' প্রায দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষে। উড়িষ্যার সমগ্র জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মন্বন্তরের ফলে পুরুলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে নতুনকরে জন-আগমন ঘটেছিল উড়িষ্যা থেকে।

মহাবিদ্রোহের ফলে অভ্যন্তরীন প্রশাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। জনসাধারণের ওপর বড় বড় জমিদারদের প্রভাব যে কতখানি বিদ্যমান সে বিষয়ে তারা অবহিত হয়েছিলেন। প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে না রেখে প্রশাসনিক যন্ত্রে চক্র হিসাবে তাদের জুড়ে দেবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অনুগত ও সহায়ক জমিদারদের প্রদান করা হযেছিল উপাধি, খিলাত, এমনকি ভূসম্পত্তিও। সৃষ্টি হয়েছিল অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ।[১৮] ইউরোপীয় ম্যানেজমেনটে সৃষ্টি করা হয়েছিল বড় বড় জমিদারী।[১৯] মফঃস্বলে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল ভলানটিয়ার কোর বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। দেশীয় জমিদারেরা জনসাধাবণের কাছ থেকে ক্রমশ বিযুক্ত হয়ে চলেছিলেন।

ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও পরিব্যাপ্ত ছিল খ্রীস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ। মহাবিদ্রোহের পর মিশনারীরা তাদের কার্যকলাপ বাড়িয়ে চলেছিলেন। উসকে দিতে সুরু করেছিলেন উপজাতি সর্দারদের। খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে দাঁড় করিযেছিলেন স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে। ফলে স্থানীয় জমিদার, হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে মিশনারীদের মুখোমুখি

---

১৮ খিলাত দেওয়া সুরু হয়েছিল ১৮৫৭—৫৯। ১৮৫৯ সালে কিছুদিনের জন্য বর্জিত হয়েছিল, পরে তৎকালীন বাংলার লে. গভর্নর স্যার জে. পি. গ্রান্টের সময় ১৮৬১ সালে পুনরায় চালু হয়েছিল। খিলাতের মধ্যে প্রধান ছিল মহারাজা বাহাদুর, রাজা বাহাদুর ও রায় বাহাদুর এবং হজরত। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়োগ পাকাপাকিভাবে সুরু হয়েছিল ১৮৬০—৬১ সালে। গ্রানট কর্তৃক নিযুক্ত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা মফঃস্বলে ছিল ৪৫, কলকাতায় ৪৫।

১৯. মানভূমে এ ধরণের জমিদারী ছিল, মেসার্স ওয়াটসন এনড কোং, ও গিসবোর্ন এনড কোং।

সংঘর্ষের উপক্রম হয়েছিল। চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল রাঁচির লুথারিয়ান মিশন। উপজাতিদের মধ্যে যারা খ্রীস্টান হয়েছিলেন, জমি দখল করে নিতে সুরু করেছিলেন অ-খ্রীস্টান উপজাতিদের। বিদ্রোহের পর রাঁচির মিশন ক্ষতিপূরণ লাভ করেছিল। মিশনারী ও সরকারের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল খ্রীস্টান উপজাতিদের ওপর। দলে দলে খ্রীস্টান হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল উপজাতিদের মধ্যে। স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অত্যাচারের অভিযোগ তুলে উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য নতুন করে প্রনীত হয়েছিল আইন।[২০]

আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলে উপজাতি সমাজে বিপুল পরিবর্তনের ইংগিত সূচিত হয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থায় ভাঙ্গন, খ্রীস্টধর্মের প্রভাব ও প্রসার, গ্রামীন ব্যবস্থায় প্রাচীন খুঁটকাটি প্রথার বিপর্যয়, অনিবার্য-ভাবে উপজাতি সমাজে পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন এনে দিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ পাঁচ বছর এই প্রয়োজন বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে উলগুলান বা বিদ্রোহের আকারে রাঁচি জেলায় অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। মানভূম ও রাঁচি কাছাকাছি হবার ফলে বিদ্রোহের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল মানভূমেও।

১৮৭৫ সালের এক বৃহস্পতিবারে জন্ম হয়েছিল বীরসার। পিতার নাম সুগন মুণ্ডা, মাতা কার্মি। অধিকাংশ মুণ্ডা পরিবারের মত বীরসার পরিবারকেও অন্ন সংস্থানের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে বসতি করতে হত।[২১] বীরসার জন্মের আগেই সুগন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, প্রচারক হয়েছিলেন জার্মান মিশনের। শৈশবেই বীরসা দীক্ষিত হয়েছিলেন খ্রীস্টধর্মে। ধর্মান্তরিত হবার পর নাম হয়েছিল দাউদ মুণ্ডা বা দাউদ বীরসা। মুণ্ডা সমাজের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী, বীরসার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিধৃত হয়ে আছে লোক সঙ্গীতের টুকরো টুকরো বিবরণে।

---

২০. The Chota Nagpur Tenures Act of 1869.

২১. সুগন মুণ্ডার জন্মস্থান ছিল উলিহাতু। কারও কারও মতে উলিহাতু ছিল বীরসারও জন্মস্থান। সেখানে সুগন ও বীরসার অস্থি রক্ষিত আছে। কারও মতে বীরসার জন্মস্থান চালকাদ, কারও মতে বাম্বা। —The Dust—Storm and Hanging Mist by Dr Suresh Singh, 1966.

সুরয উঠল চালকাদে, ও বীরসা যেন তু
উজল হল নাগপুর বাড়লি যত তু
সুগণ মুণ্ডার কুঁড়ের ঘরে জনম লিল তু।[২২]

বোহন্দার জঙ্গলে বীরসা যেতেন মেষ চরাতে। কোমরে বাঁধা বাঁশি, হাতে লাউয়ের খোলা দিয়ে তৈরি টুইলা বা একতারা। চমৎকার বাঁশি বাজাতেন বীরসা, আখড়ায় নাচে গানে কাটত সময়। কখনও কখনও তার মুখে অদ্ভুত কথা শুনে অবাক হয়ে যেতেন সঙ্গীরা।

বুরজুর জার্মান মিশন থেকে লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। আপার প্রাইমারীতে পড়ার জন্য গিয়েছিলেন চাইবাসায়। চাইবাসায় বীরসা ছিলেন প্রায় চার বছর। ড. নটর্টের সমালোচনা করার জন্য তিনি মিশন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। চাইবাসা ছেড়ে আসার পর পরিবারসহ বীরসা জার্মান মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন। নতুন করে নাম লিখিয়েছিলেন রোমান ক্যাথলিক মিশনে। এই সংযোগও ছিল অল্প কালের। পরে আবার মুণ্ডাদের আদিম ধর্মীয় বন্ধনে ফিরে গিয়েছিলেন।

ষোল বছর বয়সে বীরসা, আনন্দ ও তার ভাই সুখনাথ পাঁড়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আনন্দ পাঁড়ে ছিলেন বাধগাঁওয়ের জমিদার জগমোহন সিংহের মুনশি। ধর্মে বৈষ্ণব, জীবন যাপনে সন্ন্যাসী। বীরসার ওপর তার প্রভাব ছিল গভীর। পৈতে নিয়েছিলেন বীরসা, চন্দনের তিলক কাটতেন কপালে, গো-বধ নিষিদ্ধ করেছিলেন, পুজো করতেন তুলসী গাছ। খ্রীস্ট ও বৈষ্ণব ধর্মের আদলে গঠিত হয়েছিল তার ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রটি।

কোল বিদ্রোহের স্মৃতি মুণ্ডাদের সমাজে কাঁচা ক্ষতের মত লেগেছিল। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বন থেকে বিতাড়িত হবার আশংকা। নতুন আইন অনুসারে[২৩] সিংভূম, পালামৌ ও মানভূমে সেটেলমেনট অপারেশন চলছিল। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন সর্দারেরা। পাঁড়েদের ছেড়ে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন সর্দারদের সঙ্গে।

---

২২. চালকাদ হাতুরে বীরসা, সিঙ্গীলিকাঅম তুরোলেনা / হায়াজনহঅম মতজন, গোটা নাগপুরেম মারসালকেদা / সুগুনা মুন্ডা অ সিরিজাত অররে জনম গোছা অম অগুলেদা।

২৩. Indian Forest Act VII of 1878.

কৈশোর থেকে ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটছিল যৌবনে। বীরসা পরিণত হয়েছিলেন বলিষ্ঠ, সুন্দর, বুদ্ধিমান ও কৌশলী যুবকে। মাথায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, সুগঠিত শরীর, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ, প্রশান্ত মুখমণ্ডল। গায়ের রং সাধারণ মুণ্ডাদের তুলনায় অনেক হালকা। খ্রীস্ট ধর্ম ছেড়ে, পাঁড়েদের সংস্পর্শ ছিন্ন করে, বীরসা ফিরে গিয়েছিলেন অরণ্যে। সর্দারদের বিক্ষোভ সেখানে কালবৈশাখীর মেঘের মত একটু একটু করে জমা হতে সুরু করেছিল।

এক জ্যৈষ্ঠের দিনে, বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে, বীরসার চিন্তা ও চেতনা আমূলভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন ঘরে আবদ্ধ থেকে ঘোষণা করেছিলেন ঈশ্বরের কৃপা তার ওপর বর্ষিত হয়েছে। কাতুই গ্রামে মহামারীর প্রকোপ প্রশমিত করার পর বীরসার খ্যাতি বেড়ে চলেছিল। সেই সময় একদিন তিনি নিজেকে 'ধরতী আবা' বা ধরনীর পিতা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।[২৪]

লোকের মুখে মুখে লোকগাথায় ধরতী আবার আবির্ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছিল—

গহন গভীর বনে চালকাদ হাতুরে
ধরতী আবা জনম লিল রে···[২৫]

তার চোখে নতুন দৃষ্টি, মুখে নতুন কথা, মুণ্ডাদের তিনি পরিত্রাতা। দলে দলে মানুষ তাকে দেখতে ছুটেছিলেন।

চলো তারে দেখে আসি চলো তার কাছে
চলো তার কাছে
চাল ছাতু ইঁড়ি নিয়ে থাকব সেখানে
চলো, থাকব সেখানে।[২৬]

বীরসা প্রথমে ছিলেন ঈশ্বরের দূত। পরে হয়ে উঠেছিলেন বীরসা

---

২৪. একদিন বজ্রঝড়ের মাঝখানে বীরসার মা তাকে ছেলে বলে ডাকলে, বীরসা তাকে বলেছিলেন তিনি 'ধরতী আবা'। এরপর থেকে তাকে যেন সেইভাবেই ডাকা হয়।
—Dr. Suresh Singh. এ ঘটনা ঘটেছিল সম্ভবত ১৮৯৫ সালে।

২৫. 'বীর দিশম চালকাদ হাতুরে ধরতী আবাদোও জনমলেনা' Quoted by Dr. S. Singh,

২৬. নেরেআবু সেনেআবু দোলাতিবু লেলজোমা / দোলাতিবু লেলজোমা হাতু চাউলি ইড়িকেতে দেয়াইআবু বাসাইআবু / দেয়াইআবু বাসাইআবু।

ভগবান। অসুর নিধনকারী খাসরা কোড়ার অবতার। নতুন রাজা, মুণ্ডা সমাজ তার পাশে এসে সমবেত হয়েছিলেন। মুণ্ডাদের দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষোভ, ক্রোধ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠে। 'জেগে ওঠ তোমরা, দূর করে দাও বিদেশীদের, প্রতিষ্ঠা করো মুণ্ডা রাজ। বীরসা ছাড়া কোন সরকারের তোমরা অধীন নও।' বীরসার কার্যকলাপ, প্রতিবাদ, মিশনারীদের মাধ্যমে সরকারের গোচরীভূত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালের আগসটে চালকাদে ছ'হাজার সশস্ত্র মানুষের সমাবেশ সরকারী কর্তৃপক্ষকে ত্রস্ত করে তুলেছিল। জেলার পুলিস সুপারিনটেনডেনট জি. আর. কে মেয়ার্স স্বয়ং গিয়েছিলেন তাকে গ্রেপ্তার করতে। রেভ. লাসটি নিয়ে গিয়েছিলেন পথ দেখিয়ে। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বীরসা। দু বছরের জন্য দণ্ডিত হয়েছিলেন কারাদণ্ডে।

৩০ নভেমবর ১৮৯৭ সালে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষে রাঁচি অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছিল। বীরসার অনুগামীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একদল ছিলেন তার ধর্মীয় কার্যকলাপে অনুগত, অপবদল বিদ্রোহের জন্য সংগঠিত হযে চলেছিলেন। অনুচরদের সঙ্গে নিযে পূর্বপুরুষদের আবাস ক্ষেত্রগুলি পরিভ্রমণ কবেছিলেন বীরসা, তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরববোধ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল আরও ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল বিদ্রোহের তীব্রতা। খ্রীস্টমাসের আগেব দিন একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছিল সিংভূম জেলার চক্রধরপুর, রাঁচি জেলার খুন্তি, কাড়বা, তোরপা, তামার ও কাসিয়ার থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি। বৃষ্টির মত তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল মিশনগুলিতে। কিছু ইউরোপীয়, হিন্দু ও খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত মুণ্ডা নিহত ও আহত হয়েছিলেন। টনক নড়েছিল সরকারের। বৃদ্ধ, নারী, শিশু -মুণ্ডা সমাজের আবাল বৃদ্ধ বণিতা অস্তিত্ব রক্ষায় ধারণ করেছিলেন অস্ত্র।

শৈল রাকাবে শেষ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমবেত হয়েছিলেন বিদ্রোহীরা। সঙ্গে বালুয়া, টাঙ্গি, তীর ও ধনুক। সেদিন ছিল ১৯০০ সালের ৯ জানুয়ারি। দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল শৈল রাকাব। এক বাহিনীতে ছিলেন ছোটনাগপুর ভুক্তির কমিশনার, আর্থার ফরবেস স্বয়ং, সঙ্গে কর্ণেল ওয়েসটমোরল্যাণ্ড। তারা এগিয়েছিলেন বাধগাঁও, বুরুজু ও সাইকো হয়ে। অপর দলে ছিলেন রাঁচির ডেপুটি কমিশনার এইচ. সি. স্ট্রেটফিল্ড ও ক্যাপটেন রোচে। প্রায় নিরস্ত্র বিদ্রোহীরা কলাগাছের মত ভূপাতিত হয়ে-

ছিলেন। মুণ্ডা রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল শৈল রাকারের কঠিন শৈল স্তূপ। ব্যাপক ধরপাকড়ের মাধ্যমে বিদ্রোহের সবটুকু বহ্নি নির্বাপিত করার উদ্যোগে নিয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ।

ধরা পড়েছিলেন বীরসাও। তাকে আনা হয়েছিল রাঁচির জেলখানায়। সেখানে বিচারের প্রহসন চলেছিল কিছুদিন। বিচারকালেই রহস্যময় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছিল রহস্যময় এই জীবনটির। কেউ কেউ বলেন জেলে থাকাকালে বীরসা আক্রান্ত হয়েছিলেন কলেরায় এবং সেটিই ছিল তার জীবনান্তের কারণ। তখন তার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর।

জীবনের এই স্বল্পকালের মধ্যে অত্যাশ্চর্য যুবকটি মুণ্ডা সমাজে যে অভূতপূর্ব জাগরণ এনে দিয়েছিলেন, যেভাবে তাদের গৌরববোধ ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অধিকার রক্ষার জন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন সশস্ত্র বিদ্রোহে, ইতিহাসে তেমন নজীর খুব বেশি পাওয়া যায় না। গান্ধীজী যেভাবে ভাবতীয় জনগণকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, বীরসাও তেমনিভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন মুণ্ডা সমাজকে, নিজেদের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মুণ্ডাদের। ব্যর্থ হয়েছিল বীবসা ও মুণ্ডাদের বিদ্রোহ কিন্তু তার প্রভাব ও আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি। পরাধীনতা, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সমগ্র অবণ্য অঞ্চল নিজেদের ক্ষেত্রটি নতুন করে আবিষ্কার করার প্রথম আলোক বেখাটি দেখতে পেয়েছিল। বীরসা মুণ্ডার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল তাদেব প্রথম জাতীয় নেতা। পরিত্রাতাকে।

৩. স্বাধীনতা আন্দোলন

মানভূম ও পুরুলিয়া

নমো মানভূমি
পাতিয়াছ তুমি
স্নেহের আঁচলখানি।—মুক্তি, ১৩৩

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মানভূমের ভাগ্য জড়িয়ে গিয়েছিল বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের সঙ্গে। বিহারই ছিল মুখ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা তখনও বিহারে দানা বাঁধেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলেজ খোলা হয়েছিল পাটনায়। বছর দুয়েক পরে সেটি ডিগ্রি কলেজে পরিণত হয়েছিল।[১] সংবাদপত্রও ছিল না তখন।[২]

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার বাইশ বছর পরে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল (১৯০৮)। আলি ইমাম ছিলেন প্রেসিডেনট, মৌলানা মজারুল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই বছরেই এপ্রিল

---

১. পাটনায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৩ সালে। সেটি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়েছিল ১৮৬৫-৬৬ সালে।

২. বিহার প্রদেশে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা ছিল উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হত মজঃফরপুর থেকে, নাম আখবারুল—আখিয়ার (Akhbarul—Akhiar) পত্রিকাটি প্রকৃতপক্ষে Bihar Scientific Society (1868) থেকে প্রকাশিত হত। 'বিহার বন্ধু' (১৮৭৩) ছিল প্রথম হিন্দী পত্রিকা। বিহারে বসবাসকারী বাঙালীরা বের করেছিলেন প্রথম ইংরেজি পত্রিকা 'Bihar Herald' (1875)।

মাসে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বোমা ছুঁড়ে সারা ভারতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।[৩] চম্পারণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

বিহারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেক আগে বাংলায় রাজনৈতিক চেতনা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। এমনকি সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য গোপন সমিতিও গঠিত হয়ে গিয়েছিল।[৪] মানভূমে এসব ঢেউ এসে পৌঁছেছিল অনেক পরে। প্রকৃতপক্ষে মানভূমে কংগ্রেস রাজনীতির সূচনা করেছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও পরিব্যাপ্ত করেছিলেন রাজনৈতিক চেতনা। নিজের ঋষিকল্প জীবনযাপনের মাধ্যমে অসংখ্য অনুগামীর সৃষ্টি করেছিলেন। তার আদর্শ ও সাহচর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র জেলা। রাজনৈতিক চেতনার ব্যাপক উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন অনুগামীরা। চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। জেলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মাহাত সম্প্রদায়ের অগ্রণী শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

নিবারণচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ঢাকা জেলায়।[৫] ছাত্র ছিলেন বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন সহপাঠী। ছাত্রাবস্থায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কলেজের শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবন সুরু করেছিলেন মেদিনীপুরে। স্কুলের সাব-ইন্‌সপেক্টর। ঝাড়গ্রাম, কাঁথি ও তমলুক মিলিয়ে প্রায় দশ বছর ছিলেন মেদিনীপুর জেলায়। বদলি হয়ে এসেছিলেন মানভূমে। প্রথমে মানবাজার, পরে ঝালদায়। ইতিমধ্যে বিটি পাশ করেছিলেন, লোকান্তরিত হয়েছিলেন সহধর্মিণী। পুরুলিয়া জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।[৬] নিযুক্ত হয়েছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিবারণচন্দ্র যেখানে যেতেন সেখানেই সান্ধ্য বৈঠকের

---

৩. বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ৩০ এপ্রিল ১৯০৮। কলকাতার একদা প্রেসিডেনসী ম্যাজিস্ট্রেট ও মজঃফরপুরের জেলা জজ মিঃ কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ভুল করে মি. পিংলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যাকে নিহত করেছিলেন।

৪. প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতীয় অনুশীলন সমিতি'র উদ্বোধন হয়েছিল ২৪ মার্চ, ১৯০২। সমিতি গঠিত হবার কিছুদিন পরে সমিতির অধিকর্তা ব্যারিস্টার পি. মিত্র নামটি ছোট করে রেখেছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'।

৫. ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার গাউপাড়া গ্রামে, ১২ বৈশাখ ১২৮৩ (এপ্রিল, ১৮৭৬)।

৬. মেদিনীপুর জেলা থেকে মানভূমে বদলি হয়ে এসেছিলেন ১৯১১ সালে। পুরুলিয়া জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক ১৯১৪ এবং প্রধান শিক্ষক ১৯১৫ সালে।

ব্যবস্থা করতেন। গীতাপাঠ, ধর্ম ও দর্শন আলোচনা এবং সেই সঙ্গে সামাজিক অবস্থার কথাও সবিশেষ আলোচিত হত। কাঁথিতে থাকার সময় একবার রাজনৈতিক সন্দেহে তার ঘরে খানাতল্লাসী চলেছিল। মানভূম জেলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জেলায় রাজনৈতিক সংগঠন বলতে তখন কিছুই ছিলনা।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিনহা ছিলেন বিহার ও উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর।[৭] গভর্ণর হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।[৮] অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে নাগপুর অধিবেশনে পাকা হয়েছিল সিদ্ধান্তটি। ঢেউটি মানভূমে এসেও লেগেছিল। বিহার-উড়িষ্যা লেজিসলেটিভ কাউনসিলে তখন মানভূম থেকে দুজন সদস্য ছিলেন। উত্তর মানভূম থেকে ছিলেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ মানভূম থেকে রায়বাহাদুর জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়।[৯]

কলকাতা ও নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল ব্যাপক কর্মসূচী। সেসব কার্যকর করতে মানভূমে এগিয়ে এসেছিলেন নিবারণচন্দ্র। তেইশ বছরের চাকরি ছেড়ে সামিল হয়েছিলেন আন্দোলনে। আংশিক পেনশনও গ্রহণ করেন নি। চাকুরি-হীন, গৃহহীন নিবারণচন্দ্র নিজের সংকল্পে ছিলেন অটল। সঙ্গে দুই পুত্র ও তিন কন্যা। সহকর্মী উপেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত তাকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয়

---

৭ লর্ড সিনহা গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন ২৯ ডিসেমবর ১৯২০। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম একটি প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন (১. ১. ১৯১৫) এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন (ডিসেমবর, ১৯১৫)।

৮ কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪ সেপটেমবর ১৯২০। তাতে অসহযোগ আন্দোলনের মূল প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল—(১) খেতাব ও সাম্মানিক পদ বর্জন। (২) সরকারী দরবার ও অনুষ্ঠান বর্জন। (৩) সরকারী স্কুল ও কলেজ গুলি থেকে দফায় দফায় ছাত্রদের ছাড়িয়ে নেওয়া এবং জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা। (৪) একসঙ্গে ব্রিটিশ কোর্ট বর্জন এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি। (৫) মেসোপটেমিয়ার যাবার জন্য সব রকম নিয়োগে অংশগ্রহণ না করা। (৬) সংস্কার কাউনসিলে প্রার্থী ও ভোট দেওয়া বর্জন। (৭) বিদেশী দ্রব্য বর্জন। —History of Freedom Movement in India, vol-III by R. C. Majumdar (1977).

৯. Bihar and Orissa in 1921—G. E. Owen, 1921.

দিয়েছিলেন। নিবারণচন্দ্রের সংকল্প ও ত্যাগ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন জেলার সচেতন শ্রেণীর একাংশ। তাদের মধ্যে অধিকাংশ পেশায় ছিলেন উকিল, ওকালতি ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যথা, উপেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, জীমূতবাহন সেন প্রভৃতি।

নিবারণচন্দ্রের মত অতুলচন্দ্রও সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। জন্ম বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে। শৈশবে অযোধ্যায় কাকার কাছে কিছুকাল কাটাবার পর, পুরুলিয়ার মেসোমশায়ের কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ওকালতিও সুরু করেছিলেন পুরুলিয়ায়। ওকালতি ছেড়ে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন কংগ্রেসের কাজে। পুরুলিয়া সহরে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই জামাতা, কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[১০] ও নুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় থাকতেন পুরুলিয়ায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা মাও বাড়ি কিনে পুরুলিয়া সহরে থিতু হয়েছিলেন। জীমূতবাহন সেনের বাবা শরৎচন্দ্র ও বাঁকুড়ার রজনীকান্ত সরকার দুজনেই ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। কংগ্রেসের সঙ্গে তাদেরও যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

উপেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের আশ্রয় ছেড়ে নিবারণচন্দ্র পুরুলিয়া স্টেশনের কাছে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাম শিল্পাশ্রম। নিজের মত আদর্শ ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন কর্মীও তার পাশে এসে সমবেত হয়েছিলেন। স্টেশনের কাছ থেকে আশ্রম উঠে গিয়েছিল নীলকুঠি ডাঙ্গায়। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য সেখানে দেশলাই কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'তিলক জাতীয় বিদ্যালয়।' বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মনি বাঈজীর বাড়িতে। পরে সেটি স্থানান্তরিত হয়েছিল ভাগাবাঁধ পাড়ায়। কংগ্রেস সংগঠন মানভূম জেলায় একটু একটু করে বেড়ে চলেছিল।

নীলকুঠিডাঙ্গাতেও আশ্রম ছিলনা বেশীদিন। স্থানান্তরিত হয়েছিল নডিহায়। সেখান থেকে উঠে গিয়েছিল দেশবন্ধুর বাড়ির পাশে। সেখানেই নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্রের পরিবারবর্গ একত্র মিলিত হয়েছিলেন। মিলিত হয়েছিলেন

---

১০. কর্ণেল উপেন্দ্রনাথের ছেলে ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। দেশবন্ধুর বাবা মাও এখানে থাকতেন। অ্যামেরি সাহেবের কুঠিটি সি. আর. দাশ কিনে নিয়েছিলেন। পুরুলিয়ার নিস্তারিনী কলেজ প্রকৃতপক্ষে সি. আর. দাশের মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির নাম ছিল 'আনন্দমঠ'। এখন সেখানে রিফর্মেটারী স্কুল।—সাক্ষাৎকার, অশোক চৌধুরী, পুরুলিয়া ২৪. ৮. ১৯৮৯।

আরও অনেক কর্মী। মানভূম জেলায় রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে শিল্পাশ্রমের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পুরুলিয়া সহরে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে।[১১] মহাত্মা গান্ধী সেই প্রথম পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের মধ্যে গিয়েছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মৌলানা মঝারুল হক। অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেলা স্কুলের পেছনে জীমূতবাহন সেনদের জায়গায়। গান্ধীজী তখন বেশ কয়েকদিন ছিলেন পুরুলিয়ায়।[১২] অধিবেশনের পরে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'দেশবন্ধু প্রেস' ও 'মুক্তি' পত্রিকা। মানভূম জেলায় জনমত গঠন ও রাজনৈতিক চেতনা প্রসারিত করার কাজে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মুক্তি ছিল সাপ্তাহিক পত্র, দাম এক আনা, সম্পাদক নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত[১৩]। ব্রিটিশ রাজশক্তির রোষ বারবার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটির ওপর এসে পড়েছিল। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল পত্রিকা ও প্রেস। তবু সেই দুর্বিপাক উপেক্ষা করে পত্রিকাটি আজও পর্যন্ত টিঁকে আছে।

রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠক হিসেবে নিবারণচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত বাঁকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের বিষ্ণুপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মানভূম জেলার নানা জায়গায় সংগঠনের কাজ জোরদার হয়ে উঠেছিল। পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক অতুলচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা করেছিলেন চার আনা পয়সা বা দুশো গজ সুতো কেটে দিলে কংগ্রেসের সদস্য হওয়া যাবে। তিলুড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিক্ষাশ্রম।[১৪] তুলিনে যুব সম্প্রদায় কর্তৃক জাতীয় সপ্তাহ

---

১১ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক জীমূতবাহন সেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ। 'অন্নদার কথা'—অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়। কমিটির অধিবেশনে জীমূতবাহন সেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। গঠিত হয়েছিল মানভূম জেলা কমিটি (১৯২৫): সভাপতি নিবারনচন্দ্র দাশগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পাদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ।

১২. ছিলেন প্রায় সাতদিন, দেশবন্ধুর বাংলোয়।—মুক্তি, ৯।৯ (২. ২. ১৯৪৮)। অশোক চৌধুরীর কথায় ছিলেন শচীন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ি।

১৩. ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল ৬ পৌষ ১৩৩২; ইংরেজি ২১ ডিসেমবর ১৯২৫।

১৪. তিলুড়ি বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে। শিক্ষাশ্রম উদ্বোধন করেছিলেন পঞ্চকোটের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহদেও (১৯২৬)।

বিরাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছিল।[১৫] ঝালদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুব সমিতি (১৯২৬)। সভাপতি ছিলেন নিবারণচন্দ্র। কংগ্রেস কমিটিও গঠিত হয়েছিল ঝালদায়।[১৬] কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায়।[১৭] কাউনসিলের জন্য নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে বছর।[১৮] সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড আরউইন বেড়াতে গিয়েছিলেন ধানবাদে। দেড়শো ফুট গভীর খাদে নেমে দেখেছিলেন কয়লা কাটা। দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারে চাঁদা তোলার জন্য গান্ধীজীও গিয়েছিলেন ধানবাদ ও ঝরিয়ায় (১৯২৭)। ছিলেন ধানবাদে গুণেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ি। হাজারিবাগ থেকে কোলেরা চরকাসহ তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। চরকা কেটে দেখিয়েও দিয়েছিলেন।

বি. এন. আর কোমপানির প্রায় চল্লিশ হাজার কর্মচারী সেসময় ধর্মঘট করেছিলেন। রেলকোমপানির দুটি বড় বড় স্টেশন খড়গপুর ও আদ্রায় তীব্র হয়ে উঠেছিল আন্দোলন। গুলি চলেছিল খড়গপুরে।[১৯] আহত হয়েছিলেন তের জন, চোদ্দ জন ধৃত। আদ্রা স্টেশনে শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি ভি. ভি. গিরির ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল পুলিস। 'শ্রমিক' পত্রিকার সম্পাদিকা সন্তোষকুমারী গুপ্তা শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য আদ্রায় একটি ভাণ্ডার খুলেছিলেন। বছরের শেষ দিকে হঠাৎ পুরুলিয়ায় এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র।[২০] ছিলেন দুদিন। দেখা করেছিলেন বাসন্তীদেবীর সঙ্গে। এর কিছুদিন আগে এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।[২১]

---

১৫. অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল ১৩ এপ্রিল ১৯২৬। সভাপতি—বানেশ্বর লায়েক, সম্পাদক—করালীকুমার কুণ্ডু। নিবারণচন্দ্র তখন তুলিনে গিয়েছিলেন।

১৬. সভাপতি—শিবনারায়ণ লাল যশোয়াল।

১৭. রঘুনাথপুরে—শ্রীলাল সিংহানিয়া, আদ্রায়—ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মচারী, বরাহবাজারে—যতীশচন্দ্র সিংহ মোদক, বান্দোয়ানে—কিশোরী সিং সর্দার, গোপালপুরে—হারাধন কুম্ভকার, তুলিনে—সৃষ্টিধর মাহাত, ইছাগড়ে—কালীপদ মুখোপাধ্যায়, নয়াগড়ে—বংশীধর লালা, ও পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে লাবণ্যপ্রভা ঘোষ।

১৮. ছোটনাগপুর কেন্দ্র থেকে কাউনসিলের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন জীমূতবাহন সেন, উত্তর মানভূম গ্রাম্য কেন্দ্র থেকে গুণেন্দ্রনাথ রায়।

১৯. ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৭। গুলি চালিয়েছিল BNR Auxiliary Force. ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন ২০ হাজার শ্রমিক।

২০. ২২ অকটোবর ১৯২৭।

২১. ২৯ সেপটেমবর ১৯২৭।

কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সংগঠনও একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল মানভূমে। ললিতকিশোর মিত্রের সভাপতিত্বে হিন্দুসভা গঠিত হয়েছিল পুরুলিয়ায়।[২২] রঘুনাথপুরে ফণীভূষণ দত্ত কৃষি দপ্তরে কাজ করতেন। গোলকুণ্ডা গ্রামে তিরিশ বিঘা জমি নিয়ে কৃষি ফার্ম তৈরি করেছিলেন।[২৩] ফার্মটি ছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মগোপনের আশ্রয়। রামচন্দ্রপুরে 'আর্য আশ্রম' নামে একটি বর্ণচোরা বৈপ্লবিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল (১৯১৮) অন্নদা কুমার চক্রবর্তীর উৎসাহে। নেতাজীর পরামর্শে সেটি 'মানভূম কর্মী সংসদে' রূপান্তরিত হয়েছিল (১৯২৮)।

প্রকৃতপক্ষে অন্নদা কুমারের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রামচন্দ্রপুরে মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন অধিবেশনের সভাপতি। অন্নদাকুমার ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।[২৪] হাজার হাজার মানভূমবাসী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এক স্বরে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন।

'আমি ভগবানকে সাক্ষী করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যতদিন দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন কোনরূপ বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিব না এবং স্বদেশজাত বস্ত্র গ্রহণ করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন। বন্দেমাতরম্।'

বাঁকুড়া ও রঘুনাথপুর হয়ে সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন রামচন্দ্রপুরে। ভাষণ দিয়েছিলেন রঘুনাথপুরে আয়োজিত জনসভায়। অধিবেশনে মানভূমের জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল।

---

২২. গঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। কোষাধ্যক্ষ—সুরেশচন্দ্র সরকার, সাধারণ সম্পাদক—উপেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত।

২৩. ফণীন্দ্রনাথ রঘুনাথপুরে এসেছিলেন ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে। ফার্ম তৈরি করেছিলেন ১৯২৯ সালে। চাকরি ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন ১৯৩০ সাল থেকে। রঘুনাথপুরে অপর যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শশাংকশেখর চৌধুরী।—সাক্ষাৎকার, শশাংকশেখর চৌধুরী, ২৩. ৮ ৮১।

২৪. অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২ ও ২৩ ফাল্গুন ১৩৩৪ বাং, এপ্রিল ১৯২৮। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য অফিস-বিয়ারারদের মধ্যে ছিলেন সম্পাদক—দুর্গাদাস রায়, সহ সম্পাদক—ফকিরচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, কোষাধ্যক্ষ—কালীপদ রায়। এ ছাড়া ছিলেন সর্বেশ্বর রায় ও রতনমণি গোস্বামী। ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র আর একবার পুরুলিয়ায় এসেছিলেন জামশেদপুর থেকে। বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে।

রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মচাঞ্চল্য শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, গৃহের অঙ্গন ছেড়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন মহিলারাও। গঠিত হয়েছিল মহিলা সভা। মহিলা সভার অধিবেশন বসেছিল ১৯২৮ সালের সেপটেম্বর মাসে, নীলকুঠি ডাঙ্গায় কেশবচন্দ্র সরকারের বাড়ি। সভানেত্রী ছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী।[২৫] ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে মানভূম থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলা ছিলেন একজন। নাম শেফালিকা বসু।

সেই বছরেই ঝালদায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। সত্যকিংকর দত্ত ছিলেন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। বসবাস ছিল ঝালদায়। ঝালদার রাজার নানা রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন আন্দোলন। সেদিন ছিল মঙ্গলবার; ১০ ডিসেম্বর ১৯২৮। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের কাছে সদর রাস্তা, রাঁচি রোড়ের ওপর হঠাৎ তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন হরকু কান্দু। রাজার নিয়োজিত লোক হরি ঠাকুর ওরফে হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ মাখান কুড়ুল দিয়ে তাকে আঘাত করেছিলেন। তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তিন দিন পরে সত্যকিংকর মারা গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা, বালিকা পত্নী, সত্যকিংকরের মৃত্যুতে ঝালদা ও পুরুলিয়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।[২৬]

শিল্পাশ্রম শেষবার জায়গা বদল করেছিল ১৯২৮ সালে। পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মহাপ্রাণ হরিপদ দাঁ তেলকল পাড়ায় আশ্রমের জন্য একখণ্ড জমিসহ বাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। শিল্পাশ্রম এখনও সেই জায়গাতেই বিদ্যমান। ১৯২৮ সালে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ অন্নদাকুমার ও সুরেন নিয়োগী সিংভূম জেলার প্রধান সহর চাঁইবাসায় একটি কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্থাপিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জন প্রেস। তরুণশক্তি (১৯২৮) নামে একটি পত্রিকা সেখান থেকে প্রকাশিত হত।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে লাল বিপ্লবের ছায়া আশংক্ষা করে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার। গৃহীত হয়েছিল দমনমূলক নীতি। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আঘাত দেবার পরিকল্পনা নেওয়া

---

২৫. অধিবেশনে সর্বাগ্রে বক্তৃতা দিয়েছিলেন দেশবন্ধুর মেয়ে কল্যাণীদেবী। আর যারা ভাষণ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন নীহারবালা দেবী, লতিকাদেবী ও তরুলাদেবী (হুটমুড়া)। সভায় উপস্থিত ছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

২৬. ঝালদার মানুষ অসহায়ভাবে বলেছিলেন, "গেলি কিরে সত্য, সত্যের কাছে জানাতে দেশের অবিচার। সুধাতে কি তাঁর চরণ ধরে, কবে হবে এর প্রতিকার?"

হয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল একত্রিশজন প্রথম সারির নেতাকে।[২৭] তাদের বিরুদ্ধে জাল বোনা হয়েছিল ষড়যন্ত্রের, সাজান হয়েছিল মামলা। মামলাটি 'ঝীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' নামে সুপরিচিত। দমন নীতির অনুসঙ্গ হিসেবে প্রেস ও প্রকাশনার ওপর আঘাত এসে পড়েছিল, কিছু পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও মুদ্রকদের।

বিহারে তিনটি পত্রিকার ওপর পড়েছিল আঘাত। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত 'মুক্তি', চাঁইবাসা থেকে প্রকাশিত 'তরুণশক্তি' ও 'সার্চলাইট'। মুক্তির সম্পাদক ছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, মুদ্রক সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। উভয়েই গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তরুণশক্তির জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অন্নদাকুমার চক্রবর্তী, সার্চলাইটের জন্য মুরলি মনোহর প্রসাদ।[২৮] পুরুলিয়ার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার, ছোটনাগপুর ডিভিশনের কমিশনার মি. জে. আর ডেইনকে লিখেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ও বসবাসকারী রাজনীতিকেরা ভায়োলেনট, তারা সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন এবং জীবন দিয়েও মাতৃভূমির সেবা করার জন্য যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলছেন'।[২৯]

উকিলেরা রাজনৈতিক চেতনা প্রসার ও দেশের কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সরকার পক্ষ উদ্যোগটি বানচাল করার জন্য অভূতপূর্ব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। ব্রিফলেস উকিলদের জাল দেশনেতা সাজান হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতারা যা বলতেন, সেসবের উলটো কথা বলতেন তারা। প্রতি মিটিংয়ের জন্য পারিশ্রমিকও দেওয়া হত। মিটিং প্রতি দশ থেকে পনের টাকা। পরিকল্পনাটি ছিল সাঁওতাল পরগণার কমিশনার ই. এস. হনের্লের।[৩০]

সম্পাদক গ্রেপ্তার হলেও মুক্তি বন্ধ থাকেনি। নতুন সম্পাদক হয়েছিলেন বীর রাঘব আচারিয়া। কংগ্রেসের সংগঠনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবীদের

---

২৭. নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২০ মার্চ ১৯২৯।

২৮. নিবারণচন্দ্রের কারাদণ্ড হয়েছিল ৩ মার্চ ১৯২৯ থেকে এক বছরের জন্য। IPC-র 124A ও 153A ধারা অনুসারে। মুক্তিতে প্রকাশিত 'বিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য আনা হয়েছিল অভিযোগ। অন্নদাকুমারের কারাদণ্ড হয়েছিল 124A ধারা অনুযায়ী ছয় মাস, 153A অনুসারে ছয় মাস।

২৯. Weekly Report of the Bihar Provincial Congress Committee and Young India, May, 1930. পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী ২৬. ৯. ১৯৩০ পর্যন্ত মানভূম জেলায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল ২২১।

৩০. Freedom Movement in *Bihar, vol*—I,—K. K. Datta (1957), P 83.

কার্যকলাপ বিন্যস্ত হয়েছিল মানভূমে। তবে সংগঠন বেশি জোরদার ছিলনা। কংগ্রেসের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যেতেন। রামচন্দ্রপুরে অন্নদাকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে অনুশীলন দলের যোগাযোগ ছিল। অনুশীলন দলের সংগঠন ছিল ঝরিয়া ও ধানবাদে। ধানবাদ থেকে দুটি এ্যাকশন পরিচালিত হয়েছিল। বম কেস ও ভালগাড়া ডাকাতি (১৯২৮)। দুটি এ্যাকশনই নিষ্ফল হয়েছিল। ভালগাড়া ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীর রাঘব আচারিয়া।[৩১]

পুরুলিয়া সহরে 'শ্রদ্ধানন্দ কর্মমন্দির' নামে একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। আপাতভাবে সেটি ছিল ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার। যুবকেরা সেখানে মিলিত হতেন। অনুশীলন দলের সঙ্গে যারা সংযুক্ত ছিলেন, পুরুলিয়ায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অমর চৌধুরী ও অলক চৌধুরী। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে পুরুলিয়ায় এসে আত্মগোপন করতেন।[৩২] বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তও সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।[৩৩]

মানভূমে দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে, ঝালদায়।[৩৪] নিবারণচন্দ্র সে সময় জেলে। ফণীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ঝালদার অধিবাসী। কর্মসূত্রে থাকতেন সিল্লিতে। সেখানে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। মানভূম, রাঁচি ও পাটনা থেকে অনেক নেতা এসেছিলেন সভায়।[৩৫] উনিশ শো তিরিশ সাল ছিল মানভূমের রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস (২৬ জানুয়ারী) উদ্‌যাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মানভূমের বহু জায়গায় বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস।

লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। প্রথম কর্মসূচী ছিল সরকারের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ। বিহারের নেতৃবৃন্দ বিহার ও উড়িষ্যার

---

৩১. সাক্ষাৎকার, বীর রাঘব আচারিয়া, পুরুলিয়া, ২৫. ৮. ৮১.

৩২. যেমন, দীনেশ মজুমদার, শচীন করগুপ্ত প্রভৃতি।

৩৩. অশোক চৌধুরী জানিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ যুক্ত ছিলেন অনুশীলন দলের সঙ্গে, বীর রাঘব আচারিয়া জানিয়েছিলেন যুগান্তরের সঙ্গে।

৩৪. ২৭ ও ২৮ এপ্রিল ১৯২৯। সভাপতি—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, যুব সম্মেলনের সভাপতি—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

৩৫. সভাটি হয়েছিল ২৮ জানুয়ারী ১৯৩০। নেতাদের মধ্যে ছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত (ইতিমধ্যে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন) অতুলচন্দ্র ঘোষ, বীর রাঘব আচারিয়া,

লেজিসলেটিভ কাউনসিল থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। মানভূম থেকে পদত্যাগ করেছিলেন জীমূতবাহন সেন, নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক আবদুল বারি। এগারো দফা দাবী জানিয়েছিলেন গান্ধীজী। দাবী অমান্য হলে সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা জানিয়ে লর্ড আরউইনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে আরউইন জানিয়েছিলেন গান্ধীজীর প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ হলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি গান্ধীজী।[৩৬] বিক্ষুব্ধ গান্ধীজী সত্যাগ্রহ ও আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন দীর্ঘ পদযাত্রার মাধ্যমে সূত্রপাত হবে আন্দোলনের। যাত্রাটি হবে সবরমতী থেকে ডাণ্ডি। ১২ মার্চ সুরু করেছিলেন ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা।

স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপন মানভূমে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। হিড়িক পড়েছিল কংগ্রেস সদস্য হবার। কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন ৩৭৯ জন।[৩৭] মানভূম কংগ্রেস কমিটির সভায় গঠিত হয়েছিল জেলা সত্যাগ্রহ কমিটি।[৩৮] অপর একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল অর্থ সংগ্রহের জন্য। শেষোক্ত কমিটির অধিকাংশ সদস্য ছিলেন উকিল। ফলে উকিলদের জব্দ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার প্রস্তাব করেছিলেন, স্বাধনিতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী উকিলদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট থেকে ব্যবস্থা নিতে।[৩৯]

ধানবাদে এ সময় মানভূম রাজনৈতিক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্ধারিত সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি আসতে না পারায় সভাপতিত্ব করেছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে খোলা বাজারে লবণ বিক্রি সুরু হয়েছিল। সূত্রপাত হয়েছিল লবণ আন্দোলনের।

রামচন্দ্র অধিকারী, পাটনা থেকে মথুরা প্রসাদ, মজঃফরপুর থেকে দ্বারকানাথ শর্মা রাঁচির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

৩৬. "On bended knees I asked for bread and I have received stone instead."—Gandhi.

৩৭. The Searchlight, 18. 2. 1930.

৩৮. সত্যাগ্রহ কমিটির সভাপতি—নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, সম্পাদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র দত্ত।

৩৯. Letter from D. C, Manbhum to the Commissioner, Chotanagpur, 14. 4. 1930.

মানভূম জেলা সত্যাগ্রহ কমিটি সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, ঝালদা থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শিউশরণ জয়সোয়াল, স্বামী মোহনদাস বাবাজী, 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক বীর রাঘব আচারিয়া ও রেবতী কান্ত চট্টোপাধ্যায় দ্রুত গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সভা সমিতি ও মিছিল বন্ধ করে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা উপেক্ষা করেছিলেন নিষেধাজ্ঞা। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র।[৪০] প্রেস অর্ডিনান্সের ফলে 'দেশবন্ধু প্রেস' ও 'মুক্তি' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরুলিয়ার জুবিলি টাউন হলে জাতীয় পতাকা অবনমিত করা নিয়ে সে সময় সহরবাসীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। পতাকা তুলেছিলেন পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার। পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার পুলিস ও সশস্ত্র গুর্খা বাহিনীর সাহায্য সেটি নামিয়ে, ইউনিয়ন জ্যাক প্রোথিত করেছিলেন।[৪১] প্রতিবাদে মিউনিলিপ্যালিটি অফিস বন্ধ করা হয়েছিল। পদত্যাগ করেছিলেন নিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার।

জনজাগরণের প্রতি উপেক্ষা এখানেই থেমে ছিল না। মি. এ. টেলর ছিলেন তখন পুরুলিয়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যাদের গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছিল, বিচারের সময় উপেক্ষা দেখিয়ে তাদের সামনেই গান্ধী টুপি পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোর্টরুমের বাইরে আগুন দেওয়া হয়েছিল টুপিতে। টেলর স্বয়ং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন সেই বহ্নি উৎসব। ঘটনাটিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন পুরুলিয়ার স্থানীয় অধিবাসীরা। কঠোর ভাষায় টেলরের কার্যকলাপের নিন্দা করেছিলেন। মানহানি ও ক্ষতি-পূরণের মামলাও দায়ের করা হয়েছিল।[৪২]

টেলরের অত্যাচার এখানেই থেমে ছিলনা। রামচন্দ্রপুরে অন্নদাকুমার চক্রবর্তী

---

৪০. আর যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, জীমূতবাহন সেন ও গুমান মাঝি। নিবারণচন্দ্র গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২৫ জুলাই ১৯৩০। তাকে রাখা হয়েছিল হাজারিবাগ জেলে। এসময় রাজেন্দ্রপ্রসাদও ছিলেন সেই জেলে। দুজনে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। একসঙ্গে পতঞ্জলির 'যোগভাষ্য' অধ্যয়ন করেছিলেন।
—Autobiography by Dr. Rajendra Prasad, P 346.

৪১. ২৫ জুলাই ১৯৩০। পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন তখন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪২. The Liberty, 10. 7. 1930.

সাঁওতালদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন।[৪৩] পয়লা আগসট (১৯৩০) লোকমান্য তিলকের স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়েছিল। খবব পেয়ে পুলিস প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু তারা সভায় বিঘ্ন ঘটাতে সাহস করেনি। জেলা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ১৪ আগসট জয়েনট ম্যাজিস্ট্রেট টেলর ও সার্জেনট চার্চার পুলিস বাহিনী সহ আশ্রমে গিয়ে ঢুকেছিলেন। খানাতল্লাসী চলেছিল আশ্রমে। টেলর অন্নদাকুমারকে এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখে দিতে বলেছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্তি ছিন্ন করবেন। অঙ্গীকারপত্র দিতে অস্বীকার করেছিলেন অন্নদাকুমার। খানাতল্লাসী চলেছিল মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতেও। মারধোর ও নানারকম অত্যাচার চালান হয়েছিল অন্নদাকুমারের ওপর। হতচেতন অবস্থায় তাকে একটি পুকুরের ধারে ফেলে রেখে গিয়েছিল পুলিস বাহিনী। সেখান থেকে তুলে এনে মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী লীলাবতী শুশ্রূষা করেছিলেন। মাসখানেক পরে অন্নদাকুমারকে গ্রেপ্তার করে মুরাডি স্টেশনের কাছে অন্তরীন রাখা হয়েছিল।

ঝালদায় সতীকিঙ্কর দত্তের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর ১ মাঘ গুর্জর নদীর তীরে একটি মেলা বসত। নাম সত্য মেলা। ১৯৩০ সালে সারা জেলাতেই সভা সমিতি ও জমায়েতের ওপর একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করা হয়েছিল। একদল সত্যাগ্রহী আইন ভঙ্গ করে মেলায় জমায়েত হয়েছিলেন। ফলে গুলি চালিয়েছিল পুলিস। তাতে পাঁচ জন[৪৪] মারা গিয়েছিলেন।

সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করে মানভূমে সত্যাগ্রহীদের পিকেটিং ও আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। পাঠান ঘোড় সওয়ার ও সশস্ত্র গুর্খা বাহিনী সর্বত্র টহল দিয়ে বেড়াত, দলে দলে গ্রেপ্তার করত সত্যাগ্রহীদের। তবু স্তিমিত ছিলনা আন্দোলন। একদল গ্রেপ্তার হলে নতুন দল তাদের জায়গা নিতেন। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাও কম ছিলনা।[৪৫] পিকটিং প্রধানত চলত মদের দোকানের সামনে।

করাচী কংগ্রেসের পর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির

---

৪৩. এ কাজে তাকে যারা সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মহেন্দ্র চক্রবর্তী, সুরাই মাঝি, গুমান মাঝি প্রভৃতি। প্রায় পাঁচ হাজার সাঁওতাল সংঘবন্ধ হয়েছিলেন বলে কথিত হয়।

৪৪. সহদেব মাহাত, শীতল মাহাত, গণেশ মাহাত, গোকুল মাহাত ও মোহন মাহাত।

৪৫. Letter from D. C. Manbhum to the Commissioner of Excise and Salt, 17. 6. 1930.

জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। সফল হয়েছিল প্রচেষ্টা। নেতারা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। মনোনিবেশ করেছিলেন গ্রামীন সংগঠন গড়ে তুলতে। সেই সময় মানভূম জেলা কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হয়েছিল। স্থান ছিল হুটমুড়ার ব্রহ্মচর্য আশ্রম। আশ্রমের আমের বাগানে বিহারের নানা জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হয়েছিলেন। যথা রাঁচি, হাজারিবাগ, পাটনা, সাঁওতাল পরগণা ও ধানবাদ।[৪৬] সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

জেলার বিভিন্ন জায়গায় কর্মী শিক্ষা শিবির স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। এ জাতীয় দুটি শিবির ছিল উল্লেখযোগ্য, রঘুনাথপুরেব চৌলিয়ামা (চরগালী) ও ঝালদায়। ঝালদায় অনেকগুলি আখড়া গড়ে উঠেছিল। সেখানে লাঠিখেলা শেখান হত। শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল পুলিস।[৪৭] বছরের শেষ দিকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় চালু করার জন্য প্রস্তুতি সুরু হয়েছিল। সরকারও তাকে বানচাল করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিল।

পরের বছরে সুরু থেকেই দমনমূলক নির্দেশ জারি করেছিল সরকার। কংগ্রেস কমিটিগুলি ও সেবাদল অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল পুরুলিয়া শিল্পাশ্রম, গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।[৪৮] গুলি চলেছিল মতিহারি, রোশেরা, বেগুসরাই, সিওড় ও তারাপুরে। এদের ভেতর তারাপুরে মারা গিয়েছিলেন পনের জন, আহত হয়েছিলেন শত শত। রামচন্দ্র-পুরের আশ্রম বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিল পুলিস বাহিনী।

জেলে থাকতেই নিবারণচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জেল থেকে বেরুবার পর আক্রান্ত হয়েছিলেন ক্ষয়রোগে। মাঝে অসুস্থ শরীর নিয়েই ঢাকায় গিয়ে-ছিলেন। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন রাঁচিতে ক্ষিতীশচন্দ্র বসুর আশ্রমে। চিকিৎসাধীনে ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর। ৩০ এপ্রিল গান্ধীজী স্বরাজ্য দলের মিটিংয়ে রাঁচি গেলে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। অসুস্থতা বেড়ে চলেছিল দিন দিন। রাঁচি থেকে চলে এসেছিলেন সাধের মানভূমে। শ্রাবণের প্রথম দিনটিতে সবে আকাশ জুড়ে ঘন

---

৪৬. অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ১৯৩১। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ক্ষিতীশ ব্রহ্মচারী (রাঁচি), জীমুতবাহন সেন, নগেন্দ্রনাথ গুহ রায় (নোয়াখালি) প্রভৃতি।

৪৭. Manbhum Police Reports.

৪৮. নিবারণ চন্দ্র গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জানুয়ারি ১৯৩২। তিনি কংগ্রেস সেবাদলেরও সদস্য ছিলেন (১৯৩০)।

মেঘের আড়াল থেকে যখন আলোকের রেখা ফুটে উঠেছিল, অবসান ঘটেছিল ঋষিকল্প জীবনটির।[৪৯] মৃত্যু সম্ভাবিত ছিল, তবু মানভূমবাসী আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন শোকে। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, 'নিবারণবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। এমন একটি খাঁটি মানুষ সহজে মেলেনা।' মানভূমবাসীরা কান্না ভেজা গলায় বলেছিলেন,

আমরা পাইয়াছিনু মূর্তিমতী গীতা।
সে গীতা লইল কাড়ি শ্মশানের চিতা॥[৫০]

নিবারণচন্দ্রের মৃত্যুতে মানভূমে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও কর্মকাণ্ডের একটি অধ্যায়ে ছেদ পড়েছিল। তার প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিভূমির ওপর নতুন করে বিন্যস্ত হয়েছিল পরবর্তী অধ্যায়।[৫১]

---

৪৯. নিবারণ চন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছিল পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমে, ১ শ্রাবণ ১৩৪২। ইং ১৭ জুলাই ১৯৩৫।

৫০, অন্নদাকুমার চক্রবর্তী।

৫১. এই অধ্যায়টি লিখতে 'মুক্তি' পত্রিকার পুরনো কাঁপগুলি থেকে প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পত্রিকার কাঁপগুলি অনুগ্রহ করে দেখতে দিয়ে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

চ. বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও পরবর্ত্তী রাজনৈতিক ধারা

'India is on the march to Independence....
No one can stop it. It is her destiny.
India has bled enough for it."
—M.K. Gandhi, 1946.

নিবারণচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে অধিকাংশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেব ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল।[১] বিহার বিধান সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্বাচন। কংগ্রেস সদস্যেরা সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই বছরেই (১৯৩৪) ভারতের জাতীয় ইতিহাসে আরও দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারা যুক্ত হয়েছিল। কৃষক আন্দোলন ও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ।

কৃষক আন্দোলনের পাদপীঠ ছিল কিষাণ সভা।[২] মানভূমে কিষাণ সভার সংগঠন গড়ে উঠলেও তেমন জোরদার ছিলনা।[৩] সহজানন্দ সরস্বতী ঘুরে গিয়েছিলেন মানভূম। বিহারে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল কংগ্রেস।[৪] জীমূতবাহন

১. নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়েছিল ৯ জুন ১৯৩৪। জারি হয়েছিল ৪ জানুয়ারি ১৯৩২।

২. বিহারে কিষাণসভা প্রথম গঠিত হয়েছিল মুঙ্গেরে (১১২২-২৩)। সভাপতি—শাহ মুহম্মদ জুবের, সহ-সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, সম্পাদক—সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরী ও নন্দকুমার সিংহ। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে (১৯২৮ থেকে) কিষাণসভা জোরদার হয়ে ১উঠেছিল।

৩. সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মিহির চট্টরাজ, রবি কুণ্ডু প্রভৃতি। সহজানন্দ এসেছিলেন ১৯৫৭-৩৮ সালে।

৪. মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল ২০ জুলাই, ১৯৩৭।

সেন ছিলেন পাবলিক ওয়ার্কস ও ইরিগেশনের পার্লামেনটারী সেকেটারী। বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে কিষাণ সভার বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সভার বৈপ্লবিক কাজকর্মে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল কংগ্রেস। কৃষকদের সঙ্গে জমিদারদের সংঘর্ষের উপক্রম দেখা দিয়েছিল।

মানভূম জেলায় ধানবাদ ছিল শ্রমিক বিক্ষোভের মূল কেন্দ্র। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিহারে যে এগারোটি শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে পাঁচটিই সংগঠিত হয়েছিল ধানবাদে। পুরুলিয়া জেলায় কমিউনিসট পার্টির সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন সদস্য প্রবীর মল্লিক থাকতেন ধানবাদে। সেখান থেকে আসতেন পুরুলিয়ায়। ছোট একটি একটিভিসট গ্রুপ তৈরি হয়েছিল পুরুলিয়ায়।[৫] অপর সদস্য ছিলেন সুশীল দাশগুপ্ত। তিনিও থাকতেন ধানবাদে। ধানবাদ শ্রমিক ধর্মঘটে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। বিহারে তখন শ্রমিক নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবদুল বারি। মানভূম জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঝরিয়ায়। তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন হুমায়ন কবীর।[৬] পরের বছর ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুরুলিয়ায়, হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকে এসে ছাত্রনেতারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন[৭]।

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করে সেই বছরেই কংগ্রেসের মধ্যে নতুন দল গড়ে তুলেছিলেন।[৮] দলটিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে ঘোরাঘুরি করেছিলেন পুরুলিয়া জেলার নানা জায়গায়। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল রঘুনাথপুর, কাশীপুর, হুড়া, রামচন্দ্রপুর, পাড়া প্রভৃতি।

---

৫ তাতে ছিলেন সুশীল (বা সন্তোষ) দাশগুপ্ত, প্রবীর মল্লিক ও গৌর মুখার্জী। ১৯৩১ সালে গৌর মুখার্জী চাকরিসূত্রে অন্যত্র গেলে আরও দুজন যোগ দিয়েছিলেন গ্রুপে, সমর রায় ও পূর্ণেন্দু মজুমদার।—সাক্ষাৎকার প্রবীর মল্লিক, ২১ ৭. ৮২। সুশীল দাশগুপ্তের বাবা ননী দাশগুপ্ত ছিলেন স্কুলের সাব-ইনসপেকটর। সুশীল দাশগুপ্ত কমিউনিসট পার্টির সদস্য ছিলেন আগে থেকে, প্রবীর মল্লিক মেমবারশিপ পেয়েছিলেন ১৯৪০, সমর রায় ও পূর্ণেন্দু মজুমদার পেয়েছিলেন ১৯৪১ সালে।

৬. সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেপটেমবর ১৯৪০।

৭. যথা, গোপাল হালদার, বিশ্বনাথ মুখার্জী, নিতাই গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

৮, পদত্যাগ ২৯ এপ্রিল ১৯৩৯, ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন ৩মে ১৯৩৯। পুরুলিয়া জেলার সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিহির চট্টরাজ, সন্তোষ মিত্র, কানাই পাল (ধানবাদ), অন্নদাকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি।

হিন্দু মহাসভা প্রথমে ছিল হিন্দু মিশন। স্বামী শংকরানন্দ ছিলেন হিন্দু মিশনের অধ্যক্ষ। থাকতেন আমলাপাড়ায়। কংগ্রেসের কিছু সদস্য[৯] পুরুলিয়া জেলায় হিন্দু মহাসভার সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে শংকরানন্দকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মিশন থেকে। জেলায় আর. এস. পির সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪০-৪১ সালে।

গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘনিয়ে উঠেছিল বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ইংল্যাণ্ড।[১০] সংশয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কংগ্রেস। সরকার কর্তৃক ১৯৪০ সালের প্রথমার্ধ থেকে ব্যাপক ধরপাকড় সুরু হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল পত্র পত্রিকা ও প্রকাশনার ওপর। এই সংশয় ও সন্ত্রাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রামগড় কংগ্রেস। যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার অস্বীকার করেছিল কংগ্রেস।[১১] অন্যদিকে রামগড়েই সমন্বয়-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছিল জেহাদ।[১২]

টালমাটাল অবস্থার সামাল দিতে আইন-অমান্য ও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। দেখতে দেখতে জেলখানাগুলি ভরে উঠেছিল। নেতারা চলে গিয়েছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। প্রায় এক বছর পরে তাদের ছাড়া হয়েছিল। বিয়াল্লিশের সুরু থেকে গণ-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি তৈরী হয়ে চলেছিল সবার অলক্ষে। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল জনসাধারণ। আপাত শান্ত উপরিভাগের নিচে তীব্র বিক্ষোভ তরঙ্গিত হয়ে চলেছিল, যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণের জন্য উন্মুখ।

ওয়ার্ধায় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব

---

৯ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ললিতকিশোর মিত্র, রায় বাহাদুর সতীশ সিন্হা, ঈশান মোহান্ত প্রভৃতি।

১০. ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।

১১. সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল সেই অঙ্গীকার—"We have no quarrel with the British people. We want to be their friends and retain their goodwill, not on the basis of their domination, but on the basis of a free and equal India." সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯ ও ২০ মে ১৯৪০।

১২. বিরোধী সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী বলেছিলেন, 'The success of this Conference should mean deathknell of compromise with imperialism."

গৃহীত হয়েছিল।[১৩] বম্বে অধিবেশনে উপস্থিত করার কথা ছিল সেটি। ভারত সরকার বিধিবদ্ধ করেছিলেন নতুন প্রতিরক্ষা আইন।[১৪] খড়্গের মত তা প্রথম এসে পড়েছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের ওপর। পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মিহিরকুমার চট্টরাজ।

বম্বের অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবটি পাকা হয়েছিল।[১৫] মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল ''করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।' কংগ্রেসের সমস্ত সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠান অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল সরকার। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নেতাদের।

দশই আগস্ট অতি প্রত্যুষে পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম ঘিরে ফেলেছিল পুলিস। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল তিনজনের বিরুদ্ধে। বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও বীর রাঘব আচারিয়া। পূর্ণেন্দুবাবু আশ্রমে ছিলেন না, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অপর দুজনকে। আশ্রমবাসীদের খালি করে দিতে বলা হয়েছিল আশ্রম। তারা অস্বীকার করেছিলেন। ফলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সাবইকে।[১৬] বাজেয়াপ্ত হয়েছিল মুক্তি প্রেস, নিবারণ পল্লী শিল্প সংঘ, চাষের কংগ্রেস অফিস ও আশ্রম। বম্বে অধিবেশন থেকে ফিরে আসছিলেন অতুলচন্দ্র। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনদিন পরে (১৩ আগস্ট)। কিন্তু এরই মধ্যে আন্দোলনের কর্মসূচী স্থির হয়ে গিয়েছিল।

সহরের নানা জায়গায় বিলি হয়েছিল ইস্তাহার। ডাক দেওয়া হয়েছিল আন্দোলনের। ষোলই আগস্ট ব্যাপক ধরপাকড় সুরু করেছিলেন পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার।[১৭] ধানবাদ, ঝরিয়া ও কাতরাসেও গ্রেপ্তার হয়েছিলন অনেক নেতা ও সদস্য। তবু আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। সতেরোই আগস্ঠ পুরুলিয়ার পথে পথে ও কোর্ট কম্পাউণ্ডে

---

১৩. ১৪ জুলাই ১৯৪২।

১৪. Defence Rule 27A, June 1942.

১৫. বম্বে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭ ও ৮ আগসট ১৯৪২।

১৬. যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন, (১) শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ (২) কমলা ঘোষ (৩) শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) বৈদ্যনাথ দত্ত (৫) রামকিঙ্কর মাহাত ও (৬) অরুণচন্দ্র ঘোষ।

১৭. ইস্তাহার ধরা পড়েছিল ১৫ আগস্ট ১৯৪২। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, জেলা কংগ্রেসের সদস্য অশোক চৌধুরী, কিষাণ সভার সদস্য সমরেন্দ্রমোহন রায় ও কমিউনিস্ট দলের সদস্য সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পরিচালিত হয়েছিল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়েছিল ধানবাদ ও ঝরিয়ায়। ধানবাদে আক্রান্ত হয়েছিল পোস্ট অফিস, ঝরিয়ার পোস্ট অফিস ও রেলস্টেশন।

ক্যাপটেন এলিসের নেতৃত্বে এয়ারক্রাফট গানারদের একটি বাহিনী আসানসোল থেকে প্রেরিত হয়েছিল ঝরিয়ায়। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দশজন। ধানবাদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল বাহিনী। ধানবাদ, ঝরিয়া ও কাতরাসে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। চলাচলের প্রধান সড়কগুলিতে মোতায়েন হয়েছিল পুলিস পাহারা। রঘুনাথপুরে সড়ক ও রেলপথ পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

নেতাদের মধ্যে অনেকেই প্রেরিত হয়েছিলেন জেলে। যারা বাইরে ছিলেন, সপ্তাহে অন্তত একবার ছোট ছোট দলে গোপনে মিলিত হতেন।[১৮] সেখানেই স্থির হত কার্যক্রম। এক একটি এলাকার ভার এক বা দুজনের ওপর দেওয়া হয়েছিল।

পুরুলিয়া সহরে মদের দোকানের সামনে পিকেটিং চালান হয়েছিল উনিশে আগস্ট। সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সাতজন। ধর্মঘট হয়েছিল মানভূম ভিকটোরিয়া ইনসটিটিউশনে। একদিন পরে পুনরায় চালান হয়েছিল পিকেটিং ও হরতাল। সেদিন গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল নয় জন। বাইশে বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা এবং পালিত হয়েছিল হরতাল। ছাব্বিশে দুটি স্কুলেই ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। ভিকটোরিয়া ইনটিটিউশনের একজন শিক্ষকসহ গ্রেপ্তায় হয়েছিলেন কয়েকজন ছাত্র। সাতাশ ও আঠাশে ব্যাপক পিকেটিংয়ের সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কয়েক-জন নেতা।[১৯] পুরুলিয়ার মাড়োয়ারি এসোসিয়েশান প্রস্তাব নিয়েছিলেন কংগ্রেসের দাবী যুক্তিপূর্ণ, সরকারের মেনে নেওয়া উচিৎ।

মানবাজারে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সত্যকিঙ্কর মাহাত। বাইশে আগস্ট কোর্ট কম্পাউন্ডে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সাতজন। আরও মর্মান্তিক ঘটনা অপেক্ষা করেছিল মানবাজারের জন্য। তিরিশে সেপ্টেম্বর পাঁচশো সত্যাগ্রহীর বিরাট জনতা মানবাজার থানা আক্রমণ করতে এগিয়ে চলেছিলেন। ভয় পেয়ে গুলি চালিয়েছিল পুলিস। ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছিলেন

---

১৮. তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, অমল ঘোষ, চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চৌধুরী, সাগর মাহাত, বাসন্তী দেবী, গিরীশ মজুমদার, চৈতন মাঝি, বড়কা মাঝি প্রভৃতি।

১৯. তাদের মধ্যে ছিলেন গিরীশচন্দ্র মজুমদার, মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী, পঞ্চানন অধিকারী, ও পূর্ণেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

চুনারাম মাহাত। দারুনভাবে আহত হয়েছিলেন গোবিন্দ মাহাত, গিরীশ মাহাত, হেম মাহাত প্রভৃতি। গোবিন্দ মারা গিয়েছিলেন হাসপাতালে।

বরাবাজারে নেতা ছিলেন কয়েকজন।[২০] তেইশ ও চব্বিশে আগস্ট সেখানে হরতাল সংগঠিত হয়েছিল। আট থেকে দশটি রাইফেল ছিল থানায়। সত্যাগ্রহীদের দেখে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল পুলিস। মথন মাহাত এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভাই, আপনারা সবাই ভারত মাতার সন্তান। আসুন সবাই মিলে মায়ের বন্ধন মোচন করি।' থানায় ঢুকে সত্যাগ্রাহীরা দারোগাসহ সিপাহীদের বেঁধে ফেলেছিলেন। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মদের গুদাম ও পোসট অফিসে। পোড়ান হয়েছিল সরকারি রেকর্ড। এক সপ্তাহ ধরে বরাবাজারে প্রশাসনের অস্তিত্ব ছিলনা। মাহাতদের মত শবরদের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছিল আন্দোলনের চেতনা। তারাও অংশ নিয়েছিলেন। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অনেকে।[২১] অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে (৬ কি ৭ তারিখে) গুলি চলেছিল বরাবাজার মিলিটারী অবজারভেশন পোসটে। আহত হয়েছিলেন ছয়জন।

পুরুলিয়া সহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে বান্দোয়ান। যোগাযোগের ব্যবস্থা খারাপ। তখন বর্ষাকাল, ফলে আরও দুর্গম হয়ে উঠেছিল এলাকা। নেতৃত্বে ছিলেন ভজহরি মাহাত ও কুশধ্বজ মাহাত। থানার মাথায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বান্দোয়ান থেকে বরাবাজার যাবার পথে পড়ে কুমীর গ্রাম। পটমদা থানার ভেতর। সেখানে সভা বসার কথা ছিল। কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী জমায়েত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ভূমিজ, সাঁওতাল, খেড়িয়া, মাহাত, শবর প্রভৃতি। টহলদারী মিলিটারী ট্রাক চলেছিল বান্দোয়ানের দিকে। টটকো নদীর ধারে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ট্রাকটা ঘিরে ফেলেছিলেন সত্যাগ্রহীরা। ভয় পেয়ে গুলি চালিয়েছিল সৈন্যেরা। আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ।[২২]

মিলিটারী অবজারভেশন পোস্ট ছিল বাগমুণ্ডি ও ভজুডিতে। দুটিই আক্রান্ত হয়েছিল। ঝরিয়া ও চন্দনকিয়ারীর থানা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিয়াল্লিশের আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ মানভূমে।

---

২০. মঙ্গল মাহাত, ভীম মাহাত, মথন মাহাত, ধনু মাহাত, জনার্দন মাহাত, প্রাণকৃষ্ণ মাহাত প্রভৃতি।

২১. শবরদের মধ্যে ছিলেন রামু শবর, লক্ষণ শবর ও ছামু শবর। —মুক্তি, ৯।৪৩।

২২. আহতদের মধ্যে ছিলেন লক্ষণ, বিপ্র, মড়িরাম মাহাত, রতন মাঝি, জুড়েন মুদি, দুর্গাচরণ ভূমিজ প্রভৃতি।

আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মদভাটি, থানা, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফের তার, রেলপথ এবং অবজারভেটরী পোস্ট। কোথাও কোথাও রোড কালভার্ট ও ব্রিজ।

উত্তর মানভূমে আন্দোলনের তীব্রতা অতখানি ছিল না। কারণ, নেতারা আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তবু ধর্মঘট পালিত হয়েছিল বলরামপুর, আদ্রা, রঘুনাথপুর, বেড়ো, ঝালদা, হুড়া, পাড়া ও পুঞ্চায়। বন্ধ হয়েছিল প্রধান প্রধান স্কুলগুলি। রঘুনাথপুরের মুনসেফ আদালতে পরিচালিত হয়েছিল শোভাযাত্রা। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কয়েকজন। পুরুলিয়া, আদ্রা ও রঘুনাথপুরে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের আগে ঘোষণা সম্বলিত লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল।

সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় মানভূম জেলায় বিয়াল্লিশের আন্দোলনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল ৪৫২, জেলে ছিলেন ৯১, কাউকে চাবুক মারা হয়নি।[২৩] ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মানভূমের ডেপুটি কমিশনার বিহারের মুখ্য সচিবকে জানিয়েছিলেন,[২৪] 'মাঝে মাঝে পাওয়া রিপোর্টে জানা যায় অবস্থা আপাতত শান্ত। সেটা বাহ্যিক। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রবল। সুযোগ এলেই গুপ্ত ও বিধ্বংসী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।'

আপাতশান্ত সেই অবস্থা বজায় ছিল প্রায় আরও তিন বছর। কারণও ছিল। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিরোধ একটু একটু করে ঘনিয়ে উঠেছিল। হিন্দী প্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল মানভূম জেলা কংগ্রেস। যদিও সে বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছিল ভারত স্বাধীন হবার পরে। তবু, তারই মধ্যে ১৯৪৫ সালে, জাতীয় সপ্তাহ পালিত হয়েছিল। নানা জায়গায় উত্তোলিত হয়েছিল জাতীয় পতাকা। আন্দোলনটি 'পতাকা সত্যাগ্রহ' নামে পরিচিত হয়েছিল। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। তিনজন মহিলাসহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরও পাঁচজন।

স্বাধীনতার পরে মানভূমে সবচেয়ে বড় আন্দোলন ছিল 'টুসু সত্যাগ্রহ'। বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বঙ্গভুক্তির দাবী নিয়ে সুরু হয়েছিল আন্দোলনটি।[২৫] মানভূম জেলায় কংগ্রেসের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকে। গঠিত হয়েছিল নতুন দল। লোকসেবক সংঘ। কংগ্রেসের সেই দুর্বলতার নেপথ্যে বামপন্থী দলগুলি, বিশেষত ভারতের

২৩. ১৪.১২.১৯৪২ তারিখে বিহার থেকে Secretary of State for India-এর কাছে পাঠান রিপোর্ট। প্রদত্ত সংখ্যা—৩০.১১.১৯৪২ পর্যন্ত।

২৪. ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪২।

২৫. বিশদ বিবরণের জন্য এই গ্রন্থের 'মানভূম থেকে পুরুলিয়া' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছিলেন তাদের সংগঠন।

মানভূমে কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল কলিয়ারি এলাকায়, ভাওরা কোকপ্লানটে (১৯৪৮)।[২৬] পার্টি অফিস ছিল ধানবাদে। ইনডিয়ান মাইনস ওয়ার্কারস ফেডারেশনের অফিসের কাছে। ১৯৪৬ সালে পার্টির সংগঠন গড়ে উঠেছিল বলরামপুরে। লাক্ষার কারখানা ছিল অনেকগুলি। গঠিত হয়েছিল ইউনিয়ন।[২৭] কারখানা ছাড়াও কৃষকদের নিয়ে সংগঠন গড়ে উঠেছিল বারোটি গ্রামে (১৯৪৬)। ধান পাকলে বাইরে থেকে শ্রমিক এনে কাটিয়ে নেওয়া হত। প্রতিবাদ হিসেবে সংগঠিত চাষীরা নিজেরাই কেটে নিয়েছিলেন ধান।

লাক্ষা শ্রমিকদের মজুরি ছিল অত্যন্ত কম। ঘাটোয়ালদের আট আনা, বেলোয়ারদের ছ' আনা ও ফেরাইদের তিন আনা। আন্দোলনের ফলে বেড়েছিল মজুরী। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য গড়ে তোলা চলেছিল আদিবাসী ও উপজাতিদের। প্রশিক্ষণ দেওয়া হত আর্চারিতে। ঝালদাও লাক্ষা শিল্পের বড় কেন্দ্র ছিল। সেখানে সংগঠন গড়ে উঠেছিল অনেক পরে।

পুরুলিয়া সহরে 'আলোক বাহিনী' নামে একটি একটিভিস্ট গ্রুপ তৈরি হয়েছিল (১৯৪৬)। গ্রুপটি ছিল আর. সি. পি. আইয়ের।[২৮] সেবামূলক কাজের ভেতর দিয়ে প্রসারিত করার চেষ্টা হয়েছিল জনসংযোগ। বস্তী এলাকা ও বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সংগঠন। গ্রুপটি পরে কমিউনিসট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রিকসা চালকদের মধ্যেও গড়ে উঠেছিল সংগঠন। জঙ্গলে কাঠ কাটা নিয়ে অত্যাচার চলত সাধারণ মানুষের ওপর। সংঘবদ্ধভাবে জঙ্গলে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হত। মারের বদলে পালটা মার দেবার কথাও বলা হত। ফলে বলরামপুরের জঙ্গল এলাকা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ছোটনাগপুর রেজিমেন্ট নামাতে হয়েছিল পুরুলিয়ায়।

---

২৬. সভাপতি—সমর রায়, সম্পাদক—প্রবীর মল্লিক। পরে, আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন গড়ে উঠলে সম্পাদক হয়েছিলেন চিন্ময় মুখার্জী।

২৭. সমর রায়—সভাপতি, মিশ্রিলাল জয়সওয়াল—সম্পাদক। স্থানীয় নেতা ছিলেন, জীবন সিং সর্দার, অক্ষয় কুমার, শ্রীপতি রজক প্রভৃতি। সাঁওতালদের মধ্যে নেতা ছিলেন বিক্রম টুডু, ভূমিজদের মধ্যে শিবশংকর মাঝি।

২৮. সদস্য ছিলেন চিত্ত মিত্র, অমূল্য কর্মকার, ত্রিভঙ্গ দাঁরিপা ও অমৃত মিত্র। —সাক্ষাৎকার, অমূল্য কর্মকার, পুরুলিয়া ১৭.৪.৮২। পরে যুক্ত হয়েছিলেন মাণিক গাঙ্গুলী, সুবল মাকুর, প্রহ্লাদ বাউরি, মাণিক দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

আড়ষা থানায় জমিদারের বিরুদ্ধে বিরাট র‍্যালি করা হয়েছিল মুদালি গ্রামে (১৯৫১-৫২)। বেট-বেগারী ও জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে ছিল প্রতিবাদ। সংঘর্ষও হয়েছিল উভয় পক্ষে।[২৯] ১৯৬০ সালে যখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ও রেলকর্মীদের ভারতব্যাপী ধর্মঘট হয়েছিল, জে. এম. বিশ্বাস, এন. সি. রায়চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন এ অঞ্চলের নেতা। পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল বারো থেকে চোদ্দশো।

নির্বাচনী রাজনীতিতে লোকসেবক সংঘের সাফল্য ছিল বিপুল। দলটি মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চরিত্রে গান্ধীবাদী, সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী, প্রভাবে আঞ্চলিক। নবগঠিত পুরুলিয়া জেলার মধ্যেই সীমিত ছিল কার্যকলাপ।[৩০] ১৯৬৭ সালের যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় লোক সেবক সংঘের মন্ত্রী ছিলেন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। দলটির জনপ্রিয়তা তখনও পর্যন্ত বজায় ছিল। জেলায় প্রদত্ত ভোটের সিংহভাগ (৪৮·৭০%) পেয়েছিল দলটি।

সমগ্র পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বদল ঘটে চলেছিল দ্রুত। ছোট ছোট দলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। লোকসেবক সংঘও এই ধারা থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯৭১-৭২ সালের নির্বাচনের পর দলটির রাজনৈতিক প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে ভারতব্যাপী আলোড়িত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল নকশাল আন্দোলন। যদিও উপজাতি, বিশেষত সাঁওতাল ও আদিবাসীদের মধ্যে আন্দোলনের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক, এবং পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতাল অধিবাসীদের সংখ্যা কম নয়, আন্দোলনটি জেলায় তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য যেসব এরিয়া কমিটি তৈরি হয়েছিল, তাদের মধ্যে পুরুলিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে ছিল বাঁকুড়া আঞ্চলিক কমিটি। সম্পাদক ছিলেন অমিতাভ বসু। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত শ্রেণীশত্রু নিধনের যে কার্যক্রম সি. পি. আই (এম-এল) দল কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, পুরুলিয়া জেলায় তাতে নিহতের সংখ্যা ছিল আটজন।

রাজনৈতিক দিক থেকে পুরুলিয়া জেলা সংগঠিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

---

২৯. আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সমর রায়, প্রবীর মল্লিক, অশোক কুমার চৌধুরী (গুণুবাবু) সুরেন হাঁসদা, মটরু মাঝি প্রভৃতি।

৩০. ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে মোট ১১টি আসনের মধ্যে লোকসেবক সংঘ পেয়েছিল—৭, ১৯৬২ সালে—৪, ১৯৬৭ সালে—৫, ১৯৬৯ (মধ্যবর্তী নির্বাচন)—৪, ১৯৭২—০।

সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটিও বিজড়িত। জেলার সত্তরভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে অবর্ণনীয় দুর্দশা থেকে আরও দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত। অব্যাহতি পেতে যারাই তাদের আশার বানী শুনিয়েছেন, অবলম্বন হিসেবে ধরতে চেয়েছেন তাদের। কিন্তু সবই প্রবঞ্চনায় পর্যবসিত হয়েছে। ক্রমাগত প্রবঞ্চনায় তাড়িত মানুষদের বিক্ষোভ রূপান্তরিত হয়ে চলেছে ক্রোধে। খরায় দগ্ধ প্রকৃতির মত সে রোষের প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও ভয়ানক, বিস্ফোরণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। অনতিবিলম্বে পরিকল্পিত কার্যক্রমের মধ্যে দারিদ্র্য নিরসনের ব্যবস্থা না নিলে, কোন রাজনীতিই এখানে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে না। কারণ, ক্ষুধার কাছে কোন নীতিই গ্রাহ্য নয়।

জনজীবন

ক. জনবিন্যাস ও প্রকৃতি

'The district of Maunbhoom contains a large portion of Bengalis, and is much more civilized than the rest of Chota Nagpur"—H. Beverley Report on the Census of Bengal, 1872.

ছোটনাগপুরের মালভূমি বিন্ধ্য পর্বতমালার প্রসারিত উপশাখা। সুবিশাল দণ্ডকারণ্যের একাংশ বলে কথিত। জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। ভূমি অনুর্বর, রুক্ষ ও পাথুরে। নিঃশেষিত অরণ্যের কঙ্কালের মধ্যে ছাড়া ছাড়া পাহাড় ও ডুংরি। প্রাকৃতিক এই পরিবেশের ভেতর মানভূমের জনজীবন বিন্যস্ত হয়েছিল।[১]

সিংভূম জেলার উত্তরে, ছোটনাগপুর ভুক্তির একেবারে পূর্বসীমায় অবস্থিত ছিল মানভূম। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমপ্রান্ত ছুঁয়ে প্রারম্ভ। ভূমি উঁচুনিচু, বর্ধমানের পশ্চিমপ্রান্তে উচ্চভূমির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। আরও পশ্চিমে, ক্রমউত্তুঙ্গ ভূভাগ ছোটনাগপুরের মালভূমির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছে। প্রাকৃতিক এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রেও সত্য।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলার সমতল ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলত না। তবু ছোটনাগপুর ভুক্তির মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল ছিল মানভূম জেলা। উত্তরপূর্বে

---

১. ১৮৭২ সালে ছোটনাগপুর ভুক্তির আয়তন ছিল ৪৩,৯০১ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৩৮,২৫,৫৭১; ঘনত্ব বর্গমাইলে ৮৭। —H, Beverley, P 121.

বসতির ঘনত্ব ছিল বেশি, দক্ষিণে কম।[২] বিগত একশো বছরে পুরুলিয়ার কয়লাখনি অঞ্চল বিহারের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে জনবহুল এলাকার বৃহত্তর অংশ জেলার বাইরে চলে গেছে। দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলের অন্তর্গত কৃষিসমৃদ্ধ চাষ থানাও জেলার বহির্ভূত। তবু জনবিন্যাসের রূপান্তর কৌতূহল উদ্রেক করে। জনসংখ্যা বেড়েছে কিছু, আগে প্রায় সমানভাবে বণ্টিত ছিল জনবসতি, জায়গায় জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে এখন। আধা সহরের চেহারা নিয়ে সেসব জায়গা বেড়ে বেড়ে চলেছে। বসতির ঘনত্বের দিক থেকে পুরুলিয়া পশ্চিমবাংলার মধ্যে সবচেয়ে জনবিরল জেলা। জনসংখ্যার দিক থেকে চতুর্দশতম।[৩]

জীবনযাপন যেখানে অনায়াস, রুজিরোজগার সহজলভ্য, জনবসতি সেখানে দ্রুত গড়ে ওঠে। পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ অঞ্চল অসমতল, মাঝে মধ্যে ডুংরি ও ছোট ছোট পাহাড়। মাটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা। জমি অনুর্বর, রঙ গেরুয়া থেকে কালচে বাদামি, বেশিরভাগ ল্যাটেরাইট। উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চল এই ধারার অনেকখানি ব্যতিক্রম। দামোদরের পলি দিয়ে গঠিত। ফলে ভূপৃষ্ঠ বন্ধুর ও শিলাময় হলেও মোটামুটি সমতল, মাটি উর্বর। পাহাড় ও ডুংরির আকস্মিক মাথা তোলা ছাড়া সবুজ শস্যক্ষেত্র আদিগন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে পাড়া থানার একাংশ, সাঁওতালডি, নেতুরিয়া, রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ি ও কাশীপুর থানা।

জনবসতি এদিকে ঘন। জনবহুল গ্রামের সংখ্যা বেশি।[৪] জেলার মধ্যে পাঁচটি থানার লোকসংখ্যা এক লক্ষের বেশি। তাদের মধ্যে দুটি থানা, রঘুনাথপুর ও কাশীপুর এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। নেতুরিয়া থানায় কৃষি ছাড়াও পাঁচটি কয়লার খনি আছে। তাতে শ্রমিকের সংখ্যা কম নয়। শ্রমিকদের সিংহভাগ সাঁওতাল, কোড়া ও মুণ্ডা। বাউরিরা একসময় সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলেন কোলিয়ারিতে। খাদের ভেতরে ও বাইরে উভয় স্থানেই ছিল তাদের প্রাধান্য। ক্রমশ সাঁওতালেরা তাদের স্থান

২. উত্তরপূর্ব কোণে রঘুনাথপুরে জনবসতির ঘনত্ব ছিল বর্গমাইলে ২৮৯, দক্ষিণে বরাভূমে ১৫২, গড় ঘনত্ব ২০৩ (১৮৭২ সালে)। তুলনীয়, বর্তমান গড় ঘনত্ব বর্গ কিলোমিটারে ২৯৬ (১৯৮১ সালে)। —Paper I of 1981, Provisional Population Totals.

৩. সবথেকে কম দার্জিলিং, তারপর কোচবিহার।

৪. পাঁচশোর ওপর লোকসংখ্যা বিশিষ্ট জনবহুল গ্রাম ধরলে, নেতুরিয়ায় জনবহুল গ্রাম—৩১, সাঁতুড়িতে—৩৩, পাড়ায়—৫৫, রঘুনাথপুরে—৭০ ও কাশীপুরে—৭৪। —Census of India 1971, General Population Tables.

দখল করে নিয়েছেন। এখন তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

বাউরিরা সম্ভবত ছিলেন এ অঞ্চলের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চল ছাড়া জেলার মধ্যাঞ্চলেও তাদের সংখ্যা বেশি। মূল বসতি কেন্দ্রীভূত রঘুনাথপুরে।

পঞ্চকোট রাজাদের রাজপাট কাশীপুরে স্থানান্তরিত হবার ফলে, রাজধানী ঘিরে নানা জনগোষ্ঠীর বসতি গড়ে উঠেছিল। রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বসতি তুলেছিলেন ব্রাহ্মণেরা। দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলের উর্বর ক্ষেত্রগুলি থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছিলেন বাউরিরা। এবং সেগুলি অধিকার করে নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণেরা। ফলে জেলার নানাদিকে বাউরিদের ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

কাঁসাইয়ের দক্ষিণে একমাত্র মানবাজার থানায় বাউরিদের বসবাস কিছুটা উল্লেখযোগ্য। মানা-বাউরি নামে বাউরিদের একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী সেখানে বিদ্যমান। মানবাজারের সঙ্গে লাগোয়া বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ, রায়পুর, সাতপাটা, মণ্ডলকুলি, অম্বিকানগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রধানত মানা-বাউরিদের বসবাস দেখা যায়।

বাঁকুড়া থেকে যে সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে, হুড়া, ছড়রা, জয়পুর ও ঝালদা ছুঁয়ে রাঁচি পর্যন্ত প্রসারিত, সেই সড়কের দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ ভূভাগটি পুরুলিয়া জেলার মধ্যাঞ্চল। পুরুলিয়া সহর থেকে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি চাইবাসা রোডকে বিভাজন ধরলে মধ্যাঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশ। পূর্বাংশের মধ্যে পড়ে পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার একাংশ, হুড়া, পুঞ্চা, ও মানবাজার থানা। পশ্চিমে জয়পুর, আড়ষা, বাগমুণ্ডি, ঝালদা ও বলরামপুর থানার একাংশ।

পূর্বাংশের ভেতর দিয়ে অনেকগুলি নদী প্রবাহিত। তাদের মধ্যে কংসাবতী প্রধান। উপনদী ও শাখানদী মিলিয়ে কংসাবতী অনেকগুলি সেচবৃত্ত রচনা করেছে। দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলের মত যদিও নদীগুলির অববাহিকাভূমি অতখানি পলিঋদ্ধ নয়, তবু পূবের মাটি কম অনাবৃত, ভূত্বক পুরু। ছাড়া ছাড়া জঙ্গল ও ডুংরির ফাঁকে ফাঁকে কোথাও পরিব্যাপ্ত কোথাও খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র। এক লক্ষের বেশি জনবসতি সম্পন্ন দুটি থানা, পুরুলিয়া মফঃস্বল ও মানবাজার এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। জনবহুল গ্রামের সংখ্যাও কম নয়।[৫]

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সীমান্ত ঘেঁষে, জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণে

---

৫. পুরুলিয়া মফঃস্বল—১০৯, হুড়া—৬৮, পুঞ্চা—৫৪, মানবাজার—১০২।

লম্বালম্বি, এই অঞ্চলটির একাংশে সাঁওতাল জনবসতির প্রাধান্য প্রসারিত। অন্যান্য থানায় বসতি ছড়ান ছিটানো ও বিক্ষিপ্ত হলেও পূর্বদিকের থানাগুলিতে, যথা, নেতুরিয়া, সাঁতুড়ি, কাশীপুর, হুড়া, পুঞ্চা, মানবাজার ও বান্দোয়ানে ঘন সংবদ্ধ। আঠারো শতকের শেষদিকে জঙ্গল হাসিল করে সম্ভবত তারা এদিকে কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করেছিলেন, সেইসঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন বসতি। সংঘবদ্ধ বসতি ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ হবার ফলে, উপজাতিগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গুলি অনেকাংশ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলেও কোলারীয় বা সাঁওতালি ভাষা এখনও মাতৃভাষার রূপ নিয়ে বজায় আছে।

বান্দোয়ান, মানবাজার, বরাবাজার ও বলরামপুর থানায় দেশোয়ালি মাঝি নামে একটি জনসম্প্রদায় বসবাস করেন। নিজেদের তারা সাঁওতাল বলে পরিচয় দেন। উপজাতিদের তুলনায় চেহারা অনেকখানি মার্জিত, আচার আচরণে হিন্দুয়ানির ছাপ সুস্পষ্ট। মাতৃভাষা বাংলা। কোনক্রমেই এখন তাদের কোল মুণ্ডা বা সাঁওতাল বলে সনাক্ত করা যায়না। ঠারা বা হড় মাঝি অর্থাৎ সাঁওতালদের থেকে অনেক আগে এসে এখানে বসবাস সুরু করেছিলেন মনে হয়। এবং বৃহত্তর সংস্কৃতির প্রভাবে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন আধা হিন্দু সম্প্রদায়ে।

উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের তুলনায় মধ্যাঞ্চলের পূর্বাংশে জনবসতি ঘন, গ্রামগুলির চেহারা সুস্পষ্ট, অনেকটা সমৃদ্ধও। হুড়া ও পুঞ্চায় জনবসতি ছিল ছাড়া ছাড়া, ডুংরি ও জঙ্গলে সমাকীর্ণ, চাষআবাদ ছিল গৌণ। বর্তমানে হুড়া থানায় বসতি নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে চলেছে। প্রসারিত হয়ে চলেছে বনসৃজন ও আবাদি ক্ষেত্র। দুর্গাপুর-বাঁকুড়া হয়ে যোগাযোগের প্রধান সড়কটি হুড়া থানার ভেতর দিয়ে প্রসারিত। থানাটির রূপান্তরের ক্ষেত্রে সেটির ভূমিকা নগণ্য নয়।

পূর্বাংশের মধ্যে পুরুলিয়া মফঃস্বল ও মানবাজর থানা আয়তনে যেমন বড়, তেমনি জনবহুল।[৬] জেলা সহর পুরুলিয়াকে ঘিরে থাকায় মফঃস্বল থানার জনবসতি অনেকখানি ঘন বিন্যস্ত, আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সম্পন্নও। ভূমি সমতল, কৃষির অনুকূল, ফলে চাষআবাদ অন্যতম জীবিকা। অন্যদিকে জেলা

৬. পুরুলিয়া জেলার মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে বড় থানা মানবাজার (৬০৩·২ ব. কি) তারপর যথাক্রমে পুঞ্চা (৫৮৩ ব. কি), ঝালদা (৫৬৯·৮ ব. কি) ও পুরুলিয়া মফঃস্বল (৫৪৫·৫ ব. কি)।

সহরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় রোজগারের অন্যান্য পন্থাও নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। মানভূমের রাজপরিবারের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল মানবাজার। জনবসতি প্রাচীন ও বিন্যস্ত। একসময় জেলার সদর দপ্তর ছিল মানবাজারে। অনেকগুলি নদীর জলধারায় অভিষিক্ত হবার ফলে থানার অধিকাংশ অঞ্চল কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী। জঙ্গল হাসিল করে চাষও সুরু হয়েছিল বহু পূর্বে। কাঁসাইয়ের দুই তীরে, মানবাজার থানার মধ্যে, প্রাচীন জৈন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পরিকীর্ণ দেখা যায়। কোথাও কোথাও জৈনক্ষেত্রগুলির ওপর উপস্থাপিত হয়েছিল শৈবধর্ম। জৈন ও শৈব ধর্মাবলম্বী সেইসব কৃষ্টিবান জনগোষ্ঠী এখন কোন কোন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলেমিশে রয়েছেন, কিছু কিছু অনুমান করা যায় মাত্র, সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় না।

মানবাজার থানার পশ্চিমে বরাবাজার থানা। মানবাজারের মত বরাবাজারও ছিল বরাভূম পরগণার রাজপরিবারের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। আয়তনে বেশ বড় ছিল পরগণাটি।[৭] চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর, বরাবাজার ও বান্দোয়ান থানা, বিহারের সিংভূম জেলার পটমদা থানার সমগ্র ও চাণ্ডিল থানার বৃহত্তর অংশ। দুর্গম হবার ফলে মুসলমান আধিপত্যের বাইরে ছিল পরগনাটি, ইংরেজ শাসনের অধীনে আনীত হয়েছিল ১৭৭৬ সালে।[৮]

ভূপ্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে বরাভূম পরগণার জনবসতি বিন্যস্ত হয়েছিল। উত্তরের দিকে, প্রধানত গড়তালি, কুমারীপার, তিনসওয়া প্রভৃতি তরফগুলি কম বন্ধুর ও পার্বত্যময়, অপেক্ষাকৃত সমতল। দক্ষিণের তরফগুলি, যথা, পঞ্চসর্দারি, সতেরখানি ও ধাদকা পর্বতাকীর্ণ ও জঙ্গলময়। দলমা শৈলশ্রেণীর প্রসারিত অংশ। সমতল অংশের এলাকা কম, জনবসতির ঘনত্ব বেশি, প্রধান জনগোষ্ঠী মাহাত ও সাঁওতাল। দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকায় গ্রামগুলি ছাড়া ছাড়া, জনঘনত্ব কম, প্রধান বসতি ভূমিজ ও সাঁওতালদের।[৯]

---

৭. বরাভূম পরগণার আয়তন ছিল ৬৩৫ বর্গ মাইল। তুলনীয়, বর্তমানে বরাবাজার থানা ২৩২ বর্গ কিলোমিটার, বলরামপুরে ২৭৬ বর্গ কিমি, বান্দোয়ান ৩৭৬.৮ ব. কি।

৮. Report on Barabhum—W. Higginson, 1776. বরাভূম পরগণা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি সমীক্ষা হয়েছিল। সমীক্ষাগুলির হদিস দেওয়া হয়েছে গ্রন্থপঞ্জীতে।

৯. এলাকা—সমতল অংশের ২০৬.৬৫ বর্গ মা. পাহাড়ি এলাকা ৩৬৯.৩৪ বর্গ মাইল। প্রতি বর্গমাইলে গ্রামের সংখ্যা, সমতলে—বর্গমাইলে ১.৩, মোট গ্রাম ২৬৫; ঘনত্ব ৫১৮ ব. মা. পাহাড়ি এলাকা—ব. মা. .৭১, মোট গ্রাম ২৫৬, ঘনত্ব ৩৮৬ ব. মা. —Ethnic Groups, Villages and Towns of Pargana Barabhum by Dr. S. Sinha and others.

প্রধান জনগোষ্ঠীগুলি ছাড়াও বরাভূম পরগণায় প্রায় ৬৫টি জনসম্প্রদায়ের বসবাস। সমতল অংশ কৃষির পক্ষে অনুকূল হবার ফলে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে এসে বসবাস গড়ে তুলেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্মণ, ময়রা, তামলি ও কায়স্থ। ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য এসেছেন মাড়োয়ারী, বেনিয়া, জয়সওয়াল ও মুসলমান। পাহাড়ি এলাকার ভূমিজ ও সাঁওতাল ছাড়াও খাড়িয়া ও পাহিরাদের বসবাস দেখা যায়।

উত্তরে জয়পুর থেকে দক্ষিণে বলরামপুর থানা পর্যন্ত পশ্চিমের সমগ্র অংশই শুষ্ক, বন্ধুর ও শিলাময়। ছোটনাগপুর মালভূমির বৈশিষ্ট্য সর্বাঙ্গে জড়ানো। পাহাড় ও ডুংরির ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ের সানুদেশে, মাঝে মধ্যে চাষের ক্ষেত। ছোট ছোট গ্রাম। ক্ষুদ্র জনবসতি।

হাজারিবাগ ছুঁয়ে ঝালদা থানার সীমান্ত ঘেঁষে সুরু হয়েছে ছাড়া ছাড়া একক ও পাহাড়গুচ্ছের মাথা তোলা। দক্ষিণে এগুতে থাকলে পাহাড়গুচ্ছ ক্রমশ ঘন হয়ে উঠেছে দেখা যায়। বাগমুণ্ডি থানায় ঢোকার মুখ থেকে সুবিস্তৃত শৈলশ্রেণীর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, হঠাৎ গিয়ে শেষ হয়েছে মাঠায়। গড় উচ্চতা প্রায় দু'হাজার ফুট, নাম বাগমুণ্ডি বা আযোধ্যা পাহাড়। সুবর্ণরেখা ও কাঁসাইয়ের মধ্যে পাহাড়শ্রেনীটি জলবিভাজিকার সৃষ্টি করেছে। অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্বদিকে সুবিস্তীর্ণ সমতল, জেলার মধ্যাঞ্চলের পূর্বাংশ।

পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান জনগোষ্ঠী কুর্মী। ঝালদা, আড়ষা, পুরুলিয়া মফঃস্বল ও বরাভূম সব ক'টি থানাতেই প্রধান। সেই সঙ্গে সাঁওতাল ও ভূমিজদের সংখ্যাও কম নয়। প্রকৃতপক্ষে কুর্মী, সাঁওতাল, বাউরি, ও ভূমিজরা পুরুলিয়া জেলার সংখ্যা গরিষ্ঠ জন-চতুষ্টয়। প্রায় প্রতি থানাতেই বিদ্যমান। চারটি গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালেরা যদিও সংখ্যাধিক্যে সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ কুর্মীরাই জেলার অগ্রণী জনসম্প্রদায়। জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে প্রভাবসম্পন্ন। সংখ্যার দিক থেকে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, জেলার জনজীবনে সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও রূপান্তরিত-করণের দিক থেকে ব্রাহ্মণদের অবদান একদা কম ছিল না। ব্রাহ্মণ ও কুর্মীসহ অন্যান্য বর্ণ সম্প্রদায়গুলি আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে জেলায় একটি স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে তুলেছেন। সমাজটি সম্প্রসারণশীল ও বর্ধিষ্ণু। উপজাতি ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের সম্পন্ন পরিবারগুলি ধীরে ধীরে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছেন।

বড় বড় চারটি জনগোষ্ঠী ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় জেলার

বিস্তীর্ণ জনসমুদ্রে বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের মত ছড়িয়ে আছে। ১৮৭২ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিক জনগণনায় এ জাতীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল একশোর ওপর।[১০] বর্ণহিন্দু ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্রাহ্মণ, কলু, তাঁতি, শুঁড়ি, রাজোয়ার, রাজপুত, নাপিত, ময়রা, কুমার, কামার ভড়, বারহি, হাড়ি ও ডোম। এখনও তাই।

জনবসতির বিন্যাস যেমন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, জনপ্রকৃতির বৈচিত্র্য তেমনি গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক শক্তিগুলির ক্রিয়া প্রক্রিয়া ও নব নব জনসম্প্রদায়ের আগমন ও নিষ্ক্রমণে। বেসিক বা মৌলিক জনগোষ্ঠী উপজাতি ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়, জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ছত্রিশভাগের বেশি। ভূমি ব্যবস্থা, পুজো-পার্বণ, লোক উৎসব, মেলা, দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা, গ্রামের নাম—সমস্তই এই সত্যটির দিক নির্দেশ করে।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে রাঢ় অঞ্চলে সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, বাশফোঁড়, মাল-পাহাড়ী প্রভৃতি জনসম্প্রদায়গুলি আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে পূর্বতন নিগ্রোবটুদের মেশামিশি হয়েছিল রক্তের। কবে এবং কোথায় সে সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলা কঠিন। দক্ষিণ ভারতের সমতল প্রদেশ তামিল-ভাষী মানুষদের দ্বারা অধ্যুষিত। তারা সুবৃহৎ 'মেলানিড' বা 'ভারতীয় মেলানিড' নরগোষ্ঠীর বংশধর।[১১] ডালটন, রিসলে, হান্টার—সকলেই সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভড়, দোসাদ, কৈবর্ত, মাহিলি, মাল, মালো মৌলিক রাজোয়ার প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে দ্রাবিড়ীয়-রা দ্রাবিড়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। সনাক্তীকরণ, বলা বাহুল্য, সর্বাংশে অনুমানভিত্তিক। একমাত্র গায়ের রঙ ও চেহারায় কিঞ্চিৎ ছাপ ছাড়া, সম্প্রদায়গুলির স্বাতন্ত্র্য আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করা দুরূহ। ভাষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে যেটুকু স্বাতন্ত্র্যের হদিস ছিল, তাও দ্রুত বিলীয়মান। এই ঝোঁক ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন আলাদা। তবে অর্থনৈতিক ও বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রভাবে ক্রমরূপান্তর যে অনিবার্য, সে ইংগিত বহুদিন আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক কালের প্রথম পর্বে পুরুলিয়া জেলায় শিখররাজ্যের হদিস পাওয়া

---

১০. বর্তমানে (১৯৮১) বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়গুলি বাদ দিলে, উপজাতীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ২৩ এবং তফসিলভুক্ত সাম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৮।

১১. ড. নীহাররঞ্জন রায় বাংলার নৃতাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Von Eicksted-এর অভিমত গ্রহণীয় বলে মনে করেছেন।—দ্রষ্টব্য, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব পৃ ৪০-৭৯। অন্ততঃ পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রে এ অভিমত সত্য বলে মনে হয়।

যায়। শিখররাজ্য কোন গোষ্ঠীভুক্ত রাজবংশের দ্বারা শাসিত হত, নির্ণয় করা যায় না। পুরুলিয়া জেলায় পরিকীর্ণ জৈন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইংগিত করে, রাজ্যটির বৃহত্তর জনসম্প্রদায় ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী। 'জৈন', নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সূচক শব্দ নয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত ধর্মের নাম।

যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ থেকে ছ'শো বছর আগে জৈনেরা ছিলেন বর্তমান পুরুলিয়া জেলায় প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী। এবং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে আদি-অস্ট্রালদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল যীশুখ্রীস্টের জন্মের আগেই। সম্ভবত জেলার উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল এই ধারা। প্রায় শতাধিক বছর আগে জৈন সারকদের চেহারায় মার্জিতভাব দেখে ডালটন যে বিস্মিত হয়েছিল, তার কারণ জৈন সরাকেরা ছিলেন সম্ভবত আদি-অস্ট্রালদের থেকে ভিন্ন জনগোষ্ঠী।

শিখররাজ্যের বিধ্বংসের ওপর তৈলকম্প রাজ্যের কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। তৈলকম্প নিঃসন্দেহে ছিল দ্রাবিড় রাজ্য।[১২] ছয়-সাত খ্রীস্টাব্দে সম্ভবত রাজ্যটি বিন্যস্ত হয়েছিল। দ্রাবিড় প্রভাব ও সংমিশ্রণ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল তৈলকম্পে। সম্ভবত কুর্মী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল তখন। দ্রাবিড়ীয় প্রভাব এখনও পুরুলিয়ার গ্রাম নাম, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, লোক উৎসব ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে পরিব্যাপ্ত।

পুরুলিয়া জেলার আঠারোটি থানার ভেতর সাতটি থানার নামে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। যথা, পুরুলিয়া মফঃস্বল ও সহর, আড়সা, বান্দোয়ান, পুঞ্চা, মানবাজার ও বরাবাজার। পুরুলিয়া নামটি আদিতে সম্ভবত ছিল পেরুল্লো বা পারুলা। দ্রাবিড় ভাষায় পেরুল শব্দটির অর্থ নদী বা জল, পারু শব্দের অর্থ নুড়ি বা পাথরের চাঁই। লা বা ওলা শব্দের অর্থ মধ্যে। অর্থাৎ পাথুরে ডাঙ্গার মধ্যে অবস্থিত গ্রাম বা সহর।

তামিল ভাষায় 'আর' শব্দের অর্থ খনন করা, আরু—চাষ। কন্নড়ে আর, লাঙ্গল। সা-অন্তে গ্রাম নাম দ্রাবিড় ভাষায় প্রচুর দেখা যায়। আরসা বা আড়সা নামটি এইভাবে উদ্ভব হয়েছিল মনে হয়। অর্থাৎ পাথর বা পাহাড় ভেঙ্গে যেখানে লাঙল পড়েছিল বা চাষ সুরু হয়েছিল। অনুরূপ দ্রাবিড়ীয় প্রভাব দেখা যায় বরাভূম নামের মধ্যে। তামিলে 'বর' বন্ধ্যাজমি, বরা অনুর্বর স্থান, মারাঠী ভুঁই অন্ত্যপদ হিসেবে যুক্ত হয়ে নাম হয়েছিল বরাভুঁই বা

১২. এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের 'তৈলকম্প ও পঞ্চকোট, অন্যান্য সামন্তরাজ্য' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

বরাভূম। বান্দুয়ান বা বান্দেয়ান, মানবাজার, পুণ্ডা প্রভৃতি নামে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।[১৩]

দ্রাবিড়ের মত অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব দেখা যায় জেলার ছ'টি থানার নামে। যথা, সাঁতুড়ি, পাড়া, সাঁওতালডি, ঝালদা, হুড়া ও বাগমুণ্ডি। সাঁতুড়ি বা সাঁতুরি ও সাঁওতালডি নিঃসন্দেহে সাঁওতালদের বসবাসের দিকে ইংগিত ক'রে। সাঁতুড়ি শব্দটির মধ্যে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব আছে, সম্ভবত নামটি তাদেরই দেওয়া।[১৪] বাগমুণ্ডি মুণ্ডাদের বসবাসের ইংগিত সূচক। অস্ট্রিক ভাষায় দা অর্থ জল। ঝালদা নামটি অস্ট্রিক শব্দজাত বলে মনে হয়।

পুরুলিয়া জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ২৬৮৭। তাদের মধ্যে প্রায় দেড়হাজার গ্রাম-নাম দ্রাবিড়ীয় ও অস্ট্রিক শব্দ জাত। পরবর্তীকালে, কিছু কিছু গ্রাম ও থানার নাম পরিবর্তিত হযেছে। যেমন চারটি থানার নাম. রঘুনাথপুর, কাশীপুর, জয়পুর ও বলরামপুর হিন্দুভাবাপন্ন। যে অন্ত-পদগুলি দিয়ে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষায় গ্রামনামগুলি গঠিত হয়, তাদের অধিকাংশ এখানকার গ্রামনামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।[১৫] অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাবাপন্ন নামগুলি প্রতি থানাতেই কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যেমন. বাঁধডি রূপান্তরিত হয়েছে বৃন্দিধটাঁড়ে, বাগমুণ্ডি অযোধ্যায়, জোজাড়ি শ্যাম-নগরে, টালটাঁড় দেবগ্রামে, সামুরাডি বৈকুণ্ঠপুরে ইত্যাদি। এ তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে।

---

১৩. বান্দোয়ান সম্ভবত ছিল বিন্দ+আন, বিন্দ (দ্রাবিড়) পাহাড়, আন—(দ্রা) নিকটে। দ্রাবিড়ে মান—বৃহৎ—মানবাজার, বড় সহর। দ্রাবিড় ভাষায় পুন বা পুনিন শব্দের অর্থ জল। পুনিন-এর সঙ্গে পুণ্ডার সংযোগ আছে বলে মনে হয়। মুণ্ডাদের পণ্ড বা পণ্ডারেত প্রথা থেকেও পুণ্ডা নামটি আসা অসম্ভব নয়।

১৪. সাঁতুড়ি বা সাঁতুরি = সাঁত বা সাঁওত + উরি (দ্রাবিড়, বাড়ি বা গ্রাম)।

১৫. অস্ট্রিক অন্ত্যপদগুলির মধ্যে প্রধান, আড়া, ওড়া, কোল, গোড়া, টিকর, ডাঙ্গা বা ডাং, ডি, ডুংরা, দা, হিড়, সোল বা সুলি। যথা পটুআড়া (আড়সা), রাউতওড়া (বরাবাজার), ছোটাহানকোল (ঝালদা), বুরুহিগোড়া (বান্দুয়ান), কুসুমটিকরি (বাগমুণ্ডি), শিয়ালডাঙ্গা (কাশীপুর), গোহালডাং (বলরামপুর), হারঘাডি (নেতুরিয়া), ভালুকডুংরি (বরাবাজার), মাপুইডি (পাড়া), ঝালদা (ঝালদা), তোলাহিড় (রঘুনাথপুর), লেহাসোল (পুরুলিয়া মফঃ)। দ্রাবিড় ভাষায় গ্রাম নামে অন্তপদ অজস্র। পুরুলিয়া জেলার অন্তপদগুলির মধ্যে প্রধান—অনু, আনু, আই, অর, আর, আল, ইন, ইনা, ইর, ইরা, ইল, উর, উরি, উলি, ওনা, ওসী, কর, কা, কি, কোট, কুটি, গা, গি টি, ডুবা, তা, তোর, না, বা, মা, লা, সর, সরা, সল, সাল, সা, আস, সির, হার ইত্যাদি।

জেলার আঠারোটি থানার মধ্যে ছটি থানায় উপজাতি বহু সংখ্যায় বসবাস করেন। তাদের মধ্যে মানবাজারে সব থেকে বেশি। অন্য থানাগুলি যথাক্রমে, কাশীপুর, বান্দুয়ান, বলরামপুর, ঝালদা ও বরাবাজার। তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের বসবাস বেশি ছটি থানায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রঘুনাথপুরে। অন্যান্য থানাগুলি যথাক্রমে, পুরুলিয়া মফঃস্বল, কাশীপুর, মানবাজার, ও পুঞ্চা।

বিগত কুড়ি বছরে উভয় সমাজের মধ্যে বসতি পুণর্বিন্যাসের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি থানায় উপজাতিদের বসতি মোটামুটি স্থিতিশীল। যেমন, মানবাজার, বাগমুণ্ডি ও পুঞ্চা। অন্যান্য স্থান থেকে বাস উঠিয়ে কটি থানায় নতুন করে তাদের বসতি বিন্যাসের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। থানাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বরাবাজার, ঝালদা ও পুরুলিয়া মফঃস্বল। তিনটি থানায়, কাশীপুর, বান্দুয়ান ও বলরামপুরে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। চোখে পড়ার মত কাশীপুর ও বান্দুয়ানে।

তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রবণতা কম সক্রিয় নয়। রঘুনাথপুরে বসতি স্থিতিশীল, মানবাজার ও নেতুরিয়ায় হ্রাসমান, পুরুলিয়া মফঃস্বল, পুঞ্চা, ঝালদা, পাড়া ও কাশীপুরে ক্রম বর্ধমান। বসতি স্থানান্তরের সবচেয়ে বেশি প্রবণতা দেখা যায় পুরুলিয়া মফঃস্বল ও পুঞ্চা থানার দিকে।

জেলায় গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ও ছাড়া ছাড়া। প্রতি একশো বর্গ কিলোমিটারে বসতিপূর্ণ গ্রামের সংখ্যা উনচল্লিশ। কোন কোন থানায় এই সংখ্যা খুব কম।[১৬] উত্তরপূর্বের থানা দুটি, নেতুরিয়া ও সাঁতুড়িতে সবচেয়ে বেশি। বসতিবিহীন গ্রামের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রঘুনাথপুরে, তারপর যথাক্রমে মানবাজার ও পুরুলিয়া মফঃস্বলে। সবচেয়ে কম আড়সায়।[১৭] বসতিবিহীন গ্রামগুলি গ্রামত্যাগের ইংগিত বহন করে।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমদিকে জেলা থেকে জীবিকার সন্ধানে

---

১৬. যথা, সবচেয়ে কম পুঞ্চায়, প্রতি ১০০ বর্গ কি. মিটারে গ্রামের সংখ্যা ২৬ তারপর হুড়া ২৭। সবচেয়ে বেশি নেতুরিয়ায় ৫৪, তারপর সাঁতুড়ি ৫২। দক্ষিণের থানাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাবাজারে ৪৮ ৫। কটি থানায় আশ্চর্যভাবে এক, যথা, আড়সা, বাগমুণ্ডি ও বান্দুয়ান, প্রতি ১০০ বর্গ কি মিটারে ৩৫। —১৯৭১ এর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে।

১৭. বসতিবিহীন গ্রাম রঘুনাথপুর থানায় ৪১, মানবাজারে ৩০, পুরুলিয়া মফঃস্বলে ২২, আড়সায় ৩।

স্থানান্তরে যাওয়া ছিল ব্যাপক। কুলি সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র ছিল মানভূম ও বাঁকুড়া। বাঁকুড়ায় ছিল অধিকাংশ ডিপো বা রিক্রুটমেন্ট সেন্টার। মানভূম থেকে সংগৃহীত কুলিবাহিনী বাঁকুড়ার ডিপোগুলির মাধ্যমে প্রেরিত হত। ফলে, বিপুল জননিষ্ক্রমণের পরিসংখ্যান গ্রথিত হত বাঁকুড়া জেলায় রেকর্ডে।[১৮] জননিষ্ক্রমণের ধারা এখনও অব্যাহত। তবে প্রকৃতিগতভাবে সেটি মরশুমী। নামাল বা সমতল বঙ্গে ধানবোপা ও কাটার সময় বিপুল সংখ্যায় দিনমজুর এ অঞ্চলে চলে আসেন। মরশুম শেষ হলে ফিরে যান গৃহে। কিছু কিছু অবশ্য এখান থেকেই নতুন জীবিকার সন্ধান পেয়ে বরাবরের মত গৃহত্যাগ করেন।

জেলার প্রধান জীবিকা কৃষি। ফলে শ্রমজীবি মানুষের সিংহভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত। কাগজকলমে চাষী পরিবারগুলির অধিকৃত এলাকা বৃহৎ হলেও, আর্থিক ক্ষেত্রে অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত। জমি অনুর্বর, চাষে খরচ বেশি, ফলন তুলনীয়ভাবে অনেক কম। বহু ক্ষেত্রে খরচ উঠে আসে না, তবু চাষ অবহেলা করা চলেনা। কারণ, জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

বিকল্প জীবিকার অভাব ও চাষজমির স্বল্পতা বিপুল পরিমানে কৃষিমজুরের সৃষ্টি করেছে। কোন কোন থানায় কৃষকের চেয়ে কৃষিমজুরের সংখ্যা বেশি। যথা, রঘুনাথপুর, বান্দুয়ান ও বলরামপুর। প্রকৃতপক্ষে বান্দুয়ান ও বলরামপুরে মোট শ্রমজীবির তুলনায় কৃষিমজুরের শতকরা হারও জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম ঝালদা, জয়পুর ও নেতুরিয়ায়।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রধান গোষ্ঠীগুলি হাজার বছর আগেই তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। উপজাতি রূপান্তরিত হয়েছিলেন সম্প্রদায়ে। রূপান্তরের সে ধারাটি এখনও সক্রিয়। অনুন্নত সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার কর্তৃক যে মোটা দাগের দুটি বিভাগ, উপজাতি ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় স্বীকৃত; দুটি বিভাগই অনেকাংশে কৃত্রিম।

সম্প্রতি বেইলির সমীক্ষা এই দুই বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রকৃতির দিকে ইংগিত করেছে।[২০] দুই বিভাগেরই সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

---

১৮. দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ১৮২—১৯৩।

১৯ শতকরা ৪৬ ভাগ, বলরামপুর ২০% রঘুনাথপুরে ২১%, নেতুরিয়ায় ২৪%, বাগমুণ্ডি ৪২%, অন্যান্য থানাগুলিতে ১১ থেকে ৪০% মধ্যে। —১৯৭১ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে।

২০, Tribe and Caste in India—F. G. Bailey, Indian Sociology, No 5. 1961.

উপজাতিগত বৈশিষ্ট্য, যান্ত্রিক ঐক্য' ও বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মধ্যে অনেকাংশে নিহিত। সম্প্রদায়গুলির ঐক্য গঠিত হয়েছিল জৈবিক উপাদানে, শ্রম-বিভাগের আদলে ও উধ্বস্তরের সম্পর্কের টানাপোড়েনে। অর্থাৎ জমির অধিকার যেখানে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অবিঘ্নিত থেকে গিয়েছিল। নির্ভরতা বা অধীনতার মাধ্যমে যেখানে এসেছিল অধিকার, জনসমাজ সেখানে সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যের দিকে এগিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই পৃথকীকরণ অত্যন্ত সরলীকৃত।

পুরুলিয়া জেলায় জনজীবনের ধারাটিকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে উভয় বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের ওপর হিন্দু বর্ণ সম্প্রদায়ের প্রভাব, প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান ও ঘাটতি, ঐতিহাসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—সমস্তই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ এসবের আদলেই গড়ে উঠেছে এখানকার ধর্মীয় বোধ ও সংস্কার, খাদ্যাখাদ্যের গ্রহণ ও বর্জন, দৈনন্দিন জীবন-যাপন পদ্ধতি, উৎসব ও মেলা, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান। দীর্ঘকাল ধরে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে থাকায়, এখানকার জনজীবনের একদা সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও বহু পরিমাণে অবিকৃত রয়ে গেছে।

খ. উপজাতি ও বিভিন্ন জনসম্প্রদায়

শাল কাঠের হালটি কুসুম কাঠের বঁটা
বাঁকা বঁটা লাগাই নিয়ে করব হেঠা বেঁটা
হাইল্যা বলবি বলবি রে—
হামি আল্‌গ মুঠায় হাল ধর্যেছি।

প্রথমে বলে নেওয়া দরকার উপজাতিগত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাগ এখন অনেকাংশে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। নৃতাত্ত্বিক যে বৈশিষ্ট্যের ওপর উপজাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য গ্রথিত ছিল, সহস্রাধিক বৎসরের সংমিশ্রণের ফলে গোষ্ঠীগুলির মূল কাঠামো অবলুপ্ত হয়েছে। চেহারা, চরিত্র, ভাষা, দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা—সবই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে বিমিশ্র উপাদানে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগগুলির যৌক্তিকতা কি—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মনে আসে।

রূপান্তরের পথে চললেও সামগ্রিক রূপান্তরের প্রকৃত চেহারাটি এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সম্পূর্ণও হয়নি রূপান্তরের ধারা। উপজাতিগত ও সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও কিছু পরিমাণে আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম ও সংস্কার, সামাজিক রীতি নীতি, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে উপজাতি ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়গুলি অনগ্রসর। পরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে গোষ্ঠীগুলিকে উন্নয়নের পথে চালিত করতে গেলে প্রতিটি গোষ্ঠীর শক্তি ও দুর্বলতা, গ্রহণ বর্জনের প্রবণতা ও ক্ষমতা, স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিভাগগুলির উপযোগিতা সম্ভবত সেখানে।

---

১. শাল কাঠের হাল বা লাঙ্গল, কুসুম কাঠের বাঁট বা হাতল, আলগা মুঠোর লাঙ্গল ধরে হাঁকডাক করছি। কষ্ট হলে বলবি রে, হালের বলদ (বলদ যেন তার বন্ধু)।

সাঁওতাল : উপজাতিদের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল। ডালটনের রিপোর্ট যদি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায় গঙ্গা থেকে বৈতরণী, প্রায় তিনশো পঞ্চাশ মাইল এলাকা জুড়ে একদা ছিল তাদের বসবাস।[২] ডালটন ও রিসলের মতে সাঁওতাল উপজাতিটি দ্রমিল জাতি থেকে উদ্ভূত বা দ্রাবিড়ীয়। ভাষায় কোল। হাজারিবাগ ও বীরভূম জেলার একাংশে সুদূর অতীতেই ছিল তাদের বসবাস। পুরুলিয়া বাঁকড়া ও মেদিনীপুরে অঞ্চলে আগমন সাম্প্রতিক, আঠারো শতকের শেষদিকে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের তুলনায় প্রাক্তন মানভূম বা বর্তমান পুরুলিয়া জেলায় বসতি ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, সংখ্যায়ও বেশি।[৩]

চেহারায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। গায়ের রঙ কালচে, ঘন বাদামি থেকে কয়লা-কালো, হাঁ-মুখ বড়, পুরু ওলটানো ঠোঁট, নাক ভুরুর গোড়া থেকে ভেঙ্গে নেমেছে, চুল মোটা, কালো, কারো কারো কোঁচকানো, মুন্ডাকৃতি দীর্ঘ।[৪] অপুষ্টি, রক্তের সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস করার ফলে, দেহের গঠন ও চেহারায় রূপান্তরের ছাপ পড়েছে। বিবর্তন এসেছে দৈনন্দিন জীবনযাপন ও সামাজিক রীতিনীতিতে।

কৃষিকাজে স্থিতিশীল হয়ে বসার আগে সাঁওতালেরা স্বভাবে ছিলেন যাযাবর। অরণ্য থেকে অরণ্যে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছিল তাদের যাত্রা। বনভূমি হাসিল করার পর যখন আবাদি ক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে তা জেগে উঠত, স্থানান্তরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠতেন গোষ্ঠীর মানুষেরা। স্থানান্তর ভ্রমণের ঐতিহ্য তেমনভাবে রক্ষিত হয়নি তাদের উপকথায় বা গানে।

---

২. এই এলাকার মধ্যে পড়ে বিহারের ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও সিংভূম জেলা, বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূম জেলা এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর জেলা। —Descriptive Ethnology of Bengal by Edward Tuite Dalton, Calcutta 1872.

৩. ১৮৭২ সালের লোকগণনায় বাঁকুড়ায় সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ২৫,৩৭৮; মেদিনীপুরে ৯৬, ৯২১; মানভূমে ১, ৩২, ৪৪৫।

৪. 'In point of physical characteristics the Santals may be regarded as typical examples of the pure Dravidian Stock.' —The Tribes and Castes of Bengal by H. H. Risley (1891 Rep. 1981). বাঁকুড়া (তরুণদেব ভট্টাচার্য) গ্রন্থে সাঁওতালদের আদিভূমি, সামাজিক ব্যবস্থা এবং ধর্ম ও দেবীদেবী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে বিবাহ ও সামাজিক রূপান্তর সম্পর্কে। —লেখক।

কিছুটা ছিটেফোঁটা যে ইংগিতটুকু নিহিত রয়েছে তাতে মনে হয় খারওয়ার গোষ্ঠীর এক শাখা ছিলেন তারা। বীরহোড় পুরুষের ঔরসে সাঁওতাল রমণীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল মধু বা মাধো সিংহের।

সাঁওতাল কুমারীকে বিয়ে করার দাবী জানিয়েছিলেন মধু সিংহ। সে দাবী অগ্রাহ্য হলে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন সমস্ত সাঁওতাল কুমারীদের কৌমার্য লঙ্ঘন করবেন। এক গভীর রাত্রে নারী, শিশু, গো-মহিষাদি নিয়ে সাঁওতালেরা যাত্রা করেছিলেন চাই-চম্পা থেকে ছোটনাগপুরের দিকে। ছোটনাগপুরে স্থিত হননি, চলে এসেছিলেন ঝালদায়। ঝালদার অধিবাসী ছিলেন মুন্ডারা। তারা উচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। পাতকুমেও স্থিত হবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে ভূমিজদের আধিপত্যের জন্য স্থিত হতে পারেননি। পরে স্থিত হয়েছিলেন সাঁওতে। সাঁওতের রাজা সাঁওতাল মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হলে, গিয়েছিলেন শিখরে বা শিখরভূমে। দীর্ঘকাল সাঁওতে অবস্থিতির জন্য তাদের নাম হয়েছিল সাওতাল বা সাঁওতার।[৫]

বুকানন হ্যামিলটনের সমীক্ষায় সময় চের, কোল এবং খারওয়ার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। সাঁওতালদের উপকথা ও গানে রাজা, রাজ্য ও ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়না। চেরজাতি অতি প্রাচীন। খ্রীস্টপূর্ব ছয় সাত শতকে তাদের বসবাস ছিল গোরখপুর, গয়া, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। মিথিলা ও মগধেও ছিল বসবাস। সেখান থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছিলেন পরবর্তীকালে। একমাত্র পালামৌ অঞ্চলে আধিপত্য ছিল ইংরেজ রাজত্বের পূর্বকাল পর্যন্ত। পালামৌ অঞ্চলেই চের ও খারওয়ার অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন বারো হাজারি ও আঠারো হাজারি হিসেবে। উভয় উপজাতিই গ্রহণ করেছিলেন হিন্দু সংস্কৃতি। চেরেরা নিজেদের চৈন মুনির বংশধর বলে পরিচয় দিতে সুরু করেছিলেন। খারওয়ারদের পরিচয় ছিল হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের বংশধর হিসেবে। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব থেকে খারওয়ারদের মধ্যে যে অংশটি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, সম্ভবত তারা পরিচিত হয়েছিলেন সাঁওতাল হিসেবে। সাঁওতাল সমাজ ছয় রকমের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এক, বাপলা

৫. Descriptive Ethnology of Bengal—E. T. Dalton লিখেছেন হামির সিং নামে এক রাজার অধীনে মানভূমের পূর্বাংশে, পাচেটের কাছে তারা স্থিত হয়েছিলেন। রাজা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে অবশেষে স্থিত হয়েছিলেন রাজমহলে গিয়ে। —The Tribes and Castes of Bengal.

বা কিরিঙ বেহু, কণে কেনা। দুই, ঘারদি জাঁওয়ায়, ঘরজামাই। তিন, পুতত রেয়ান, জোর করে সিন্দুর দেওয়া। চার, ব্রিওর বলংকু রেয়ান্, স্বেচ্ছায় হরণ। পাঁচ, সাঙ্গা। ছয়, কিরিঙ জাওয়া, বর কেনা। এ ছাড়া আর এক ধরণের বিয়ে আছে তাকে বলা হয় 'গোলাত' বিয়ে। 'গোলাত' বিয়েতে যে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক গ্রথিত হয়, দুই পরিবারেরই বিবাহযোগ্য ছেলে ও মেয়ে থাকলে এক পরিবার অপর পরিবারের সঙ্গে ছেলে-মেয়ে বিবাহের মাধ্যমে বিনিময় ক'রেন।

উপযুক্ত বয়সে সাঁওতাল তরুণতরুণীর বিয়ের ব্যবস্থা হয়। বাল-বিবাহ সাঁওতাল সমাজে অপ্রচলিত। বাপলাই সামাজিক ভাবে স্বীকৃত প্রধান বিবাহ-পদ্ধতি। ছেলের বাবা রায়বার (রায় বারিচ) বা ঘটকের মাধ্যমে কনের খোঁজ করেন। কনের গুণ হিসেবে প্রধান বিবেচ্য তার মা-মাসির কর্মদক্ষতা। বারোটি পারিস বা গোত্র সাঁওতাল সমাজে বিদ্যমান। গোত্রগুলি আবার একাধিক উপ-ভাগ বা খুঁটে বিভক্ত। একই পারিসের মধ্যে বিবাহ হলেও একই খুঁটের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কনে দেখার ব্যাপারটি সারা হয় জগ-মাঝির উদ্যোগে, কনের বাড়িতে। ছেলে কনে দেখেন হাট, বাজার, মেলা বা পূর্ব নির্ধারিত কোন জায়গায়। বিবাহের প্রস্তাব প্রথম যায় ছেলের পক্ষ থেকে। বিয়ের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে আগে ছিল ষোল থেকে সতের, মেয়েদের ক্ষেত্রে পনের। এখন বয়স-সীমা বেড়েছে তিন থেকে চার বছর।

পাত্র বা ছেলে মেয়ে পছন্দ করলে ছেলের বাবা সামান্য উপহার নিয়ে মেয়ের বাড়ি যান। পুত্রবধূ হিসেবে মেয়েটিকে গ্রহণ করার স্বীকৃতি থাকে উপহারের মাধ্যমে। কন্যাপক্ষ তারপর যান পাত্রের বাড়ি। পাত্র কন্যাপক্ষের ব্যক্তিদের কোলে বসিয়ে চুম্বন করেন, উপহার দেন কিছু অর্থ। পাত্রীর বাবাকে দেওয়া হয় পাগড়ি ও নতুন কাপড়। অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় পাত্রীর বাড়িতে, পাত্রপক্ষ যখন সেখানে যান। প্রথাটি আগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে কোন কোন অঞ্চলে।

বিয়ের দিন ঠিক হয় কনের বাড়ীতে। সেদিন থেকে যেদিন বিয়ে হবে সেদিন পর্যন্ত মাঝখানে যতদিন বাকি থাকে ততগুলি গিঁট দেওয়া হয় একটা কাপড়ে বা সুতোয়। সেই গিঁটবাঁধা কাপড় বা সুতো, শালপাতার পাঁচটি থালা বা বাটিতে বাটা হলুদ, দুর্বা ও আতপ চাল সহ ঘটকের হাত দিয়ে পাঠান হয় পাত্রের বাড়ি। পাত্রপক্ষও সুতোয় গিঁট বেঁধে কনের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। সম্মতি জানান নির্ধারিত দিনটিতে বিবাহ অনুষ্ঠানের।

বর্তমানে বিয়েতে আশীর্বাদ গায়ে-হলুদ, আইবুড়ো ভাত-খাওয়ান, জল-সওয়া,

বর-বরণ, সিন্দুর-দান, বরকনে-বরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি হিন্দু-বিবাহ রীতি অনুসরণ করে সাঁওতাল সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে মনে হয়।

বিবাহ-মণ্ডপ তৈরি বা ছাঁদনা-তলা প্রস্তুত করার যে রীতিটি প্রচলিত তার কতখানি উপজাতিগত বৈশিষ্ঠ্য সমান্বিত, কতখানি হিন্দুরীতি প্রভাবিত, বলা কঠিন। বিবাহের ক'দিন আগে, বিয়ের মণ্ডপ তৈরি করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পুরুষদের নামে হাঁড়িয়া উৎসর্গ করা হয়। পাত্রের বাবা জগ মাঝিকে পাঁচটি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে জোগাড় করে দিতে বলেন। জগ মাঝি পাঠান গোড়েৎ মাঝিকে। গোড়েৎ মাঝি ছেলে মেয়েদের জোগাড় করে আনেন। বরের বাবাকে বলেন, 'দাও তিনটে মুরগি, একটা খয়েরি দুটো সাদা, তিন পাই চাল, হাঁড়িয়া ও পূজার সামগ্রী'। নায়কে (পুরোহিত) জাহের থানে গিয়ে মণ্ডপের নামে খয়েরি মুরগিটি বলি দেন। সেইসঙ্গে প্রার্থনা করেন যাতে শুভকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। বাকি সাদা দুটি মুরগির একটি মড়েকক্কে (পঞ্চ দেবতা) ও অন্যটি মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। প্রার্থনা থাকে একই।

মণ্ডপ তৈরি শেষ হলে জগমাঝি মণ্ডপের মধ্যে গর্ত খুঁড়তে বলেন। তিন ফেঁকড়া কাঁচা হলুদ, পাঁচটি কানা কড়ি, তিনটি দূর্বা, তিনটি আতপ চাল, বাটা হলুদ দিয়ে মেখে, বরের মা-বাবা একটি পুঁটলি করে বাঁধেন। পুঁটলিটি গর্তের ভেতর রাখা হয়। তারপর মহুয়া গাছ লাগান হয় গর্তের ভেতর। গাছ লাগাবার পর খড়ের কাছি দিয়ে তিন পাক জড়ান হয়। মাটি দিয়ে লেপে সমান করা হয় গাছের গোড়া, আলপনা দিয়ে ছবি আঁকা হয় বর ও কনের।

মণ্ডপের কাজ শেষ হলে হাঁড়িয়া খান ছেলেমেয়েরা। গাঁয়ের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ডেকে আনা হয় গায়ে-হলুদের জন্য। তারাও হাঁড়িয়া খান। সবাইকে মাখান হয় হলুদ, ছেলের বাবা-মাও বাদ যাননা। সঙ্গে চলে গান,

হারূদি হারূদি পুরা পাটর কনে মরা হারূদি বাইসাড' আয়েতে
রাইলা হো চন্দনারে।
হারূদি হারূদি পুরা পাটর আয়ো মরা হারদি বাইসাড' আয়েতে
রাইলা হো চন্দনারে।[৬]

আমকা-আমকি বা যুবক-যুবতীদের এই যে নাচগান সুরু হয়, বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাতে ছেদ পড়েনা।

বিয়ের দিন বরের পক্ষ থেকে অগ্রগামীরা যান কনের বাড়ি। তারা চলে গেলে

---

৬. পাত্র ভরা হলুদ আর চন্দন, কে মাখাচ্ছ? পুরা পাত্র হলুদ আর চন্দন মাখাচ্ছেন আমার মা।

নারী পুরুষ সবাই মিলে যান কাছাকাছি কোন নদী বা পুকুরে, জল আনতে। বরের মায়ের কাছে থাকে বড় একটি ডালা, তাতে থাকে আতপ চাল ধান দুর্বা ডিম তেল সিন্দুর ও এক লাতি সুতো। বরের কাকি ধরেন তরোয়াল, পিসি তীর ধনুক। দু'জন তেতরে মেয়ের মাথায় সুতোর বিড়ার ওপর থাকে কলসি। শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে কলসি বা শুভঘট। পাত্রের ভগ্নিপতিকে বলা হয় বামুন। জলে তীর মেরে এবং তরোয়াল দিয়ে কুপিয়ে দেবার পরে তেতরে মেয়েরা কলসিতে জল তোলেন।

প্রথাটি রকমফেরে বহু উপজাতীয় বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে সংযুক্ত। কেন এবং কখন উদ্ভব হয়েছিল প্রথাটির, কোনদিকে সেটি ইংগিত করে, অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সম্ভবত প্রথাটির মধ্যে উপজাতীয় স্মৃতি অন্তর্নিহিত হয়ে আছে।

বরসহ বরযাত্রীরা যাবার আগে বরের মা ছেলেকে কোলে বসান। গুড়জল খাওয়ান ছেলেকে। একটি টাকা মুখে করেন ছেলে, ছেলেকে মা স্তন খাওয়ান, ছেলে টাকাটি উগরে দেন মাকে। সেটি দুধ টাকা। বরযাত্রার সঙ্গে মেয়েরা গান ধরেন,

কাতি দূরে কাতি দূরে নাইহারা,
কাতি দূরে শ্বশুরা ঘর
ইণ্ডে হনা গাং নাদি, উণ্ডে হনা জাবো নাদি
তাহির মাঝে গো পুতা ওহরা নাহি হায়।[৭]

মেয়েরা কোলে করে বরকে গ্রামের কুলি বা রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

বিয়ের সময় বরকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়ান বামুন বা বরের ভগ্নিপতি। মেয়েকে আনা হয় দাউড়া বা বড় ডালার ওপর বসিয়ে। ব্যবস্থা হয় শুভদৃষ্টির। সে সময়েই কনের সামনে থেকে ঘোমটা সরিয়ে কনের মাথায় সিন্দুর দেন বর। পাঁচবার দেওয়া হয় সিন্দুর। শেষে সব সিন্দুর মাখিয়ে দেওয়া হয় কনেকে। তখন সবাই বলে ওঠেন, 'হরিবোল'।

সাঁওতালি বিয়েয় কোন মন্ত্র নেই। মেয়ের বাড়ি থেকে বিদায়ের আগে মাঝি ছেলেকে বলতে বলেন, বৎস, আজ তোমাকে এ বোঝা বেঁধে দেওয়া হল। শিকারে গেলে তুমি অর্ধেক খাবে ও অর্ধেক আনবে। রোগে শোকে, সুখে দুঃখে তোমরা সঙ্গী সাথীরূপে থাকবে। আজ তুমি অস্থি ও ছাই উভয়ই কিনলে।[৮]

---

৭. কত দূরে, কত দূরে এর শ্বশুর বাড়ি। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে জাবো নদী, মাঝখানে, পুত্র, তোমার শ্বশুরবাড়ি।

৮. 'মা বাবা, তেহেঞ্জ দ কাম্মার টট্‌কলে তল্‌ওয়েয়া। সেন্দরারে কারকারেম চালাঃক্‌,

বরের গ্রামের মাঝির ওপর ভার দেওয়া হয় কনের। কনেকে বলা হয়,

'মা, পুকুর বা নদীর ঘাটে তুমি আগেকার স্মৃতি স্মরণ কোরনা। আজ থেকে তোমাকে রাখা হল আশ্রয়ে। তোমার হাড় ও ছাই লবণের মাপে ওজন করা হল। রোগে শোকে দুঃখে সুখে তোমরা সঙ্গী হয়ে থাকবে'।

রিসলে অনুমান করেছিলেন আদিতে সাঁওতাল বিবাহ রীতি ছিল খুব সাদাসিধে।[৯] পাত্র পাত্রী দুজনে চলে যেতেন বনে। ফিরে এলে দুজনকে একটি ঘরে আটকে রাখা হত। ঘর থেকে বেরিয়ে এলে তাদের গণ্য করা হত স্বামী-স্ত্রী বলে। উনি। এতকের শেষদিকে ডালটন এ প্রথা দেখেছিলেন বীরহড়দের মধ্যে।

রিসলের অনুমান সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, যাযাবর সমাজে বিবাহ প্রথা জটিল আচার অনুষ্ঠান ও লোকাচারযুক্ত হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়না। গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বর্তমান বিবাহ-রীতি একটু একটু করে সে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

বিবাহ-রীতির মত আরও অনেক রূপান্তরের হদিস পাওয়া যায় সাঁওতালদের বর্তমান জীবনযাপনের ব্যবস্থায়। ডালটন, রিসলে বা হানটার যে সাঁওতাল সমাজ দেখেছিলেন, লিপিবদ্ধ করেছিলেন যাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা, সে সমাজ এখন অনেকখানি রূপান্তরিত।

উপজাতিদের বিচ্ছিন্নতার দুর্গ এখন ভগ্ন প্রাকার। পাহাড় ও ডুংরির ভেতর দিয়ে প্রসারিত হয়েছে পাকা সড়ক। অরণ্য উচ্ছিন্ন, প্রশাসনিক আধিকারিক, বন-দপ্তরের কর্মচারী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার এবং মহাজনদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসীদেরও। এই যোগাযোগ, শিক্ষার প্রসার এবং গ্রাম সমাজে নগর সভ্যতার অনুপ্রবেশ রূপান্তরের, ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সাঁওতাল পরিবার আকারে মাঝারি।[১০] শিক্ষায় জেলার উপজাতিদের মধ্যে

আ জাং জাং দ জমমে। আর জেলে জেল দ আগুইমে। বুয়াঃকু'রে হাসোঃ কু'রে। সুকবে দুকরে জুরীজতা বাড়ে তাঁহেকঃকাবন। তেহেঞ দ বাবা জাং জাং তরচ হ' তরচ এম কিরিঞ কেদা।' —সাঁওতাল বিবাহে লোকাচার-ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।

৯ The Castes and Tribes of Bengal, Vol-I by H. H. Risley. 1891 (Rep 1981).

১০. এক সমীক্ষায় দেখা যায় নাপিতদের পরিবার সবচেয়ে বড়, সদস্যসংখ্যা পরিবার পিছু দশজন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণদের, পরিবার পিছু সদস্য ৬·০২ জন। তৃতীয় সাঁওতাল, পরিবার পিছু সদস্য ৫·৪৭ জন। —Twenty Five Villages of West Bengal. Ed. by B. Chakrabartty & P. Roy. 1972.

সবচেয়ে বেশি অগ্রসর। বর্তমানে কলকারখানা, অফিস, আদালত, হাসপাতাল প্রায় সর্বক্ষেত্রে কিছু কিছু তাদের নিয়োজিত দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে জেলায় মাহাত এবং মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি। বর্ণ হিন্দু এবং অন্যান্য তফসিল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য আগেকার থেকে এখন অনেকখানি আন্তরিক হয়ে উঠেছে। তবু দীর্ঘকালধরে বঞ্চনার শিকার ও বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে যতখানি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা, তা গড়ে ওঠেনি। এদিক থেকে পরিকল্পিত কোন কার্যক্রম কোন দিক থেকেই অনুসৃত হয়নি। নাগরিক সভ্যতা ও শিক্ষার প্রসার প্রকৃতিগতভাবে উভয় সমাজের মধ্যে মন্থরগতিতে যোগসূত্র গড়ে তুলে চলেছে।

কুর্মী ঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার, ছোটনাপুর, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যায় কৃষিজীবি হিসাবে কুর্মীদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। কুর্মীদের উদ্ভব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। অনেকের মতে তারা প্রাচীনতম আর্য উপনিবেশকারীদের বংশধর।[১১] উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কুর্মীদের চেহারায় আর্য প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ব্রাহ্মণদের তুলনায় কম মার্জিত, রাজপুতদের তুলনায় কম সৌষ্ঠব সম্পন্ন, তবু অসুন্দর নন। উচ্চতায় মাঝারি, অবয়ব মানানসই, গায়ের রঙ বাদামি থেকে তামাটে, হালকা শরীর। উপজাতিদের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটলেও চেহারায় আর্য প্রভাব অবলুপ্ত হয়নি।

ডালটনের মতে ছোটনাগপুরে অতি প্রাচীনকালেই তারা স্থিত হয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন উপজাতিদের মধ্যে। সেজন্য কোল ভাষাভাষী উপজাতি, বিশেষত ভূমিজ ও মুণ্ডাদেয় সঙ্গে তাদের লিপ্ত হতে হয়েছিল সংগ্রামে। এখনও কুর্মী গ্রামের উপান্তে মুণ্ডাদের কবরস্থান সূচক পাথরের স্তম্ভ পোঁতা দেখা যায়।

মানভূমে কুর্মীদের বসবাস অতি প্রাচীন বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। বিশেষত মানভূমের পশ্চিমাঞ্চলে। উনিশ শতকের শেষদিকে তাদেয় বসবাস বাহান্ন পুরুষ ধরে চলে আসছে বলে জানান হয়েছিল।[১২]

---

১১. এই অভিমত যারা পোষণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম E. T. Dalton (Descriptive Ethnology of Bengal), Buchanan (Eastern India, vol-I), Sir Henry Elliot (Races of North—Western Provience), Sherring (Hindu Castes and Tribes, Nesfield (Brief View of the Caste System) Sir George Campbell (Ethnology of India).

১২. E.T, Dalton.
পুরুলিয়া জেলায় আমি যেসব মাহাতদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তারা জানিয়েছিলেন,

ডালটনের অনুমান আংশিকভাবে মেনে নিলেও ছোটনাগপুর এবং প্রধানত মানভূমের কুর্মীদের সম্বন্ধে রিসলে সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পারেননি। মানভূম ও উড়িষ্যার উত্তরাংশে বসবাসকারী কর্মীদের চেহারায় আর্য প্রভাব যেমন অনুপস্থিত, ভূমিজ ও সাঁওতালদের সঙ্গে তেমনি সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

উচ্চতায় খর্বাকৃতি, শক্ত সমর্থ শরীর, গায়ের রঙ কালো, চেহারায় দ্রাবিড়ীয় সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের খাওয়া দাওয়া চলে। জনশ্রুতি অনুসারে একই পিতার প্রথম স্ত্রীর সন্তান সাঁওতাল, দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান কুর্মী। রিসলে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কুর্মী থেকে তাহলে কি মানভূম ও উড়িষ্যার কুর্মীরা পৃথক জনগোষ্ঠী? উত্তর দিতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ে অনুমান করেছিলেন। এক, কুর্মীরা দুটি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত। আর্য গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত এক শাখা, দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত অপর শাখা। দুই, সমগ্র সম্প্রদায়টিই আর্য গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। রক্তের সংমিশ্রণ এবং জীবিকার নিরিখে পরবর্তীকালে পৃথক হয়েছেন। তিন, সমগ্র সম্প্রদায়টি আদিতে দ্রাবিড়ীয়। সংমিশ্রনের ফলে এক গোষ্ঠী উন্নত হয়ে উঠেছিলেন, অপর গোষ্ঠী প্রত্যন্ত প্রদেশে বসবাস করার ফলে প্রায় আদিম অবস্থায় রয়ে গিয়েছিলেন।

শেষোক্ত অনুমানের বিমিশ্র সমর্থন পাওয়া যায় ডালটনের সমীক্ষায়। দক্ষিণ ভারতে এই উপজাতি বা সম্প্রদায়টি কুমনি বা কুনবি নামে পরিচিত। সিন্ধিয়ারা সাঁতারার কুর্মী প্যাটেল হিসাবে স্বীকৃত। ভোঁসলা পরিবার দেওরির প্যাটেল, এবং সম্ভবত কুর্মী। পঞ্চকোটের রাজাদেরও ডালটন কুর্মী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেছিলেন।[১৩]

প্রকৃতপক্ষে কুর্মী সম্প্রদায় দুটি মোটা দাগে বিভক্ত। ঝারি কুনবি বা জঙ্গলের কুনবি ও মারাট্টা কুনবি। ঝারি কুনবিরা জঙ্গল কেটে প্রথমে বসতি ও আবাদ পত্তন করেছিলেন। মারাট্টা কুনবিরা এসেছিলেন বর্গী অভিযানের

জেলার প্রাচীনতম পরিবার ঝালদায় ভোলামারার মাহাত পরিবার। ছ' সাত পুরুষ আগে তারা এখানে স্থিত হয়েছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন মাহাত পরিবার—ঘাঘরজুড়ি, নিপানা, হুড়া ও মানবাজারে বসবাস করেন—সাক্ষাৎকার, সন্তোষকুমার মাহাত বয়স ৭৫, মধুবন, তারিণীপদ মাহাত, বয়স ৫২ নামকোল (১৪.২.১৯৮৩) এবং সুনীতিকুমার পাঠক, বোড়াম, বয়স ৬২ (নভে ১৯৮২)।

১৩. এ প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের 'ইতিহাস' অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য। এবং সেইসঙ্গে 'মান মানা মানভূম ও ভূমবুক অঞ্চল' অধ্যায়টি বিশেষভাবে পঠিতব্য।

সময়। পুরুলিয়া জেলায় তৈলকম্প রাজ্যের সময় ও তার আগে যারা এসেছিলেন তারা প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে অধিকাংশ কুর্মী মাহাত দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত।[১৪]

পুরুলিয়া জেলায় কুর্মীরা অন্তর্বিভাগে চারভাগে বিভক্ত। কুরুম, আধ-কুরমি বা মধ্যম কুরমি, শিখরিয়া বা ছোট-কুর্মী এবং নিচ-কুর্মী। উত্তরদিকে আরও দুটি উপভাগের হদিস পাওয়া যায়, মগহিয়া ও বগসারিয়া।[১৫] মগহিয়ারা অধিকতর হিন্দুঘেঁষা এবং তাদের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। বগসরিয়ারা উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট।

বিহারে কুর্মীদের উপভাগ সাতটি।[১৬] তাদের মধ্যে একটি উপভাগের নাম ছাঁওয়ার। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় পঞ্চকোটের রাজাদের বলা হত ছাঁওয়ার বাঁধা রাজা। উড়িষ্যায় ভাগ চারটি।[১৭] ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার কুর্মীদের মধ্যে নানারকম টোটেম প্রচলিত। যথা, শিকারী, মাকড়শা, চিল, ডুমুর, বুনো হাঁস, কচ্ছপ, পান, জাল, ঘাস, মহিষ ইত্যাদি। পুরুলিরা জেলায় শিখরিয়া ভাগটি শিখরভূম কুর্মীদের প্রাচীন বসবাসের ইংগিতবহ। কুর্মী শব্দটি যেমন নানাভাবে প্রচলিত, তেমনি কুর্মীদের মধ্যে প্রচলিত পদবিও বিভিন্ন।[১৮]

পুরুলিয়া জেলায় কুর্মীরা একই বিভাগ এবং মায়ের দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধন এড়িয়ে চলেন। প্রথাটি দ্রাবিড়ীয় রীতির সঙ্গে তাদের সংযোগের নিদর্শন বহন করে।

বিভিন্ন অঞ্চলে কুর্মীদের বিবাহ প্রথা বিভিন্ন। মোটামুটি যে রীতিগুলি প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হয়, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের সঙ্গে উপজাতীয় বিবাহ প্রথার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। বিশেষত সাঁওতালদের সঙ্গে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কুর্মীদের মধ্যে বাল-বিবাহ এবং উপযুক্ত বয়সে বিবাহ উভয়ই

---

১৪ মাহাতো বা মাহাত শব্দটি মহা-রট্ট বা মারাট্টা শব্দের অপভ্রংশ বলে অনুমিত হয়।

১৫ ছোটনাগপুরে আরও একটি উপভাগের হদিস পাওয়া যায়, 'খাঁরিয়া।' পুরুলিয়া জেলায় অনুসন্ধানকালে লেখক উপভাগটির হদিস পাননি

১৬. উপভাগগুলি, অযোধিয়া বা আয়োধিয়া, ছাঁওয়ার, ঘামেলা, জয়সওয়ার, কাচ্ছাসিয়া, রামাইয়া ও সাশওয়ার।

১৭. গারসার, মৈসাসরি, বগসরি ও গাড়াসরি।

১৮. কুর্মী নানাভাবে কথিত, যথা, কুনবি, কুরমি, কুরুম কুরুমানিক। পদবির মধ্যে প্রধান, চৌধুরি, মহন্ত, মহাশাই, মাহাত বা মাহাতো, মণ্ডল, মরার, মুখ্যা, পরামানিক, রাউত, সরকার, সিং ইত্যাদি।

প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাল-বিবাহ প্রায় অপ্রচলিত। সাঁওতালদের মত কুর্মীদের মধ্যেও কনে-পণ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে প্রথাটি বদলে চলেছে। কণে-পনের বদলে চালু হয়ে চলেছে বর-পণ।

বিয়ে করতে যাবার সময় পাত্রের হাতে তিন বা পাঁচটি আম পাতা সাদা সুতো দিয়ে বাঁধা হয়, একে বলে আমাদিয়া। হাতে থাকে জাঁতি। মেয়ের হাতে বাঁধা হয় মহুয়ার পাতা, হাতে থাকে কাজল লতা।

ছামুরা বা ছাদনাতলা সব ক্ষেত্রে তৈরী হয়না। কোন কোন পরিবারে সামিয়ানা টাঙিয়ে বিয়ে হয়। যেখানে ছাদনাতলা হয়, ছাদনাতলার আকার হয় চৌকো, চারদিকে পোঁতা হয় খুঁটি, মাঝখানে মহুয়া গাছ। খুঁটির সঙ্গে সুতো বাঁধা থাকে, আমের পল্লবও বাঁধা হয়।

পাত্রীর বাড়ি যাবার আগে আমগাছের সঙ্গে বিয়ে হয় পাত্রের। পাত্রীর বিয়ে হয় মহুয়া গাছের সঙ্গে। পাত্র পাত্রীর ভগ্নীপতিরা অনুষ্ঠানটি করে থাকেন। মেয়ের বাবা বা কাকা কোলে করে পাত্রকে ছাদনাতলায় নিয়ে যান। পাত্রীকে নিয়ে যান বৌদি, কোথাও কোথাও ডালায় বসিয়েও পাত্রীকে আনা হয়। ছাদনাতলায় দুটি মাটির ভাঁড় থাকে। একটিতে থাকে দই, অপরটিতে চ্যাং মাছ। কড়ে আঙুল দিয়ে দইয়ের টীপ দেওয়া হয় পাত্রীর কপালে। চ্যাং মাছটা দেখান হয়। পরে মাছটা ছেড়ে দেওয়া হয় জলে।

সিন্দুর দানের আগে বরকনের মালা বদল হয়। সেই সঙ্গে বদল হয় আম পাতা। মাহাতোদের বিয়েয় বাসি বিয়ে নেই। অষ্টমঙ্গলার দিন একটি অনুষ্ঠান হয়। পাত্র পাত্রীর বাড়ি এলে ঘটা করে স্নান করতে যাবার ব্যবস্থা হয়। তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে যান পাত্র। জলের ঘটি নিয়ে যান পাত্রী। পাত্র তাতে তীর মারেন, পাত্রী দ্রুত ঘটি মাথায় করে বাড়ি ফিরে আসেন।

বিয়ের ব্যাপারে পুরুলিয়া জেলায় কুর্মীদের মধ্যে নির্দিষ্ট রীতি বা প্রথা অনুপস্থিত। স্থান বিশেষে পরিবর্তিত হয়েছে প্রথা। বরযাত্রায় বরের মাথায় কোথাও থাকে পাগাড়ি, কোথাও টোপর। কোথাও তৈরী হয় ছাদনাতলা, কোথাও টাঙানো হয় সামিয়ানা। আম বা মহুয়া গাছের সঙ্গে পাত্র পাত্রীর বিয়ে সহরাঞ্চলে প্রায় অপ্রচলিত হয়ে উঠেছে।

ঝাড়খণ্ডে প্রবাদ আছে, 'ঘর আর বর, মাঘ মাসে কর'। অর্থাৎ মাঘ মাস ঘর তৈরি ও বিবাহ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত সময়। কনে-পনের কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে আছে গানে গানে,

উঁচ উঁচ ঘর খিলান গম্ভীর গম্ভীর পিঢ়া

তার ভিতরে ভমরা গুঞ্জরে।
আজাকে যে দিবে ভমর আঁজলা ভরা টাকা
তবে ভমর হইব তোমারই ॥

গাছের সঙ্গে বিয়ে হবার পর বর যখন কনে বাড়ির দিকে যাত্রা করেন, গান শোনা যায়,

তুমি যে যাবে পুতা শ্বশুরেরই বাড়ি
দিয়ে-রাখ দুধকেরি ধার।

মায়ের দুধ-ঋণ শোধের প্রশ্ন যখন উঠেই পড়ে, পাত্র বলেন

কিঅ যে দিব মাগো দুধকেরি ধার গো
মাগো আন্যে দিব জনমের কামিনী।[১৯]

বিয়ের সময় নাপিতকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতার অন্ত থাকেনা। মেয়েরা সুর করে বলেন,

আলতা কুথা পালি লাপিত
আলতা কুথায় পালি
বহিন বন্ধন দিয়ে লাপিত
আলতা নিয়ে আলি।
(লাপিতকে বাঁধ ছামড়া-খুঁটায়)[২০]

পুরুলিয়া জেলায় কুর্মীরা উদ্যোগী ও শ্রমশীল। প্রধান জীবিকা চাষ ও পশুপালন। বর্তমানে অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ব্যবসা, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি জেলার জনজীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঘর-গেরস্থালির কাজে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কুর্মী মেয়েদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষিকাজে পারদর্শিতার জন্য কুর্মীরা পুরুলিয়া জেলায় জঙ্গলময়, বন্ধুর, অনাবাদী ক্ষেত্র আবাদী ক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করেছেন চাষের ক্ষেত্র। ভূমিজদের একদা অধিগত এবং পরিত্যক্ত ভূমি কিনে নিয়ে রূপান্তরিত করেছেন শস্য ক্ষেত্রে। সামাজিক ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছেন অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

কুর্মীদের মধ্যে সমৃদ্ধ এবং সচেতন শ্রেণী সামাজিক স্বীকৃতি লাভের

---

১৯. গানগুলি ডঃ বিনয় মাহাত রচিত 'লোকায়ত ঝাড়খণ্ড' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।
২০. ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার সংগ্রহ। ছামড়া-খুঁটা—ছাদনাতলায় খুঁটি।

উদ্দেশ্যে নিজেদের পরিচয় প্রোথিত করতে চেয়েছেন কুর্মী ক্ষত্রিয় হিসেবে।[২১] বিশ শতকের গোড়া থেকে সূচিত হয়েছিল এই উদ্যোগের প্রারম্ভ। অর্থনৈতিক কাঠামো প্রধানত উদ্যোগটির পরিনাম নির্দেশক। গ্রামীন সমাজে নারী পুরুষ উভয়ের শ্রমের ওপরে কুর্মী পরিবারের অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কুর্মী সমাজে সামাজিক উত্তরণের জন্য যেসব আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙন দেখা দেবার আশঙ্কায় সেসব পরবর্তীকালে স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তবু ধীরগতিতে ও নিঃশব্দে অন্যান্য সমাজের মত কুর্মী সমাজেও বিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। বিবর্তনের মূলে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে নগর-সভ্যতার সুযোগ সুবিধা, জীবিকার রূপান্তর এবং গ্রাম-সমাজে আধুনিক মানসিকতার অনুপ্রবেশ।

পুরুলিয়া জেলায় কুর্মীরা সংখ্যার দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কর্মঠ সচেতন এবং বিবর্তিত জনসমাজ হিসাবেও তেমনি পুরোভাগে।

ভূমিজ ঃ ডালটন অনুমান করেছিলেন আর্য অনুপ্রবেশের আগে গঙ্গা অববাহিকা জুড়ে বসবাসকারী আদিম অধিবাসী ছিলেন কোল বা মুণ্ডা ভাষাভাষী মানুষেরা। বসবাস প্রধানত ছিল গোরখপুর, বিহার ও সাহাবাদ অঞ্চলে। সেই প্রাচীনতম অধিবাসীদের বংশধরেরা এখন নানা উপজাতিতে বিভক্ত। যথা, মুণ্ডা, খাড়িয়া, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো প্রভৃতি।

ভূমিজাত বা ভূমিজদের প্রধান বসতিকেন্দ্র ছিল কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। নিজেদের তারা বলেন সর্দার। সিংভূমে হো-দের মুখে মাতকুম। কাঁসাইয়ের উত্তরেও হয়ত একদা বসবাস ছিল তাদের। আর্য অনুপ্রবেশের ফলে, বিমিশ্র আর্য উপনিবেশিক, সম্ভবত কুর্মীদের চাপে দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মুণ্ডাদের সঙ্গে ভূমিজদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরে হাজারিবাগ ও লোহারডাঙ্গার সঙ্গে মানভূমকে বিচ্ছিন্নকারী শৈলগুচ্ছ থেকে সুরু করে দক্ষিণে সিংভূমের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত এবং পূর্বে অযোধ্যা পাহাড়ের সুউচ্চ পাহাড় থেকে পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্তভাগ পর্যন্ত ভূভাগে,

২১. ১৯০১ সালে অনুষ্ঠিত 'কুর্মী বাইশ', ১৯১১ সালে অখিল ভারতীয় কুর্মী মহাসভার সঙ্গে মানভূমের কুর্মীদের সংযোগ, ১৯২৯ সালে বাঘরকুঁড়ি কুর্মী-ক্ষত্রিয় মহাসভার সমাবেশ, ১৯৩১ সালে সেনসাস রিপোর্ট থেকে আদিমজাতির তালিকা থেকে কুর্মীদের বাদ দেওয়া, কুর্মীদের পৈতা গ্রহণ ও সংস্কার, এবারিজিনাল-এর বদলে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দান—সবই সামাজিক স্বীকৃতি লাভের উদ্যোগের ইতিবৃত্ত।

একসময় বসবাস ছিল মুণ্ডা ও ভূমিজদের। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাথরের স্তম্ভ প্রোথিত অসংখ্য কবরস্থান সেই সুপ্রাচীন বসবাসের ইংগিত আজও বহন করে চলেছে।

রিসলে অনুমান করেছিলেন[২২] ভূমিজরা আদিতে ছিলেন বিশুদ্ধ মুণ্ডা। মুণ্ডাদের ব্যাপক বসতি ও পূর্বাংশের মধ্যে অযোধ্যা পাহাড়, যে সুদৃঢ় পাঁচিল তুলে দিয়েছিল, সে পাচিল অতিক্রম করে আদানপ্রদানের যোগসূত্র ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। পরিশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল একেবারে। পূর্বাংশের মুণ্ডারা হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন, আরম্ভ করেছিলেন বাংলা ভাষা এবং মূল গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হয়েছিলেন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে।

ভূমিজদের উপকথায় দেশান্তরে যাত্রা ও এ অঞ্চলে আগমণের কাহিনী শোনা যায় না। সেটি তাদের আদিম অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত ক'রে। মানভূম ও ধলভূমে অধিকাংশ ঘাটোয়াল, ভূমিজ। ধলভূমের রাজারা ভূমিজ বলে রিসলে অনুমান করেছিলেন। পাড়ার কুলদেবী রুক্কিণী ধলভূমের রাজাদের কুলদেবী হয়ে উঠেছিলেন।

ভূমিজেরা একাধিক ভাগ ও উপভাগে বিভক্ত। প্রাচীন জনগোষ্ঠী হওয়ায় ভাগ ও উপভাগগুলি সাখ্যায় বেশি। ভাগগুলি ছয়ভাগে বিভক্ত। দেশী, তামারিয়া ও মুরা বা মানকি-মুরা, শিখরিয়া বা মেনো, পাতকুমিয়া, শেলো ও বরাভূমিয়া। ভাগগুলির মধ্যে চারটিই স্থান নির্দেশক। প্রাচীন বসবাসের ইংগিতবহ। বিশেষত তামার, শিখরভূম, পাতকুম ও বরাভূমে। পদবী, প্রধানত চারটি, মানকি, মাতকুম, মুড়া বা মুরা এবং সর্দার বা সিংসর্দার।

রিসলে কুড়িটি উপভাগের উল্লেখ করেছিলেন। ড. সুরজিৎ সিনহা বরাভূম অঞ্চলে ভূমিজদের মধ্যে সমীক্ষার সময় আরও নটি উপভাগের হদিস পেয়েছিলেন।[২৩] উপভাগগুলিকে বলা হয় গোত্র। ভূমিজদের মূল বসতিকেন্দ্র

---

২২. The Tribes and Castes of Bengal, vol-I, —H. H. Risley।

২৩. রিসলে কর্তৃক নথিভুক্ত উপভাগঃ বস্তা, কুরকুটিয়া, বারদা, ভুইয়া (মাছ), চাণ্ডিল, গুলেগু (মাছ), হাঁসদা (হাঁস), হেমব্রম (পানপাতা), জারু (পাখি), কাশ্যপ (কচ্ছপ), লেঙ (ব্যাঙের ছাতা), নাগ (সাপ), অবারসাধি (পাখি), পিলা, সাপমা, শালঋষি, শাণ্ডিল্য (পাখি), শাওসা, টেসা (পাখি), তুমারং (লাউ) তুতি (পাঁজ)। ড. সিনহা কর্তৃক নথিভুক্ত অতিরিক্ত উপভাগ: উবুরসাণ্ডিল, ~ইগ, সামা, পরসা, সাঁইথিয়া, দেও, সিরকা, কররা, ও কাউরি।

নটি তরফের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। তরফগুলি ছিল, পঞ্চসর্দারি, সত্রখনি (সতেরখনি), তিনসওয়া, ধাদকা, বনগুড়দা, সরবেরিয়া, দুবড়াজি, ঘরতালি ও কুমারিপার। প্রকৃতপক্ষে ভূমিজদের মধ্যে প্রচলিত গোত্রের সংখ্যা পঞ্চাশটি।

গোত্রগুলি এখন আর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বৃহত্তর এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত। নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্দার বা সংঘও এখন আর ক্রিয়াশীল নেই। একমাত্র অস্থি করব দেবার সমাধিস্থানের মাধ্যমে গোত্রগুলির যোগসূত্র কিছুটা রক্ষিত। পঞ্চাশটি গোত্রের অস্থি জমা রাখার সমাধিস্থান ৩৬৬টি।

গোত্রগুলি স্পষ্টত টোটেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। টোটেমের ইংগিতবহ দ্রব্য, প্রাণী বা বৃক্ষ সেই গোত্রের ব্যক্তিদের কাছে ব্যবহার করা বা হত্যা করা নিষিদ্ধ। শুধু ভূমিজেরা বসবাস করেন এমন গ্রামের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। অধিকাংশ গ্রামে জনবসতি মিশ্র। যে সংহতি ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত ছিল, বিমিশ্র গ্রাম-সমাজে তা ভেঙ্গে পড়েছে, নতুন করে নির্ধারিত হয়ে চলেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্পর্কের ধারা।

ভূমিজদের মধ্যে প্রাচীন প্রথা বর্তমানে প্রায় সবই ভেঙ্গে পড়েছে।[২৪] একমাত্র অস্থি-কবর প্রথাটি কিছু পরিমাণে বজায় আছে। প্রথাটির মধ্যে মুণ্ডাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিস্ফুট। শব দাহ করা হয় দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে, চিতা জ্বালিয়ে দেন পুরুষ আত্মীয়েরা। মৃতের স্ত্রী, বোন কি অন্যান্য নারীরা জলের কলসি নিয়ে অপেক্ষা করেন। চিতা নিভে এলে, জল ঢেলে দেন চিতায়, সংগ্রহ করেন অস্থি। অস্থির একাংশ পুঁতে দেন মৃতের গৃহের অঙ্গনে, তুলসী গাছের নিচে। অপরাংশ নিয়ে যাওয়া হয় পরিবার বা গোত্রটির জন্য নির্দিষ্ট কবরস্থানে।

অস্থি কবর দেবার জন্য লায়ার কাছ থেকে কিনতে হয় মাটি। দাম বাঁধাধরা থাকে না। কখনও দিতে হয় এক টাকা বা কিছু বেশি বা একখানা মোটা কাপড়। হলুদের গুঁড়ো, সরষের খোল, তেল ও সিঁদুর দিয়ে চিত্রিত করা হয় অস্থি। যে পাত্রে অস্থি রাখা হয় সেটিকেও চিত্রিত করা হয়। চালের গুঁড়ো, পিঠে এবং অস্থি রেখে পাত্রটির মুখ ঢাকা দেওয়া হয় শাল গাছের ছাল ও নতুন কাপড় দিয়ে।

---

২৪. ভূমিজদের সম্বন্ধে আরও বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ২২৯—২৩১, এবং মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৮।

মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয় পাত্রটি। তার ওপর একটি পাথরের ফলক খাড়াভাবে পুঁতে দেওয়া হয়। বিগত দুশো বছরে ভূমিজদের সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অবস্থাপন্ন ভূমিজেরা নিজেদের রাজপুত বলে পরিচয় দিতে সুরু করেছিলেন এবং অনুসরণ করতে সুরু করেছিলেন হিন্দু রীতিনীতি। হিন্দুদের মৃতদেহ সংকার ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মত তারাও সংকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকেন। বর্তমানে দশদিনে হয় কামানো এবং এগারো দিনে শ্রাদ্ধ।

যুদ্ধ ছিল ভূমিজদের প্রধান জীবিকা। আঠারো এবং উনিশ শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে প্রধান ভূমিকা ছিল ভূমিজদের। লুণ্ঠন এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণেও তাদের জুড়ি ছিল না। রিসলে অনুমান করেছিলেন বরাভূম, ধলভূম, মানভূম, পাতকুম এবং বাগমুণ্ডির জমিদারেরা একসময় ছিলেন ভূমিজ। প্রকৃতপক্ষে ভূমিজেরা মানভূমের দক্ষিণাংশে বড় বড় এলাকা নিজেদের অধীনে রেখেছিলেন। ঘাটোয়াল, সর্দার, তাবেদার, সড়িয়াল ও দিঘওয়ারও ছিলেন তারা।

ভূমিজেরা বিবর্তিত ও ক্ষয়িষ্ণু জনগোষ্ঠী।[২৭] উপজাতিদের মধ্যে তারা ছিলেন সবচেয়ে অভিজাত ও সম্পন্ন। অবসর ছিল জীবনে, ছিল অহংকার ও শৌর্য। পুরুলিয়ার, ছৌ বা ছো নাচ এবং নাচনীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তারা। সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিজের হাতে চাষ বিবর্জিত হয়েছিল। বন উৎসন্ন হবার ফলে লাক্ষা, মধু, কাঠ প্রভৃতি বিক্রয়ের পন্থাও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিছন থেকে তাদের একটু একটু করে গ্রাস করেছিল দারিদ্র্য। ঠাট বজায় রাখতে বেচে দিতে হয়েছিল আবাদী ও অনাবাদী জমি। বিক্রীত জমির অধিকাংশ গিয়ে উঠেছিল কুর্মী মাহাত, ওড়িয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হাতে।

কৃষি ছাড়াও ভূমিজেরা এখন নানা জীবিকায় লিপ্ত। তাদের মধ্যে প্রধান খুচরো ও পাইকারী ব্যবসা, ঠিকাদারি, শিক্ষকতা, স্কুল কলেজ হাসপাতাল ও সরকারী দপ্তরে স্বল্প সংখ্যায় চাকুরি ইত্যাদি। পুরুলিয়া জেলায় ভূমিজদের মূলকেন্দ্র বরাবাজার। বরাবাজারের রাজবংশটিও সম্ভবত ভূমিজ।

বাউরি ঃ তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউরিরা পুরুলিয়া জেলায় সবচেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। অবশ্য জনগোষ্ঠী না বলে জনসম্প্রদায় বলাই সঙ্গত।

---

২৭. ১৮৭২ সালে মানভূম জেলায় তাদের সংখ্যা ছিল ৯১,২৬১; ১৮৮১ সালে ১,০৪,৩১৮। বর্তমানে সংখ্যা ৫০ হাজারের নিচে।

তাদের উদ্ভব সম্বন্ধে নিশ্চিত নন নৃতাত্ত্বিকেরা।[২৬] বর্ধমান জেলার একদা শেরগড় পরগণায় মূল বসতিকেন্দ্র ছিল বাউরিদের। বহিরাগতদের আগমণ ও কয়লাখনি আবিষ্কৃত হবার ফলে সেখান থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। সরে গিয়েছিলেন দামোদরের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে। ফলে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় তাদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

স্বভাবে নিরীহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় উদাসীন, শিক্ষায় অনগ্রসর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া দুই জেলা জুড়ে বিশাল বাউরি সমাজ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। পরিবারের আয়তন গড়ে ৪ ৬৯ জন, শিক্ষার হার গ্রামাঞ্চলে শ'য়ে পাঁচজনের কম, কৃষি মজুরের সংখ্যা আধাআধি। জীবিকা অর্জনে নারীদের ভূমিকা পুরুষদের প্রায় সমান। জেলার মধ্যে রঘুনাথপুর থানায় বসতি সবচেয়ে বেশি, মানবাজারে সবচেয়ে প্রাচীন। মানা বাউরিদের বসতিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বাউরিদের ন'টি উপভাগের মধ্যে দুটির নাম, পঞ্চকোটী, ও শিখরিয়া বা গোবরিয়া। বিভাগ দুটি নিসন্দেহে পুরুলিয়া জেলায় প্রাচীন বসবাসের ইংগিত বহন করে। স্বাতন্ত্র্য ও অহংকার বর্জিত এই জনসমাজ হিন্দু ও মুসলমান, যে সমাজের কাছাকাছি থেকেছেন, সে সমাজের রীতিনীতি কিছু পরিমাণে রপ্ত করে নিয়েছেন।[২৭] প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তারা। ঠাঁই হয়েছে হিন্দু সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে।

সরাক শরাক বা শ্রাবক : মানভূম জেলায় পরিকীর্ণ জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি ও পুরাকীর্তির জনক বলে যে জনগোষ্ঠীটিকে চিহ্নিত করা হয়, তারা সরাক নামে পরিচিত। তামার খনি তাদের উদ্যোগেই খনিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি। মূল বসতি ছিল মানভূমে। মানভূম এখন দুটি জেলায় বিভক্ত, পুরুলিয়া ও ধানবাদ। দুটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের বসবাস। পুরুলিয়া ও ধানবাদ ছাড়াও তাদের বসবাস আছে বর্ধমান, বীরভূম, দুমকা, রাঁচী ও বাঁকুড়া জেলায়।[২৮]

---

২৬. বাউরিদের এথনিক গ্রুপ ও অন্যান্য বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ২০৩—২০৭।

২৭. চারটি উপভাগের একটি এবং পদবীর একটি মুসলমান সংশ্রবের ইংগিত দেয়। উপভাগ চারটি, আলিমন বা আজিমন, কাশ্যপ, মল্লকুল্যা ও মাঝি। পদবী সাধারণত, দিঘা, মণ্ডল, মাঝি, মৌলিক, বাউরি ও পরামানিক।

২৮. পুরুলিয়া জেলায় বসতি আছে ৬৯টি গ্রামে। যথা, রঘুনাথপুর থানায় ৩০ গ্রাম,

সংখ্যায় বেশি না হলেও সম্প্রদায়টি নানা দিক থেকে কৌতূহল উদ্রেক করে। মানভূম ও রাঁচির সরাকেরা দাবী করেন তাদের আদি বসতি ছিল সরযূ নদীর তীরে, প্রাক্তন যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গাজীপুরের কাছে। জীবিকা ছিল মহাজনী কারবার ও বাণিজ্য। অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আগরওয়াল সম্প্রদায়ের এবং উপাস্য ছিলেন পরেশনাথ। আদি নিবাস ছেড়ে কেন তারা দেশান্তরে যাত্রা করেছিলেন, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা নেই। জনৈক মানরাজার রাজ্যে ধলভূমের কাছে এসে নতুন বসতি তুলেছিলেন। সরাক সম্প্রদায়ের একটি মেয়ের প্রতি রাজা আকৃষ্ট হলে চলে এসেছিলেন পাঁচেটে।

রাঁচির কিছু সরাকেরা আবার মনে করেন তাদের আদিভূমি ছিল পুরীর কাছে ওগরা। পরবর্তীকালে ছোটনাগপুরে এসে স্থিত হয়েছিলেন। বর্ধমান ও বীরভূমের সরাকদের দাবী আলাদা। তারা বলেন, স্থপতি ও রাজমিস্ত্রী হিসাবে তাদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। বরাকরের মন্দিরগুলিতে মূর্ত হয়ে আছে তাদের হাতের ছোঁয়া।

ছোট হলেও সম্প্রদায়টি যে অতি প্রাচীন সে ইংগিত বহন করে তাদের ভাগ এবং উপভাগগুলি। ভাগ, উপভাগ, গোত্র এবং থাকের মধ্যে দেশান্তরে বসবাস এবং ক্রম বিবর্তনের ইংগিতও নিহিত।

পুরুলিয়ায় সরাকেরা দুটি মোটা দাগে বিভক্ত, চোদ্দ শিখা ও আঠারো শিখা। সামাজিক দিক থেকে আঠারো শিখা উঁচু, দুই ভাগের মধ্যে বিয়ে-থাওয়ায় বাধা নেই। গোত্র সাতটি, আদি বা আদ্য দেব, ধর্মদেব, ঋষিদেব, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, অনন্ত ও ভরদ্বাজ। বীরভূমে আরও দুটি গোত্র যুক্ত হয়েছিল, গৌতম ও ব্যাস। রাঁচিতে যুক্ত হয়েছিল বাৎস্য। গোত্রগুলির মধ্যে হিন্দুরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

গোত্র ছাড়াও আছে থাক। থাকগুলি স্থান ও জীবিকা নির্দেশক। গেইট পাঁচটি থাকের উল্লেখ করেছিলেন।[২১] এক, পঞ্চকোটটীয় বা মানভূমের অন্তর্গত

পাড়া থানায় ২৩ গ্রাম, কাশীপুর থানায় ১১ গ্রাম, নেতুরিয়া থানায় ৩ গ্রাম, ও সাঁতুরি থানায় ২ গ্রাম।—সাক্ষাৎকার, মহাদেব মাজি (৫৬) ও সুদেবকুমার মাজি (৪১), গোবিন্দপুর, ১৩. ১০. ১৯৮১। বর্ধমান জেলায় বসতি আছে ২টি পরগণায়, শেরগড় ও সাত্তপায়। শেরগড়ে গ্রাম ১০, সাত্তপায় ১৩। দুমকা জেলায় বীরভূম ও কড়েয়া পরগণা ও বাঁকুড়া জেলায় মাইহবাড়া পরগণাতেও গ্রামের সংখ্যা ১৩।—অরুণকুমার সরাক, ছত্রাক, ৬।২ ও ৩।

২১. Census of India (1901), vol-VI (1902)—E. A. Gait, F. SS.

পঞ্চকোট জমিদারীতে বসবাসকারী সম্প্রদায়; দুই, নদীপারীয় বা দামোদর পেরিয়ে যারা দক্ষিণ তীর বা মানভূমে বসবাস সুরু করেছিলেন; তিন, বীরভূমীয় বা বীরভূমে বসবাসকারী; চার, তামারীয় বা রাঁচি জেলায় তামার পরগণার অধিবাসী। পঞ্চম থাকটি বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর মহকুমার সরাকী তাঁতি বা তাঁতি সরাক।[৩০]

উড়িষ্যায় সরাকেরা প্রধাণত সরাকী তাঁতি হিসাবেই পরিচিত। বিশ শতকের প্রারম্ভে বৌদ্ধ হিসাবে তারা জনগণণায় নথিভুক্ত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে তাদের পূর্বপুরুষেরা পুরী গিয়েছিলেন বর্ধমান থেকে, পুজো দিতে। পুরীর রাজা ছিলেন তখন বৌদ্ধ। সরাকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বসবাসের জন্য প্রাসাদের পাশে জায়গা করে দিয়েছিলেন। গোত্র চারটি, আদি দেব বা অগ্নি দেব, কৃষ্ণদেব, হেম দেব ও ধর্মদেব। পদবীগুলিও বাঙ্গালী ধাঁচের, যথা, চন্দ, দত্ত, কর এবং নন্দী। এ কাহিনী কিছুমাত্র সত্য হলেও উড়িষ্যায় সরাকদের বসবাস দুশো খ্রীস্ট পূর্বাব্দ থেকে চারশো খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সুরু হয়েছিল, অনুমান করা যায়। মানভূমে বসবাস নিঃসন্দেহে আরও প্রাচীন।

পশ্চিমবঙ্গে সরাকদের পদবী প্রধানত মাজী, সরাক, মণ্ডল, সিং, খাঁ, পাত্র, লায়েক, বৈষ্ণব, বকসী প্রভৃতি।[৩১] শিখরভূমের জৈন রাজ্যটি বিধ্বস্ত হবার পরে সম্ভবত সরাকেরা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন মূল গোষ্ঠী থেকে। মানভূম অঞ্চলে তখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং প্রধাণত শৈবধর্ম পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ চলেছিল। সেই প্রবাহের মধ্যে আত্মসমর্পন করেছিলেন সরাকেরা। উড়িষ্যায় তারা দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ অনুসরণ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গেও গৃহীত হয়েছিল শৈবধর্ম। বিভিন্নস্থানে সমাজের জমায়েতগুলিও অনুষ্ঠিত হয় শিবমন্দিরে। পুরুলিয়া জেলায় এ জাতীয় জমায়েতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধস্থান রঘুনাথপুর সহরের কাছে দাপুনিয়ার শিবমন্দির।

সরাক সম্প্রদায়ের হিন্দু সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হবার ইতিহাস নিঃসন্দেহে

৩০. তারা আবার চারটি উপ-থাকে বিভক্ত। যথা, আশ্বিনী তাঁতি, পাচ, উত্তকুলি এবং মন্দারিনী। সাঁওতাল পরগণাতেও উপ-থাক চারটি, ফুল-সরাকী, শিখরীয়, কান্দল ও সরাকী তাঁতি।

৩১. শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী (শ্লোক ৬।২ ও ৩) মাজী (মাঝি), মণ্ডল, নায়েক, সিংহ পদবীগুলি পঞ্চকোট রাজাদের দেওয়া বলে যে অনুমান করেছিলেন তা সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, পদবীগুলি পঞ্চকোট ছাড়া অন্যত্রও প্রচলিত।

দীর্ঘ। কোথাও কোথাও বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে রূপান্তরের ধারাটি বিজড়িত হয়ে এসেছিল মনে হয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে গেইট[৩২] সরাকদের বিবাহ পদ্ধতির যে ক'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছিলেন, তাদের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাবের সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। বিয়ের সময় বুদ্ধদেবকে আবাহন, কন্যাদানের সময় দুধ, দই, মধু, গুড়, এবং ঘি দিয়ে মধুপর্কের পঞ্চামৃত বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করে বর ও কণের খাওয়া—বৌদ্ধপ্রভাবের ইংগিতবহ।

হোম, গণপতি ও বরুণ এবং অষ্টাদশ মাতৃকার পুজো, দশ দিকপালকে নিবেদিত নৈবেদ্য,—হিন্দুধর্ম প্রভাবিত বলে অনুমান করা যায়। বিয়ের সময় অনুষ্ঠান করে গুয়া— পৈতা নেবার প্রথাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পৈতা থাকে তিনদিন।

চেহারায় মার্জিত, স্বভাবে নিরীহ এবং মর্যাদা সম্পন্ন, কৃষিকাজে দক্ষ, এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টি এখন পুরোপুরি হিন্দু সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত। পুজো ও উৎসবের মধ্যে প্রধান, শিবের গাজন, দুর্গাপুজো, কালিপুজো, লক্ষী ও সরস্বতী পুজো। এমনকি রক্ষাকালীর পুজোও। পারিবারিক বা কুলদেবতা অধিকাংশ পরিবারের কৃষ্ণ। বিশেষত মাজী পরিবারগুলির। শ্রাদ্ধের সময় অশৌচ চলে তিরিশ দিন, অস্থি যায় গঙ্গায়, পিণ্ড দেওয়া হয় গয়ায়। জৈন তীর্থগুলি এবং নিকটবর্ত্তী পরেশনাথ পাহাড়ও তীর্থক্ষেত্রের তালিকা থেকে বর্জিত।

কৃষি প্রধান জীবিকা হলেও, অন্যান্য পেশাতেও তারা নিয়োজিত। শিক্ষা-ক্ষেত্রেও অগ্রণী। নারীদের মধ্যেও শিক্ষার হার কম নয়।

ব্রাহ্মণ : পুরুলিয়া জেলায় পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বসবাসের হদিস পাওয়া যায়। রাঢ়ী, কাণ্যকুব্জ, মৈথিলি, মধ্যশ্রেণী ও উৎকল। সব মিলিয়ে সংখ্যায় তারা কম নন। বসতি জেলার সর্বত্র সমানভাবে বণ্টিত হয়নি। প্রধানত রঘুনাথপুর ও কাশীপুর থানায় কেন্দ্রীভূত। কাশীপুর রাজবংশের পৃষ্ঠ-পোষকতায়, কাশীপুরের কাছাকাছি গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণদের বসতি। বরাবাজার, মানবাজার ও জয়পুর ছাড়া এ জাতীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিলনা জমিদারপরিবার-গুলির। অন্যান্য জায়গায় ব্রাহ্মণদের বসতি সাম্প্রতিক, মূলত জীবিকার প্রয়োজনে বিন্যস্ত হয়েছিল।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আদিশূর ও কাণ্যকুব্জের কিংবদন্তি বিজড়িত। আদিশূরের আহ্বানে পঞ্চ ব্রাহ্মণ[৩৩] নাকি কাণ্যকুব্জ থেকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এসে বসবাস গড়ে তুলেছিলেন। আগমন ঘটেছিল খ্রীস্টীয় এগারো

---

৩২. E. A. Gait. দ্রষ্টব্য, পার্ট ২৯।

৩৩. পঞ্চব্রাহ্মণ নাকি ছিলেন ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ।

শতকে। জনশ্রুতি আরও বলে, পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পাঁচ জায়গায় ভূসম্পত্তি দিয়ে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন শূরনৃপতিরা। তাদের মধ্যে ক্ষিতীশের বসতি নির্দিষ্ট হয়েছিল পঞ্চকোটে। ক্ষিতীশের বংশেই ভট্টনারায়ণের জন্ম। ভট্টনারায়ণের ষোলটি পুত্রের মধ্যে 'গণ' বসতি স্থাপন করেছিলেন বরাকর নদের দক্ষিণে ঘোষল গ্রামে। ঘোষল গ্রাম থেকেই ঘোষালি গাঞীর উদ্ভব।[৩৪] রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গোত্র পাঁচটি। শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য (বা ভার্গব), সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ। জেলায় তাদের বসবাস প্রাচীণ এবং জনজীবনের রূপান্তরে ভূমিকা ছিল একদা গুরুত্বপূর্ণ।

কাণ্যকুব্জ বা কনৌজ-ব্রাহ্মণদের বসতি প্রধানত জেলার উত্তরাংশে, কাশীপুরের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে বিন্যস্ত।[৩৫] আচারাদি পরিচালিত হয় শুক্ল যজুর্বেদের নির্দেশ অনুসারে। রাজ অনুগ্রহে তারা ভূসম্পত্তি লাভ করেছিলেন এবং একটি পরিবার রাজপরিবারের গুরু ছিলেন বলেও দাবী করে থাকেন। পরবর্তীকালে রাজপরিবারটি রামমন্ত্রে দীক্ষা নিলে গুরুপুরোহিতে পরিণত হয়েছিলেন। কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের ব্যাপক বসতি আছে বিহারে এবং তারা অযোধ্যা থেকে আগত বলে দাবী করেন, পুরোহিত ছিলেন সুবিখ্যাত রামচন্দ্রের। পুরুলিয়া জেলার কনৌজিয়ারা সম্ভবত বিহার থেকে এসে এখানে বসতি তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান পুরুলিয়া বা প্রাক্তন মানভূম জেলা একসময় বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে সুবিশাল ব্রাহ্মণ সমাজের পঞ্চগৌড় শাখার মধ্যে মৈথিলি বা তীরহুতীয় ব্রাহ্মণেরাও অন্তর্ভুক্ত।[৩৬] মানভূম জেলায় তাদের প্রধান বসতি ছিল চাষ থানায়। বর্তমান পুরুলিয়া জেলার উত্তর পশ্চিম অংশে, বিশেষত ঝালদা, পাড়া, জয়পুর, নেতুরিয়া ও সাঁতুড়ি থানায় অধিক সংখ্যায় বসবাস দেখা যায়। কনৌজিয়া ও মৈথিলিরা পুরুলিয়া জেলায় মিলেমিশে প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছেন।

মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের প্রধান বসবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়। সামাজিক

---

৩৪. এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের 'মধ্যযুগ ও পঞ্চকোটবৃত্ত' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য, পৃ ১১৯ ও ১২৭।

৩৫. রামচন্দ্রপুর, আড়রা, গোবরান্দা, মঙ্গলদা, আনড়া, কড়চা, পাচা প্রভৃতি। গোত্র, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, উদ্বাহ, কৃষ্ণাত্রেয়, বাৎস্য প্রভৃতি। পদবী প্রধানত দুবে, গোস্বামী, পণ্ডিত, পাঠক, চক্রবর্তী প্রভৃতি।

৩৬. পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণের পাঁচটি শাখা, যথা, সারস্বত, কাণ্যকুব্জ, গৌড়ীয়, উৎকল ও মৈথিল।—The Caste and Tribes of Bengal, vol-I, P 144.

মর্যাদায় রাঢ়ীশ্রেণীর পরে স্থান। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণপূর্ব অংশে বসবাস বেশি। সম্ভবত রাঢ়ী, সপ্তশতী ও উৎকল ব্রাহ্মণদের সংমিশ্রনে শ্রেণীটির উদ্ভব হয়েছিল। রাঢ়ীয় গোত্র ছাড়া আরও তিনটি গোত্র মধ্যশ্রেণীদের মধ্যে প্রচলিত। পরাশর, গৌতম ও ঘৃতকৌশিক। পরাশর, সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে গোত্র হিসাবে প্রচলিত। গৌতম ও ঘৃতকৌশিক প্রচলিত উৎকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে। মধ্যশ্রেনীরা শক্তির উপাসক যদিও ক্রিয়াকর্মে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের থেকে পৃথক নন।

জনশ্রুতি অনুসারে উড়িষায় গঙ্গবংশের আধিপত্যের সময় সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন। পরে কনৌজ থেকে দশ হাজার ব্রাহ্মণ এসে বসতি তুলেছিলেন বৈতরনী নদীর তীরে যাজপুরে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজাপার্বন পুনরায় গৃহীত হলে, উড়িষ্যার রাজা যাজপুর থেকে কিছু ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তারা গিয়ে বসতি তুলেছিলেন পুরীর মন্দিরের চারপাশে। একাংশ থেকে গিয়েছিলেন যাজপুরে। পুরীর মন্দিরের কাছে যারা স্থিত হয়েছিলেন দাক্ষিণাত্য শ্রেণী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। যাজপুরের অংশের নাম ছিল উত্তর-শ্রেণী। পরবর্তীকালে উড়িষ্যার উত্তরাংশে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, নাম হয়েছিল উৎকল শ্রেণী।

জীবিকার অন্বেষণে ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময় বহু ব্রাহ্মণ পরিবার পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশে এসে স্থিত হয়েছিলেন। গোত্র ও ক্রিয়াকর্মে তাদের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রঘুনাথপুরের কাছে বেড়ো গ্রামে দ্রাবিড়ীয় ব্রাহ্মণদের একটি শাখা কাশীপুরের রাজবংশ কর্তৃক আনীত হয়েছিলেন। এরা রাজবংশটির গুরু।

পাঁচটি প্রধান শ্রেণী ছাড়াও শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণদেরও কিছু বসবাস দেখা যায় পুরুলিয়া জেলায়। তারা মগ বা মঘা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব এবং কুষ্ঠরোগের কিংবদন্তি তাদের সঙ্গে বিজড়িত।

অন্যান্য গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ঃ অন্যান্য যেসব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় পুরুলিয়া জেলায় দশ হাজারের ওপর তাদের মধ্যে প্রধান রাজোয়ার, হাড়ি, ডোম, চামার, ধোপা, গোয়ালা এবং লোহার বা কামার। উপজাতিদের মধ্যে মুণ্ডা ও কোড়া। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে রাজোয়ারেরা দ্রাবিড়ীয়দের থেকে উদ্ভূত। বিহারে ভুঁইয়াদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। পুরুলিয়ায় উদ্ভব কুর্মী ও কোলদের সংমিশ্রণে। মানভূম বা পুরুলিয়ায় এসেছিলেন নাগপুর থেকে। গোত্রগুলির মধ্যে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব সুস্পষ্ট এবং শিখরভূম অঞ্চলে প্রাচীন বসবাসের

ইংগিতবহ।[৩৭] বিবাহ ও শ্রাদ্ধে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি অনেকখানি অনুসরণ করেন। বর্তমানে কুর্মীদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়না। পেশা কৃষি ও দিন-মজুরি।[৩৮]

সংখ্যায় কম হলেও পুরুলিয়া জেলায় ব্যবসা বাণিজ্যের মূল ধারাটি নিয়ন্ত্রণ করেন মাড়োয়ারি পরিবারগুলি। জেলায় তাদের বসবাস সুরু হয়েছিল প্রায় দেড়শো বছর আগে। প্রথমে এসেছিলেন কাটারুকা পরিবার। অন্যান্য প্রাচীন পরিবার ছিলেন সাহা ও খেড়িয়ারা। খেড়িয়ারা এসেছিলেন জয়পুর ও বিকানীর থেকে। পদবী, মল্ল, রাঠি, সারদা, বিয়ানি প্রভৃতি। লাটরাও এসেছিলেন জয়পুর থেকে।

প্রকৃতপক্ষে মাড়োয়ারি বলতে মাড়োয়ার অঞ্চলের অধিবাসীদের চিহ্নিত ক'রে। কিন্তু বাংলায় শব্দটি ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে। রাজপুতানা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে যারা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাংলায় এসেছিলেন সবাই মাড়োয়ারি নামে পরিচিত। এইসব বণিকদের চারটি ভাগ: আগরওয়াল, মহেশ্বরী, খাণ্ডেলওয়াল ও যশওয়াল (বা ওসওয়াল)। ওসওয়ালরা সবাই জৈন ধর্মাবলম্বী, আগরওয়ালদের মধ্যে সরাওগীরা জৈন। পুরুলিয়া জেলায় সমস্ত ভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিয়েথাওয়া চলে।

পুরুলিয়া সহরে মাড়োয়ারি পরিবার আছেন প্রায় সাতশো। জেলার বিভিন্ন থানায় ছড়িয়েছিটিয়ে আছেন তার কিছু বেশী। থানাগুলির মধ্যে প্রধান বলরামপুর, ঝালদা, আদ্রা, রঘুনাথপুর ও বান্দোয়ান। আড়সা ও বাগমুন্ডিতে আছেন কটি মাত্র পরিবার, জয়পুরে একেবারেই নেই।

সম্প্রদায়টি মিত্যবায়ী, উয্যোগী ও ধনী। জেলার বড় বড় ব্যবসাগুলি তাদের দ্বারাই পরিচালিত। ব্যবসার মধ্যে প্রধান, কাপড়, ভুষিমাল, গোলদারী ও লাক্ষা। বর্তমানে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোট ছোট কারখানা বা ক্ষুদ্র শিল্প।

দীর্ঘকাল ধরে জেলায় বসবাস করলেও জেলার জনজীবনের সঙ্গে সম্প্রাদায়টি পুরোপুরি মিশখেয়ে যেতে পারেন নি। ভাষা, আচার আচরণ, পোষাক পরিচেছদে বাঙ্গালীয়ানার প্রভাব সুস্পষ্ট, তবু সামাজিক সম্পর্কে এখনও দূরত্বের বিন্দুতে সমাসীন। দূরত্বের প্রধান কারণ বাঙ্গালীরা যেমন সামাজিক ও সংস্কৃতিক

৩৭. গোত্র সাতটি, যথা, অংরোক বা অজার, চপওয়ার, শিখরিয়া, সুকুলকারা, বড়-ঘরি-মঝল-ভুরিয়া, এবং বেড্ডা-রাজোয়ার।

৩৮. অন্যান্য গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য ও বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

জীবনের মধ্যে তাদের টেনে আনতে পারেন নি, তারাও তেমনি নিজেদের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নেননি। দুদিকের পাঁচিল ভেঙে মিলনের সমক্ষেত্র বহুদিন থেকেই তৈরী হয়ে রয়েছে। এটিকে বোধহয় বিলম্বিত করা আর কোনদিক থেকেই উচিৎ হবে না।[৩৯]

---

৩৯. পুরুলিয়ার মাড়োয়ারি সমাজ সম্বন্ধে তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীশিবপ্রসাদ কোঁয়া, সাক্ষাৎকার, পুরুলিয়া সহর, জুলাই ১৯৮২।

ধর্ম ও সংস্কার

'I ask'd of Time for whom these temples rose
That prostrate by his hand in silence lie;
... ...
I saw Oblivion pass with giant stride;
And while his Visage wore Pride's scornful smile,
Happly, Thou know'st, then tell me, whose I cried,
Whose these vast domes that ev'n in ruin shine?
I reck not Whose, he said; they now are mine."
—James Tod (1829-32).

ঐতিহাসিক ধারা, জনবসতির বিন্যাস ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুলিয়া জেলার ধর্মীয় চেতনার বীজ ও রূপান্তরের ইংগিতটি নিহিত রয়েছে। বসতি বিন্যাসে পাহাড় ও নদীগুলির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্তন মানভূম জেলার জনগড়ায় যে ক্ষুদ্রাশ্মর ও নবাশ্মর আয়ুধগুলি পাওয়া গিয়েছিল, সময়ের নিরিখে তাদের বয়স পাঁচ লক্ষ বছরের কাছাকাছি। সম্ভবত আদি-অসট্রাল গোষ্ঠীর মানুষদের ছিল সেসব আয়ুধ।

প্রাক-বৈদিক সেই অনার্য জনগোষ্ঠী, যাদের এক কথায় বলা হয় নিষাদ, একদা গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে জনবিন্যাসের মূল কাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন। যীশু খ্রীস্টের জন্মের আগে তাদের ধর্মীয় বোধের স্বরূপটি কি ছিল, জানা যায় না। নৃতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেছেন, তারা ছিলেন প্রকৃতি-পূজারী বা এনিমিস্ট।

পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলের নিষাদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপ্রথম সংস্কৃত

ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন জৈনেরা। চব্বিশতম জৈন তীর্থংকর মহাবীর বর্ধমানের লাড়দেশে পরিভ্রমণের যে বিবরণ আচারাঙ্গ সূত্রে বিধৃত হয়েছে, সে দেশের টুকরো টুকরো পরিচয় এখনও পর্যন্ত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার গ্রাম-নামের মধ্যে নিহিত রয়ে গেছে। যথা, সুখলাড়া, লৌলাড়া, লাড়রা, পোদলাড়া, বহুলাড়া ইত্যাদি। শেষোক্তটি বাদে সবগুলি গ্রামই পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত।

গ্রাম নাম ছাড়াও গ্রামে গ্রামে ছড়ানো মন্দির, মূর্তি ও পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন জৈন শ্রাবক সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হবার পর সরাক নামে জেলায় বসবাস, সামাজিক রীতিনীতি এবং উৎসব ও পার্বনে জৈনধর্মের বিলুপ্ত প্রায় রেশ—সবই আদিম জনসমাজের মধ্যে জৈনধর্মের অনুপ্রবেশের দিকে ইংগিত ক'রে। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলে জৈনধর্মের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকে।[1]

জৈনদের দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল-এ অঞ্চলে। কাঁসাই নদীর তীরভূমি ধরে প্রসারিত হয়েছিল ধর্মটি। ফলে, কাঁসাইয়ের দুই তীরে এখনও বহু মন্দির ও মূর্তির ধ্বংসাবশেষ পরিকীর্ণ। কাঁসাই একান্তভাবে পুরুলিয়ার নদী, জন্ম এবং বৃহত্তর প্রবাহ-পথ জেলার মধ্যেই আবর্তিত। জলধারার মত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান ধারাটিও নদীটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। সে ধারা এখনও অব্যাহত।

ধর্মীয় রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায় জেলার বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতি পূজার সঙ্গে বিমূর্ত উপাসনার প্রাথমিক চেতনা জড়িয়ে আছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া, রাজোয়ার প্রভৃতি গোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে। ভূমিজ, ভুঁইয়া, বাগদী ও বাউরিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৈষ্ণব ও উপজাতীয় ধ্যানধারণায় অনেক বীজ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। বর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। খ্রীস্টান সম্প্রদায় জেলায় সংখ্যার দিক থেকে খুবই কম। মরশুমী যে জনপ্রবাহ আদ্রা রেলওয়ে সেটেলমেনটে মাঝেমধ্যে এসে পড়েন জেলায় তাদের উপস্থিতি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত।

গভীরতম ধর্মীয় চেতনার বদলে বছরের বিভিন্ন সময়ে যে উৎসব ও মেলা

---

১. এ প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য পৃ. ২৩৩-২৪১। স্বর্গত বিনয় ঘোষ পুরুলিয়া জেলার ধর্মীয় বিবর্তন সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। দ্রষ্টব্য, Cultural Profile of Purulia, Census 1961, Purulia.

গুলি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়, সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যেই ধর্মীয় অভীপ্সার স্বরূপটি অনুসন্ধান করেন। অভীপ্সার পিছনে সচেতন প্রয়াস থাকে কিনা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে বৃহত্তর জনসমাজ যে তাদের মধ্যে আনন্দের উৎসটি খুঁজে পান, দৈহিক কৃচ্ছসাধন ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৃত্তটি কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য হলেও ভেঙ্গে ফেলেন, একীভূত ও উন্নীত হন বৃহত্তর মানবিক সম্পর্কে, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

দৈনন্দিন জীবন যাপন, রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানে সাঁওতালদের মধ্যে আদিম সমাজের ধর্মীয় বোধ, রূপান্তরিত হলেও, কিছু পরিমাণে বিদ্যমান। ভিত্ হিসাবে সাঁওতালদের এবং শীর্ষে ব্রাহ্মণদের ধরলে, মধ্যবর্তী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় গুলি ধর্মীয় চেতনার বিভিন্ন স্তরে রয়ে গেছেন দেখা যায়।

সাঁওতালদের দেবরাজ্যে প্রধান দেবতা সিঞ বঙ্গা।[২] শুভ ও শান্তি বিধায়ক, আসল নাম লিটা। প্রকৃতপক্ষে তিনি সূর্য। দিন ও রাত্রির অধীশ্বর, রোদ ও জলের মালিক। ঞিদা চাঁদো বা রাতের চাঁদ তার স্ত্রী, নক্ষত্রেরা সন্তান-সন্ততি। মুন্ডা ও ভূমিজদের মধ্যেও সিঞ বঙ্গা প্রধান দেবতা। মুণ্ডাদের কাছেও তিনি সূর্য। এবং নিষ্ক্রিয়। রোগ ছড়িয়ে হড়হপনদের শাস্তি না দিলেও, রোগের প্রকোপ থেকে উদ্ধার করেন। তখন সাদা ছাগল বা সাদা মোরগ বলি দিতে হয়। ভূমিজদের কাছে সিঞ বঙ্গার স্বরূপ অনেকটা ধর্ম ঠাকুরের মত। কোন কোন জায়গায় তিনি ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম।

ভুঁইয়াদের কাছে সূর্যের স্বরূপ সনাক্ত করা হয় বোড়ামের সঙ্গে। বোড়াম, বড় দেবতা। অনেকটা ওঁরাওদের ধর্মঠাকুরের মত। বোড়ামের প্রতীক নেই। বলি দেওয়া সাদা মোরগ। এ প্রসঙ্গে আড়সা থানায় বোড়াম স্থানটির কথা স্মরণীয়। স্থানের নামটি একদা ভুঁইয়াদের প্রাচীন বসবাসের প্রতি ইংগিত করে।

মারাং বুরু বা বড় পাহাড় প্রায় সমস্ত অরণ্যবাসীদের কাছে প্রধান হিসাবে মান্য। সাঁওতালদের কাছে শুভ অশুভ উভয় ক্ষমতার অধিকারী, একাধারে

---

২. রিসলে লিখেছিলেন 'ঠাকুর'। না-ভাল না-মন্দ—কোন কাজই যেহেতু তিনি অনুষ্ঠিত করেন না সেজন্য পরবর্তীকালে বর্জিত হয়েছিলেন।—Tribes and Castes of Bengal, vol-II, P 232. প্রকৃতপক্ষে 'ঠাকুর'. হিন্দুধাঁচের বিমূর্ত দেবতা এবং সম্ভাত হিন্দুদের সংস্রবে আসার পর সাঁওতাল সমাজে তার উদ্ভব ঘটেছিল। পাঁচ বা সাত বছর অন্তর খুব ঘটা করে কোথাও কোথাও ঠাকুরের পুজো হয়।

দেবতা ও দানব। মুণ্ডাদের মধ্যে আরও দুটি নামে তিনি পরিচিত, বুরু বঙ্গা ও পাট-সরনা। বাগদী ও বাউরিদের কাছে নাম বড় পাহাড়ি। মারাং বুরু অরণ্য সন্তানদের কাছে সর্বগ্রাহ্য দেবতা হয়ে উঠেছেন। হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় সবাই তার কাছে পুজো দেন, নিরাপদে থাকার জন্য জানান প্রার্থনা। কুম্ভকার বা কুমারেরা ধর্মে হিন্দু হলেও এখনও পাহাড় ও বুরুর পুজো করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য কানা বুরু, মাঠা বুরু, কাশিক-বুরু ইত্যাদি।

সাঁওতালদের দেবরাজ্যে মঁড়েকো একসময় ছিলেন পাঁচজন বা পঞ্চদেবতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন মিলেমিশে পরিণত হয়েছেন একজনে। তিনি অগ্নির স্বরূপ বা অগ্নি। ভূমিজদের কাছে মঁড়েকোর প্রতিরূপ পঞ্চবাহিনী। কোথাও কোথাও নাম বারদেলা। বাঁকুড়া জেলায় ভূমিজদের মধ্যে বারদেলার পুজো অধিক প্রচলিত। বলি দেওয়া হয় ছাগল, বারদেলাকে দেওয়া হয় মুরগি। প্রভাব ও প্রতিপত্তির দিক থেকে তারা জাহির-বুরুর সঙ্গে তুলনীয়।

সাঁওতালেরা বলেন মঁড়েকোর বোন জাহের এরা। অধিষ্ঠান জাহের থানে বা পবিত্র জায়গায়। গ্রাম বা অরণ্যের উপান্তে আদিম অরণ্যের যে টুকরো খণ্ড বা একটি বিশেষ গাছ সযত্নে রক্ষিত হয়, সেটাই জাহির বা জাহের-থান। মারাং বুরুর মতই জাহের এরা অরণ্য সন্তানদের কাছে সর্বমান্য। ভূমিজ দের কাছে নাম জাহির-বুরু, পুজো হয় বছরে দুবার, বৈশাখ ও ফালগুনে। কৃষি কাজের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত, ক্রুদ্ধ হলে ফসল নষ্ট হয়, দেখা দেয় খরা বা অতিবৃষ্টি। পুজোর উপকরণ পাঁঠা, মুরগি, চাল ও ঘি।

মুণ্ডাদের কাছে কাড়া-সরণা বা গ্রাম দেবতার স্ত্রী জাহির-বুড়ি। কাড়া-সরণাকে কোথাও কোথাও দেওশালি বলা হয়। প্রতিটি গ্রামে তার অধিষ্ঠান, কৃষির সঙ্গে তিনি যুক্ত। তুষ্টি বিধানের জন্য তার কাছে উৎসর্গ করতে হয় কাড়া বা মোষ। স্বামীর সঙ্গে ঝোপেই থাকেন জাহির-বুড়ি। তাকে উৎসর্গ করা হয় মুরগি। সরণার আর এক দেবীর নাম গুমি। তিনি কাড়া-সরণার স্ত্রী নন, অধিষ্ঠান ঝোপে।

ভুঁইয়াদের মধ্যে ঝোপে থাকেন তিন দেবতা। দাসুম পাট, বামনি পাট ও কৈসোর পাট। তিন জনে ভাই। ভাইসহ দাসুম রোগে রক্ষাকর্তা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিকভাবে দাসুম ও তার ভাইদের কাছে বলি দেওয়া হয় পাঁঠা। গাছের নিচে তাদের প্রতীক থাকে নুড়ি পাথর।

মুণ্ডাদের যেমন কাড়া-সরণা, ভূমিজদের তেমনি দেবতা কাড়া-কাটা।

তিনিও কৃষির সঙ্গে যুক্ত, পূজো উপেক্ষিত হলে দেখা দেয় খরা, বলি দিতে হয় মোষ।

দেবতাদের মত অপদেবতারাও কম শক্তিশালী নন। তাদের মধ্যে প্রধান কুদরা ও বিষইচন্ডী, বাঘুত বা বাঘভূত, পারগণা এরা প্রভৃতি। কুদরা বাউরিদের কাছে কুদরাসিনী, মানুষের অনিষ্ট করার দিকে ঝোঁক। ভূমিজেরা পূজো দেন সংঘবদ্ধভাবে। বাউরিরা তাকে আরও বেশি আয়ত্বের মধ্যে এনেছেন। পূজো দেন শনি ও রবিবারে। সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যেও কুদরার প্রভাব কম নয়। বাঘুত বাঘের দেবতা, বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা তার কাজ। পূজোও হয় ভয়ানক সময়ে, কার্তিক মাসে অমাবস্যার রাত্রে, কি অমাবস্যার আগের রাত্রে।

প্রধান প্রধান এসব দেবদেবী ছাড়া, ছোট ছোট দেবদেবীও আছেন অনেক। যেমন, ইঁকির বঙ্গা বা জলের দেবতা, নাগে বা নাগে এরা কৃষিক্ষেত্রের দেবতা, গোঁসাই-এরা বা মংড়েকোঁর ছোট বোন, চর্কাদীরি, নরা-হরা, শিলফোড়, দুয়ারসিনী, ভগবান, ছড়ুয়া-বরু ইত্যাদি। গোঁসাই-এরার প্রভাব আছে বাগদীদের মধ্যে।

প্রকৃতিপূজো বা আদিম স্তরের দেবদেবীদের ওপর দ্বিতীয় ধাপে যেসব দেবতারা আছেন তাঁরা মনুষ্যাকৃতি ও বীরের প্রতীক। বাউরিদের মানসিং, মুন্ডাদের কোলোম সিং বা খাড়িরা পূজা, ডোমদের কালুবীর, গোয়ালাদের কালুমাঝি, লোহার ও ময়রাদের মোহন গিরি ও সাহেব মিঞা, মুচিদের মুচিরাম ও রুইদাস, রাজপুতদের বন্দী ও নরসিং, দক্ষিণ পুরুলিয়ায় ভানসিং –সবাই এই স্তরের মধ্যে এসে পড়েন। প্রকৃতিপূজো ও বিমূর্ত দেবদেবীর মধ্যবর্তী এই স্তরটি পূজকদের কাছে অধিকতর জনপ্রিয় এবং হৃদয়ের কাছাকাছি। উৎসব ও মেলার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি সম্ভ্রম ও পূজার উপহার উৎসর্গ করা হয়। ধর্মীয় আচার সেখানে গৌণ।

দ্বিতীয় স্তরের আর একটি উপভাগে রয়েছেন টুসু ও ভাদু। উৎসবের মধ্য দিয়ে তাদেরও হয় উপাসনা। আনন্দগীতির মধ্য দিয়ে নেওয়া হয় আপন করে। দেবীদের সঙ্গে উপাসিকারা একাত্ম হয়ে যান, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার গোপন গুঞ্জন ধ্বনিত হয় স্বরচিত গানের সুরে সুরে। টুসু ও ভাদু সম্ভবত বিমূর্ত বা প্রতীক থেকে মূর্তিমতী দেবীতে পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে কোথাও কোথাও দুই দেবীকেই মূর্তি গড়িয়ে পূজা করা হয়।

শিব ও মনসা পুরুলিয়া জেলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় দেব ও দেবী।[৩] গাঁয়ের পরব বলতে সাধারণত শিবের গাজনই চিহ্নিত হয়। গাজন যেমন প্রাচীন তেমনি জনপ্রিয়। দ্রাবিড়ীয় নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে শৈব ধ্যানধারণা মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার যুগ থেকে বিজড়িত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। শক্তি ও মাতৃকা পূজোর ধারাটি জীবন্ত সরীসৃপ, নাগ বা সর্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটিও দ্রাবিড়ীয় প্রভাব যুক্ত। প্রাকৃতিক সত্যগুলি যেমন দেবীর রূপ ধারণ করেছেন যেমন, গঙ্গা, শিলাবতী, মনসাও তেমনি সর্পদেবীর রূপ ধারণ করে মানবীয় আকারে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

উপজাতি ও তফসিলীদের জাহের-এরা বা ঝোপের দেবী অনেকক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন চণ্ডী ও বনদুর্গায়। অরণ্যে বসবাস বলে তাদের চেহারা ভীষণা, অনিষ্টকারী শক্তির প্রকোপও ভীতি উদ্রেককারী। চণ্ডীদের মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় সবচেয়ে মান্য, আদ্রা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে জয়চণ্ডী পাহাড়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী জয়চণ্ডী। জেলার আর যেসব জায়গায় চন্ডী বা খেলাই চণ্ডীর পূজা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বান্দোয়ান থানার চিল্লা, পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার নাদিরা ও গোলমারা, রঘুনাথপুর থানার বেড়ো ও সাঁতুরি থানার দণ্ডহিত গ্রাম।

জনগণণা অনুযায়ী আদিবাসী ও উপজাতিদের হিন্দু হিসাবে ধরলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পুরুলিয়া জেলায় সংখ্যা গরিষ্ঠ। হিন্দুর পরেই মুসলমান বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। মোট জনসংখ্যার শতকরা ছয় ভাগ। সব থানায় ছড়ানছিটান কিছু কিছু বসবাস থাকলেও চারটি থানায় বসতি পাঁচ হাজারের ওপর। যথা, ঝালদা, নেতুরিয়া, পুরুলিয়া মফঃস্বল ও রঘুনাথপুর। মুসলমান প্রধান গ্রাম জেলায় প্রায় তিরিশটি। মোট জনগোষ্ঠী তিনভাগে বিভক্ত। শেখ, পাঠান ও জোলা। জোলা বা আনসারীরা আটটি গ্রামে কেন্দ্রীভূত। অন্যান্য জায়গায় বসবাস বিক্ষিপ্ত।

জেলায় মুসলমানদের প্রধান জীবিকা চাষআবাদ। সেইসঙ্গে আছে বিড়ি তৈরি ও টেলারিং। খুচরো ও পাইকারী ব্যবসাতেও নিয়োজিত আছেন কিছু। জোলা বা অনাসারীদের অধিকাংশ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত। তাঁতও সাবেকি আমলের পিট লুম। তাতে প্রধানত বোনা হয় গামছা ও লুঙ্গি।

---

৩. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ২৩৩—২৪৬। এবং পৃ ২৫০—২৫৩ ও ২৫৬—২৫৮। হিন্দু ধর্মাশ্রিত দেবদেবীর পূজা সম্বন্ধেও দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া।

পুরুলিয়া জেলায় খ্রীস্টান মিশনারীদের আগমন প্রথম ঘটেছিল ১৮৬৪ সালে। ডেনিশ ইনজিনিয়ার মি. বোয়েরেসেন ও নরওয়ের মিশনারি শ্রেফ্রার্ড ছিলেন দুই বন্ধু। বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছিল বার্লিনে। ছোটনাগপুরে কাজ করার জন্য গশনার মিশন সোসাইটির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। শর্ত ছিল দুজনকে যেন এক জায়গায় কাজ করতে দেওয়া হয়।[৪] মি শ্রেফ্রার্ড এসেছিলেন আগে, পুরুলিয়ায় পৌঁছেছিলেন ১৮৬৪ সালে। মি বোয়ে-রেসেন পত্নী এবং শ্রেফ্রোর্ডের বধূসহ পুরুলিয়ায় এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলন ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে। জার্মানী ও ডেনমার্কের মধ্যে তখন যুদ্ধ চলছিল। ফলে, রাঁচির গনণার মিশন তাদের একসঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেননি। অনুমতি দেওয়া হয়েছিল আরও একবছর পরে (১৮৬৬ সালে)। তিষ্ঠিত হয়েছিল নতুন মিশন।[৫] স্থান ছিল সাঁওতাল পরগণার বেলবনি গ্রাম।

জেলার তিনটি থানায় প্রসারিত হয়েছিল মিশনারীদের কার্যকলাপ, পুরুলিয়া, ঝালদা ও বাগমুণ্ডিতে। মিশনারীদের সদর দপ্তর ছিল পুরুলিয়ায়। শহরের বাইরে দেশীয় যাজকদের দ্বারা পরিচালিত হত শাখা দপ্তর। সেগুলি ছিল সিরকাবাদ, ইলু ও তুন্তুরিতে।[৬] মিশনের উদ্যোগে ১৮৬৬-৬৭ সালে কুষ্ঠ রোগীদের আশ্রম খোলা হয়েছিল পুরুলিয়ায়। উদোক্তা ছিলেন রেভ হেমারিথ উফম্যান। রোগীদের চিকিৎসা এবং আরোগ্যান্তে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও ছিল মিশনের লক্ষ্য। ফলে আশ্রম বা এসাইলামের মধ্যে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বর্তমানে এই কুষ্ঠনিবাস ভারতের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

বিশ শতকের প্রথম দিকে আদ্রায় গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ও রেলওয়ে সেটেলমেনট গড়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় ও দেশীয় খ্রীস্টানদের বসবাসও ঘন হয়ে উঠেছিল। আদ্রার কাছাকাছি রঘুনাথপুরের নীলকুঠিতে একটি মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে অনাথ শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য চালু হয়েছিল

৪. বন্ধুদের নাম ছিল Mr. Hans Peter Boerresen এবং Mr. Lars Olsen Skrefsurd, মিশনের নাম Gossner Mission Society.

৫. মিশনের নাম হয়েছিল Indian Home Mission to the Santal এই দুই বন্ধুর প্রতিষ্ঠিত মিশনই সাঁওতাল পরগণার প্রসিদ্ধ—The Santali Mission of the Northern Churches

৬. সদর ও শাখা দপ্তরগুলি পরিচালিত হত German Evangelical Lutheran (Gossner's) Mission-এর তত্ত্বাবধানে।

স্কুল। পরে আদ্রা ও বলরামপুরেও মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে (১৮৬০ সালে) সমস্ত মিশনগুলি সম্মিলিত করে গঠিত হয়েছিল ইউনাইটেড মিশনারী চার্চ। সম্মিলিত মিশনগুলির স্বীকৃত নাম ভারতীয় যুক্ত খ্রীস্ট প্রচার মণ্ডলী।[৭]

আদিম ধর্মচেতনার সঙ্গে জড়ানো ছিল ভীতি ও বিস্ময়। প্রাকৃতিক শক্তির মুখোমুখি হলে অসহায় হয়ে পড়ত মানুষ। অরণ্য, হিংস্র প্রাণী, পাহাড় ও নদী ছিল তাদের কাছে একদিকে প্রয়োজনীয় অন্যদিকে ভীতি উৎপাদক। নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা যেমন ছিল না তেমনি যুক্তি ও বিচারের দ্বারা গ্রহণ করার মত মানসিকতাও ছিল না তাদের। ফলে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে অসংখ্য সংস্কার ঢুকে পড়েছিল। অদৃশ্য শক্তিগুলিকে পরিতুষ্ট করার ইচ্ছার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সংস্কারগুলি। অদৃশ্য শক্তিগুলি যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, তেমনি বিবর্তিত হয়ে চলেছে সংস্কারের সঙ্গে বিজড়িত আচার অনুষ্ঠান।

অরণ্যে সাপ বিভীষিকা। রাঢ়ের সাপ বিষধরও। জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো থেকে উনিশ পর্যন্ত রোহিন। রোহিনের প্রথম দিনে থেকে সুরু হয় চাষ। সেদিন বৃষ্টি নাকি অনিবার্য। বৃষ্টি হলে সাপের বিষ ধুয়ে যায়। শষ্য বপন করলে ব্যর্থ হয়না। কথায় বলে, 'কপাল টলে রোহিন টলে না'। রোহিনে বেলেকঁড়া বা আষাঢ়ী ফল খেলে সাপের কামড়ে বিষ লাগে না। ভয় থাকেনা মরার। রোহিনে বৃষ্টি ভেজা মাটি ঘরে থাকলে নাকি সাপ ঢোকেনা ঘরে।

গাছ কাটা নিয়ে নানা সংস্কার আছে অরণ্য অঞ্চলে। খাড়োয়ালেরা করম গাছ কাটেন না। লোধা ছাড়া উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে কেউ শালগাছ কাটতে চান না। বিশ্বাস, শাল গাছে অধিষ্ঠিত থাকেন দেবতা। প্রিয়জন সম্বন্ধে দুঃস্বপ্ন দেখলে চাল বাটা পিঠে তৈরি করে শালপাতায় মুড়িয়ে রোস্ট করে তাকে খাওয়ালে নাকি দোষ কেটে যায়।

খাওয়া নিয়ে সংস্কার আছে আরও। মাঘ মাসে ভীম একাদশীর পরের দিন অনেক পরিবারে কুলের সাথে বেথা শাকের তরকারি খাবার রেওয়াজ আছে।

---

৭. রঘুনাথপুরে মিশন ও অনাথ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৯০১ খ্রী) মি ও মিসেস ডি. ডব্লু জুক। এটি ছিল আমেরিকান মিশন। আদ্রার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০২ সালে এবং বলরামপুরে ১৯২৯ সালে। ১৯৬০ সালে মিশনগুলি সম্মিলিত হয়েছিল, নাম হয়েছিল United Missionary Church রেজিস্ট্রি হবার পর (১৯৬৮) নাম হয়েছিল ভারতীয় যুক্ত খ্রীস্ট-প্রচার মণ্ডলী।—মিস্ জ্যোতি রাণা, (আদ্রা) কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত।

কার্তিক মাসে ওল ও মাঘ মাসে মূলো খাওয়া নিষিদ্ধ। শ্রীপঞ্চমীর পর গোটা পিঠে খাওয়া বারণ। খেতে বসে হাঁচলে ভুঁয়ের ভাত কুড়িয়ে একটু জল খেতে হয়, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ফের সুরু করতে হয় খাওয়া। বিড়ালের সন্তান প্রসবের পর বিড়ালের ফুল (প্ল্যাসেন্টা) যদি কেউ পেয়ে যায়, সে নাকি রাজা হয়। বন্ধ্যা মেয়েরা সেই ফুলের সামান্য অংশ কলার মধ্যে পুরে খেলে সন্তানবতী হয়।

শাড়ির আঁচলকে এদিকে বলা হয় টেপ। টেপের হাওয়া শিশুদের গায়ে লাগা খুব খারাপ, টেপ লাগলে তো কথা নেই, শরীর খারাপ হবেই। শরীর খারাপ হলে আঁচলটি মাটিতে ঠেকালেই দোষ কেটে যায়। কোলে থাকা শিশুর পা যদি কাছে দাঁড়ানো কোন ছেলের মাথায় লাগে, কোলের শিশুটিকে কিছু ক্ষণের জন্য মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়। অন্তঃসত্ত্বা নারী খাটের পায়ের দিকের দড়ি টান করলে কন্যা সন্তান হয়। ডাইন বক্‌সদের কুনজর থেকে রক্ষা করতে খাটে মাথার দিকের দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে হয় ফুল, সরষে পড়া, কাজললতা প্রভৃতি। এমনকি কোথাও কোথাও কাস্তেও গুঁজে দেওয়া হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় খাট থেকে পড়ে গেলে পরদিন অবশ্যই স্নান করতে হয়।

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় রাঁধা তরকারি অশুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তখন তুলসীর পাতা দিয়ে ঢেকে রাখলে দোষ কেটে যায়। কালসন্ধ্যা বা সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যা প্রদীপ দেখাবার সময় কোথাও যেতে নেই, সুরু করতে নেই কোন কাজ, দাঁড়াতে নেই ছাঁচতলায়। তেমনি পচামুখে বা সকালে উঠে মুখ ধোওয়ার আগে মিথ্যা কথা বলতে নেই। দীপাবলীর রাত্রে ইঁজয় পিজয়ের আগুনে হাত পা সেঁকে নিলে খোসপাঁচড়া হয়না। সাঁওতালদের মধ্যে সংস্কার আছে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরে ডাকলে ছেলে নাকি কালা হয়। তাই তারা পরস্পরকে ডাকে, ফলনার বাবা, ফলনার মা বলে। ভাসুর বা স্ত্রীর বড় বোনের নাম ধরে ডাকলে মরার পর পোড়াবার সময় নাকি পুড়তে চায় না। কেউ কারও নাম ধরে ডাকেন না।

সংস্কার ও আদিম ধর্ম বিশ্বাসের ফলে সাঁওতালদের মধ্যে ডানকো বা ডাইনীদের প্রতি অহেতুক ভীতি উদ্রিক্ত হয়েছে। হড়হপনদের বা সাঁওতালদের সুখদুঃখ, শুভঅশুভ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিচ্ছেদ, এমনকি খরা অতিবৃষ্টি ও সামাজিক সুশৃঙ্খলাভঙ্গের সমস্ত দায়দায়িত্বও ডানকোদের ওপর অর্পণ করা হয়। তারা জমা হয় রাত্রে, বনে বা মাঠে, ঝাঁটা পরে, ভাঙ্গা কুলো কাঁখে নিয়ে যায় জাহের থানে। সেখানে পুজো করে মুরগী, খিচুড়ি পিঠে তৈরি করে খায়।

প্রদীপ নিয়ে ঘোরে বাড়ি বাড়ি, সংগ্রহ করে শিষ্য। শিখিয়ে দেয় মন্ত্র ও ঝাড়নি গান। সিদ্ধাইয়ের প্রথম শর্ত থাকে বাবা কি দাদার অনিষ্ট, তাদের খাওয়া। কাটকম চারা বা এক রকম ঘাস দিয়ে খুঁটে ধার করে কলিজা, সিদ্ধ করে সেটা শিষ্যাদের প্রথম খাওয়ায়। স্ত্রীদের তাই পারিবারিক দেবতার নাম বলেন না সাঁওতালেরা। কে জানে কখন কোন স্ত্রী ডানকো হয়ে উঠবে, অনিষ্ট করবে সমস্ত পরিবারের। পরিবারের দেবতা বশীভূত হলে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সচেষ্ট হবেন না। তখন রক্ষা করবে কে!

ডানকোদের প্রতিষেধক ওঝাকো ও জানকো। বা ওঝা ও জান। কামরু গুরুর কাছে ডাইন, ওঝা ও জান তিনজনেই নাকি শিক্ষা নিয়েছিলেন। এখনও সেই শিক্ষা বাহিত হয়ে চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ওঝাদের কাজ হল ছ'টি : (১) খড়ি দেখা (২) চাল ছড়ান (৩) কামড়ান বা লণ্ডা করা (৪) দেবতা খোঁড়া (৫) দেবতা ছাড়া ও (৬) ওষুধ দেওয়া।

দুটো শাল পাতায় তেল মাখিয়ে ওঝা মন্ত্র পড়ে ঘষতে থাকেন। পাতার এক এক জায়গা ওঝা এক এক অপদেবতার জন্য অনুমান করে রাখেন। পাতার যে দিকে হিজিবিজি দাগ পড়ে সেখানকার অনুমিত অপদেবতাকে চিহ্নিত করেন ওঝা। সে অপদেবতা যদি জজম বঙ্গা বা জজম বুরু হন অর্থাৎ যারা মানুষ খান, চাল ছড়িয়ে তাদের ঝাঁখেড় বা মিনতি করা হয়। যেন তারা রোগীকে ছেড়ে দেন। যদি অপদেবতা ছাড়া দুঃখ বা বিষ অনুমিত হয়, ওষুধ খাওয়ান হয় আক্রান্ত ব্যক্তিকে।

দুঃখ বা বিষ নির্দিষ্ট করার জন্য ডাল পোঁতা হয়। একে বলে ঢাউরা বিং। ডাল দেখে অসুখ বা অপদেবতার প্রকৃতি সনাক্ত করেন ওঝা। ব্যবস্থাও নেওয়া হয় সেইমত।

ওঝার কাছে ভাল না হলে দরবার করা হয় জানদের কাছে। তারা সনাক্ত করেন কোন ডাইন তুক করেছে কিনা। ডাইন যদি তুক করে থাকে এবং তাকে যদি সনাক্ত করা যায়, তবে তার শাস্তি গ্রাম থেকে নির্বাসন বা মৃত্যু।

পাইল-পরব

উৎসব ও মেলা

মাদল বাজে বুকের মাঝে

সুরগুলো ফুটে লালে লাল

বহিরাবরণে পুরুলিয়া রুক্ষ, ঊষর ও কংকরময়। দারিদ্র্য দেহে, অনাহার ও অপুষ্টি অঙ্গসজ্জায়। বহিরাবরণের আড়ালে আনন্দ বিজড়িত অফুরন্ত প্রাণশক্তি ফল্গুনদীর মত সতত প্রবহমান। প্রকৃতপক্ষ সেই প্রাণশক্তিই বেঁচে থাকার অক্ষয় মন্ত্রটি দান করেছে। অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে সারা বছর ধরে ছড়ানো পাইল পরব, উৎসব ও মেলার মধ্যে। আনন্দ ছাড়াও উৎসবগুলির মধ্যে নিহিত থাকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সূত্র। সামাজিক ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বীজ।

উৎসবগুলি স্বতোৎসারিত ও প্রাচীন। বসতি ও মানুষের আগ্রহের সঙ্গে স্থান বদল করেছে কোথাও কোথাও। রূপান্তরিতও হয়েছে কিছু। তবু মূল কাঠামো, অন্তর্নিহিত শক্তি, তেজ ও সাঙ্গীকরণের ক্ষমতায় দুর্বল হয়নি।

১. শিবের গাজন—পুরুলিয়া জেলায় শিবের গাজনকে বলা হয় গাঁয়ের পরব। নামের মধ্যেই জনপ্রিয়তার ইংগিতটি নিহিত। গাঁয়ের পরব ছাড়াও আরও নানা নামে চিহ্নিত হয় উৎসবটি। যথা, ভগতা পরব, চৈত পরব, কুঁড়া-ফেলা, ছো পরব, আম-খাওয়া পরব, চড়ক পূজো ইত্যাদি।

জেলায় উৎসবটি সুরু হয় প্রধানত চৈত্র সংক্রান্তি থেকে। সেজন্য বলা হয় চৈত পরব। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সুরু করে সারা বৈশাখ মাস ধরে চলে

অনুষ্ঠান। বৈশাখ ছাড়িয়ে জ্যৈষ্ঠে গিয়েও পড়ে।[১] চারদিন ধরে চলে অনুষ্ঠান। পৃথক পৃথক নাম আছে অনুষ্ঠানগুলির। যেমন, ফলার, জাগরণ, ভগতাঘুরা ও তেলহলদা।

গাজনের দশ থেকে পনের দিন আগে থেকে ডোমেরা ধুমল বা শিবকে জাগাবার জন্য বাজনা বাজাতে সুরু করেন। ফলার আসলে প্রস্তুতির দিন। ভগতারা চুল নখ কেটে, এক বেলা খেয়ে শরীর মন উৎসবের উপযোগী করে নেন। পবিত্র হয়ে নেন অন্তরে ও বাহিরে। সে দিনই সারা বছর পুকুরে ডোবান টেঁড়া ডাঙ্গ তুলে আনেন। নিজেদের গোত্র থেকে অনুপ্রবিষ্ট হন দেবগোত্রে। জাগরণের দিন পাটনী পাট বা শিবের প্রতীক কাঠের পাটা নিয়ে যান বাড়ি বাড়ি। তুলসী তলায় পাটা নামিয়ে জ্বাল দেওয়া হয় দুধে। তখন পা ঢেকে রাখা হয়। সন্ধ্যের আগে স্নান সেরে মেয়ে ভগতারা কেউ লটন বা দণ্ডি কেটে, কেউ পায়ে হেঁটে মন্দিরে এসে ওঠেন। নতুন ভগতাদের বেত গরম করে সেঁকা দেন পুরোহিত। একে বলে এ্যাঁড়া দাগা।

পুরুষ ও নারী ভগতারা (পার্বতী বলে কোথাও) মন্দিরে এলে পুরোহিত সবাইকে সেমজল বা শান্তিবারি ছিটিয়ে দেন। ভগতারা জাগর বা ঘিয়ের প্রদীপ ও ফুলঘরা বা কাগজের ফুল দেন। জাগর দেওয়া হয়ে গেলে নেচে নেচে শিবের মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে ভাঙ্গা হয় লংকাগড় বা বালির ঢিবি। ডিগবাজি খেয়ে ভেঙ্গে ফেলতে হয় সেটা। তৃতীয় প্রহরে হয় ফুলখেলা বা আগুন ছোঁড়াছুড়ি।

জাগরণে নানা রকম নাচগান চলে সারারাত। তাদের মধ্যে প্রধান ছো নাচ, নাটুয়া ও ঝুমুর। পরের দিন ভগতা ঘোরা। বড় আকর্ষণ। সকালে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখা হয়; ভগতা গাছ. চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু সোজা লম্বা শাল খুঁটি; টেঁড়া ডাঙ্গ, আড়াআড়ি বাঁধা লম্বা কাঠ, তাতে বাঁধা থাকেন ভগতা; চারমাচা বা মাচান; চরখি, যাতে ভগতা ঘোরেন; ফাভড়ি, ভগতার বিপরীত দিকে বাঁধা কাঠ; বরহি মোটা শনের দড়ি; কালবুদি ধারাল ফলা, কামার যেটি ভগতার গায়ে ফুটিয়ে দেন। ভগতা-ফোঁড়া দেখতে যারা দাঁড়িয়ে থাকেন, গান ধরেন,

---

১, বৌদ্ধ পূর্ণিমাতেও কোথাও কোথাও শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, কেতকা, রাঙ্গামাটি, ভুতাম, গেঙ্গাড়া প্রভৃতি। পুরুলিয়ায় শিবের গাজন সম্বন্ধে ছত্রা পত্রিকায় শ্রীসুন্টিধর মাহাত, সিরাজুল হক ও নিমাই ওঝা মূল্যবান আলোচনা করেছেন। শিব-গাজনের মূল বিষয় সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য। পুরুলিয়া জেলার গাজনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিই এখানে আলোচিত হয়েছে।

সাজ বাজ ক'রে ভগতা ঘাটে দাঁড়ালি
জানবি রে ভগতা যখন ফুড়াবি।

সে গানের সঙ্গে ভগতারাও সুর মেলান। বাজনা বাজে, ডে ডে ডেংটি; ডে ডে ডেং টি; উর, ডে ডে ডেং, ডে ডে ডেংটি ডে। গান ও বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ভগতারা উদ্দামভাবে নাচতে থাকেন।

চড়ক ঘোরার সময় গামছায় বাঁধা মিঠাই ও পয়সা দর্শকদের মধ্যে ছড়ান হয়। পায়ে বাঁধা ঘুঙুর বাজতে থাকে। হাঁক দিয়ে ভগতা বলেন, বুধপুরের বুদ্ধেশ্বর, আনাড়ার বানেশ্বর, চিড়কার গৈরীনাথ ইত্যাদি। দর্শকেরা জয়ধ্বনি দেন।

বিকেলে পরব টাঁড়ে মেলা বসে। সেখানে বিক্রি হয় চুড়ি, শাখা, রং ফিতে, কাঁটা, পাউডার, ফুল, বাঁশি, টরটরি, মিঠাই, তরমুজ ইত্যাদি। সাঁওতালদের নাচ সুরু হয়। হিড়িক পড়ে যায় ফুল বা বন্ধুত্ব পাতানোর।

চতুর্থ দিনে তেল হলদা। ফোঁড়ের চারদিকে সিন্দুর লাগিয়ে দেওয়া হয়। মেযেদের ছোঁয়া নিষেধ, ছুঁলে দেরী হয় ক্ষত সারতে। খুলে দেওয়া হয় সুতরি, ভগতারা নিজেদের গোত্রে ফিরে যান। সেদিনেও থাকে মেলা।

জেলায় শিব ও গাজন উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম দর্দা, উলুবেরিয়া, আনাড়া, মনতুমড়া, জামবাদ, ভরতডিহা, দেউলিহারুপ, বান্দোয়ান, কুইলাপাল, কেঁদাপাড়া, তুলিন, বড়রা, বুধপুর, ঘাগরজুড়ি ইত্যাদি। জেলার মধ্যে শিবপুজো সবচেয়ে আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তুলিনে। প্রায় এক লক্ষ্য লোক সেখানে সমবেত হন।

২. *অযোধ্যা পাহাড়ের দিসুম সেন্দ্রা*—দিসম সেন্দ্রা অর্থাৎ দেশ শিকার। সিংভূম জেলার গা ছুঁয়ে, পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে বাগমুন্ডি থানা। থানার পূর্বপ্রান্তে সুদৃঢ় প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে অযোধ্যা পাহাড়। সাঁওতালদের কাছে অযোধিয়া বুরু। বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে অযোধিয়া বুরুতে আয়োজিত হয় বিরাট শিকার উৎসব। উৎসবটি সাঁওতালদের কাছে বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতীক। কারও কারও মতে বীর কিশোরদের যৌবনে পদার্পণের দীক্ষা ক্ষেত্রও। প্রবাদ আছে, 'যে মরদ অযোধ্যা শিকারে যায়নি, সে মায়ের পেটেই রয়ে গেছে।'

প্রস্তুতি সুরু হয় বেশ কিছুদিন আগে থেকে। পাতা পরবের সময় দিহরী ডাল নিয়ে ঘোরেন। লোকে জিগেস করে, কিসের ঢারওয়াঃ তোমার? দিহরী বনের নাম জানিয়ে দেন, রাত্রের থাকার জায়গার কথাও বলেন। কোথাও দুটি আমপাতার সাহায্যেও জানান হয় নিমন্ত্রণ। সুরু হয় ধনুকে ছিলা পরানো,

ফলা আর ঠুঁটি পরানো শরে, শান দিয়ে ছুচলো করা হয় ফলা, শান দিয়ে বেঁট পরান হয় টাঙ্গিতে, লাঠিতে পরান হয় বল্লম, ঝকঝক করে তলোয়ার।

মেয়েরা তৈরী করেন মহুলের মোয়া, মাঝির জন্য 'মান্ডলা' অর্থাৎ পাঁচ পাই চাল ও এক পোটলা মহুয়া, পাঁচজনে খাবেন। দাকা পটম বা ভাতের পোঁটলা, উড়ু পটম বা তরকারীর পোঁটলা, উল পটম বা আম পোড়ার পোঁটলাও তৈরি হয়।

বেজে ওঠে রেগড়া টামাক। নাগরা বাজে 'ডুবু ডুবু', বাঁশি বাজে 'শড়ং শড়ং', শিঙা বাজে 'তুতু তুতু', হাঁক পড়ে 'ঢুপ্‌ঢুপ' চলো, অর্থাৎ যে জায়গায় জড়ো হয়ে সবাই শিকারে যাবার জন্য যাত্রা করেন। সমবেত স্বরে শোনা যায় গান,

জংলি মোরগ ডাকছে দূরে সিংবিরে
মানবিরের গভীর বনে কেকাধ্বনি
অযোধিয়া কাঁপছে যেন ঢেঁকির পাড়
রেগড়া টামাক বাজছে কেন বাজছে কেন আজ![২]

নানা জায়গা থেকে আসেন সাঁওতালেরা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ, সিংভূম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি। কাছাকাছি স্টেশন উরমা, কাঁটাডি, বরাভূম বা পুরুলিয়া। পুরুলিয়ায় নামলে আবার আসছে হয় বাসে।

পুরুষেরা শিকারে বেরিয়ে গেলে মেয়েরা দিন গুনতে থাকেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত কাচা হয়না জামাকাপড়, সিঁথিতে পড়েনা সিন্দুর, চিরুনি দেওয়া হয়না মাথায়। জলভরা পিতলের কলস ঘরের ভেতর এনে রাখেন দিহুরী। শিকারের আগেকার রাত্রে জল ভরে দুটো কাঁচ শালগাছের ডাল ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ভোরবেলায় দেখা হয় তাজা আছে কিনা ডালগুলো। ডাল যদি তাজা ও সবুজ থাকে শিকার শুভ, জল ঘোলা হয়ে উঠলে ঘোষিত হয় ছোট প্রাণী বা পাখি মারার সংবাদ। লাল হলে বাঘ, ভালুক বা বুনোশুওর শিকারের প্রতি ইংগিত ক'রে।

শিকারে জন্তু বা পাখি মারা পড়লে কিভাবে ভাগ হবে, নির্দিষ্ট বিধি আছে। বিপদ ঘটলে বাজনাওয়ালা তিনবার ঘুড়ি বা ঘণ্টা পিটবে। বিপদ-স্থানে এসে

২. সিংবিররে সিম কোয়াককে / মানবিররে মারাক হিঁয়োকে / অয়োধিয়ারে ঢেঁকী লাড়্‌'রেন / চেতেরেনা রেগড়া টামাক / দগো আয়োগো, সাড়ে কান দো।—দিসুম সেন্দরার বোঁকল মেলা—পশুপতিপ্রসাদ মাহাত, অমৃত, ১৪. ৭. ১৯৭৮।

জমা হন শিকারীরা। শিকারে পিছু হাঁটা চলেনা, তাই বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। আগে শিকার হত পাঁচ দিন, এখন জঙ্গল উৎসন্ন, বন্যপ্রাণী নিঃশেষিত, শিকার হয় মাত্র একদিন। শিকারে ফুলাহি চড়ুপ বা বিচার সভাও বসে। যেসব বিরোধ অমীমাংসিত থাকে গ্রামে বা গ্রামে গ্রামে যেসব বিরোধ, সেসব বিরোধের নিষ্পত্তি হয় শিকার সভায়। দিহরী হন বিচারক।

শিকার শেষ হলে নিজের নিজের আড্ডায় ফিরে আসেন শিকারীরা। আড্ডাগুলি যেখানে বসে সে জায়গার নাম সীতাচাটান। ক্ষীণধারার ছোট একটি ঝরণা আছে সেখানে, নাম সীতাকুণ্ড। চাটানের ঘন গাছে চুলের মত কালো কালো শিকড় দেখা যায়। শিকারীরা তা সংগ্রহ করেন। বিশ্বাস, এসব সীতাদেবীর চুল, প্রেমিকার খোঁপায় দিলে ঘন ও কালো হয় চুল। প্রবাদ আছে, রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবী নাকি বনবাসকালে এখানে ক'দিন কাটিয়েছিলেন। চুলের মত চাঁপা ফুলও সংগ্রহ করেন শিকারীরা।

আড্ডা বা আখড়ায় আখড়ায় নাচ গান হয়। আলাদা ও সমবেতভাবে নাটক ও নাটকের প্রতিযোগিতাও চলে। ফুল-পাতানো বা বন্ধুত্ব হয় দলে দলে। গৃহে ফিরলে থালায় রেখে শিকারীদের পা ধুইয়ে দেন মেয়েরা, আঁচল পেতে নেন চাঁপা ফুল, গোয়ালঘর বা পবিত্রস্থানে রেখে দেন ফুলগুলি।

৩. ধর্মঠাকুরের পূজা ও মেলা—বিভিন্ন চেহারা ও আকৃতিতে জেলায় ধর্মরাজের মূর্তি বিদ্যমান। ছড়রায় ধর্মঠাকুরের স্থান আয়তাকার একটি ক্ষেত্র, তাতে আমলক ও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের টুকরো সাজান। মানবাজারের বাবপাড়ায় ধর্মঠাকুরের থান আছে, মূর্তি পিতলের, আকৃতি কূর্ম। কূর্মের চারটি পা, পিঠে দুটি পায়ের ছাপ খোদাই করা, মূর্তিটির তিনদিকে পনেরটি শিলামূর্তি সাজান। শাঁকা গ্রামে ধর্মরাজতলা বটগাছের নিচে, গাজন হয় বৈশাখে, তখন পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। আজকোদায় ধর্মঠাকুর থাকেন গোলাকার একটি কৌটোর মধ্যে। তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় যেসব গ্রামে সংখ্যা গরিষ্ঠ, ধর্মঠাকুরের প্রভাব প্রধানত সেইসব গ্রামগুলিতে দেখা যায়। পুরোহিতেরা পণ্ডিত উপাধিধারী। জাতিতে কেউ ডোম, কেউ বাউরি, কেউ বা কোয়ালি ইত্যাদি।

জেলায় অধিকাংশ প্রাচীন গ্রামগুলিতে ধর্মঠাকুরের অধিষ্ঠান লক্ষণীয়। এইসব গ্রামগুলিতে জৈন মূর্তির প্রাচুর্যও কম নয়। ধর্মঠাকুরের পূজা ও মেলাগুলি অধিকাংশ স্থানেই হয় বৈশাখে। বড় বড় মেলাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাড়া, পঞ্চকোট, গাগুনাবাদ ধানোসাড়ি প্রভৃতি। পাড়ায় মেলাটিই

জেলায় ধর্মের মেলাগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখে, জনসমাবেশ ঘটে তিরিশ হাজারের ওপর। দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা বসে নেতুরিয়া থানার অন্তর্গত পঞ্চকোটে, সময় চৈত্র মাস, জনসমাবেশ হয় প্রায় আট হাজার।

বৈশাখে অন্যান্য পুজো ও উৎসরের মধ্যে ডোমদের কালুবীরের পুজোটিও উল্লেখযোগ্য। পুজো হয় জঙ্গলে। কোথাও কোথাও জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিনে ডোমেরা ধর্মরাজের পুজো করেন।

৪. রহিন উৎসব—জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে জেলায় রহিন উৎসব পালন করা হয়। 'বীচ পুহ্' বা বীজ বপন হয় সেদিন। চাষী পরিবারগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে উদযাপন করেন দিনটি। অক্ষয় তৃতীয়া বীচ—পুহার প্রথম দিন, কিন্তু সেদিন বীজ বপনে তেমন সাড়া পড়েনা। কৃষকদের বিশ্বাস, রহিনে বীজ বপিত হলে পোকা লাগেনা চারায়, ব্যাহত হয়না বেড়ে ওঠা, বীজগুলি হয় সুপুষ্ট, শস্য হয় প্রচুর।

রহিন আসলে রোহিনী নক্ষত্র। বিশ্বাস, সেদিন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ে নক্ষত্রটি। কৃষিকাজের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠে সময়, ব্যাপ্তি থাকে সাত দিন। তেরো থেকে উনিশ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম ভারতীয় বিশ্বাসে কৃষিদেবতা। তার নামও হল বলরাম, প্রতীক বা আয়ুধ লাঙ্গল। বলরামের মায়ের নাম রোহিনী। হয়ত রোহিনী নক্ষত্রের প্রভাব এবং বলরামের মাতা কৃষি কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিশ্বাসটির জন্ম দিয়েছে।

ভোরে মেয়েরা ঘর উঠন গোবর জলে নিকিয়ে ফেলেন। গবর গোলা জলে লতাপাতা ডুবিয়ে আঁক দেন। সে আঁক বা রেখা ডিঙ্গিয়ে অশুভ শক্তি গৃহে প্রবেশ করতে পারেনা। ক্ষেত থেকে রহিণ মাটি আনার জন্য নতুন ঝুড়ি নিতে হয়। স্নান সেরে, ভিজে কাপড়ে মাটি আনাই বিধি, তখন কথা বলা চলেনা, দাঁত দেখানো নিষিদ্ধ। মাটি রাখা হয় ঘরের চারকোনে ও তুলসী মঞ্চে। গৃহস্বামী সংগ্রহ করেন রোহিণ ফল বা কেলেকড়া। যে বাড়িতে আয় বেশি খরচ কম সে বাড়ির লোককে দিয়ে বীচ পুহা করাতে হয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছেঁড়া কাপড় রঙ কালি মেখে বানর ভালুক প্রভৃতি সাজে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপ দেখায়। আদায় করে চাল ও পয়সা। গিন্নীরা দেন ছোলাভাজা, গুড়, ফুটি, তরমুজ, পাকা খেজুর ইত্যাদি। ছেলেরা ভালুক নাচতে নাচতে গান গায়,

আঁড়ে আঁড়ে যায় ভালুকা ভুকু কুড়ে খায়
ভুকু তুকু নাই পায়ত ভুকুলিয়াকে খায়।

ভালুকে নুন কুথা পায় ভালুকে তেল কুথা পায় ?
আঁওলা বাঁওলা খাএে ভালুকা বনকে পালাএ যায় ।[৩]

জ্যৈষ্ঠ মাসে মেয়েদের ব্রত পালিত হয় জেলায় সাধারণত দুটি। মঙ্গলবার ব্রত ও অরণ্য ষষ্ঠী। অরণ্য ষষ্ঠীই আসলে জামাই ষষ্ঠি। পুরুলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে অরণ্য ষষ্ঠীতে জামাই আদরের ঘটা নেই তেমন, সন্তানদের মঙ্গলকামনায় ব্রতটি পালিত হয়। দুটি বড় মেলা বসে জ্যৈষ্ঠে। বাগমুণ্ডি থানার দেউলিহারূপে মেলা হয় এড়ুনাথ ও নাংটিঠাকুরাণীর পূজো উপলক্ষ্যে, আড়সা থানার পটুযাড়ায় মেলা হয় শিবপূজো উপলক্ষ্যে।

৫. এরঃক সিম ও বাটাউলি—বৎসরে সাঁওতালদের প্রথম উৎসব এরঃক সিম। পূজো হয় বীজ ফেলার নামে। প্রকৃতপক্ষে এটি সাঁওতালদের বীচ পুহা, জ্যৈষ্ঠের বদলে অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ়ে। ঘরে ঘরে বলি দেওয়া হয় মুরগি। মন্ত্র, 'এই যে বীজ বোনবার নামে দিচ্ছি, এক জায়গায় বুনলে যেন দশ জায়গায় হয়। জল যেন খুব হয়। বৃষ্টির জলে ভরিযে যেন নিযে যায় গ্রামের মধ্যে দুঃখের পাপের অসুখ বিসুখ'।[৪] নায়কের পূজো শেষ হলে মুরগিগুলি দিয়ে খিচুড়ি রান্না হয়, খান গ্রামের সমস্ত পুরুষেরা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে পূজো করা হয় আবগে বঙ্গা ও পূর্ব পুরুষদের, সেইসঙ্গে মারাং বুরু ও পূজো পান।

সাঁওতালদের মত মুণ্ডাদের মধ্যে বর্ষা উৎসব পালিত হয় আষাঢ়ে। নাম কদলেতা বা বাটাউলি। প্রতিটি চাষী কদলেতাকে মুরগি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গীকৃত মুরগির একটি ডানা কেটে বাঁশের চোঙার মধ্যে ঢুকিয়ে পাঁতে দেন ক্ষেতে, বা গোবর গাদায়। বিশ্বাস, এটি না করলে ধানে থোড় আসেনা।

মেয়েলি ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে আষাঢ়ে পালিত হয় দুটি। অম্বুবাচী ও বিপত্তারিনীর ব্রত। অম্বুবাচীতে ধারিত্রী ঋতুমতী হন বলে বিশ্বাস। ফলে ব্রতটি নানা বিধি নিষেধের সঙ্গে পালনীয়। আষাঢ়ে সবচেয়ে বড় উৎসব রথযাত্রা। উৎসটি যদিও বৈষ্ণবদের উৎসব হিসাবে চিহ্নিত, সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষেরাই উৎসবটিতে যোগ দেন। জেলায় রথযাত্রা উৎসবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলরামপুর ও বন্দোয়ানের রথযাত্রা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দুটি স্থানেই মেলা হয়। বলরামপুরের মেলাটি বৃহৎ, জনসমাগম হয় পঞ্চাশ

৩. ভুকু-উইপোকা, ভুরুলিযা—এক রকম গাছের শিকড়।

৪. "নে তবে এর'ক সিম এতুমতে এমাম্‌ চালাম কানা, মিৎ ঠেনলে এরা, গেল বার ঠেন কানাইরঃ মুনাইরঃ মা স্বারগে দাঃ জুঁড দাঃক হোএ আগু, চাপে আগুই মার নিরা আতোরেমানহরে দুকাঃক পাপাঃক রগ বিষনাঃ।'

হাজারের কাছাকাছি। বান্দোয়ানের মেলাটিও ছোট নয়, লোক হয় কুড়ি হাজারের কাছাকাছি। অম্বুবাচীর মেলা হয় রঘুনাথপুর থানার জুরাডা গ্রামে।

৬. মনসা পূজা—ধর্মঠাকুর ও মনসার সহাবস্থান দেখা যায় বাঁকুড়া জেলায়। তাদের প্রভাবও গভীর এবং ব্যাপক। পুরুলিয়া জেলায় মনসার জনপ্রিয়তা অতখানি না থাকলেও একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। পুরুলিযাব তিন রূপে পূজিত হন মনসা। প্রতিমা, বারি ঘট ও সিজমনসার ডাল। প্রতিমা আসলে মনসামেড়। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে পূজিত হন দেবী। রাত্রে পুকুর থেকে আনা হয় বারি। পূজারী মাথায় থাকে বারিঘট, থাকেন পুরোভাগে। পেছনে সারি বেঁধে চলেন নারী ও পুরুষ, মাথায় বড় বড় ধুনুচি। ধুনুচিতে দেওয়া হয় ধুনো ও গুগ্গুল, মানতকারীরা বহন করেন ধুনুচি। প্রতিষ্ঠিত হয় বারিঘট, পূজো হয়। পূজান্তে বলিদান। আঁখ, চালকুমড়ো, হাঁস, মুরগি, এমনকি মানত থাকলে পাঁঠাও বাদ যায়না।

মনসানেড় রাখা হয় সারা ভাদ্র মাস। প্রতিরাতে জাত গানের আসর বসে। মনসামঙ্গল কাব্যই গাওয়া হয় সুর ক'রে। যেমন,

ঢাই গুড় গুড় বাজনা বাজে কন গায়ের ঘর
চাঁদ সদাগরের বেটা ভালাই লখিন্দর।
ঢাই গুড় গুড় বাজনা বাজে নিছনি নগরে
চাঁদ বান্যার বেটার বিয়া সায় বান্যার ঘরে ।।

শ্রাবণ সংক্রান্তির আগের রাত্রে মনসার জাগরণ, সারারাত গাওয়া হয় জাত গান। শ্রাবনের এক শুভ দিনে 'খৈ ঢ্যরা' পালন করা হয় কোন কোন গৃহস্থ বাড়িতে, পূজিত হয় সিজ মনসার ডাল। সেদিন অরন্ধন। বাগদীরা মনসার পূজো করেন নাগপঞ্চমীতে।

রহিন দিনে শিষ্যদের সর্পবিদ্যার পাঠ দেন গুনিনেরা। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মেলা বসে অনেক জায়গায়। এক বা দুদিনের মেলা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আড়সা থানার পলপল, বাগমুণ্ডি থানার বারড়িয়া, বলরামপুর থানার রাপকাটা ও বেলা, জয়পুর থানার টানাসি, মানবাজার থানার পিড়ারগড়িয়া, পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার নড়রা রঘুনাথপুর থানার জুরাডা ইত্যাদি।

শ্রাবনে লোটন বা লুন্ঠন ষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয় গৃহস্থ বাড়িতে। ব্রতটি পালন করেন মেয়েরা। জীহড় ষষ্ঠীর গাছ একধরণের ক্যাকটাস। পূজোর উপকরণ আতপচাল, গুড়পিঠে ও ছোট ছোট ক্ষীরের নাড়ু। নাড়ু

থাকে নটি, নাম লোটন। গোবর মাখিয়ে গৃহিনী নাড়ুগুলি মাটিতে ফেলে দেন চুলের সাহায্যে শালপাতার থালায় তুলে ফেলেন; একে বলে লোটন তোলা। সন্তানদের মঙ্গল কামনার ব্রত এটি। কুমোরেরা শ্রাবণে করেন কুণ্ডর দেবতার পূজো

৭. করম পরব ও জাওয়া—ধান রোপা শেষ হয়ে গেলে কিছুকালের জন্য অবকাশ জোটে চাষী পরিবারে। নানা উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে গ্রামের জীবন। অধিকাংশ উৎসবই কৃষিকেন্দ্রিক। করম বা জাওয়া ছিল প্রধানত ভূমিজদের উৎসব। ধীরে ধীরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও অনুষ্ঠানটিকে আপন করে নিয়েছেন। বর্তমানে ভূমিজ, কুর্মী, সাঁওতাল, বাউরি, ভূঁইয়া, হাড়ি, ঘাসি, মাহালি প্রভৃতি উৎসবটি নানাভাবে পালন করে থাকেন।

ভাদ্রে শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠেন ধরিত্রী। ধানের গর্ভবতী হবার সময়। সাঁওতালেরা পালন করেন হাড়িয়ড় সিম, বলি দেওয়া মুরগি, উৎসর্গ করা হয় খড়ি ও গুন্দলি। ছাই রঙের মেঘের আড়াল থেকে অকস্মাৎ নেমে আসে বৃষ্টি। আদুরে গলায় গৃহবধূ গেয়ে ওঠেন,

> ছাতা ধর ধররে দেওরা
> অঙ্গে কা পাটশাড়ী ভিজ গেলা।

নেচে ওঠে কিশোরীদের মন। অবিবাহিত মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা করম পরবে। পরবের প্রায় দিন দশেক আগে থেকে প্রতি সন্ধ্যায় কুলিতে বা গ্রামের পথে ও আখড়ায় মিলিত হন মেয়েরা, হাত ধরাধরি করে, গায়ে গা ঠেকিয়ে মৃদুতালে সুরু করেন নাচ।

> সাঁঝে ফুটে ঝিঙাফুল সকালে মলিন
> আজ কেনে বঁধুর বদন মলিন হে?

'জাওয়া' করম পরবের প্রধান অঙ্গ। ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথি বা পার্শ্ব একাদশীর দিন হয় আসল উৎসব। একাদশীর পাঁচ কি সাতদিন আগে মেয়েরা ছোট জোড় বা নদী, হিড় বা বাঁধে কিংবা পুকুরে বাঁশ দিয়ে বোনা ছোট টুপা এবং একটি বড় ডালা নিয়ে যান। সরু বালি দিয়ে গলা সমান ভর্তি করা হয় টুপা ও ডালা। তেল হলুদ দিয়ে মাখান হয় মটর, জুনার, মুগ, বুট ও কুর্থির বীজ। বারো কি তেরো বছরের কুমারী মেয়েরা স্নান করে ভিজে কাপড়ে ছোট শালপাতার থালা বা খালায় বুনে দেন বীজগুলি। খালার ভেতরে সিঁদুর ও কাজলের তিনটি দাগ টানা হয়। এর নাম 'বাগাল জাওয়া।'

খালায় বীজ বোনা শেষ হয়ে গেলে বোনা হয় ডালায়। ডালার জাওয়া

প্রকৃত জাওয়া। তিন, পাঁচ বা সাতজন কুমারী ছড়িয়ে দেন বীজ। এদের বলা হয় 'জাওয়ার মা।' প্রত্যেকের জাওয়া চিহ্নিত করার জন্য ভুজনকাঠি বা কাশকাঠি পুঁতে দেওয়া হয়। জাওয়ার মায়েরা লক্ষ্য রাখেন নিজেদের জাওয়ার দিকে। পান্তা বা বাসি ও আমিষ ভোজন এসময় নিষিদ্ধ। চিরুনিও দেওয়া হয়না মাথায়।

টুপার জাওয়া বোনা হয়ে গেলে কুমারীরা গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকেন।

উত্তরে বুনলম মাইগো পশ্চিমে বুনলম গো
পাওলম জাওয়া তৈরী হার।

বাগাল জাওয়াটি লুকিয়ে রেখে অন্যান্য জাওয়াগুলি নিয়ে গ্রামের আখড়ায় ফিরে আসেন কুমারীরা। কোথাও কোথাও কুমারীদের বলা হয় পার্বতী। দিন গড়িয়ে চলে, কুমারীরা লক্ষ্য রাখেন অংকুর দেখা দিল কিনা জাওয়ায়। উপোসের আগের দিন মজুত। দিনের স্নান সেরে তিন বা পাঁচটি ঝিঙাপাতা উলটো করে বিছিয়ে নেওয়া হয়। প্রতি পাতায় বসান হয় একটি করে দাঁতনকাঠি। রাত্রে তৈরি হয় চালগুঁড়ির পিঠে। ঘরের চালে সাজিয়ে দেওয়া হয় পিঠে। একে বলে চালসিয়া। পরদিন উপোস।

ভোরে জাগান হয় জাওয়া। গোবর দিয়ে সাফসুতরো করা হয় আখড়া। আলপনা দেওয়া হয়। দেয়ালে সিন্দুরের দাগ টেনে কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়, নিচে রাখা হয় ফুলের ডালা ও প্রদীপ। বিবাহিত মেয়েরা নৈহর বা বাপের বাড়ি যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন,

দিনা 'চারই সঁয়া যাব ত নৈহর গো—দিনা চারই
পড়ল ভাদর মাস লাগিল নৈহরের আশ
দিনাচারই সঁয়া যাব ত নৈহর গো…

যারা শ্বশুর বাড়ি থাকেন তাদের জ্বালা কম নয়। নাচগানে অংশ নিতে গিয়ে দেখা দেয় বিপত্তি।

এক দুয়ারে শ্বশুর শুয়ে এক দুয়ারে ভাসুর শুয়ে
পায়ের নূপুর বাজে রুম ঝুম ঝুম
কৈসে বাহির হবরে।

বধূদের নতুন ডালা ও নতুন শাড়ী জামা পেঁাছে দেয় শ্বশুর বাড়ি থেকে। একে বলে 'কর মজলা' পেঁাছান।

উপোসী মেয়েরা বনে বনে ফুল তুলতে যান। গানের ছন্দে চলে

গালিগালাজ ও খিস্তি। ছেলেরা দলবেঁধে ছাতাডাল নিয়ে আসেন। ছাতাডাল আসলে শালডাল। গড়াইত একটি করমডাল কেটে এনে লায়ার বাড়ির সামনে পঁুতে দেন। এটি হয় করম গোঁসাই বা করম ঠাকুর। দিনরাত গড়াইত সেটি পাহারা দেন। সন্ধ্যার পরে হয় করম পুজো। পুজো শেষে সামান্য বিশ্রামের পর আখড়ার করমতলায় জাওয়ার ডাল নিয়ে যান মেয়েরা। সুরু হয় নাচগান। চলে সারারাত। পরদিন সকালে বেলা সাতটা নাগাত বিসর্জন দেওয়া হয় জাওয়া। অর্থাৎ অংকুরিত বীজগুলি উপড়ে ফেলা হয়, নিজেদের ভেতর ভাগাভাগি করে নেন মেয়েরা। ঘরের চালে, বাড়িতে, লতাপাতার ওপর সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। করম ডালটি ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে। বিষন্ন সুরে মেয়েরা গাইতে থাকেন,

কাইলরে করম গোঁসাই ঘারে দুয়ারে
আজরে করম গোঁসাই কাঁশিনদী পারে।

৮. ইঁদ ও চাকলতোড়ের ছাতা পরব—ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীতে করব পরব, দ্বাদশীতে ইঁদ। করম ও জাওয়া জনতার উৎসব, ইঁদ পরবের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং রাজা। পুরুলিয়া জেলায় বরাবাজারের ইঁদ এবং চাকলতোড় ও বোঙ্গাবাড়িতে ছাতা পরব প্রসিদ্ধ। রাজা ছাড়াও বড় বড় ভূস্বামীরাও উৎসবটি পালন করতেন। এখনও কোথাও কোথাও পালন করে থাকেন। রাজা পালন করতেন ইঁদ, ভূস্বামীরা পালন করেন ছাতা পরব। ইঁদে জাঁকজমক ছিল বেশী। পরবের কদিন আগে সপারিষদ রাজা বেরুতেন শিকারে, বাছাই করতেন ইন্দ্রদণ্ড বা ইঁদ-ডাং করার মত উপযুক্ত গাছ। পুজো করার পর কুড়ুল দিয়ে রাজা আগে আঘাত করতেন গাছটিকে। পরিষদেরা পরে সেটি কেটে এনে তুলতেন ইঁদটাড়ে। সাধারণত গাছটি হত দীর্ঘ ও ঋজু শালবৃক্ষ। ইঁদ-ডাণ্ডের মাথায় বাঁধা হত কাপড় দিয়ে মোড়া বাঁশের ছাতা। পরবের দিনে ছাতাসহ দণ্ডটি উত্তোলিত করতেন রাজা। সমবেত সুরে গান হত,

রাজার বিটির ইঁদ আর হামদের জাওয়া গো
ডেগে ডেগে পঞ্চডেগে উঠে রাজার ইঁদ গো
কে কে যাবে ইঁদ দেখতে হামরা দিব কাঁড়ি গো
ডেগে ডেকে পঞ্চডেগে উঠে রাজার ইঁদ গো।

ইঁদপরব আসলে ছিল স্থানীয় রাজার আধিপত্য ও প্রভুত্ব ঘোষণার উৎসব। কৃষিবর্ষের প্রারম্ভ সূচিত করতেন রাজা। মল্লরাজ্যে এটিকে বলা হত সনপোটা, বরাবাজারে সুনিয়া। সম্ভাব্য কৃষিকাজ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন রাজা, বেঁধে

দিতেন খাজনা। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও পণ্যের দামও নির্দিষ্ট হয়ে যেত।

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার ভেতর চাকলতোড়, টামনা স্টেশন থেকে কাছে। ভাদ্র মাসের শেষ দিনটিতে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় ছাতা পরব। মেলা বসে একদিনের। প্রসিদ্ধ মেলা। লোকে ছড়া কেটে বলেন,

জয়পুরের রাসপূর্ণিমা, বরাবাজারের ইঁদরে
কাশীপুরের দুর্গাপুজো, চাকলতোড়ের ছাতারে।

চাকলতোড় রাজপরিবারের নামেমাত্র রাজা লাল সাহেব উত্তোলন করেন ছাতা। পালকি চেপে যান ছাতাটাঁড়ে। উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে দর্শন দেন স্থানীয় মানুষদের। মেলায় যারা আসেন তাদের অধিকাংশ সাঁওতাল। সিংহভাগ রমনী। সাঁওতাল সমাজের লৌকিক প্রথা অনুসারে পুরুষদের অন্তত একবার যেতে হয় অযোধিয়ার শিকার পরবে, নারীদের চাকলতোড়ের ছাতা পরবে।

রাতভোর চলে নাচ গান। মাথায় গোঁজা ফুল, পরনে মোটা শাড়ী, অবিশ্রান্ত স্রোতের মত সুরের প্রবাহ চলে, ঢেউয়ের মত ওঠানামা করে, ভাঙে। মাঝে মাঝে পুরুষেরা নাচতে নাচতে লাফিয়ে ওঠেন,-হুর-র-র, লিহোই লিহোই। মেয়েরা গান,

তুমদা দুহলাও, বানাম রাহুলাও
ধমসা হুদড়াও নওয়া জীবন আধবাম
এাম—আঁ—আঁ।

বাজুক বাঁশি, মাদল ও ধামসা, এই রঙিন দিন আর ফিরবে না।

চাকলতোড়ে মেলার বৈশিষ্ট্য বড় বড় ধামসার বেচাকেনা। ঢাঁই করে থাকে ধামসা, রাতভোর চলে বেচাকেনা। ছেলেরা আবেদন জানায়,

দেন দাদা পুইসা
চাকুলতাড়ি ছাতা এে এে এি চালাঃ আ
জুরী লাইগে রে দা
ধামসা লিব রে—ধামসা লিব।

শ্বশুরবাড়ি থেকে পালানো বধূদের হদিস পাওয়া যায় চাকলতোড়ের মেলায়। সেসব বধূদের ধরা হয় এখানে। এখানে ফুল ও সঁয়া পাতানোও চলে। মেলার মাঠে বন্ধুত্ব গ্রথিত হলে বজায় থাকে আজীবন

৯. ভাদু উৎসব—ভাদোই ধানে নবান্ন উৎসব। ভাদ্রে আউশ ধান পাকে, কেটে তোলা হয় ঘরে।[৫] বর্তমান রাণীগঞ্জ এলাকা ছিল শেরগড়

---

৫. ভাদু উৎসব সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

পরগণার অন্তর্ভুক্ত। উনিশ শতকের প্রথমদিকে সেখানে ব্যাপকভাবে কয়লা খনি খোলা হয়েছিল। শেরগড় পরগণার প্রাচীন ও প্রধান অধিবাসী ছিলেন বাউরি ও বাগদী। দামোদরের উত্তরাঞ্চল থেকে বসবাস তুলে তারা দক্ষিণাঞ্চলে এসে থিতু হয়েছিলেন। এ অঞ্চলও ছিল পঞ্চকোট রাজার অধীন। জনবিস্ফোরণ ও অরণ্য-অঞ্চলের ওপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রন তাদের কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করেছিল। সুনা বা শালি জমি ছিল অপ্রতুল, ফলে বাইদ ও তড়া বা গড়া জমিতে চাষ সুরু করতে হয়েছিল তাদের। এসব জমিতে আমনের চাষ চলত না, করতে হত আউশের চাষ। ভাদু সেই আউশ ধানের নবান্ন উৎসব।

ভাদ্রমাস জুড়ে নানা উৎসব চালু ছিল অরণ্য অঞ্চলে। যেমন, করম ও জাওয়া, ইঁদ ও ছাতাপরব, সাঁওতালদের হাড়িয়ার সিম, কামারদের বিশ্বকর্মা, মেয়েদের জিতাষ্টমী ও মাথান ষষ্ঠীর ব্রত ইত্যাদি। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নবান্ন উৎসব ভাদু। পরবর্তীকালে ভাদু উৎসবের সঙ্গে দুটি লিজেন্ড বা কাহিনী বিজড়িত হয়ে গিয়েছিল। এক, পঞ্চকোটরাজ নীলমনি সিংহের কন্যা ভদ্রেশ্বরী বা ভদ্রাবতীর কিংবদন্তি। দুই, বিজয়োৎসবের কিংবদন্তি। ছাত্রনা বা ছাতনা রাজার সঙ্গে পাচেটের রাজার যুদ্ধ হয়েছিল নাকি ভাদ্র মাসে। জয়ী হয়েছিলেন পাচেটের রাজা। কেউ কেউ মনে করেন উৎসবটি সেই বিজয়ের স্মৃতিবহ।

প্রথম কিংবদন্তির, উৎস রিজলে সাহেব।[৬] তিনি জানিয়েছিলেন ভাদ্র মাসের শেষ দিনে মানভূম ও বাঁকুড়া জেলায় বাগদী ও বাউরিরা ভাদুনামে এক দেবীর মূর্তি নিয়ে নাচগানসহ শোভাযাত্রা করেন। মূর্তিটি প্রাক্তন পঞ্চকোট রাজের প্রিয় কন্যা বলে কথিত। কুমারী অবস্থায় তিনি নাকি মারা গিয়েছিলেন। উৎসবটি সেই কন্যার স্মৃতিরক্ষা করে চলেছিল বলে তিনি অনুমান করেছিলেন। এই জনশ্রুতির ফলে পরবর্তী কালে গানও রচিত হয়েছিল।

> কাশীপুরের রাজার ঝিটি বাগদী ঘরে কি কর।
> হাতের জালি লয়ে কাঁধে সুখ সায়রে মাছ ধর ॥
> মাছ ধরণে গেলে ভাদু ধানের গুছি ভেঙো না
> একটি গুছি ভাঙলে পরে পাঁচটি সিকা জরিমানা ॥

রিজলে সাহেবের অনুমান উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণের ওপর ভিতি করে গ্রথিত হয়েছিল বলে মনে হয়না। প্রাক্তন পঞ্চকোটের রাজা বলতে এখানে নীলমণি সিংহদেওয়ের দিকেই ইংগিত করে। নীলমণি সিংহদেওয়ের পুত্র ছিল

---

৬. The Tribes & Castes of Bengal, vol-, (1891) P 41.

তেরটি, কন্যার হদিস পাওয়া যায়না। থাকলেও তাদের মধ্যে কারো নাম ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরী ছিল কিনা, তাও জানা যায়না। সম্ভবত ভাদোই ধানের চাষের জন্য পাঁচেটের রাজা বাগদী ও বাউরিদের উৎসাহিত করেছিলেন এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় ভাদোই ধানের নবান্ন উৎসব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ফলে পঞ্চকোট বা কাশীপুর রাজপরিবারের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে গিয়েছিল উৎসবটি।

পুরুলিয়া জেলায় প্রায় পঞ্চাশ ভাগ জমিতে চাষ হয় ভাদোই ধানের। বাকি পঞ্চাশ ভাগে হয় আঘনি বা আমন, রবি ইত্যাদির চাষ। এ প্রসঙ্গে মুণ্ডাদের ননা বা জম ননা উৎসবের কথা স্মরনীয়। উৎসবটি হয় আশ্বিনে। আউশ ধানের নবান্ন উৎসব। জম ননার প্রভাব ভাদু উৎসবকে প্রতিষ্ঠিত করতে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছে বিচার্য।

ভাদ্রের সারা মাস ধরে একটু একটু করে কাটা হয় ধান, ঝাড়াই মাড়াই ও ভেনে ঘরে তোলার জন্য ডাক পড়ে মেয়েদের। ক্লান্তিকর কাজটিকে তারা গানে গানে আনন্দময় করে তোলেন। দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন ও বঞ্চনার সব রকম ঢেউ প্রতিধ্বনিত হয় সুরে সুরে। ভাদ্রসংক্রান্তির আগের রাত্রে ভাদুর জাগরণ। সারারাত চলে গান।

পুরুলিয়া জেলায় কোন কোন অঞ্চলে ভাদুর অনুকরণে ছেলেরা 'ভাদা' অনুষ্ঠান পালন করেন। মেয়েরা যে গানগুলি সাধারণত গেয়ে থাকেন সেগুলি বিকৃত করে গাওয়া হয়।

১০. জীতাষ্টমী বা জীমূতবাহনের পূজা—বাঁকুড়া জেলায় জীতাষ্টমী পালিত হয় আশ্বিনে,[৭] মানভূম ও পুরুলিয়া অঞ্চলে উৎসবটি পালিত হয় ইঁদ পরবের ঠিক বারো দিন পরে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। সপ্তমীতে পাতা হয় জীতাষষ্ঠি, পিতলের ঘড়া বা গৈরায়। ছোলা ভিজিয়ে গৈরার গায়ে এঁকে দেওয়া হয় সিন্দুরের টিপ, গলায় শালুক ফুলের মালা। ঘড়ার মুখে বাটির ওপর থাকে মাদাল বা অতা, ভেলা, আমলকী ইত্যাদি। ঘড়ার নিচে ছড়ান থাকে শশা। নাপিতানীর কাছে নখ কেটে আলতায় রাঙান হয় পা। ভোজন নিরামিষ।

---

৭. বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীগোপাল হালদার ও শ্রীমতী অরুণা হালদার লিখেছেন শিরাল শকুন মূর্তি জলে ভাসিয়ে যে উৎসব বাঁকুড়া অঞ্চলে পালন করা হয়, সে উৎসবের কথা বইটিতে উল্লেখ করা হয়নি।—সমতট : ১৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। উৎসবটির কথা বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্রষ্টব্য পৃ. ২৫৮,

পরদিন ভোরে ব্রতধারিণী ফলার সেরে নেন। দৈ চিড়ের ফলার। সারাদিন উপবাস। পূজো সুরু হয় সন্ধ্যায়। পুরোহিতের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হন জীমূতবাহন। ডাল পুঁতে আখ, ভেলা, মাদাল প্রভৃতি দেওয়া হয়। পূজোর জায়গা থেকে জ্বলন্ত প্রদীপ নিজেদের বাড়ি নিয়ে যান গৃহিনীরা। প্রদীপ থেকে কাজল তুলে দেওয়া হয় ছেলেমেয়েদের চোখে। পরিয়ে দেওয়া হয় ভেলার টিপ। পূজো শেষ হলেও ভঙ্গ হয়না উপবাস। পরদিন দেওয়া হয় প্রসাদ। বয়োজ্যেষ্ঠেরা দেন সর্বকনিষ্ঠকে। প্রসাদ আসলে ছোলা, শশা, কলা, মিষ্টি ইত্যাদি।

পান্না বা উপবাস ভঙ্গ করা হয় ঘটা করে। ব্রতধারিনীরা পুত্রকণ্যাসহ যান ঘাটে। পুকুরের একটা দিক বেছে নেন। পুকুরে ডুব দিয়ে এসে তৈরী করেন ফলার। মাটি দিয়ে তৈরী করা হয় শিয়াল ও শকুন। পূজো হয় শিয়াল শকুনের। মাথায় জোড়া মূর্তি ও হাতে একটি শশা চিড়েদই মাখিয়ে গৃহিনী গলা জলে নেমে যান। ডুব দিয়ে, জলের ভেতরেই শশাটিতে কামড় দিয়ে ভঙ্গ করেন উপবাস। একে বলে শশা ডুবান বা আড়াই কামাড়। লোককথায় জীমূতবাহন সূর্যপুত্র। সন্তান দান ও তাদের কল্যাণ বিধান করা তার কাজ।

১১. *দুর্গাপূজা*—জেলার প্রতিটি থানায়, বিভিন্ন গ্রামে দুর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হয়। এক সময় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল কাশীপুরে রাজবাড়ির দুর্গাপূজো। রাজারা এখন বৈভব হারিয়েছেন, জৌলুসও কমেছে পূজার। মানবাজার রাজবাড়িতে মূর্তি গড়িয়ে পূজো হয় না, নবপত্রিকা বিগ্রহের প্রতিরূপ গ্রহণ করেন। জামবাদ গ্রামে টোলা ঠাকুর বাড়িতে যে পূজো হয় তাতে পুরোহিত হন রুহিদাস বা চর্মকারেরা।

মোটামুটি ছয়দিন ধরে চলে পূজো। আলাদা আলাদা নাম আছে প্রতিদিনের। ষষ্ঠির দিনে হয় বেলবরন, বেলগাছ তলা থেকে বরণ করে আনতে হয় মাকে। সপ্তমী চিহ্নিত হয় 'ঠাকুরান আসা' নামে। নদী বা পুকুরঘাট থেকে বরণ করে আনা হয় সেদিন। অষ্টমীর দিন বড় পূজো। নবমির দিন নমি পূজো, সেদিন মেলা বসে নানা জায়গায়। ছো-নাচ, ঝুমুর গানে মুখরিত হয়ে ওঠে পূজো ও মেলা প্রাঙ্গন। দশমির দিন বিজয়া। পরদিন বাহার-বিজয়া।

অষ্টমীর দিন ঘর-জাগা ও খেত জাগা পালন করা হয়। গুঁড়ি বেঁটে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ঘরের আসবার ও শস্যক্ষেত্রে। বিশ্বাস, অশুভ শক্তি এতে প্রতিহত হয়। বাহার বিজয়ার দিন মাছ ও ঝিঙে পোড়া খাইয়ে মাকে বিদায় দিতে হয়। বিজয়া পুণ্য দিন। শুভকাজের সূত্রপাত করতে হয় সেদিন।

বিজয়া ও বাহার-বিজয়ার দিন থেকে সুর শোনা যায় অহিরা গানের।

১২. বাঁধনা পরব, অহীরা ও সোহরায়—কার্তিক মাসে অমাবস্যার রাত্রে হয় কালীপুজো। জেলার মধ্যে বাঁধামৌতোড়ের কালীপুজো প্রসিদ্ধ। রঘুনাথপুর থানার মধ্যে অবস্থিত বাঁধামৌতোড় গ্রাম। রঘুনাথপুর চেল্যামা রোডের ওপর। পুজোর দিন প্রচুর পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বলি দেওয়া হয় মোষও। জেলার নানাগ্রামে কালীপুজোর সংখ্যা কম নয়। বাঁধামৌতোড়ের কালীপুজোর সঙ্গে কাশীপুর রাজবংশের কিংবদন্তি বিজড়িত।

কালীপুজোর পরদিন থেকে অনুষ্ঠিত হয় বাঁধনা পরব। পরবে যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে অহীরা। বাঁধনা প্রধানত কুর্মী, ভূমিজ, কোড়া, লোধা প্রভৃতিদের উৎসব। সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের কাছে উৎসবটি সোহরায় নামে পরিচিত। সোহরায় সাঁওতালদের সব চেয়ে বড় উৎসব। অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিন ধরে। অন্যান্য জায়গায় সাঁওতালেরা সোহরায় উৎসব পালন করেন পৌষে। পুরুলিয়া জেলায় বাঁধনা পরবের সময় অর্থাৎ কার্তিকেই সেটি পালিত হয়।

কুর্মী ও ভূমিজেরা তিনটি পর্বে পালন করেন উৎসবটি। জাগরণ, চুমাণ ও নাচন। একমাস আগে থেকে সুরু হয় উৎসবের প্রস্তুতি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় গৃহ ও অঙ্গন। ছোপ মাটির প্রলেপ দিয়ে দেয়ালগুলি করে তোলা হয় ধবধবে। গিরিমাটি ও খড়িমাটি দিয়ে আঁকা হয় আলপনা।

কার্তিকে হৈমান্তিক ধান থাকে মাঠে, হাতে কাজ কম, কৃষকদের ক্ষণিক অবকাশ। উৎসবের আমেজ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যায়। খেতে সম্ভাব্য ঐশ্বর্যের সম্ভার। সব থেকে অন্তরঙ্গ যে প্রাণীটি দীর্ঘসময় ধরে নিরন্তর খাটুনির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তার প্রতি সকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে মন। উৎসবের অংশভাগ তাকেও দিতে ইচ্ছা করে। কৃতজ্ঞতাবোধ ও সহচর প্রাণীকুলকে জড়িয়ে নেবার তাগিদ থেকে সম্ভবত একসময় বাঁধনা পরবের উদ্ভব ঘটেছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আশু ফসলের সম্ভাব্য ফলনের দিকটিও।[৮]

অমাবস্যার দিন গোয়ালের সবচেয়ে বৃদ্ধ গরু বা মোষের সিংয়ে তেল মাখিয়ে অন্য গরু মোষের সিংয়ে তেল মাখান হয়। তেল সাধারণত হয় কড়চার। বিকেলে

---

৮. পণ্ডিতেরা উৎসবটির মধ্যে নানা তত্ত্ব আরোপ করেছেন। কেউ কেউ অনুমান করেছেন (J. G. Frazer—Golden Bough) ষাড় শক্তি, ঐশ্বর্য ও শস্যের প্রতীক। পশ্চিম এশিয়ার অনেক জায়গায় ষাঁড়ের লেজ শস্যগুচ্ছের প্রতীক। কেউ মনে করেছেন (J. Harrison—Ancient Art and Ritual) ষাঁড়ের মাংসভক্ষণ ও মাংস ক্ষেতে পুঁতে রাখার যে রীতি আছে, বাঁধনা পরব তারই অপর রূপ।

কুলিমুড়ায় বা গ্রামের মোড়ে গরুগুলিকে একত্র করা হয়। মাঠের ভেতর লায়া বা দেহরি চালের গুঁড়ো দিয়ে ঘর কেটে বাঘুত, ছাঁদন দড়ি ও বাঁধনদড়ির পুজো করেন। নাম গোঠপুজো। পুজো শেষ হলে আলপনার মত ঘর কেটে তার ভেতর ডিম রেখে দেওয়া হয়। হঠাৎ ঢাক, ঢোল, ধামসা বেজে ওঠে, গরুগুলি হতচকিত হয়ে ছোটাছুটি করে। লায়া লক্ষ্য রাখেন গরুগুলির মধ্যে কোনটি ডিমটি মাড়িয়ে দেয়। যে গরু প্রথম ডিমটি মাড়িয়ে দেয়, মাথায় তেল সিন্দুর দিয়ে সেটিকে সাজান হয়। মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় ধানের শীষ। বিশ্বাস, গরুটির মালিকের ভাগ্য সে বছর সৌভাগ্যপূর্ণ।

সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলা, খামার, গোবরগাদা, কুয়োতলা ও বাড়ির দরজা জানলায় কাঁঠাল কিংবা শালের পাতায় চালের গুঁড়োর ভেতর সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপের দুপাশে থাকে মড়দা ঘাস। একে বলা হয় কাঁচিজিয়ারি।

রাত্রে জাগর বা জাগরণ। আনন্দ ও উৎসবের রাত্রি। ঘরে ঘরে গৃহিনীরা নতুন কাপড় পরে, কুলোয় ধানদূর্বা, হলুদজল, আমের পল্লব ও ধুপধুনা দিয়ে গরু চুমান। নববধুকে যেভাবে বরণ করা হয়, একইভাবে বরণ করা হয় গরুকে। গৃহিণী গরুকে জিগেস করেন,

> কুথায় যে পাব ধুপ ভরতি ধুনা
> আর সিঁথিভরা সিঁদুর যে বাবুহো
> কুথায় যে পাব হামি দশহাতের শাড়ী গো
> কুথায় যে পাব বরদা জলকেরি ঘটি ?

— ধুপ দেবার জন্য সরা পাব কোথায়, কোথায় পাব পুটলিভরা সিন্দুর। দশহাতের শাড়ীই বা কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে জলের ঘটি ?

গরুকে বরণ করতে গৃহবধূই উত্তর দেন,

> কুমার ঘরে পাবি গো ধুপদিয়া সরা
> বান্যা ঘরে পাবি গো এক পুড়া সিঁদুর।
> জোলাঘরে পাবি দশহাতের শাড়ী গো
> স্যাঁকরাঘরে পাবি জলের ঘটি ॥

রাত্রি গভীর হলে গোয়ালে জেলে দেওয়া হয় ঘিয়ের প্রদীপ, উঠনে জ্বলে মুড়া কাঠের আগুন। বাজে মাদল, ধামসা। যুবকেরা বাড়ি বাড়ি যান গরু জাগাতে। গো-জাগরণকারীদের বলা হয় ধাঁগড়িয়া বা ধাঁগড়। কুর্মালি ভাষায় ধানগর শব্দের অর্থ ভৃত্য। ধাঁগড় শব্দটি হয়ত তার বিকৃত রূপ। ধাঁগড়িয়াদের

আগমনের জন্য গৃহে গৃহে অপেক্ষা করেন গৃহস্থেরা। দল আসে। বাজনা ও গানে মুখরিত হয়ে ওঠে গৃহের অঙ্গন।

অহিরে—

হামরা যে যাতেছিলি, কুলহি না কুলহি যে বাবুহো
তোর গেয়ার ডাকিয়ে ঘুরাল।
আইসরে ধাঙ্গড়া, বইসরে ধাঙ্গড়া
খাই লাগি দে ত গুয়াপান।

অভ্যর্থনা জানান গৃহস্বামী। ধাঁগড়িয়ারা বন্দনা গান করেন,

জাগো মা লক্ষ্মিনী জাগো মা ভগবতী জাগে ত আমাবিইস্যার রাতি।
জাগেকা পতিফল দেবে গো মালিনী পাঁচপুতায় দশ ধেনু গাই॥

পুত্র, ধেনু ও সমৃদ্ধি কামনা পরবের মূল লক্ষ্য। ধাঁগড়িয়াদের নাচ ও গান শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। অশালীনতা উৎসবের অঙ্গ। একে বলে 'মাছিখেদা' বা 'মাছিবাইটা'। দেহ এবং আচরণ অশালীন ও অপবিত্র ক'রে অপদেবতার প্রভাব পরিহার করা হয়। গৃহবধূরা পিটুলি গোলার সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে হোলি খেলেন ধাঁগড়িয়াদের সঙ্গে।

অমাবস্যার পরদিন গরয়া গোঁসাইয়ের পুজো। লাঙল, জোয়াল, মই প্রভৃতি সাফসুতরো করা হয়। গৃহকর্তা এক আঁটি ধান কেটে আনেন জমি থেকে। ধানের শীষ দিয়ে তৈরী করা হয় মোড় বা অলংকার। পরিয়ে দেওয়া হয় গরু ও মোষের শিংয়ে। গৃহিনী তৈরী করেন পিঠে। পুজোর পরে চাষের যন্ত্রগুলি তুলে রাখা হয় ঘরের মাথায়। সেগুলি আবার নামিয়ে আনা হয় হালপুন্যার দিনে। বা মাঘ মাসের প্রথম দিনে।

গরয়া পুজো শেষ হয় বিকালে। সেদিন গৃহবধূরা গরু চুমান। পরদিন বা ভাইফোঁটার দিন অনুষ্ঠিত হয় সবচেয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান গরুখুঁটা বা কাড়াখুঁটা বা বুঢ়ীবাঁধনা। নির্বাচিত গরুগুলিকে সাজান হয়। গায়ে লাল ছোপ, কপাল ও শিংয়ে তেল সিঁদুর, গলায় মালা, ঘণ্টা ও ঘুঙুর। মাঠে বা পথের পাশে খুঁটি পুঁতে বেঁধে রাখা হয়। মুচির বাড়ি থেকে চামড়া এনে, গরুর সামনে ধরেন ধাঁগড়িয়া ও উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা। চারিদিকে বাজে ঢাক, ঢোল ও ধামসা। গরু উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ঢুঁস দেয় ধরে থাকা চামড়াটিকে। একটি গরু ক্লান্ত হয়ে পড়লে, অপর গরুর কাছে যান সবাই। সঙ্গে সঙ্গে চলে নাচ ও গান,

অহিরে—

অরুণ বনে কোরি তরুণলতা যে বাবু হো
লবঘনে ভাণ্ডব যত
সেহ যত বান্ধব কাঁপলা কা পুতা
খেলি খেলি আওত মাতাল।

সাঁওতালদের সোহরায় হয় পাঁচদিন পাঁচরাত্রি। ম'ড়েসিএ্র ম'ড়ে এ্রিন্দা। পাঁচদিন পরবের পাঁচটি নাম। উম, বংগাবুরু, ঘুন্টাউ, ঘুন্টিচেঙে ও জালে। পরিচ্ছন্নতার আয়োজন আসলে উম নাড়কা। পরিষ্কার করা হয় ঘরদোর ও জামাকাপড়। নায়কে থাকেন উপবাসী, জগমাঝি ঘরে ঘরে আদায় করেন 'চুরুচ চন্ডাল'। এ দিনই হয় ডিম-ভাঙ্গা অনুষ্ঠান ও গাই চুমাউড়।

বংগাবুরুতে পরিচ্ছন্ন করা হয় চাষের যন্ত্রপাতি। গোয়াল পুজো। বলি দেওয়া হয় মুরগি ও শুকর। পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ফুটাম বা উৎসর্গও করা হয় মুরগি। সারা রাত চলে হাড়িয়া পান ও নাচগান। ঘুন্টাওদের দিন ভোরেই পুরুষেরা কুলিতে বা পথে পথে বেরিয়ে পড়েন। মাদল ও নাগড়ার সঙ্গে চলে ডান্টাদন নাচ। দুপুর পর্যন্ত নাচ চলে। ছেলেরা করে জাগারণা। কচু, মানকচু, শশা, প্রভৃতি গেরস্থ বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে পালায়। নষ্টচন্দ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘুন্টিচেঙের দিন হয় গরুখুঁটা ও কাড়াখুঁটা এবং গরুও মোষ খেলানো। শেষ দিনে জালে। মেয়েরা সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে কুলহি দাঁড়ান করতে। বা গ্রামের পথে পথে দাঁড়াতে। পুরোদিন চলে নাচ আর গান। নানারকম নাচ হয় সেদিন। সোহরায়, দং, লাগড়ে, রিংজা মাতওয়ার প্রভৃতি।

সমগ্র ঝাড়খণ্ড, পূর্বতন মানভূম এবং অধুনা পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে বড় উৎসব বাঁধনা। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে নৈহর বা বাপের বাড়ি আসেন। হাটে মাঠে, গ্রামের পথে পথে, গৃহস্থের ঘরে ঘরে আনন্দের বান ডেকে যায়। উৎসবের দিনগুলি শেষ হলে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি হাঁ করে গিলতে আসে। চোখ অশ্রুভরা। বিষন্ন সুর ভাসে বাতাসে।

আইলরে বাঁদনা ঘুধাড়ি ছেইলার কাঁদনা।
গেলরে বাঁদনা ঝিটি ছেইলার কাঁদন॥

১৩. জাথেল উৎসব ও ইরতি—জাথেল বা জান থাড় সাঁওতালদের উৎসব। অগ্রাহায়ণ মাসে গ্রামের মানুষ একটি শুকর কি ভেড়া কেনেন। তাকে বলা হয় জানথাড়। বলি দেওয়া হয় সেটি। পুজোর সমস্ত উপকরণ যুগিয়ে দেন কুড়াম নায়কে। খিচুড়ি রাঁধার চালও তাকে দিতে হয়। পুজোর পর প্রসাদ নেন শুধু পুরুষেরাই।

কার্তিক সংক্রান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন ইতু। স্থানীয় নাম ইরাতি। গৃহস্থ ঘরের বধূদের ব্রত। মাটির হাঁড়িতে পাতা হয় ইতু। নানারকম গাছগাছালি ও গাঁদাফুল দিয়ে সাজান হয়। শুভদিন দেখে নবান্ন দেওয়া হয় ইরাতিকে। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে দেওয়া হয় আসক্যা পিঠে। সংক্রান্তির পরদিন বিসর্জন।

১৪. টুসু ব্রত ও উৎসব—আমন ধান কাটা সুরু হয় অগ্রহায়ণ থেকে। ইরাতিকে দেওয়া হয় নতুন চালের নবান্ন। সাঁওতালদের জাথেল উৎসব নবান্ন উৎসবের আর এক দিক। নবান্নের পরিপূর্ণ রূপ টুসু উৎসবের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষিকেন্দ্রিক সারা বছরের সমস্ত উৎসব যেন টুসু পরবে এসে পরিণতি লাভ করে। পুরুলিয়া জেলার শ্রেষ্ঠ উৎসব টুসু।

আঘন সাঁকরাইত বা অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত, পুরো এক মাস ধরে চলে টুসুর পূজা ও গান। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের তুষ তুলে রাখেন মেয়েরা। পৌষের সুরুতে সেই তুষ দিয়ে ভরে তোলা হয় নতুন সরা। সরাটি বিশেষভাবে তৈরি, এখন হাটে ও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সরা না জুটলে মাটির পাত্রেও টুষু পাতা চলে।

গুড়ি গোলা জলে গাবান হয় সরাটি। গায়ে টানা হয় পাঁচ বা সাতটি সিন্দুরের লম্বা দাগ। সরার মধ্যে তুষের সঙ্গে রাখা হয় পাঁচ বা সাতটি গুড়ি ও কাড়ুলি বাছুরের গোবরের ঢেলা বা গুলি।

নবান্নের ধান ভানি দিনখ্যান করে
কাড়ুলি বাছুরের লাদ রাখি টুসু মায়ের তরে।

আকন্দ ও গাঁদা ফুলের মালাও রাখা হয় সরায়। নতুন আর একটি সরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তুষ রাখা সরাটির মুখ। ঘরের কুলুঙ্গি বা পিড়ির ওপর রেখে দেওয়া হয় ঢাকা দেওয়া সরা। ইনিই টুসু বা টুসু দেবী।

প্রতিদিন সন্ধ্যা 'উত্তান্নি' হবার পর বা উতরে যাবার পর ফুল ও প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করা হয় সরাটিকে। নিবেদন করা হয় ভোগ। নারী জীবনের গোপন ও ব্যক্ত কামনা বাসনা, দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ ও অভিজ্ঞতা, গ্রাম ও সামাজিক জীবনে চলমান ঘটনা প্রবাহ—সবই কথা ও সুরে নিবেদিত হয় টুসুকে। দেবীর উঁচু আসন ছেড়ে টুসু নেমে আসেন নারীদের মাঝখানে, সখীর মত তাদের পাশে বসেন। সহমর্মীর মত নিজেও অংশ নেন সমবৎসরের অভিজ্ঞতায়। সমস্ত যুবতীরাই তখন টুসু হয়ে ওঠেন।

একটি টুসু দুটি টুসু কোন টুসুটি ভাল লো

মৈঠের টুসু ঝলকদারী জলে আঁখি ঠারে লো।

জেলার কোন কোন জায়গায় মূর্তি গড়িয়ে পুজো হয় টুসুর। আলাদা-করে চেনার মত বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে এখনও উদ্ভূত হয়নি মূর্তি। কোথাও চেহারা লক্ষীর মত, কোথাও সরস্বতী মূর্তির আদলে। খলা বা সরা এবং মূর্তি যাই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটিকে চৌদল বা চতুর্দোলায় বসিয়ে বিসর্জন দেবার রীতি প্রচলিত। বিসর্জন দেওয়া হয় পৌষ বা মকর সংক্রান্তির দিনে। স্থান কাছাকাছি নদী, পুকুর বা জলাশয়।

টুসু উৎসবের প্রাণশক্তি টুসু সঙ্গীতে। জেলার আপামর জনসাধারণের আনন্দ, দুঃখ, কল্পনা, অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীল ক্ষমতা গানগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। শরৎকালের আকাশে বিচিত্র রঙ ও আকারের মেঘের মত গানের সুর ও বিষয়বস্তু তাৎক্ষণিক। কুমারী কন্যারা উৎসবের মুখ্য পালয়িত্রী। গান তাদের মধ্যেই সীমিত থাকে না। বিবাহিত নারীদের সুখদুঃখ প্রতিধ্বনিত হয় বেশি। কারণ, তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ।

হামার টুসু অকুমারী, আমার কন্যা সাজাব
আনগো বিন্দে কাজললতা নয়নে কাজল দিব।

মেয়েকে মনের মত খাওয়াবার উপকরণ মায়ের কাছে থাকে না। সে দুঃখও ধ্বনিত হয় সুরে সুরে,

ষোলঘড়ির ষোলপুজো খাও গো টুসু খই ভাজা
তুমার মা যে অভাগিনী কুথায় পাবেক দহি চিড়া।

শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে মেয়ে। নির্যাতন কখনও কখনও এত তীব্র হয়ে ওঠে যে একমাত্র মেয়ের প্রতি অত্যাচারে মা ক্রুদ্ধা হয়ে ওঠেন। জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতেও পিছ পা হন না।

হামার টুসু একটি ছাইল্যা মানবাজারে শ্বশুর ঘর।
কলসির উপর কলসি রাখে‍্য পালাই আইল বাপের ঘর।
পালাই' আলি ভাল করলি আর ত বিদায় দিব না।
জামাই আলে‍্য ঝগড়া করব লাজের বালাই রাখব না।

গ্রামের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে শহরের চাকচিক্য দেখতে মনটা উড়ুউড়ু করে। একা যেতে ভরসা হয় না। ডাকতে হয় সঙ্গী,

হামদের টুসু শিশু ছাইল্যা, কে কে যাবে কইলকাতা
কালিমাটি হ'য়ে ফিরবে গো দেখবে টাটার কারখানা।
ভালয় ভালয় ঘু'রে আল্যে, থানে দিব জড় পাঁঠা ॥

গ্রামে শতকরা সত্তরজন রমণী স্বামীর কর্মসঙ্গিনী। স্বামী কৃষক, কৃষিকর্মে

স্বামীকে পরামর্শ দিতে হয়। স্বামী কখনও সেকথা কানে তোলেন, কখনও তোলেন না। গানের মধ্যে সে ইংগিতও ধ্বনিত হয়।

বারে বারে বারণ করি বাইদে তলা দিহ না।
বাইদের তলা বাইদে থাকে মহাজনে মানে না॥

অসময় বর্ষা নামলে ভাল হয়না ফসল। চাষীদের ঘরে ঘরে দেখা দেয় অনটন। আড়কাঠিরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অভাবী চাষীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে উত্তরবাংলা ও আসামের চা বাগানে পাঠাবার জন্য প্রলোভন দেখায়।

ই বছরের নামী বরষা চাষী দুঃখে চাষ করে
এই লে গাঁয়ের খালভরারা আড়কাঠিয়ে ঘুঁগি আড়ে।

টুসু ভাসানের দিন মেলা বসে নানা জায়গায়। তাদের মধ্যে শিলাইদহের টুসু মেলা ক্রমশ জমকালো হয়ে উঠতে চলেছে। হুড়া থানার বড়গ্রাম ও পুঞ্চা থানার চক-গোপালপুরের মিলনস্থলের কাছে উৎপত্তি হয়েছে শিলাবতী নদীর। পৌষ সংক্রান্তির দিন সেখানে মেলা বসে। প্রকৃতপক্ষে বড়গ্রামই মেলার স্থান। চারটি মন্দির আছে সেখানে। সাতদিন ধরে চলে মেলা। তবে জমায়েত বেশি হয় ভাসানের দিনে। গানে গানে মুখরিত হয়ে ওঠে মেলার ক্ষেত্র। কখনও কখনও গানের কথা শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়—

শীলাই গেলে কিলাও ঘুরাব
তকে তিন ঘটি জল খাওয়াব
শীলাই গাড়হার পাকা পান খিলি
ও তুঁই কার লাগে জাগাএ ছিলি?

১৫. ভানসিং পূজা ও পরব এবং এখ্যান যাত্রা—মকর সংক্রান্তির দিন থেকে সুরু ভানসিং পরব। চলে সারা মাঘ মাস। একই দিনে একাধিক গ্রামেও অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে গ্রামে এমনভাবে অনুষ্ঠিত হয় উৎসবটি যে মাঘ মাসে একদিনের জন্যেও ছেদ পড়েনা। জেলার মধ্যে দুটি থানাতেই উৎসবটির জনপ্রিয়তা বেশি। মানবাজার ও পুঞ্চা। অন্যান্য থানাগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া মফঃস্বল, হুড়া, জয়পুর, আড়ষা ও পাড়ায়।[১] এ ছাড়া অন্যান্য থানাতেও অনুষ্ঠিত হয়, তবে তত উল্লেখ্য নয়।

ভানসিংয়ের মূর্তি নেই। সম্প্রতি কোথাও কোথাও মূর্তি গড়িয়ে পূজার

১. শ্রীসুভিধর মাহাত—'পুরুলিয়ার ভানসিং পরব' প্রবন্ধে একটি সমীক্ষা করেছেন। তাতে দেখা যায় মানবাজার থানায় পরবটি অনুষ্ঠিত হয় ২৫টি গ্রামে, পুঞ্চায় ২৩, পুরু মফঃ ৯, হুড়া ৬, জয়পুর ৫ এবং পাড়া ও আড়ষায় ৩টি গ্রামে।

প্রথা চালু হয়েছে। মন্দিরও নেই।

ছাউনিবিহীন খোলা মাঠে নিবেদিত হয় পুজো। গ্রামের লোকের বিশ্বাস ভানসিং জাগ্রত দেবতা। তিনি তুষ্ট থাকলে গরুমোষ প্রভৃতি ঘরে পোষা প্রাণীগুলি রোগ ও মড়কের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়। পুজো করেন লায়া। পুজোর অধিকার পুরুষানুক্রমিক।

ভান সিং আসলে কোন দেবতা সে বিষয়ে নির্দিষ্ট ধারণা অনুপস্থিত। কেউ কেউ মনে করেন ভানসিংহ আদতে ভানু বা সূর্য। কারও মতে ভানসিং পরব সাঁওতালদের যাতরা অনুষ্ঠানের রকমফের। যাতরার পুজো করেন গ্রামের সুসারিয়া বা পুজারী। পুজো হয় গাঁয়ের বাইরে বা টাঁড়ে। যাত্রার পুজোর সময় চণ্ডীরও পুজো হয় নানা জায়গায়। ফলে যাত্রা চণ্ডীর একটি রূপ বলে মনে করেন কেউ কেউ। ভানসিং বুড়িও বলা হয় কোথাও।

যাত্রায় দুজন কুমারী মেয়ে নিয়ম করে থাকেন। বসে থাকেন যাত্রার থানে। পুজোর জন্য তৈরি করা হয় খড় বা ছোট ছোট পাথর দিয়ে সাজান বেদী। টাটয়া বা যাদের ওপর রুম বা ভর হয়, হাতে নেন আতপ চাল। চালগুলি রগড়াতে থাকেন। রগড়াতে রগড়াতেই তাদের ওপর ঝুপান আসে। কুমারী মেয়েদুটি যেখানে বসেন তাদের মাঝখানে থাকে আসন বা কাঠের পিঁড়ি। পিঁড়িটিতে পেরেক বসান থাকে, বলা হয় জানুম গাণ্ড। ঝুপানদের ভেতর যার ওপর যাত্রা বঁগা ভর করেন, গ্রহণ করেন আসন। কুশলাদি ও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।

মাঘ মাসের প্রথম দিনটির নাম এখ্যান যাত্রা। শুভ দিন বলে খ্যাত। ঘরে নতুন ধান, কাজের তাগিদ নেই, অন্তত কয়েকদিনের জন্য দারিদ্র্যের ভয়াবহ ভ্রূকুটি সহ্য করতে হয়না। গ্রামে গ্রামে আনন্দের বান ডেকে যায়। ঝোপ ঝাড় গ্রামের কুলহিতে যেসব ছোট বড় দেবদেবী সারা বছর ধরে চুপচাপ থাকেন, হঠাৎ জাগ্রত হয়ে ওঠেন। গ্রামে গ্রামে, হাটে বাজারে সুরু হয় মুরগির লড়াই।

মুণ্ডাদের খাড়িয়া পুজো বা কোলোম সিং বা মাঘ পরবও অনুষ্ঠিত হয় এ সময়। মাঘ পরব আসলে হৈমন্তিক ফসল কাটার উৎসব। কোলোম সিংয়ের সঙ্গে ভানসিং পরবের যোগসূত্র আছে কিনা, অনুসন্ধানের বিষয়।

১৬. চণ্ডীপূজা ও খেলাইচণ্ডীর মেলা—মধ্যপ্রদেশ ও নাগপুরে ওরাঁওদের মধ্যে চণ্ডীদেবীর পুজো প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন শব্দটির মত চণ্ডীদেবীও অনার্য ঐতিহ্য সম্ভূত। জেলার নানা জায়গায় চণ্ডীর পুজো

অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ খেলাই চণ্ডী। পুজো হয় মাঘ মাসে। ছড়ায় বলে,

ক'লে ছেল্যা কাঁখে ছেল্যা
হামরা যাব চণ্ডী মেলা।

পুজোর সঙ্গে বসে মেলা। চণ্ডীর মেলাগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ বেড়ো গ্রামের কাছে, জয়চন্ডী পাহাড়ের সানুদেশে খেলাই চণ্ডীর মেলা। পয়লা মাঘ থেকে তিনদিনের মেলা। আদরা-আসানসোল রেলপথে ছোট স্টেশন বেড়ো। মেলার ক্ষেত্র সেখান থেকে মাইল খানেক। অন্যান্য চণ্ডীর পুজোর মত এখানেও আছে মাটি ফেলা, দন্ডী খাটা, পায়রা উড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কাছাকাছি রেলস্টেশন ও বাসে যাবার সুবিধা থাকায় মেলায় লোক সমাগম হয় প্রচুর। তাছাড়া একসঙ্গে তিনটি দ্রষ্টব্য জিনিষও দেখা যায়।

কেশব চাঁদ
বেড়োর বাঁধ
চণ্ডী থান।

বেড়োর মেলা ছাড়াও খেলাই চণ্ডীর মেলা বসে বান্দোয়ান থানার চিল্লা, সাঁতুড়ি থানার দণ্ডহিত, পুরুলিয়া মফঃস্বলের নদীয়াড়া, ও গোলমারা ইত্যাদি স্থানে।

সরস্বতী পুজোও হয় মাঘ মাসে। পুরুলিয়া জেলার কিছু কিছু জায়গায় ঘটা করে হয় পুজো। তাদের মধ্যে রঘুনাথপুর থানার শাঁকা গ্রামের সরস্বতী পুজোর মেলা প্রসিদ্ধ। ছদিন ধরে চলে মেলাটি।

১৭ মাঘ সিম—সারা বছরের প্রধান প্রধান কাজগুলি সাঁওতালেরা উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। শ্রম ও আনন্দ একাকার হয়ে রূপ দিয়েছে উৎসবের। মাঘ সিম এমনি একটি পরব। প্রকৃত পক্ষে সাউড়ি বা বাবুই জাতীয় ঘাস কাটার জন্য অনুষ্ঠিত হয় উৎসবটি। তাতে ঘর ছাওয়া হয়। প্রতি গেরস্থের কাছ থেকে এক পাই করে চাল কি বজরা নেন গোড়েৎ মাঝি। উদ্দেশ্য হাড়িয়া তৈরি। সোহরায়ের সময় যে গরু খ'ড় মাড়িয়েছিল তার মালিকের জন্যেও এক পাত্র হাড়িয়া আলাদা করে রাখা হয়। নায়কে স্নান সেরে খ'ড় করে মুরগি পুজো করেন। পুজো দেওয়া হয় মঁড়েকো, জাহের এরা, মারাং বুরু, গোঁসায় এরা, মাঝি হাড়াম ও সিমা আড়ার।

মাঘ সিম পুজো ও উৎসবের প্রথাগুলি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় একসময় মাঘ মাস ছিল সাঁওতালদের বছরের শেষ মাস। নতুন করে সব কিছু সুরু হত। পদত্যাগ করতেন সাঁওতাল সমাজের প্রধান পদাধিকারীরা। পারামানিক,

জগমাঝি, জগপারামানিক, গোড়ৎ, নায়কে, কুড়ান নায়কে প্রভৃতি। রায়তেরা জমি জায়গা জমা দিতেন মাঝির কাছে। সম্ভবত এ সময় নতুত করে নির্বাচিত হতেন সমাজের প্রধানেরা, নতুন করে বিলিবন্দোবস্ত হত জমি। এখন প্রথাটি শুধু রীতিরক্ষা মাত্র। পদগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে উঠেছে, জমিজমাও ভোগ করা হয় উত্তরাধিকার সূত্রে।

১৮. বাহা, সরজম বাহা বা সরহুল—সাঁওতালেরা বসন্ত উৎসবকে বলেন বাহা পরব। মুণ্ডাদের কাছে সরজম বাহা বা সরহুল। বাহা সাঁওতালদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব। বড় চেয়ে বড় উৎসব সোহরায়। শাল-গাছে ফুল আসে, ফালগুনে লালে লাল হয়ে ওঠে পলাশের বন। ইচাঃ আর মহুল ফুলও ফুটে ওঠে। সাধারণত ফালগুন মাসের দোল পূর্ণিমার পর থেকে সুরু হয় উৎসবের প্রস্তুতি।

জাহেরের থানে চালা বাঁধেন ছেলেরা। গোবর দিয়ে নিকান হয় সমস্ত দেবতার থান। পুরুষেরা দলবেঁধে শিকার করতে যান জঙ্গলে। সন্ধ্যের নায়েকের ঘরে জমা হন সবাই। সেখানে কারও কারও ওপর দেবতাদের রুম বা ভর হয়। উৎসবের আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হলে সুরু হয় গান। নতুন পাতা ব্যবহার করা সুরু হয় এদিন থেকে, নতুন ফুলে সজ্জা করেন মেয়েরা। গান ধরেন,

রিত রিতি রাংকিলো তিঞগোরে মুদাম দ
রিত রিতি রাংকিলো জাঙ্গাঞরে নিয়ুরা।

—চমৎকার আমার হাতের আংটি, সুন্দর আমার পায়ের নুপুর।

তোকোর তাম নাজিঞ হো তিঞ গোরে মুদাম দ
তোকোর তাম নাজিঞ হো জাঙ্গামরে নিয়ুরা।

—দিদি কোথায় তোমার হাতের আংটি, কোথায় পায়ের নুপুর ?

সুত দাঃরেঞ এুরকেৎ আ তিঞ গোরে মুদাম দ
ডাডি দাঃরেঞ হসরকেদা জাগাঞরে নিয়ুরা।

—খালের জলে পড়ে গেছে আমার অংটি, কুয়ার জলে খসে পড়েছে নুপুর।

হাড়িয়া পান ও নাচগান চলে সারা রাত। শেষ হয় পরব।

ফালগুন মাসে কোথাও কোথাও বরসাল চণ্ডীর পূজা হয়। দণ্ডীহত গ্রামের বরসাল চণ্ডীর পূজা ও মেলা প্রসিদ্ধ।

১৯ ভেজা বিঁধা ও মুরগীর লড়াই—ভেজা বিঁধা ও মুরগির লড়াই উৎসবের অঙ্গ হসাবে সংযুক্ত থাকতে থাকতে এখন পৃথক অনুষ্ঠান ও উৎসরের মর্যাদার উন্নীত হয়েছে। বিশেষত, ভেজা বিঁধা। আগে বড় বড় উৎসবের

সঙ্গে, প্রধানত শিকার উৎসবগুলির সঙ্গে ভেজা বিঁধা অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে কোথাও কোথাও এখ্যান যাত্রার দিনে নিয়ম করে পালিত হয় উৎসবটি। এখ্যান যাত্রা হয় পয়লা মাঘ, বা মকর সংক্রান্তির পরের দিনে।

ভেঁজা-বিঁধা আসলে লক্ষবিদ্ধ কবার উৎসব। সাঁওতালদের আদিম সমাজে তীর ধনুক বা কাড়-বাঁশ ছিল আধুনিকতম হাতিয়ার। সেই হাতিয়ারে পারদর্শিতার পরীক্ষা ও বৎসারান্তে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে। গ্রামের উপান্তে নির্জন প্রান্তর, নদীতীর বা সর্বসাধারণের মালিকাধীন কোন জায়গা উৎসবটির কেন্দ্র স্থান হিসাবে নির্ধারিত হয়। সেখানে পোঁতা হয় একটি ভেরেন্ডার ডাল। ডালের ওপর গোবর রেখে একটি ফুল গুঁজে দেয়া হয়। সেটিই লক্ষ্য বস্তু। দেড়শো থেকে দুশো গজ দূর থেকে বিদ্ধ করতে হয় ফুলটি। তীর ছোঁড়া হয় তিনটি। প্রথমে তীর ছোঁড়েন মাঝি, তারপর যথাক্রমে গোড়েৎ মাঝি ও নায়কে। তাদের তীর ছোঁড়া আনুষ্ঠানিক। প্রতিযোগিতা সুরু হয় নায়কের তীর ছোঁড়ার পর। ভেরেন্ডার ডালটি যিনি পুঁতে দেন তিনি ছাড়া উপস্থিত সকলেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। যিনি ডাল পোঁতেন, প্রতিযোগিতার স্থানে উপস্থিত থাকলে তার চোখ দুটিও বেঁধে দেওয়া হয়।

প্রতিটি প্রতিযোগী যে তিনটি কবে তীর ছোঁড়েন, সে তীরগুলি উৎসর্গীকৃত। প্রথমটি বোঙ্গার নামে, দ্বিতীয়টি পূর্বপুরুষদের নামে এবং তৃতীয়টি প্রতিযোগীর পুরুষকারের প্রতি উদ্দিষ্ট। যিনি বিজয়ী হন তাঁকে তীর ছোঁড়ার জায়গা থেকে লক্ষ্য বস্তু পর্যন্ত কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়। উপহার দেওয়া হয় নতুন জামা, কাপড় ও এক হাঁড়ি হাড়িয়া। কোথাও কোথাও এক বছরের জন্য একখণ্ড জমিও চাষ করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে।

উৎসবের অঙ্গ হিসাবে মুরগির লড়াইও খুব জনপ্রিয়। উৎসব ছাড়াও হাটের দিনে বা হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে স্থান নির্দিষ্ট করে মুগরির লড়াই হয়ে থাকে। শীতের অপরাহ্নে কুলহি-মোড়ে বা রাস্তার বাঁকে কিংবা হাট বা বাজারের উপান্তে প্রায়ই দেখা যায় গোলাকার ভিড়, শোনা যায় স্বতঃস্ফূর্ত চীৎকার। মোরগের পায়ে বাঁধা থাকে ধারালো ছুরি। যে মোরগ জখম হয় বা পালিয়ে যায়, তার মালিক পরাজিত বলে গণ্য হয়। পরাজিত মোরগটি বিজয়ী মালিকের সম্পত্তি হয়ে ওঠে। মোরগের লড়াই কেন্দ্র করে দোকানপাট বসে, আসে ভেলকিবাজী, জুয়ার আসর বসে, সঙ্গে সঙ্গে বাজে ঢাক ও মাদল।

মানভূমে পূজাপার্বন, লোক উৎসব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন

জনগোষ্ঠী একে অপরের পালপার্বন গ্রহণ করেছেন, সাজিয়ে নিয়েছেন নিজেদের মত ক'রে। যেমন সাঁওতালেরা দেকো বা হিন্দুদের কাছ থেকে অনেক পরব গ্রহণ করেছেন। যথা, করম, ছাতা, বান সিং বা ভান সিং, ইত্যাদি। দুর্গাপূজো ও কালীপূজায় সাঁওতালেরা অনুষ্ঠান করেন না, তবে দর্শক হিসাবে তাদের ভূমিকা নগণ্য নয়। সাঁওতালদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে সোহরায় যা বাঁধনা পরবের রূপ নিয়ে পুরুলিয়ার গ্রামেগঞ্জে কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়।[১০]

১০. অধ্যায়টি লিখতে যাদের রচনা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাদের নাম এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা হল। যথা, অশোক চৌধুরী, ড. বিনয় মাহাত, পশুপতি মাহাত, সিরাজুল হক, বিশাখা মাঝি, সৃষ্টিধর মাহাত, বিজয়চন্দ্র পাণ্ডা, মহাবীর নন্দী, নিত্যানন্দ রায়, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

শিক্ষা ও ভাষা

"The only School in this district is an Enghish School established in Purulia in May 1853."—H. Ricketts (1855)

শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত ভাষা। কেতাবী ভাষা নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করে চলে। নিয়ম রীতির কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষা ক্রমশ প্রসারিত হয়, এবং যেহেতু, সর্বত্র তার রূপ এক, সর্বত্রই তা সর্বগ্রাহ্য। কথ্য ভাষায় সে সুবিধা নেই। অঞ্চল ভেদে বাচনভঙ্গি ও শব্দ সংযোজন বদলে যায়। চিহ্নিত হয় আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে। পুরুলিয়া জেলায় শিক্ষা প্রসারের বিলম্বিত প্রয়াস ও মন্থরগতি একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা ও সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা বিপুল জনসমাজকে পিছন দিকে টেনে রেখেছে।

পুরুলিয়ায় আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় হেনরি রিকেটসের রিপোর্টে।[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি পুরুলিয়ায় ইনসপেকশনের জন্য এসেছিলেন। ইংরেজি স্কুল বলতে জেলায় তখন মাত্র একটি স্কুল ছিল।[২] সেটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৩ সালে। প্রধানত মধ্যবিত্তদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। ছাত্রেরাও ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের।

---

১. Selections from the Records of the Bengal Government Published by Authority. No X X··· Reports on Purulia or Manbhum (etc). by H. Ricketts. 1855.

২. ছাত্র ছিল ৫৭ জন ; তাদের মধ্যে সরকারি চাকুরের ছেলে ২৯, মোক্তারদের ছেলে ২৩ এবং ব্যবসায়ীদের ছেলে ৫। বাঙ্গালী শিক্ষক ছিলেন কালীচরণ দত্ত।

জেলার জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না।[৩] বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা মন্দির—টেরাকোটা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন ব্যাপক গণশিক্ষার আয়োজন করেছিলেন, কাশীপুরের রাজপরিবার ও অন্যান্য জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় তেমন উদ্যোগ ছিল না।

জমিদার পরিবারগুলির অনাগ্রহ থাকলেও আধুনিক শিক্ষার ঢেউ জেলায় একেবারে থেমে থাকেনি। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি জেলার নানা জায়গায় কায়েমিভাবে বসবাস তুলেছিলেন। ফলে, ১৮৫৩ সালে যেখানে ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি, দেখতে দেখতে ক্রমাগত তাদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে চলেছিল। বেড়ে চলেছিল ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যাও।[৪]

কুপল্যানড যখন গেজেটিয়ার লিখেছিলেন (১৯১১ খ্রী) মানভূম জেলায় কলেজ ছিলনা একটিও। সরকারি স্কুলের মধ্যে ছিল পুরুলিয়া সহরে জিলা স্কুল। জিলা স্কুলের প্রায় সমসাময়িক একটি ভার্ণাকুলার স্কুলও ছিল। পুরুলিয়া পৌরসভা গঠিত হলে স্কুলটি পৌরসভার সাহায্য পেতে থাকে। অনুরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল সহরে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য মাদ্রাসা, পুরুলিয়া গার্লস স্কুল ও কালীমেলা পাঠশালা। পুরুলিয়া সহবের বাইরে তৎকালীন মানভূম জেলায় উল্লেখযোগ্য স্কুলগুলির মধ্যে ছিল রঘুনাথপুরের জি ডি ল্যাঙ্গ ইনসটিটিউশন, চিরকুণ্ডার নন্দলাল ইনসটিটিউশন, ঝরিযার রাজ হাই ইংলিশ স্কুল এবং পাঁড়রার হাই ইংলিশ স্কুল। শেষোক্ত স্কুল দুটি যথাক্রমে রাজা দুর্গাপ্রসাদ সিংহ ও রাণী হিঙ্গন কুমারীর অনুদানে পরিচালিত হত। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমদিকে দক্ষিণ মানভূমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে ছিল বরাবাজার স্কুল। স্কুলটির সূত্রপাত হয়েছিল এম ই. স্কুল হিসাব (১৮৮৫), হাইস্কুল হিসাবে গোড়া পত্তন হয়েছিল ১৯৪৩ সালে।

পুরুলিয়া সহরে পৌরসভা কর্তৃক অনুদানপুষ্ট স্কুলগুলির মধ্যে দুটি স্কুল

---

৩. যদিও জমিদার পরিবার ছিল ৩১টি, জমিদাবীর অন্তর্গত মোট এলাকা ৭,৮৯৬ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৭ ৭২,৩৪০।

৪. ১৮৭০-৭১ সালে সরকারি ও সরকারি সাহয্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৩, স্যার জর্জ ক্যামবেলের গ্রানট-ইন-এড পরিকল্পনার ফলে প্রাইমারী স্কুলসহ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩১। প্রাইভেট স্কুলেব সংখ্যা ছিল ৭২। ১৯০১-২ সালে স্কুলের সংখ্যা ৭২৭, ছাত্র ১৯,৭২৮। বর্তমানে (১৯৭৫) হাইস্কুল ১১১ (ছেলে ও মেয়েদের স্কুলসহ), জুনিয়র হাই ১১৩। প্রাইমারী স্কুল ২,৫৮৭, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ২৯।

পরবর্তীকালে মহীরুহের মত বৃহদাকার ধারণ করেছে। ভাগাকুলার স্কুলটি স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির[৫] ঐকান্তিক চেষ্টায় হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছিল। অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তৎকালীন রাজা, জমিদার ও কয়লাখনির মালিকদের কাছ থেকে। পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেওয়ের চতুর্থ পুত্র, সাঁঝিলাল (মেজ ছেলে) এক খণ্ড জমিও দান করেছিলেন। স্কুলটির নাম হয়েছিল মানভূম ভিকটোরিয়া ইনসটিটিউশন।

দ্বিতীয় স্কুলটি ছিল মেয়েদের। পৌরসভার সাহায্য ও পরিচালনায় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় (১৮৮৭)।[৬] অবস্থিতি ছিল প্রতাপ নাট্য মন্দিরের সামনে, রায়বাহাদুর অম্বুজাক্ষ রোডের পাশে। স্কুলটি শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয় নামে পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করেছিল। শান্তময়ী ছিলেন পুরুলিয়া শহরের একদা প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর হরিপদ দাঁয়ের[৭] মাতা। বর্তমানে যে জায়গায় স্কুলটি অধিষ্ঠিত, হরিপদ দাঁ সে স্থানটি কিনে স্কুল গৃহ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মায়ের নামে স্কুলটির নামকরণ হয়েছিল। প্রায় কুড়ি বছর (১৯৩৩—৫৩) স্কুলটি ছিল মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়। ১৯৫৩ সালে পরিণত হয়েছিল হাইস্কুলে।

শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয় যখন পুরুলিয়া বালিকা বিদ্যালয় নামে প্রাইমারী স্কুল হিসাবে চলছিল সেসময় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালু হয়েছিল একটি নারী শিক্ষার পাঠশালা। সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন অমলাদেবী। এখন যেখানে নিস্তারিণী কলেজ সেটি ছিল আমেরি সাহেবের বাংলো। দেশবন্ধু বাড়িটি কিনে নিলে 'সি. আর. দাসের বাংলো' নামে সেটি পরিচিত হয়ে উঠেছিল। দেশবন্ধুর বাবা, ভুবনমোহন এবং মা, নিস্তারিণী দেবী এখানে থাকতেন। মাঝে মাঝে তাদের

---

৫. হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছিল ১৯[illegible]১ সালে। বিদ্যোৎসাহীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কৃষ্ণকিশোর অধিকারী, রামচরণ সিংহ, নন্দলাল ঘোষ, রামদয়াল মজুমদার এবং ডা. প্রশান্তকুমার দে। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বামাপদ বা[illegible]।

৬. পুরুলিয়া পৌর প্রতিষ্ঠানের [illegible] [illegible]ক, সুরেশচন্দ্র সরকার, ও শশধর গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্কুলটি পরিচালিত হত।

৭. হরিপদ দাঁর জন্ম বাংলা ১২৮৩ সন, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে। পিতা বাবুরাম দাঁ। ইঁটের ব্যবসা ও ঠিকাদারি করে বেশ অর্থ উপার্জন করেছিলেন। নিজে লেখাপড়া শিখতে না পারলেও শিক্ষা [illegible] ছিল প্রবল। সেজন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। মৃত্যু ৩ আষাঢ় ১৩৩৪ সন।

মেয়েরাও এসে বাবা মায়ের কাছে থেকে যেতেন। অমলাদেবী এভাবে একসময় ছিলেন প্রায় পাঁচ বছর (১৯১৬—২১)। বয়স্ক মেয়েদের জন্য বাংলোতেই একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। সেখানে গান, লেখাপড়া ও সেলাই একই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হত। অমলাদেবীর নিজের পুসপুল গাড়িতে করে আনা হত মেয়েদের। রাঁচি থেকে শান্তশীলা রায় নামে একজন শিক্ষিকাকেও আনা হয়েছিল। স্কুলটি অমলাদেবীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবার ফলে ভেঙ্গে গিয়েছিল (১৯২২)। অমলাদেবী একটি 'বিধবাশ্রম'ও খুলেছিলেন। দুটি প্রতিষ্ঠানের দেখাশুনা করতেন কালীনারায়ণ সেনগুপ্ত।

১৯৩৪-৩৫ সালে 'গার্লস কোচিং ইনসটিটিউশন' নামে একটি কোচিং স্কুল খোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বয়স্কা নারীদের বিশেষ কোচিং দিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি করা। স্কুলটির উদ্যোক্তা ছিলেন হরিপদ রায়ের বাবা বঙ্কিমচন্দ্র রায়। ছাত্রী ছিলেন ৩০।৩৫ জন। বর্তমানে শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে 'জ্যাকেরিয়া ম্যানসনে' চলত স্কুলটি। পরবর্তী-কালে নীলকুঠি-ডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়েছিল।[৯]

প্রাক্তন মানভূম জেলায় প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঝরিয়া সহরে (১৯৩৬-৩৭)। ঝরিয়া রাজের উদ্যোগে। পুরুলিয়া সহরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনসটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, জহরলাল বসু। কাশীপুর রাজবংশের জনার্দন কিশোর সিংহ দেওয়ের বদান্যতায় স্থাপিত হয়েছিল কলেজটি (১৯৪৭-৪৮)। পুরুলিয়া সহরে বঙ্গভুক্তির আগে এটিই ছিল একমাত্র কলেজ। বর্তমানে জেলায় কলেজের সংখ্যা আটটি।[১০]

সর্বভারতীয় মানের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরুলিয়াকে ভারতবর্ষের শিক্ষা-ক্ষেত্রে পরিচিতি দান করেছে। তাদের মধ্যে একটি, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন

---

৮ ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন চারুলতা চৌধুরী, সরলা কর, রাণু সেন, হাসিনা বিবি, শচীন্দ্রলাল ঘোষের মেয়েরা প্রভৃতি।

৯. পুরুলিয়ার স্ত্রীশিক্ষা—শ্রীমতী রেখা মল্লিক (২১।১।৮৩) এবং ৺অশোক চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত।

১০. (১) জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া সহর (২) নিস্তারিণী কলেজ, পু: স (৩) টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পু: স (৪) জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, পু: স (৫) রঘুনাথপুর কলেজ, রঘুনাথপুর (৬) অচ্ছুরাম মেমোরিয়াল কলেজ, ঝালদা (৭) রামানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ, লোলাড়া (পুঞ্চা), (৮) বলরামপুর কলেজ।

বিদ্যাপীঠ, অপরটি পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে, পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির পর। পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহ ও সহযোগিতা ছিল বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠিত হবার নেপথ্যে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ছিলেন প্রধান কর্ণধার।[১১] ১৯৭৬ সাল থেকেই বিদ্যাপীঠ সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুরু করেছিল।[১২] বর্তমানে বিদ্যাপীঠটি যেমন জেলার অহংকার, তেমনি পশ্চিমবাংলারও। পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলেরও জন্ম হয়েছিল জেলাটির বঙ্গভুক্তির পরে। সেটির পিছনেও ডা. রায়ের প্রচেষ্টা এবং উদ্যম ছিল অনেকখানি। বঙ্গভুক্তির পরে সবদিকে অনগ্রসর এই জেলাটিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ডা. রায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে তা আজ মহীরুহে পরিণত।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কারিগরী শিক্ষার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে জেলায়। বিশ শতকের প্রথম দিকে জিলা বোর্ড ও সরকারি অনুদানে দুটি সরকারি স্কুল পরিচালিত হত ঝালদায়। সেখানে কামান, তরোয়াল, ছুরি ও চাষের যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত। কাঠের কাজে প্রশিক্ষণের জন্য জার্মান লুথারিয়ান মিশনের উদ্যোগে একটি স্কুল পরিচালিত হত পুরুলিয়া সহরে। জিলা বোর্ডের পরিচালনায় তাঁতীদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুল ছিল রঘুনাথপুরে।

পুরুলিয়া জেলা প্রধানত আদিবাসী ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক অধ্যুষিত। শিক্ষায় অনগ্রসর।[১৩] তাদের ভাষা, দৈনন্দিন জীবনযাপন, রুচি ও জীবনবোধ পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে, ভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। নানাদিক থেকে আগত বিমিশ্র জনগোষ্ঠী কাছাকাছি বসবাস করার ফলে কথ্য ভাষাও নতুনভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার সাধারণ কথ্য ভাষা থেকে সে ভাষা স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে।

---

১১. স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ লিখেছেন তৎকালীন শিক্ষা সচিব ড. ডি. এম. সেনের অনুরোধে বিদ্যাপীঠের একটি শাখা পুরুলিয়ায় স্থাপিত করা স্থির হয়েছিল।—The Ramkrishna Mission Vidyapith, Purulia and the Museum.

১২. ১৯৭৬ সালে প্রথম চারজন ছাত্র যথাক্রমে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ২য় ও চতুর্থ (টেকনিক্যালে) এবং হিউম্যানিটিজে ৩য় ও ১০ম স্থান অধিকার করেছিল।

১৩. বিশ শতকের গোড়ায় (১৯১১) জেলায় শিক্ষিতের হার ছিল ৪.২%, বাগমুণ্ডি থানায় ছিল ২%, বরাভূমে ২.৪%। বর্তমানে (১৯৮১) জেলায় শিক্ষিতের হার ২৯.৮২% (পুরুষ ৪৫.৫৮%; নারী ১৩.৩৪%)।

গ্রীয়ারসনের ভাষা সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল ১৮৯১ সালের জনগণণার পরিপ্রেক্ষিতে। ছোটনাগপুরে তখন বিহারী বা হিন্দী প্রচলিত ছিল। ছোটনাগপুরের পূর্বে, মানভূম জেলায় চালু ছিল বাংলাভাষা।[১৪] প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যা পাহাড়ের পশ্চিমদিকে তখন কুর্মালি ভাষা প্রচলিত ছিল। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে ছিল ঝালদা, বাগমুণ্ডি, ইচাগড়, নিমডি প্রভৃতি। পাতকুম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল খাড়িয়া-থর। দামোদর নদের উত্তরাংশ, তৎকালীন মানভূম জেলার গোবিন্দপুর মহকুমায় (বর্তমানে ধানবাদ জেলার একাংশ) প্রচলিত ছিল মগহী। মানভূম জেলার বৃহত্তর অংশে বাংলার সঙ্গে প্রচলিত ছিল খোট্টা বা বিমিশ্র বাংলা। তাকে কুর্মালিও বলা হত। কখনও সে ভাষা লেখা হত বাংলা অক্ষরে, কখনও কৈথি বর্ণমালায়, কখনও ওড়িয়া লিপিতে। মানভূম জেলায় খাড়িয়ারাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলতেন।

অনেকে মনে করেন ঝাড়খণ্ডের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে একদা কুর্মালি ভাষা প্রচলিত ছিল। অঞ্চল ভেদে ভাষার রূপ বদলে গেলেও মূল কাঠামোটি চিনে নিতে অসুবিধা ছিলনা। মুণ্ডা গোষ্ঠীর মানুষেরা তাকে বলতেন 'সেদানী'। সেদানী, মুন্ডা নন এমন গোষ্ঠী-জোটের ভাষা। হাজারিবাগে নাম নাগপুরিয়া, রাঁচির পাঁচ পরগণায় পাঁচ-পরগণিয়া, বিলাসপুরে ছত্রিশগড়ি, বস্তার জেলায় কুর্মালি প্রভৃতি। সেদানী বা কুর্মালির সঙ্গে বাংলা মিশে রাঢ়ী-বোলির সৃষ্টি হয়েছে।

ভাষা সমীক্ষায় গ্রীয়ারগণ মধ্যপূর্ব ভারতীয় গোষ্ঠীর যে ভাষা নমুনা হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা ছিল আর্য-পরিবারভুক্ত, বিহারী। কথ্য-মৈথিলি। যথা,

'কোনো মনুষ্য কে দুহ বেটা রহেহি। ওহিমেঁস ছোটকা বাপসঁ কহলক জে ও বাবু সম্পত্তিমেঁস যে হমর ভাগ হো সে হমরা দিঅ। তখন ও আপন সম্পত্তি বাঁটি দেলথীহি'।[১৫]

কুর্মালি ভাষায় বিষয়টি দাঁড়ায়, 'কুন আদমিকর দু (দুগো) বেটা রেহয়।

---

১৪ 'The Language of the Chotanagpur Plateau is Bihari, while that of the district below the plateau immediately to the east, Manbhum, is Bengali."—The Linguistic Survey of India, Report, vol-V, Part I by G. A. Grierson.

১৫. Specimen Translations in Various Indian Languages—G.A. Grierson, 1897.

উমান ম'ইধে (অকর মইধে) ছটকা বাপকে কহলেক্, এ বাপ ধন মে সে হাঁমর বাঁটে (হিঁসসায়) হেই সো হামকে দে'। তব্ উমান কে উসকে আপন ধন বাঁটি দেলেক'।[১৬]

কুর্মালি ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য কমবেশি রাঢ়ী বোলির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। যেমন, 'ল' দিয়ে অতীতকাল এবং 'ব' সংযোগে ভবিষ্যৎ কাল নিরূপিত হয়ে থাকে। প্রথমপুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষে ক্রিয়ার রূপ বদলে যায়। যথা, আমি খেয়েছিলাম, ম'য় খালাহ'। তুমি খেয়েছিলে —তয় ঠাহরলাইহা। তারা খেয়েছিল উ ঠাহরলাহে। ভবিষ্যৎ কালে বলা হয়, ওয় খাতে রেহবে—তুমি খেতে থাকবে। সে খাবে—উ খাতাক। লিঙ্গ ভেদেও ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়। যেমন, রাম স্নান করছে—রাম নাহাই সাহে। সুধা স্নান করছে—সুধা নাহাইসাহি। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী বা বস্তু বোঝাতে 'আহেক' শব্দ যোগ করা হয়। গরুগুলি আসছে—গাইগিলা আয়লে আহেক। ধানের চারা খেয়েছে—বিহিন খালাহেক। অনেক সময় 'আহ' যোগ করে অতীত ক্রিয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়। আমি করেছিলাম, ময় কেরলে আহ। অনেক ক্ষেত্রে 'ক' বা এক প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্যের বিশেষণ নিষ্পন্ন করা হয়। মাটির হাঁড়ি—মাটিক হাঁড়ি, পশমের কাপড়—পশমেক লুগা, তামার পয়সা—তামাক্ পৈসা ইত্যাদি।[১৭]

কুর্মালি, ভোজপুরী, মৈথিলি, মগহী, সাঁওতালি ও মুণ্ডারির সঙ্গে বাংলা মিশে মানভূমে নিজস্ব একটি কথ্য আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত হয়েছিল। মানুষের মুখে মুখে ঘুরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।[১৮] মানভূমী ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলা ভাষায় তাদের অনুপ্রবেশ স্বভাবিক নিয়মে ও অলক্ষে ঘটে চলেছে। যেমন, ডিহি, ডহর, ডুংরি, কুলহি (গ্রামের পথ), সগড়—গাড়ির নিরেট চাকা, ইত্যাদি। অনেক শব্দ আছে যা ব্যঞ্জনা ও শব্দচিত্র গঠনে অভিনব ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। যথা, সুপাতি—পায়ের পাতা, লুগা—কাপড়, চিনহাপ—পরিচিত, আফর—ধানের চারা, ইজতিয়া—

---

১৬. কুর্মালি ভাষা—ক্ষুদিরাম মাহাত।

১৭ বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, কুর্মালি ভাষাতত্ত্ব—ক্ষুদিরাম মাহাত এবং সাদরীর রূপরেখা—পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য।

১৮. অধ্যাপক সুবোধ বসুরায় 'ছত্রাক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'মানভূমের শব্দকোষ' ও 'মানভূমের প্রবাদ-প্রবচন প্রকাশ করে ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন।

জ্যোৎস্না রাত্রি, ডেহর—উঠান, ঝরক—তাপ, ফত্কো—পতাকা, ঝমরি—মুহ্যমান, চিক-দাগ, ফিগটা—অপরিচ্ছন্ন, ইত্যাদি।

ভাষাব স্বাতন্ত্র্য প্রবাদ প্রবচনকেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। মানভূমী প্রবাদ নিজস্ব শব্দ সম্ভার ও ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। যেমন, লালায় লালায জল যায় ভুলুকে মারে তালি—নালা দিয়ে জল চলেছে ছোট ছিদ্র বন্ধ করতে ব্যস্ত। ইংরেজি 'পেনি ওয়াইজ পাউনড ফুলিস' এর মানভূমী সংস্করণ। নাপতে নাই তার ফাটা পইলা অর্থাৎ নাই মামার চেযে কানা মামা ভাল। চেঁকার ডরে পালাই, তেঁতুল তলায বাসা বা যাকে ভয় তারই মধ্যে বসবাস! টিকটিকিএ ডুম্যার গিলে অর্থাৎ বামন হয়ে চাঁদে হাত। দয়া করে দিল নুন ভাত মারে তিন গুন —দয়া দেখালেই পেয়ে বসে। ছোলা খেলাএ গেল দিন, আজ বলে ডাহিন। তুলনীয় কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজী। ঠাকুরঝিঅ বড় ডণ্ডবৎঅ বড়—অর্থাৎ যে দেবতার যে নৈবেদ্য। গাঁয়ের ক'না (কণ্যা) সিঘাননাকী—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায়না। গাঁ বড় তার উপর কুলহি, তুলনীয়, বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

ভাষা ও শিক্ষার সমান্তরাল বেষ্টণীর মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল মানভূমি সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ। মধ্যবিত্ত সমাজের সীমিত গণ্ডী এবং ছাড়া ছাড়া বসবাসের ফলে লেখ্য সাহিত্য নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারেনি। লোক সাহিত্যেব বিশাল সমুদ্রেব মধ্যে তাব অবস্থা পালতোলা ক্ষুদ্র তরণীর মত। তারা সুচিহ্নিত, শিকড়হীন ও ক্রম বিবর্তনশীল। বনের ভেতর ছোট বাংলোর মধ্যে যেমন বনের লতা ফুল পাতা দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে, মধ্যবিত্ত সাহিত্যের মধ্যেও তেমনি এখানে লোকসাহিত্যের রূপ ও গন্ধ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা

'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের মহা বিটপীর ছত্রছায়ায় কোনও প্রকার পাদপ্রদীপের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যের বালাই না রেখে বনফুলের মত মানভূমের যে সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে —তার স্রষ্টা ও সাধক হলেন মানভূম ও বৃহত্তর মানভূমের লোক কবি ও লোকশিল্পীগণ'।—অশোক চৌধুরী, মানভূম সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনে (প্রথম অধিবেশন, ১৩৭৯) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।

মানভূম জেলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটতে সুরু করেছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি। মানবাজার থেকে জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হবার পর। জীবিকার সন্ধান প্রধানত তাদের চালিত করেছিল। উনিশ শতকে সুরু হলেও মধ্যবিত্তের আগমনের প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়নি কখনও। এখনও অব্যাহত। এরা মধ্যবিত্ত সাহিত্যের ঐতিহ্য জেলায় গড়ে তুলেছিলেন। লিখিত পুঁথি, পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে নথিভুক্ত করেছিলেন তাদের চিন্তা, চেতনা ও রসবোধের স্বরূপ। বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা যেহেতু ছিল মুষ্টিমেয়, তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে। বৃহত্তর জনসমাজ নিজেদের আনন্দ বেদনা, দুঃখ ও স্বপ্নের গান নিজেরাই রচনা করতেন। সমুদ্রে ঢেউয়ের মত তা উত্তাল হয়ে উঠত, পরক্ষণে ভেঙ্গে যেত। কদাচিৎ কেউ মনে রাখত তার সুর বা কথা, নতুবা বিস্মরণের অতল গহ্বরে চিরদিনের মত বিলীন হয়ে যেত। এই ভাবেই লোকসাহিত্যের ঐশ্বর্যপূর্ণ জগৎটি সৃষ্ট হয়েছিল। আজও তার অক্ষয় প্রবাহটি বয়ে চলেছে জন-সমাজের পাশে পাশে, স্মৃতি ও সঞ্চয়ে, দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তে।

আদিবাসী ও উপজাতির মধ্যে সাঁওতাল সমাজ জেলায় শুধু সংখ্যা গরিষ্ঠ নন, সংস্কৃতির পুরোধাও। তাদের মধ্যে লোক সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য অতীতকাল থেকে বিদ্যমান। বর্তমানে শিক্ষা প্রসারের ফলে সাঁওতাল সমাজের মধ্যেই একটি শ্রেণী এগিয়ে এসেছেন। তারা মধ্যবিত্ত সাহিত্যের আদলে লিখিত সাহিত্য গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছেন। একদিকে আধুনিক মানসিকতায় ঋদ্ধ, অন্যদিকে লোক সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট, এই নব্য সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হবার সন্ধিমুখে। পুরুলিয়ার সাহিত্য এই ত্রিবেণী সঙ্গমে আপন মহিমায় সমাসীন।

স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় প্রবাসী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[১] তাতে মানভূম জেলায় পাওয়া শিলালিপি ও সেইসঙ্গে একটি পুঁথির উল্লেখ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সময় মানভূম জেলায় বেশি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমানে যেসব শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের ভাষা নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্ত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে অনুমান করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে কাশীপুরের রাজাদের কাছে প্রদত্ত একরার, দলিল, লাক্ষার কারখানায় শ্রমিকদের দেওয়া অঙ্গীকার পত্র—এসব থেকে সরকারি ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত ভাষার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'পাণ্ডব-দিগ্বিজয়' নামে যে পুঁথিটির কথা শরৎচন্দ্র তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে সেটি রচিত হয়েছিল আঠারো শতকের প্রথমার্ধে।[২] এই অভিমত গ্রহণ করলে পুঁথিটি মানভূমে এ পর্যন্ত পাওয়া পুঁথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম।

পুরুলিয়ার শিল্পিশ্রমে অনেকগুলি পুঁথি রক্ষিত আছে।[৩] অধিকাংশ পুঁথিই রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাণ্ড ও পর্ব এবং পুরাণ ও ব্যাকরণের অনুলিপি। মানভূমের লেখকদের দ্বারা লিখিত পুঁথির সংখ্যা কম। তবু পুঁথিগুলির মধ্য থেকে তৎকালীন মানভূম ও বর্তমান পুরুলিয়া জেলায় সংস্কৃতি সম্পন্ন মধ্যবিত্তদের বসবাস সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা গড়ে তোলা যায়। মহাভারতের পুঁথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অশ্বমেধপর্ব, দ্রোণপর্ব,

---

১. মানভূম জেলার সাহিত্যসেবা ও গবেষণার উপাদান—শরৎচন্দ্র রায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২।

২. JBORS 1918

রচনাকাল ১০৭০ সন। কোন অব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল বোঝা যায় না।

৩. শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ অনুগ্রহ করে পুঁথিগুলি লেখককে দেখতে দিয়েছিলেন। ৩০ (তিরিশ) টি পুঁথি পরীক্ষা করা হয়েছিল।

স্বর্গারোহন পর্ব,[৪] প্রভৃতি। শেষোক্ত পুঁথি দুটিতে লিপিকারদের বাসস্থানের ইংগিত নেই। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ অধ্যায়টি লিখেছিলেন রামদাস বাওয়াজী।[৫]

রামায়ণের পুঁথিগুলির মধ্যে অন্যতম মহিরাবণ পর্ব,[৬] কুম্ভকর্ণের পালা,[৭] সুন্দরাকাণ্ড,[৮] প্রভৃতি। ভুলুইয়ের জগদ্রাম রায়ের 'অদ্ভুত রামায়ণের' অনুলিপিও আছে পুঁথিগুলির ভেতর। শ্রীরামচরিত লঙ্কাকাণ্ড নামে একটি পুঁথিও আছে। সেটির লিপিকাল ১৯ আশ্বিন ১২৬৪ সন। লিপিকারের নাম নেই। বাংলা হরফে লেখা তুলসীদাসী রামায়ণেরও পুঁথি আছে। লিপিকার মধুতটির গোপীনাথ রায়। রচনাকাল ২৩ ফাল্গুন ১২৭৩ সাল।

পুরাণ ও বৈষ্ণব পুঁথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামলোচন শর্মা কর্তৃক মৎস্য ও দেবীপুরাণের অনুলিপি। লিপিকাল ১৭৪১ শক। একই সময়ে রামলোচন 'যজুর্ব্বিদাং ঘটস্থাপনং' নামে একটি সংস্কৃত পুঁথি অনুলিপি করেছিলেন।

পুঞ্চার রামদাস বাবাজী দর্পনারায়ণের আজ্ঞায় রচনা করেছিলেন 'কলঙ্কভঞ্জন'। রচনাকাল ১২৫৫ সাল। পুঞ্চা যে কৃষ্টিবান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল তার আরও প্রমাণ মেলে অন্যান্য পুঁথিগুলি থেকে। যেমন, বৈষ্ণবচরণ দাস লিপিকার ছিলেন 'উদ্ধবসংবাদ' (১২৫৫ সন) এবং 'প্রেমভক্তি চন্ডিকা'র (১২৫২)।

পুঞ্চার মত চেল্যামাও ছিল মধ্যবিত্তদের সংস্কৃতি কেন্দ্র। বিশেষত চেল্যামা পরগণার ইপুর। ষটশব্দী ব্যাকরণের অনুলিপি করেছিলেন ইপুরের রবি মাহাত (১২৮৫) ও রুক্মিনী সরকার (১২৫৬)। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুলিপি করেছিলেন দ্বারকানাথ সরকার (১২৫১)। লিপিকারদের সঙ্গে যেসব পাঠকেরা সাহায্য করেছিলেন তারা ছিলেন যথাক্রমে মধু মাহাত, গোবর্দ্ধন মাঝি, ও মথুর মাহাত। চেল্যামার বুধু মাহাত একটি পুঁথি রচনা করেছিলেন। পুঁথিটির নাম ও রচনাকাল দুর্বোধ।

---

৪. অশ্বমেধপর্বের লিপিকার গুরুচরণ মিশ্র, সাং—আমবাতর, পরগণা-পাড়া, বাবলে পঞ্চকোট, লিপিকাল ১২৩৭ সন। দ্রোণপর্বের অনুলিপি করেছিলেন তুলসীরাম মাহাত, লিপিকাল ১২৭২ সন। স্বর্গারোহন পর্ব গান করতেন প্রেম মাহাতোর পুত্র ধনু মাহাত।

৫. রামদাসের বাড়ি ছিল পুঞ্চা। লিপিকাল ১২৬৯ সন ২ জ্যৈষ্ঠ।

৬. লিপিকার দাশরথি ঘোষ, চেল্যামা, ১২৬৮ সন, ১৬ পৌষ।

৭ লিপিকার হরলোচন দেব, গ্রাম ইছারিয়া, লিপিকাল ১২১০ সন। পালাটির রচয়িতা বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। তার পরিচয় ও বাসস্থান অজ্ঞাত।

৮. লিখিতং লুড়কু মাহাত, চাকলা পঞ্চকোট, পরগণা জয়পুর, হাড়গাড়া, লিপিকাল ২৭ বৈশাখ, ১২৭৪ সন।

রামদাস বাবাজীর মত শিখরভূমের নাগাড়া গ্রামের নটবর সিং চৌকিদার একটি মৌলিক পুঁথি রচনা করেছিলেন। সেটির নাম ঋতুভেদ শাস্ত্র। রচনাকাল ১৪ পৌষ ১২৫৮ সাল। ঋতুভেদ শাস্ত্রে অকালমরণ, দুঃখভোগ ইত্যাদি সবকিছু ঋতুও ঋতু-মিলনের ওপর আরোপ করা হয়েছিল। যথা,

ছয় দিবসে ঋতু রাখে যেই জন
পুত্র হইলে ভিক্ষা নাহি মিলে কদাচন।

বিলতোড়ার মোহন দাস সুবিখ্যাত অমরকোষের অনুলিপি করেছিলেন (১১৮৯ সন)। এটিই শিল্পাশ্রমে রক্ষিতও অনুলিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। রাহের ন্যায়চরণ রায় 'সন্ধাবিধি'র অনুলিপি করেছিলেন। বরাহভূম পরগণার বাতাসা গ্রামের রাধাচরণ দাস অনুলিপি করেছিলেন ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল (১২৯৪ সন)।

পুঁথিগুলি অধিকাংশ মাহাত, দাস, মাঝি, রাজোয়ার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎসাহী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুলিখিত হয়েছিল। ফলে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশীয় শিক্ষার চল হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এবং তারা বিদ্যোৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে কিছু পুঁথি আছে। বিদ্যাপীঠের পুঁথিগুলি বেশিরভাগ জেলার বাইরে থেকে সংগৃহীত। লিখিত পুঁথি ছাড়া কিছু কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল।[১০] গ্রন্থগুলির অধিকাংশই পুরুলিয়া সহরে মুদ্রিত হয়েছিল। জনপ্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পুঁথির। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পুঁথিটি জেলার লাড়া-পাবড়া গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেছিলেন। সম্পাদিত ক'রে প্রকাশও করেছিলেন।[১১] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছিলেন পুরুলিয়ার ক্ষেমানন্দ সতের শতকের প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলের কবি বর্ধমানের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ থেকে

---

৯. মিশন বিদ্যাপীঠের সংগ্রহশালায় রক্ষিত পুঁথিগুলি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল লেখকের। হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুঁথিগুলি দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

১০. গ্রন্থগুলির মধ্যে লেখক যেগুলির হদিস পেয়েছেন সেগুলির কথাই এখানে লিপিবন্ধ হয়েছে। বলা বাহুল্য এসব ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা এখনও লেখকের নজরে আসেনি। গ্রন্থগুলির অধিকাংশের জন্য বন্ধুবর শ্রীঅজিত মিত্রের কাছে কৃতজ্ঞ।

১১. বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১৬। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা, "পুরুলিয়ার মনসা-মঙ্গলের কবি ক্ষেমানন্দ"। দ্রষ্টব্য, পুরুলিয়া, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮২।

পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। পুরুলিয়ার ক্ষেমানন্দের বাড়ি ছিল ডিমডিহা গ্রামে। কেতকাদাস ক্ষেমনান্দের বাড়ি বর্ধমান জেলায়।

পুরুলিয়ার ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক ও মৌলিক রচনা বলেও ড. ভট্টাচার্য অনুমান করেছিলেন। চরিত্র চিত্রণ, ভাষা, বৈষ্ণব প্রভাব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যটি ক্ষুদ্র। মনসামঙ্গলের পুঁথি সাধারণত একমাস ধরে গেয়ে শেষ করতে হয়। এই পুঁথিটি একদিনের জাগরণ পালা হিসাবে গাওয়ার মত। পুঁথিটি কাব্যগুণ মণ্ডিত। কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এটিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। যথা,

রাম দুলালিয়া রে যাদব দুলালিয়া
ওরে আর কতদিন বেড়হাবে গোপাল হামাগুড়ি দিয়া ॥
নাঞিরে বিষ নাঞিরে নাঞি কালিয়ার গায়।
ধবল ধুলিয়ার বিষ ধুলিতে লোটায় ॥

যে পুঁথিটি পাওয়া গিয়েছিল সেটি ১২২৪ সাল বা ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত হয়েছিল। মূল পুঁথিটি রচিত হয়েছিল সম্ভবত তার কিছুকাল আগে অর্থাৎ আঠারো শতকে।

উনিশ শতকের শেষদিকে চৈতন্যদাস মণ্ডল বৃহৎ 'মনসামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। চৈতন্য দাসের বাড়ি ছিল গৌরাঙ্গডি থানার বনকাটি গ্রামে। গ্রন্থ হিসাবে কাব্যটি কলিকাতা থেকে মুদ্রিত হলেও প্রকাশিত হয়েছিল পুরুলিয়া সহরের চকবাজার থেকে। মনসামঙ্গল ছাড়া গ্রন্থটির মধ্যে আরও অনেকগুলি ছোট ছোট পুঁথি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। যথা, অথ জীবাত্মা কর্তৃক পরমাত্মার নিকট অতিরূপ অভিযোগ, স্বাস্থ্যবোধ কথন, অথ দেহতত্ত্ব কথন, সত্যপীরের কথা, অথ বিকন বিন্যাস ছড়া, অবস্থানুভব কাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যটি উচ্চাঙ্গের না হলেও মানভূম অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। রচনাকাল সম্বন্ধে চৈতন্যদাস লিখেছেন,

চারি ভাগ মনসামঙ্গল হৈল ইতি ॥
জনরব শাস্ত্র আদি অন্বেষণ ক্করে।
রচিল চৈতন্য দাস মনসার বরে ॥
দিক পৃষ্ঠে বসু ইন্দু শাক নিরূপণ।
শেষ পৃষ্ঠে বারমাস সালের গনন ॥

অর্থাৎ ১৮১০ শক বা ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল গ্রন্থটি। গৌরাঙ্গডি

তখন ছিল শিখরভূমির অন্তর্গত। রাজা ছিলেন নীলমণি সিংহ। কবির কথায়,

শিখর ভূমির নাম দেশের সংবাদ
রাজধানী কাশীপুর অধুনা প্রবাদ ॥
রাজা শ্রীশ্রী নীলমনি সিংহ বাহাদুর।
সুসম্ভ্রান্ত সুচতুর ধর্ম কর্মে শূর ॥
তদসুত হরিনারায়ণ যুবরাজ।
শ্রী জ্যোতিপ্রসাদ যুবরাজের অগ্রজ ॥

অথ জীবাত্মা ইত্যাদি গ্রন্থে কবি দ্ব্যর্থবোধক শব্দে পুঁথি রচনার চেষ্টা করেছেন। যেমন,

ক্ষমা নামে যোগাড় করিয়া ধনু ঢাল।
বুদ্ধি নামে সংগঠন তার তরোয়াল ॥
নিষ্ঠা নামে কামান ভক্তি নামে বারুদগুলি।
নির্ভয় নামে বন্দুক বাদ্য করতালী ॥ —ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যাবধি কথনে আমাদের চারপাশে যেসব গাছপালা ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য আছে তাদের মধ্যে ভেষজগুণের সন্ধান দিয়েছেন কবি।

উঠান দ্বারে দুর্বাগুলি, খিড়কী পাশে শিউলি গাছে।
বাগানে ঐ বেলের পাতা, তুলসী আছে হাতের কাছে ॥
যেদিকে দেখ সবই ঔষধ, ছড়িয়ে আছে চারিধার।
কোন জিনিষটি কি গুণ ধরে, জানিলে লাগে চমৎকার ॥

চিকন বিন্যাস ছড়ায় কিসে কি চিকন হয় সেকথা বলেছেন লেখক। যেমন,—

ঘসা মাজায় ভূষণ চিকন, চালায় চিকন বাট।
কারিকরে গড়ন চিকন, রেঁদায় চিকন কাঠ ॥

তুলসীদাসের রামায়ণ বাংলা পদ্য ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন মদনমোহন চৌধুরী। অনুবাদ গ্রন্থ হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২২ বঙ্গাব্দে।[১২] মদনমোহন ওকালতি করতেন পুরুলিয়ায়। কবি প্রতিভা ছিল উচ্চাঙ্গের, মূলের প্রতি দৃষ্টিও ছিল সজাগ। যেমন, তুলসীদাসের মূল রচনা :

১২. বর্তমান সংস্করণটি মুদ্রিত হয়েছিল পুরুলিয়া সাবিত্রী প্রেস থেকে এবং প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৯ সালে। বালকাণ্ড ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হবার পর লালগোলার রাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়ের অর্থানুকূল্যে অবশিষ্ট কাণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছিল (১৩২৬ ও ১৩২৯ বঙ্গাব্দে)। মদনমোহনের জন্ম ১২৭১ এবং মৃত্যু ১৩৫০ বঙ্গাব্দে।

নীঁদহু বদন সোহ সুঠি লোনা।
মঁনহু সাঝ সরসীরুহ সোনা ॥
ঘর ঘর করহি জাগরণ নারী।
দেঁহি পরস্পর মঁগল গারী ॥

মদনমোহনের অনুবাদ,

অতি মনোহর শোভে বদন নিদ্রিত।
যেন সন্ধ্যাগমে পদ্ম হয়েছে মুদ্রিত ॥
প্রতিগৃহে নারীগণ করি জাগরণ।
পরস্পরে শুভ গালি করে বরষণ ॥

আড়ষা থানার মিশিরডি গ্রামের ভরত দাস রচনা করেছিলেন জনক সংবাদ রামায়ণ। গ্রন্থটি শেষ হয়েছিল ১৩৭০ সালে।[১৩] ভরতের পিতার নাম শ্যামাপদ, মাতা অঞ্জনা, জন্ম ১৩২১ সালে মকর দিনে। রামায়ণটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। মূল কাহিনী রামায়ণ অনুসরণ করেছে, যদিও তা ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়নি। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দশরথ কর্তৃক রামের স্তব, রাবণের পক্ষীবেশে অযোধ্যায় গমন, জানকীর নিকট রাবণের বর লাভ, রাবণ কর্তৃক রামের স্তব, শ্রীরামের বিশ্বরূপ ধারণ ইত্যাদি।

গ্রন্থটি উচ্চাঙ্গের কাব্যগুণ মণ্ডিত না হলেও পয়ার ছন্দে জনশিক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল মনে হয়। রামচন্দ্রকে দেখতে পাখির বেশ ধরে অযোধ্যায় গেলেন রাবণ। কবির কথায়,

দশানন পক্ষী বেশ করিয়া ধারণ
শূন্য মার্গে বায়ু বেগে করিল গমন।

পাখির চেহারা বিরাট সূর্য ঢেকে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল অযোধ্যার আকাশ।

পক্ষী রূপ ধরি এল অযোধ্যা নগরে।
উড়িয়া বেড়ায় সেই আকাশ উপরে ॥
ঢাকিল সূর্যের তেজ হল অন্ধকার।
মহা ভয়ংকর পক্ষী পর্বত আকার ॥

রামসুন্দর বিদ্যালঙ্কার শ্লোকার্থ বোধিকা নামে একটি বৈষ্ণব গ্রন্থ সংকলন করে অনুবাদ করেছিলেন। গ্রন্থটি ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃতের সংস্কৃত শ্লোকগুলির সংকলন। মানবাজারের রাজা মুকুন্দনারায়ণ

---

১৩. 'সন ১৩৭০ সালে রহনী দিবসে / গ্রন্থ পূর্ণ করিলাম রাম কৃপা বসে।'

দেব ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক।[১৪] কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিংহ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক। তার আশ্রয়ে স্বনামধন্য কয়েকজন পণ্ডিতের সমাবেশ ঘটেছিল কাশীপুরে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, নৈয়ায়িক পার্বতীচরণ বাচস্পতি, কেদার ন্যায়রত্ন, গণেশ দত্ত (দ্বারভাঙ্গা), শীতল ন্যায়বাগীশ। পুরুলিয়া জেলার কিছু কিছু অঞ্চলেও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের বসবাস গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, মুরাডি গ্রামের বেণীমাধব রায়, চেল্লা-কামারপাড়ার শিবরাম পদরত্ন, পানুড়িয়ার কবিরাজ নীলকণ্ঠ কবিরত্ন, বৈদান্তিক হারাধন বেদান্তবাগীশ, নডিহার তান্ত্রিক চূড়ামণি কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্বিদ রাঘব চক্রবর্তী প্রভৃতি।

রাজা নীলমণি সিংহের সময়েই মাইকেল মধুসূদন দত্ত গিয়েছিলেন পুরুলিয়ায়। প্রথমে গিয়েছিলেন মামলা উপলক্ষ্যে। স্থানীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী মিশন হাউসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কাঙ্গালীচরণ সিংহের পুত্র খ্রীস্টদাস যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন, মধুসূদন তার ধর্মপিতার কাজ করেন। সে প্রসঙ্গে একটি কবিতাও রচনা করেছিলেন[১৫]

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;

শেষে লিখেছিলেন,

লোকে যারে বলে
খ্রীস্টদাস, লভো নাম, আশীর্বাদ করি,
জনকজননী সহ, প্রেম কুতূহলে!

কিছুদিন পরে নীলমণি সিংহের আইন উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কারও কারও মতে এসটেট ম্যানেজার। পঞ্চকোটের প্রাসাদ, গড় তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, অবলুপ্ত রাজ্যশ্রী। সেসব পুনরুদ্ধারের বাসনা ছিল কবির। একটি কবিতায় ধ্বনিত হয়েছিল সেই চিত্র।

কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি

১৪. গ্রন্থটি চিৎপুর রোড, কলিকাতা থেকে ১৭৯২ শকাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৭৯২ শক=১৮৭০ খ্রী।

১৫. অভ্যর্থনার সময় যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি পুরুলিয়া (পুরুল্যো?) নামে পরিচিত।

উজ্জ্বলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি।[১৬]

উদ্দীপ্ত হয়েছিল কবির কল্পনা। পঞ্চকোটে আসতে পেরে নিজেকে তিনি ভাগ্যবান মনে করেছিলেন।

কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে)
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট ;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।[১৭]

পঞ্চকোট বা কাশীপুরে বেশিদিন থাকা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাশীপুর ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন অকস্মাৎ। হঠাৎ চলে যাওয়া সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত।[১৮] এ সম্বন্ধে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের অভিমতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[১৯] মার্জিত রুচি ও আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গি সম্পন্ন কবি গ্রাম্য রাজার সাহচর্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। হয়ত তাদের মধ্যে সেজন্য মত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ফলে অকস্মাৎ পুরুলিয়া (কাশীপুর) ত্যাগ করেছিলেন।

পঞ্চকোট রাজশ্রী ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা সঙ্গে নিয়েই কবি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

ভেবেছিনু, গিরিবর ! রমার প্রসাদে,

---

১৬. পঞ্চকোট গিরি।

১৭ পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী।

১৮. 'মধু-স্মৃতির লেখক নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে একজন রজকের কথায় কবির প্রতি রাজা নীলমণি সিংহ বিরূপ হয়েছিলেন। শান্তি সিংহ (দেশ, ১১ নভে, ১৯৭৮) কবির পুরুলিয়া ছেড়ে যাবার নেপথ্যে কল্পিত রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কবির রোমান্টিক সম্পর্কের প্রতি ইংগিত করেছেন।

১৯. "The one that I at present recollect was in connection as legal adviser of the Raja of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him that he could be happily compared to a street hydrant of the Calcutta water works. Anybody who choose had only to put it by the ear and then drink his fill !" মধুসূদন প্রথম পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২, ছেড়েছিলেন নভেম্বর মাসে।

তাঁর দয়াবলে
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায় ; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।
—(পঞ্চকোট গিরি বিদায়—সঙ্গীত)।

পুরুলিয়ার প্রকৃত গৌরব লোকসাহিত্যে। সে সাহিত্যের নানা ধারা। সঙ্গীত, প্রবচন, রূপকথা ও উপকথা, ধাঁধাঁ বা ফলই, নিজস্ব শব্দ চিত্র ও বাগ-বৈভব।

লোকসাহিত্যের প্রধান ধারা বিধৃত সঙ্গীতে।[২০] পুরুলিয়া জেলার সীমানা ছাড়িয়ে তা ছিল বৃহত্তর মানভূমে পরিব্যাপ্ত। উত্তরে দামোদর, দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে পরিধি প্রসারিত হয়েছিল আরও দূর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে। লোকসঙ্গীতের হৃদস্পন্দন ঝুমুর। পঞ্চকোটের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও প্রকাশ করেছিলেন ভবপ্রীতানন্দ ঝায়ের 'ঝুমুর রসমঞ্জরী'। জ্যোতিলাল মহাদানী সূত্রপাত করেছিলেন বিনন্দ সিংহের ওপর আলোচনা।[২১] উপেন্দ্রনাথ সিংদেও ঝুমুরের তাল নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২২]

লোক সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে অজস্র রূপকথা ও উপকথা মুখে মুখে চলে এসেছে। মানভূমের ভাষায় তাদের বলা হয় রাতকথা বা কহনী। গল্পগুলির মধ্যে এখানকার মাটি, গাছপালা, দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা বিধৃত হয়ে আছে।[২৩] গল্প যিনি বলেন তাকে বলা হয় 'বলাইয়া', শ্রোতা 'শুনাইয়া', তৃতীয় পক্ষ থাকেন সায় দেবার জন্য। গল্প গুলি সহজ সরল ও জটিলতা বর্জিত। যেমন বুড়াবুড়ীর গল্প। এক গ্রামে থাকত এক বুড়ো ও এক বুড়ি। তাদের ছেলেপুলে ছিল না। কথাবার্তাও ছিলনা দু'জনের মধ্যে। মাছ ধরা উপলক্ষ্য করে কথার সূত্রপাত হল। পড়শির কাছ থেকে পলই বা মাছ রাখার পাত্র চেয়ে আনল বুড়ি। ঘরের চালে রেখে বুড়োকে বলল, ছানে আছে জাল পলই, নিয়ে কেন নাই

---

২০ সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' অধ্যায়।

২১. ছোটনাগপুরের মহাকবি শ্রীবিনন্দ সিং (সিংহ)—জ্যোতিলাল মহাদানী।

২২. ছোটনাগপুর তালমঞ্জরী—রাজাবাহাদুর শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিং দেও। ২১ ও ২২-এ উল্লেখিত প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ 'ছত্রাক' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

২৩. 'ছত্রাক' পত্রিকায় শ্রীঅরুণপ্রকাশ সিংহ, প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা দ্রষ্টব্য।

যায়? বুড়ো অনেক মাছ ধরে আনল। বুড়ি মেহি মেহি মশলা পিষ্যেখন গরগর্যা করে মাছের ঝোল বানাল। বুড়ো স্নান করতে গেলে লোভে লোভে খেয়েও নিল সব। দুজনের মধ্যে কথোপকথন সুরু হল মাছের হিসাব নিয়ে। বুড়ো বলল, হে' ভালা, মাছ ধল্লি ধোল, শুধাই যে ঝোল। বুড়ি হিসাব দিল, যার কাছ থেকে পলই আনা হয়েছিল তাকে দিতে হয়েছে দুটো, দুটো নিয়েছে বৈদ্য, পাড়াপড়শি ভাট ব্রাহ্মণ দুই, চিল বিড়াল, ভাজতে নিয়ে নষ্ট, সব মিলিয়ে দেখা গেল একটি মাছ শুধু থাকে। বুড়ো রাগ করে বলল, হ'রে বাবু তাও ত থাকে এক। বুড়ি রেগে বলল, চ'ইখ খাঁয়ে নেজা-মুড়া দেখ। শেষে ঝংকার দিল, হামি বড় ঘরের ঝি, মাছের হিসাব দি।

এমনি গল্প আছে কাক ও কুচো-চিংড়ির। কাক বলেছিল যে সে কুচো-চিংড়িকে খাবে। সেইসঙ্গে 'লো' বলেছিল। তাতেই কুচো-চিংড়ির আপত্তি। সম্পর্ক যেখানে খাদ্য-খাদকের, সেখানে বলার কিছু নেই। কিন্তু খাদ্যকে অপমান করার অধিকার নেই খাদকের।

খাব বইল্ল্যেক ভাল কল্ল্যেক 'লো' বল্লোক কেনে?
ঐ কথাটি শুইনে আমার দিক্ লাইগ্যেছে মনে ।।

তারপর নানাভাবে কাককে সে নাস্তানাবুদ করেছিল।

বানর বানরী নিয়ে অনেক গল্প আছে মানভূমে। সওদারের মেয়েকে এক বাঁদর তার অযোধ্যাপাহাড়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির ভাই খবর পেয়ে বাঁদরের দুই ছেলেকে কেটে তেলের কড়াইয়ের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছিল। পালিয়ে এসেছিল মেয়েটিকে নিয়ে। অপর একটি গল্পে দেখা যায় পুত্রহীন এক বানরী রাজকুমারকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়ি। কিছুদিন পরে রাজকুমার চলে গেলে বানরী তাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াত। গরু ও মোষ যারা চরিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাদের জিগেস করত,

কাড়াবাগালি বগি'য়া
কোন ঘাটে রাজার কুমার যাতুয়া
পায়ে মুচুর মুচুর জুতুয়া
হাতে লাল বাঁধা ছড়িয়া
কানে উদয় রাঙার ফুল।

উদয়রাঙা অর্থাৎ উদিত সূর্য রঙের ফুল। বা অরুণবর্ণ।

কুইলাপাল থেকে কিছু রূপকথা একসময় সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়েছিল।[২৪] রূপকথাগুলি উপভোগ্য। রূপকথার মতই অজস্র ছড়া মানভূমে স্মৃতির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। কথায় কথায়, অনুরূপ ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে।

কুলি কাদা পায়ে আলতা, তাই আস্যেছে লিতে লো
হারাল সিঁদুরের কৌটো মন সরেনা যাত্যে লো।

দৈনন্দিন জীবনে যেমন ছড়া জীবনের পরতে পরতে লেগে আছে, তেমনি বালকবালিকাদের খেলাধুলার মধ্যেও বিছিয়ে আছে ছড়ার ছন্দ। প্রতিটি খেলার সঙ্গে কোন না কোন ছড়া সংযুক্ত।[২৫] যথা, ভেলেগুড় খেলার ছড়া ;

ভেলেগুড়ো খেলিয়া বাঘ মারি ছেলিয়া
বাঘের তেলে পিদ্দিম জ্বলে
জ্বলুক পদিম উঁচুক ধুয়া খেইলতে আয়রে ছুঁচামুহা, ইত্যাদি।

রাতকথার মত আর এক ধরণের কহনী প্রচলিত আছে পুরুলিয়া অঞ্চলে। সমতল বঙ্গে বলা হয় ধাঁধাঁ। পুরুলিয়ায় নানা নাম। জানকহনী, ভাঙ্গান কহনী, কহল কথা ও পলহই। প্রশ্নকর্তা মুচকি মুচকি হেসে জিগেস করেন,

কাটা মাথা বাঁচে কি ?
বিনা শব্দে পড়ে কি ?

কিছুক্ষণ ভেবে শ্রোতা উত্তর দেন, শিশির। জটীল পলহইও আছে। যেমন,

আয়বুড়াতে মারেছিলি সহেছিলাম বুকে
বিহা হয়েছে মার দেখিন মরদ বলি তখে। (উত্তর—মাটির পাত্র)

অথবা,

মা হল লতা বাপ হল ছাতা
বিটি হল সুন্দরী, বেটা ডাকুলডুমা। (উত্তর—লাউ)

এমনি অনেক আছে ধাঁধাঁ। ঘনঘোর বর্ষায় দাওয়ায় বসে কেউ প্রশ্ন করেন। বল দেখি,

---

২৪. দ্রষ্টব্য, বাংলার লোক-সাহিত্য—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং সীমান্তবঙ্গের লোক-সাহিত্য—সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫. শ্রী জগদীশ সরখেল 'মানভূমের খেলার ছড়া' প্রবন্ধে এ ধরনের অনেক ছড়ার উল্লেখ করেছেন। মানভূমে প্রচলিত জনপ্রিয় খেলাগুলির মধ্যে অন্যতম, লুকলুকানি, চাঁদা চক্কড়, বোমবোম, শালুকডাটা, কানাঘুঙরী, রাজা সিনান, এল্লাঘাসি, ভেলেগুড়, থুকথুক দাঁড়, বুড়ির বিয়াল, ইচিংমিটিং, অয়াইমরাই প্রভৃতি।

উফলিলে শোলা, ডুবলে পাথর
দৌড়লে খ'ড়া, ডাকলে ভেড়া।

সমস্বরে জবাব আসে— ব্যাঙ।

কোন কোন ছড়া প্রতীক ও ব্যঞ্জনায় সাহিত্যগুণ মণ্ডিত। যেমন ঝালদার দিকে প্রচলিত ছড়াটি,

বাঘ বাঘিন হাল জোতে
কুকুর বুনে ধান
বনের বাঁদর নুড়া ঝাড়ে
খেড়িয়া কৃষাণ। (উত্তর—খাওয়া)

এখানে বাঘ-বাঘিন, দু পাঁটি দাঁত; কুকুর হাত, বাঁদর জিভ, খরগোস উদর।[২৬]

জেলায় আধুনিক মধ্যবিত্ত সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে। ক্যুপল্যানড তার গেজেটিয়ারে দুটি পত্রিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। মানভূম ও পুরুলিয়া দর্পণ।[২৭] 'মানভূম' পত্রিকার উল্লেখ অন্যত্রও দেখা যায়।[২৮] সম্পাদক ছিলেন রাখালদাস ভট্টাচার্য কাব্যানন্দ। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩০৬ সনে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। প্রারম্ভে বলা হয়েছিল 'মধুময় মনোহর মানভূম, মাধুর্যের মহিয়সী মহিমায় মণ্ডিত মনোহারিত্বে মানব-মন মোহিত করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইব।' 'পুরুলিয়া দর্পন' সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ আরও কটি প্রাচীন পত্রিকার কথা উল্লেখ করেছেন,[২৯] কিন্তু তাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদি পাওয়া যায় না। পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির আগে কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হত জেলায়।[৩০] জেলায় চালু এবং উঠে যাওয়া পত্রপত্রিকার সংখ্যা শতাধিক।[৩১]

---

২৬. Riddles of Purulia by Prof. Subodh Basu Roy.

২৭. H. Coupland-এর গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। অর্থাৎ ১৯১১ সালে পত্রিকাদুটি চালু ছিল।

২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—বাংলার সাময়িক পত্র—দ্বিতীয় খণ্ড।

২৯. যথা, রাজশক্তি। ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষীরোদকুমার রায় সম্পাদিত Chotanagpur Times, নির্মলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত Writers Journal.

৩০. যথা, মজলিশী, ত্রস্পর্শ, অর্চনা, মানভূম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গেজেট, দীপশিখা, পল্লী, ম্যাজিক, জনআহ্বান, দেশের কথা, ফাল্গুনী এ ছাড়া আর যেসব পত্রিকা ছিল তাদের হদিস দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায়।

৩১. তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তুফান, শিক্ষাসত্র পত্রিকা, রবীন্দ্র পরিষৎ পত্রিকা, ধ্রুবতারা,

পুরুলিয়া সহরের শিল্পাশ্রমের কর্মীদের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।[৩২] পত্রিকাগুলির মধ্যে দুটি পত্রিকা উল্লেখিত হবার দাবী রাখে। মুক্তি ও চাষীর আলো। ১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হবার পর অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করে মুক্তি এখনও বেঁচে আছে। দ্বিতীয় পত্রিকাটি বন্ধ। কিন্তু বৈশিষ্ট্যে সেটি ছিল দৃষ্টি আকর্ষণকারী। গ্রামাঞ্চলে চাষীদের কৃষিকর্মে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে চালু হয়েছিল পত্রিকাটি। পত্রিকাটি ছিল সুপরিকল্পিত ও সুসম্পাদিত। অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হত জেলায়।[৩৩] পত্রিকাগুলি চিহ্নিত ছিল বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যে।

পুরুলিয়া সহরের মত আদ্রাও মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। রেল অফিস ও রেলওয়ে সেটেলমেনটে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত সমাজ আত্মপ্রকাশের জন্য পত্রপত্রিকার সহজ মাধ্যমটি বেছে নিয়েছেন। আদ্রা থেকে তাই প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা কম নয়।[৩৪]

পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমের মত রামচন্দ্রপুরও এক সময় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। সেখানকার প্রাণপুরুষ ছিলেন অন্নদাকুমার চক্রবর্তী।[৩৫] তার সম্পাদনায় ও পরবর্তীকালে তার অনুগামীদের সম্পাদনায় কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৬] রামচন্দ্রপুর ও আদ্রার কাছাকাছি রঘুনাথপুর। সেখান থেকেও কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।[৩৭] জেলার

পুরুলিয়া, জনতার ডাক, সংহতি, সন্ধান, পুরুলিয়ার কথা, জিরাফ, বৈশাখী, অব্যয়, আমরা সত্তরের যীশু, অগ্রদূত, অহনা, জয়যাত্রা, দীপ্তি, মধুমিতা, শিল্পী, সোনালী, শাল পলাশের রঙ, রঞ্জন, সবুজকলি, সাহিত্যিকা, ক্রমশ প্রকাশ্য, প্রভৃতি।

৩২. যথা, মুক্তি, লোকপত্র, সংঘপত্র, চাষীর আলো প্রভৃতি।

৩৩. যেমন, সমবায়ের কথা, হোমিওবানী, নিরাময়, গ্রন্থাগার কর্মী।

৩৪. যথা, বিচিত্রা, সবুজ সংকেত, সাহিত্য বিচিত্রা, নীলাশ, জোনাকী, ডহর, কৃষ্ণচূড়া, পলি, ইত্যাদি।

৩৫. কেউ কেউ লিখেছেন অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। এই গ্রন্থের অন্যত্র অন্নদাপ্রসাদ লেখা হয়ে থাকলেও প্রকৃতনাম হবে অন্নদাকুমার চক্রবর্তী।

৩৬. যথা, তরুণশক্তি, সংগঠন, মন্দির, পল্লীসেবক, পুরুলিয়া বার্তা, পদক্ষেপ ইত্যাদি।

৩৭. তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অযান্ত্রিক, শিখরভূমি, টুবলু, রঘুনাথ, আরফাত, দেশকল্যাণ প্রভৃতি। প্রকৃত-পক্ষে রামচন্দ্রপুরের কর্মীদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলির অধিকাংশের প্রকাশস্থল ছিল রঘুনাথপুর।

থানা সহরগুলি থেকেও প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা কম নয়।[৩৮] প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে কয়েকটি পত্রিকা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। যেমন, 'ছত্রাক'। এটি সাহিত্য পত্রিকা ও ত্রৈমাসিক। লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করার এবং স্থানীয় ভাষায় গল্প কবিতা রচনার জন্য পত্রিকাটিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অপর একটি পত্রিকা মনিহারা গ্রাম থেকে প্রকাশিত 'কেতকী'। এটি কবিতার পত্রিকা। এক যুগেরও বেশী পত্রিকাটি টি'কে আছে ও সুদূর গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।[৩৯]

সংবাদ পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক জেলা থেকে প্রকাশিত হয় অনেকগুলি।[৪০] তাদের মধ্যে সবথেকে প্রাচীন 'মুক্তি' এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। চরিত্র ও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে পত্রিকাগুলি আঞ্চলিক। জেলার ছোটবড় ঘটনা ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতিরূপ নথিভুক্ত করে চলেছে।

১৯৭০-৭১ সালে জেলায় পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থানের মত মিনি পত্রিকা প্রকাশার ঢেউ উঠেছিল। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকগুলি মিনি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তখন।[৪১]

একক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিসাবে পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতালদের বসতি গুরুত্বপূর্ণ। এইসব অধিবাসীদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ঘটে চলেছে। আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তারাও পত্রপত্রিকার পরিযানটি বেছে নিয়েছেন। পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির পর, বিশেষত

---

৩৮. যথা, মানবাজার থেকে প্রকাশিত—কংসাবতী, বোধি, অনুষ্টুপ, অনুভব, জঙ্গলমহল ঝালদা ও তুলিন থেকে—তপোবন, সুপ্রভাত, ঝালদা সমাচার, শিল্পী, সোনালী, মজদুর দর্পণ, প্রভৃতি ; বলরামপুর থেকে—শালপলাশের রঙ, নবারুণ, প্রভৃতি ; মণিহারা থেকে—মণিহারা, কেতকী, হুড়া থেকে—পুরুলিয়া জেলা সমাচার ইত্যাদি।

৩৯. 'ছত্রাক' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়। 'কেতকী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

৪০. অধিকাংশ পত্রিকার নাম বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুলিয়া সহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পুরুলিয়া জেলা হিতৈষী, পুরুলিয়া গেজেট', মালভূমি, অবরুদ্ধ, অনাগত, করমতীর্থ', ভিমদোখে পুরুলিয়া প্রভাকর প্রভৃতি। পুরুলিয়া প্রভাকরের সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত 'দিন দুনিয়া' নামে একটি 'দৈনিক' ও (১৯৮২) প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

৪১. মিনি পত্রিকাগুলির মধ্যে পুরুলিয়া সহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল—অনু, এলান, কণা, ছত্রাক, ছন্দক, ঝঞ্ঝা, ঢেউ, রু প্রভৃতি। অন্যান্যস্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল—বিদ্যুৎ (রঘুনাথপুর), রেণু (বলরামপুর), সুপ্রভাত (তুলিন) ইত্যাদি। এদের মধ্যে ছত্রাক ও রু পরবর্তীকালে বৃহৎ আয়তন ধারণ করে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

১৯৭০-৭১ সালের পর থেকে, একাধিক সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকার উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। এদের মধ্যে কিছু কিছু পত্রিকা অতি উঁচু মানের। লিটন ম্যাগাজিনের ধর্ম অনুসারে পত্রিকাগুলি যেভাবে জন্ম নিয়েছে তেমনিভাবে বিলুপ্ত হয়েছে, টিকে আছেও কিছু।[৪২] পত্রিকাগুলির বেশিরভাগ প্রকাশিত হয় এবং হত পুরুলিয়া শহরের বাইরে ও সুদূর গ্রাম থেকে।[৪৩]

পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষায় যারা সাহিত্য সাধনা করেন, তাদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল।[৪৪] সাঁওতাল সমাজের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও ব্যর্থতার ঢেউগুলি অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ভয়াবহ অসুবিধা এবং বৃহত্তর পাঠক সমাজের আনুকূল্য ছাড়াই পত্রিকাগুলি যে টিঁকে আছে, তার প্রধান কারণ পরিচালক মন্ডলীর দৃঢ়তা ও মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম অনুরাগ। সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 'তেতরে' বিশেষভাবে উল্লেখিত হবার দাবী রাখে।

বঙ্গভুক্তির পর, পুরুলিয়া জেলায় যে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণের প্রবাহ নিঃশব্দ গতিতে বয়ে চলেছে, সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার ভূমিকা সেই রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সরকার, পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও পরিচালক মণ্ডলী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

---

৪২. জেলা থেকে প্রকাশিত সাঁওতালি পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ঝারণা, মার্শাল ডহর, সুসার ডাহার, জিরীহিরি, সিলি, আরতাগম, পোন্ড গোদা, তাপান দঃ উমুল, জাং তিরয়ো, তেতরে প্রভৃতি।

৪৩. এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, 'ঝারণা' ছিল সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশিত জেলার মধ্যে প্রথম পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন শ্রবণকুমার টুডু।

৪৪. জেলার সাঁওতাল লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি ও সাহিত্যিক শ্রীসারদাপ্রসাদ কিসকু। তার রচনা বিহার মাধ্যমিক পর্ষৎ কর্তৃক পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাদেব হাঁসদা, বাদিশ্বর সরেন, রবিলাল মানডি, রামধন মুরমু, গোমস্তাপ্রসাদ সরেন, নিরঞ্জন সরেন, গিরিজল মুরমু, রতনলাল মাঝি, শ্রবণকুমা টুডু, মোহিতকুমার বেপরা বিশাখা মাঝি প্রভৃতি। জেলার প্রাচীনতম সাঁওতাল লেখক ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ হেমরম।

সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ

"In spite of extensive laterite deposits and Barakar sandstone in the north, the finest temples of Purulia—both in the early and late periods—were built of brick."—David McCutchion.

ক. মন্দির স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্প—পুরুলিয়া জেলার মন্দির ও মূর্তিশিল্প সম্বন্ধে সুশৃংখল ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।[১] প্রাক্তন মানভূম জেলা ছিল বিহারের অন্তর্গত। সেখানকার মাটি মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার মাটির মতই পাথুরে ও রুক্ষ। লাটেরাইট ও বেলে পাথর সহজলভ্য। ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশও ঘটেছিল স্বল্পমাত্রায়। ফলে, এ অঞ্চলে মন্দির স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্পের নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল এবং তাতে উড়িষ্যার স্থাপত্য শৈলীর গভীরতর প্রভাব দেখা যায়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জেলায় বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন জৈন কেন্দ্রগুলি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পাকবিড়রা, টুশামা, দেওলি, পবনপুর, পলমা, আড়ষা, ছড়রা, ঘোলামারা প্রভৃতি। কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বিজড়িত মন্দির ও মূর্তিগুলির সময় সম্বন্ধে নানা মত আছে। তবু এ কথা

---

১. বিক্ষিপ্তভাবে যেসব আলোচনার প্রচেষ্টা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) Notes On the temples of Puruilia District—David Mc Cutchion (২) Late Mediaeval Temples of Bengal—David McCutchion (৩) The Antiquarian Remains in Bihar—Dr. D. R. Patil (৪) Where the Sculptures bring the message of eternity—P.C. Dasgupta এবং (৫) ছত্রাক পত্রিকায় সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু প্রবন্ধ। মন্দির ও মূর্তি সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি অধ্যায়।

অনস্বীকার্য যে অধিকাংশ মন্দির ও মূর্তি প্রাক মুসলিম যুগে বা তেরো শতকের আগেই গড়ে উঠেছিল ও তৈরি হয়েছিল।

জৈন ধর্মের মত ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল কিছু কিছু। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেউলঘাট ও তেলকূপি। তেলকূপির অধিকাংশ মন্দির এখন সলিল সমাধিতে নিমজ্জিত। তবু তাদের সম্বন্ধে কিছুটা হদিস পাওয়া যায় বেগলার, ব্লক ও সর্বশেষে ড. দেবলা মিত্রের লেখায়।

পুরুলিয়া জেলায় ল্যাটরাইটের ব্যাপক সঞ্চয় আছে। উত্তর দিকে, বরাকরে বেলেপাথরের প্রাচুর্যও কম নয়। তবু জেলায় সুন্দরতম মন্দিরগুলির অধিকাংশ নির্মিত হয়েছিল পোড়া ইঁটে। যথা, দেউলঘাটের তিনটি মন্দির ও পাড়ার একটি মন্দির। এই মন্দিরগুলি প্রাক মুসলিম যুগে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার সোনাতপল ও বহুলাড়া, বর্ধমান জেলার সাতদেউলিয়া ও সুন্দরবনের জটার দেউলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থপত্যের দিক থেকে নগর বা রেখ শৈলীর অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যা-রীতির প্রভাবযুক্ত।

ইঁটের মন্দিরগুলি ছাড়া প্রাক-মুসলিম যুগের অধিকাংশ মন্দির তৈরি হয়েছিল পাথরে। এদের মধ্যে জৈন মন্দিরগুলিও অন্তর্ভুক্ত। গড়নে রেখ দেউল। উড়িষ্যা ধাঁচের রেখ দেউলগুলির সামনে থাকে জাগমোহন বা মণ্ডপ। রেখ স্তম্ভ খাড়াখাড়িভাবে রথ বা পগে বিভক্ত, সমান্তরালভাবে বিভক্ত বারান্দায়, সেখানে স্তম্ভ ও নিচের দেয়াল একত্র মিলিত হয়েছে। মুঘল আমলে বাংলার বৈশিষ্ট্য সমান্বিত কুঁড়ে ও রত্ন শৈলীর প্রভাব এ অঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। কুঁড়েঘরের আদলে চালা বা বাংলা মন্দিরগুলির চাল। রত্ন মন্দিরগুলি চূড়া-বিশিষ্ট। এ ধরনের সুন্দর মন্দিরগুলির দেখা পাওয়া যায় চেল্যামা ও বাগমুণ্ডিতে। এবং পঞ্চকোটের রাজাদের দ্বারা নির্মিত মন্দিরগুলিতে। মুরাডির কাছে বেলেপাথরে তৈরি এ ধরণের একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচীন মন্দিরগুলির অবস্থিতি প্রধানত দেখা যায় দেউলঘাট, ক্রোশজুড়ি, পাড়া, বান্দা, তেলকুপি, পাকবিড়রা, বুধপুর, দেউলি, সুইসা, পলমা, ছড়রা, বলরামপুর ও পঞ্চকোট পাহাড়ের সানুদেশে। দেউলঘাটে তিনটি মন্দির মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনটি মন্দিরই ইঁটের, গায়ে পাল-সেন আমলের আস্তরে ছাঁচা মূর্তি, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত। পাড়ার মন্দিরগুলির মধ্যে একটি ইঁটের, গঠন ও কারুকার্যের দিক থেকে দেউলঘাটার মন্দিরগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। পাকবিড়রায় তেরটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল, পাঁচটি মন্দির ও তিনটি ভগ্নস্তূপ দেখেছিলেন বেগলার। দণ্ডায়মান পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে

একটি ছিল ইঁটের। বুধপুরের মন্দিরটি বেগলারের সময়েই সংস্কৃত করা হয়েছিল। বলরামপুরের ইঁটের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল প্রাচীন ও আধুনিক রীতির মধ্যবর্তী সময়ে। গঠন শৈলীর দিক থেকে সবই উড়িষ্যা ধাঁচের।

পাথরের প্রাচীন মন্দিরগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্রোশজুড়ি, পাড়া, বান্দা, দেউলি, ও ছড়রার মন্দির। ক্রোশজুড়ির মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবু মনে হয় পরিকল্পনার দিক থেকে সেটি ছিল ত্রিরথ, উড়িষ্যা ধাঁচের রেখ দেউল। পাড়ায় পাথরের মন্দিরটি সম্ভবত মানসিংহের সময় সংস্কার করা হয়েছিল। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য বেলেপাথরের ওপর চমৎকার অলংকরণ। রোদেজলে অলংকরণের অধিকাংশ লুপ্ত প্রায়। তবু তাদের মধ্যে কীর্তিমুখ, রেখ-শিখর, ক্ষুদ্র চৈত্য-রূপ, পৌরাণিক দৃশ্যাবলী প্রভৃতি চিনে নিতে অসুবিধা হয়না। পাড়া গ্রামের পশ্চিম উপান্তে মন্দিরটিও পাথরের, নির্মাণকাল মুসলমান যুগের পরবর্তীকালে বলে অনুমিত। রেখ-শৈলীর গড়নে বান্দার মন্দিরটি একক, পরিকল্পনায় এটিও ত্রিরথ, পাথরের ওপর অলংকরণ ক্রোশজুড়িয় মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাকবিড়রায় পাথরের মন্দির ছিল অনেকগুলি। ভেঙ্গেপড়ার ফলে তাদের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়েছে। বাগমুণ্ডি থানার দেউলির মন্দিরগুলি ছিল পাথরের। গঠনশৈলীর দিক থেকে বাঁকুড়ার হাড়মাসড়া বা পুরুলিয়ার ছড়রার মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। ছড়রার মন্দির আসলে পাথরের ছোট রেখ-দেউল।

মন্দিরগুলির মধ্যে বিগ্রহ ছিল অনেক। নয়-দশ খ্রীস্টাব্দে অধিকাংশ মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও, তাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত বিগ্রহগুলি সব অবলুপ্ত হয়নি। ধর্মীর উন্মাদনায় বিকৃত হয়েছিল কিছু, স্থানান্তরিতও হয়েছিল কিছু কিছু, তবু সামগ্রিকভাবে বহু মূর্তি পুরুলিয়া জেলার নানা জায়গায় অবস্থিত রয়ে গেছে। মূর্তিগুলির মধ্যে ক্লাসিকাল শৈলীর সঙ্গে স্থানীয় প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের যৌথ সমন্বয় দেখা যায়। প্রধানত জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত মূর্তিগুলির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। গুপ্তযুগের পরে ময়ূরভঞ্জের কাছাকাছি খিচিংয়ে এ জাতীয় শৈলীর একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল।

শৈলীটি নিঃসন্দেহে ছিল উড়িষ্যা ধাঁচের। আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের দিক থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। বাংলায় পাথরের মূর্তিগুলির অধিকাংশ নির্মিত হয়েছিল পাল আমলে। সূক্ষ্ম কারুকার্য, নমনীয় ভঙ্গি, পেলব অবয়ব

ছিল মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য। বরেন্দ্রভূমিতে বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে পাওয়া মূর্তিগুলি এইসব বৈশিষ্ট্য থেকে বিভিন্ন।

পুরুলিয়ায় পাওয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্তি ও ভাস্কর্যগুলির অধিকাংশ জৈন ধর্মাশ্রয়ী। সুদূর অতীতকাল থেকে বয়ে আসা সমাজের রীতিনীতি ও রুচির পরিচয়জ্ঞাপক। পাকবিড়রা, ছড়রা, মানবাজার, বরাবাজার প্রভৃতি স্থানে পাওয়া মূর্তিগুলির মধ্যে এই সত্য নিহিত। মূর্তিগুলি ও ভাস্কর্যগুলি গম্ভীর, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শ্রদ্ধাউদ্রেককারী। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পাকবিড়রার মহাবীরের বিরাট চন্দ্রপ্রভ মূর্তিটি। তীর্থংকর মূর্তিগুলি ছাড়াও শ্মশানদেবী, অম্বিকা, যক্ষিণী প্রভৃতি নারী মূর্তিগুলিও সৌন্দর্য ও শিল্পসুষমায় কম মনোহারী নয়।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত মূর্তিগুলি প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন। শিল্প সুষমায় অনবদ্য। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মূর্তিগুলির অধিকাংশ দেখা যায় বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়। মূর্তিগুলির মধ্যে পালযুগের শিল্পপ্রভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। গঠন মেদবর্জিত, সুঠাম, মুখমণ্ডলে স্মিত হাসি, অলংকারে বিভূষিত। মূর্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রালিবেড়্যায় রক্ষিত উমা-মহেশ্বর বা হরপার্বতী ও গণেশ, আনাই-জামবাদের কার্তিকেয়, দেউল-ঘাটার মহিষমর্দিনী ও গণেশ, পাড়া থানার হরকতোড় মৌজার হরপার্বতী, গায়ত্রী ও অন্যান্য মূর্তি। ক্রোশজুড়ি ও রালিবেড়্যায় পাথরের চৌকাঠে উৎকীর্ণ মূর্তি স্থানীয় শিল্পীদের শিল্পরুচি, দক্ষতা ও ধর্মীয় ধ্যানধারণার পরিচয়-জ্ঞাপক। মূর্তিগুলির মধ্যে কোন কোন সময়ের শিল্পপ্রভাব বিধৃত হয়ে আছে এখনও উপযুক্তভাবে আলোচিত হয়নি। প্রাচীন মূর্তিগুলি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে পালযুগের প্রভাব সম্পন্ন হলেও, পরবর্তীকালের মূর্তিগুলি সেন-আমলের শিল্পধারা অনুসরণ করেছিল মনে হয়।

মন্দিরগুলির মত মূর্তিগুলিও অনাদরে ও অবহেলায় যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত। পরিকল্পিতভাবে এগুলিকে সংগ্রহ করে অবিলম্বে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একদা যে শিল্পিপ্রতিভা ও রুচি বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল, মূর্তি ও মন্দিরগুলির মধ্যে সেসব সাক্ষ্য নিহিত হয়ে আছে। এগুলিকে অনাদর ও অবহেলার অর্থ আমাদের সেইসব দক্ষ ও কীর্তিমান শিল্পীদের অবমাননা করা।

খ. গানবাজনা—পুরুলিয়া জেলার প্রাণ স্পন্দন ধ্বনিত হয় লোকসঙ্গীতে।

ঝুমুর হৃদপিণ্ড। শুধু পুরুলিয়া জেলা নয় সমগ্র ছোটনাগপুরের শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে রয়েছে ঝুমুর। এতখানি ব্যাপ্তি নিয়ে আর কোন লোকসঙ্গীত টিঁকে আছে কিনা বিচার্য। তুলনা করতে গেলে বাউল গানের কথা মনে আসে। বাউল গান বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেদিক থেকে ঝুমুর পরিব্যাপ্ত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, সিংভূম, রাঁচি, পাঁচ পরগণা অর্থাৎ, সিল্লী, বুণ্ডু, তামাড়, ধারেন্দা ও রাহে এবং সোনাহাতু ও পাতকুম প্রভৃতি অঞ্চলে। বাউলদের পীঠস্থান বীরভূমেও গাওয়া হয়।

ঝুমুরের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা জনের নানা মত।[২] নৃত্য, গীত ও বাদ্য তিনটি নিয়েই ঝুমুর গাওয়া হয়, যদিও গীত অংশেরই প্রাধান্য। সুরের দিক থেকে বৈশিষ্ট্য উচ্চগ্রাম থেকে নিম্ন গ্রামে অবরোহণ। প্রকৃতপক্ষে অবরোহণের বিচিত্র ধারাটিই ঝুমুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমে না ধরে ফাঁক থেকে ধরা হয়। তাল অগ্রাহ্য ক'রে, মাত্রা অনুসরণ করে গড়ে ওঠে সুর। ফাঁক থেকে ফাঁকে লাফিয়ে চলে। গতি বঙ্কিম, মধুময় ও মৃদু। কীর্তনের সঙ্গে মিল অনেক, অমিলও আছে কিছু কিছু। ঝুমুর থেকে কীর্তনে, কীর্তন থেকে ঝুমুরে আসা-যাওয়া সহজ। কীর্তন সূক্ষ্ম, ঝুমুর মোটা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানকে কেউ কেউ বলেছেন ঝুমুর।

বিষয়বস্তু ও রচনার বৈশিষ্ট্যে ঝুমুরকে নানা শাখায় বিভক্ত করা চলে। এক, মার্জিত ভাষায় রচিত ঝুমুর ; বিষয়বস্তু দেহতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক, নিদান, সাঙ্কেতিক প্রভৃতি। পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত, কলি থাকে চারটি, তাদের মধ্যে থাকে ধুয়া, রঙ ও ভণিতা। দুই, লৌকিক ধারার ঝুমুর। যথা, টাঁড়, উধোয়া, ডমকচ, ডহরিয়া, দাঁড় প্রভৃতি। এতে কলির সংখ্যা কম, বড় জোর তিনটি, সুরবৈচিত্র্য নেই। আকস্মিক আবেগ বা অভিঘাতে

---

২. শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মনে করেন, ঝাড়খণ্ডী কীর্তন এখানকার ঝুমুরের রীতিতে প্রচলিত হয়েছিল এবং গরানহাটির চেয়েও প্রাচীন। প্রাচীনতম পদাবলীর নিদর্শন। অভিমতটি বিপদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সুকুমার সেন লিখেছেন, সংস্কৃতে ঝুমুরকে বলা হত জম্ভালিকা। বিনয় ঘোষের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতই ঝুমুর'প্রাচীন এবং ঝোম্বোড়া শব্দ থেকে উদ্ভূত। ঝুমুর সম্বন্ধে 'ছত্রাক' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মূল্যবান আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়। এ বিষয়ে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও (পুরুলিয়া, জুলাই ১৯৮২) তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। ঝুমুর সম্বন্ধে আরও যারা আলোচনা করেছেন ক'রেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাজা বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সিংদেও (অনুবাদ—নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়), জ্যোতিলাল মহাদানী, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অশোক চৌধুরী, প্রভৃতি।

রচিত ও গীত। স্থায়িত্বে তাৎক্ষণিক। তিন, সুর, তাল ও নৃত্য অনুসরণ ক'রে রচিত ঝুমুর। যথা, বাউলছোঁয়া বা উদাস্যা, ঢুয়া, কীর্তনছোঁয়া, দাঁড়শালিয়া, খেমটি, আড়হাইয়া প্রভৃতি। চার, ঋতু অনুসরণ ক'রে। যথা, ভাদরিয়া, চৈতারি, আষাঢ়ি, বারমেসা ইত্যাদি। পাঁচ, অঞ্চলবিশেষের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যথা, বরাবাজারিয়া, বাগমুড়্যা, ঝালদোয়া, সিলিয়াড়ি, গোলায়ারি, পাঁচ পরগনিয়া, তামাড়িয়া, নাগপুরিয়া, প্রভৃতি। ছয়, জাতি বা প্রজাতি জ্ঞাপক। যথা, কুরমালি, মুণ্ডারি ইত্যাদি।

ঝুমুর সাধারণত দুইভাবে গাওয়া হয়। সমঝদারের আসরে ও নাচের আসরে। সমঝদারের আসরে গাওয়া হয় বৈঠকী, ছুট ও পালাবদ্ধ ঝুমুর। বৈঠকী ঝুমুরে নাচ থাকেনা, বাজনা থাকে হারমোনিয়াম কি পাখোয়াজ, গায়ক একজন। 'ছুট' ঝুমুর একটি পূর্ণাঙ্গ ঝুমুর। পালা-ঝুমুর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়, ভাবটি সম্প্রসারিত হয় ঝুমুরে ঝুমুরে।

নাচের আসরে ঝুমর অনেকসময় এক থাকলেও মেজাজ বদলে যায়। গানের সঙ্গে থাকে নাচ ও বাজনা। এক বা একাধিক ঝুমুরিয়া বা ঝুমুরগায়ক মঞ্চে ওঠেন, প্রথম কলিটি গান। সুর ওঠে সানাইয়ে। ঢোল বাজে, ধামসা বাজে। বাদ্যযন্ত্র থাকে আরও, মাদল বাঁশি ইত্যাদি। রসক্যা বা রসিক মঞ্চে আসেন, সঙ্গে নাচনী। রসিক আসলে নায়ক, শ্রীকৃষ্ণ। প্রধান নাচনী রাধিকা। অন্যান্য নাচনীরা সখী, গোপিনী। সকলেই সুসজ্জিত। রসক্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বাগমুণ্ডি থানায় কাঁড়দার অজমৎ খাঁ ও বীরডির রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী।

লৌকিক ঝুমুরে মার্গ সঙ্গীতের প্রভাব নেই, ভনিতাও নেই বৈঠকী ঝুমুরের মত। গাওয়া হয় সমবেত কন্ঠে। বর বিয়ে করতে যাবার সময় মেয়েরা গান ডমকচ। দাঁড়ঝুমুরও গাওয়া হয় একসঙ্গে।

বাগমুণ্ডি ও পাতকুম ছিল ঝুমুরের পীঠস্থান। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ছিলেন এ অঞ্চলে ঝুমুরিয়াদের মধ্যমণি। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাতকুমের রাজা। বাগমুণ্ডির রাজা মদনমোহন সিংদেও ছিলেন ঝুমুর গানের উঁচু দরের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। তার সভাকবি ছিলেন জগৎ কবিরাজ বা জগচ্চন্দ্র সেন। অধিবাসী ছিলেন মানবাজার থানার পলমা গ্রামের। কবি জীবন কেটেছে বাগমুণ্ডিতে। ক্লাসিকাল গানের চর্চা করতেন। অসাধারণ সুরেলা ছিল গলা। ঝুমুর রচনার হাতও ছিল সুন্দর—

এস নয়ন সলিলে ধুয়াইয়া দিই হৃদয়ে রাখিগো যতনে,
আমার হৃদি হতে কামবিষ যাক দূরে তব নখ মনির পরশনে,
তোমার উপাসনা কিছুই জানিনা ধবলি চরাই বনে বনে।
বলি সব অপরাধ ক্ষমিবে শ্রীরাধে নিজগুণে
তোর নামের ভিতর রয়েছে স্বরূপ দেখেছে জগৎ নয়নে।

লোকে বলত,

যেমন হারমোনিয়ামের গৎ
তেমনি কবি জগৎ।

উদয় কবিরও বাড়ি ছিল বাগমুণ্ডী। বয়সে ছোট ছিলেন জগচ্চন্দ্রের। লেখার হাত খারাপ ছিল না। যেমন,

কি করিবে মান সে, তার গলায় পাষাণ
কবি করে বাখান!
উদয় আদার বেপারী হয়ে গো
করে জাহাজের সন্ধান॥

বাগমুণ্ডির অন্যান্য ঝুমুর রচয়িতা ও গায়কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দীনা তাঁতি, বরজুরাম দাস, গৌরাঙ্গ সিং প্রভৃতি। বরজুরামের পদরচনাও বেশ সরস, শব্দচয়ণ সতর্ক,

পরে নীল শাড়ি কাঁখেতে গাগরী
চাহে ফিরি ফিরি মৃগগতি ধায়
সখা বল না বারি নিয়ে কেবা যায়।

গৌরাঙ্গ সিংয়ের বাড়ি ছিল সিল্লী, থাকতেন বাগমুন্ডিতে। বাগমুণ্ডির রাজা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। দুর্যোধনও ছিলেন উঁচুদরের কবি।

শ্রাবণ বরখে বুঁদ না রোখে
গরজে ঘন বিভাতিয়া
কৈসে গোঁয়ায়ব আঁধার রাতিয়া
কৈসে বিতায়ব আঁধার রাতিয়া।

গৌরাঙ্গ সিং ছিলেন সিল্লীর মহাকবি বিনন্দ সিংয়ের সমসাময়িক। বিনন্দ সিংয়ের জন্ম হয়েছিল রাঁচি জেলার সিল্লীর রাজবংশে। আনুমানিক ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। আঠারো কুঁয়ারদের বা রাজকুমারদের একজন ছিলেন তিনি। বেশি লিখেছিলেন ভাদুরিয়া ঝুমুর, সে তুলনায় বৈঠকী ও পালা ঝুমুর ছিল কম। বিনন্দ গেয়েছেন,

রসিকা রসেতে ভাসে, ভ্রমর কমলে বসে
নিরমল রসে ডুবি যায়
তবু মধু কভু না সিরায়।
বিনন্দ সিং কয়, যে জন রসিক হয়
অবশেষে দরশন পায়।

জগৎ কবিরাজ ও রামকৃত গাঙ্গুলী ছিলেন সমসাময়িক। লোকে বলত,

জ্যেঠ মাসে যেমন আম মিষ্ট
তেমনি ভাবে রামকিষ্ট।

বড় দরের গাইয়ে ছিলেন রামকৃষ্ণ। চর্চা করতেন ক্লাসিকাল গানের। এত ভাল গলা মানভূমে আর কারও ছিল না। মার্জিত ভাষা, অন্তরঙ্গ ভাব, দীর্ঘ চরণ, রাগরাগিনীর প্রয়োগ—সব মিলিয়ে ঝুমুরে তিনি গাম্ভীর্য ও মর্যাদা অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছিলেন।

কাঁচ মরকত নবীন নীরদ সুকোমল তনু শ্যামল
ভুরু দুটি আঁকা ঈষৎ বাঁকা বাঁকা আঁখি দুটি ঢলঢল
দেখে যা সখি ভরিয়ে আঁখি
ওগো, রূপে বন করে আছে আলো।

পাতকুমের অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গঙ্গাধর ঘোষ, দিবাকর সিংপাতর প্রভৃতি। আড়ষার চৈতন্য সিং, ঝালদার নরোত্তম, জয়পুরের ফণিভূষণ হাজরা এবং পুরুলিয়ার দ্বিজ টিমা বা টিমা ঠাকুর প্রসিদ্ধ ঝুমুরিয়া।

চাঁচর চিকুর বেণী পৃষ্ঠেতে দোলিছে ধনীরে,
ফণীর ভরমে শিখি করিবে ভক্ষণ
তারে এই কথা বলোরে, সাবধানে করিতে গমন। (চৈতন্য সিং)

নরোত্তম লিখেছেন,

মধুমণি আইল গো মধুমাসে
পরাণ কাঁপিছে মম মদন ত্রাসে

টিমা ঠাকুরের অধিকাংশ সুন্দর ঝুমুরগুলি ব্রজবুলিতে লেখা। সুরে এবং কথায় নেশাধরানো আমেজ আছে। যথা,

বিছাওল সাজিয়া রহল মোর রাতিয়া
কাঁদি কাঁদি দুনয়নে লর বহি গেল
পিয়া দরশন নাহি ভেল।
দ্বিজ টিমায় কহয়ে কথা কিবা কহব মনেক কথা
হামার না দিয়াক দিয়াই রহি গেল

পিয়া দরশন নাহি ভেল।

ভবপ্রীতানন্দ ওঝার গান পুরুলিয়া অঞ্চলে খুব জনপ্রিয়। ভবপ্রীতানন্দ বা ভবপ্রীতা ছিলেন বৈদ্যনাথধামের প্রধান পুরোহিত। জন্ম ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে, দেওঘরের কাছে কুন্ডা গ্রামে। কাশীপুরের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংদেওয়ের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। নাম 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী'।

প্রসিদ্ধ ঝুমুরিয়া ছাড়া ছোট বড় আরও অনেক ঝুমুরিয়া ছিলেন ও আছেন এ অঞ্চলে। তাদের সুর তরঙ্গে এখানকার জীবনে আনন্দের ফল্গুধারা সতত প্রবহমান। এই আনন্দই এখানকার অধিবাসীদের প্রাণশক্তি। প্রতিটি উৎসব, পাল-পার্বনে গাওয়া হয় ঝুমুর। টুসু, ভাদু, অহিরা, জাওয়া, করম—প্রায় সমস্ত গানের সুরের মধ্যে ঝুমুরের প্রাণ স্পন্দন নিহিত।

দরবারী বা বৈঠকী ঝুমুর ছাড়াও টাঁড়ঝুমুর বা উদয়াগানও এ অঞ্চলে খুব জনপ্রিয়। টাঁড় শব্দের অর্থ উন্মুক্ত প্রান্তর। টাঁড় ঝুমুর মাঠে গাওয়ার গান, লোকালয়ে গাওয়া হয় কম। টাঁড় ঝুমুর দুটি মোটা দাগে বিভক্ত করা যায়। এক, আষাঢ়ে, বর্ষার সুরুতে গাওয়া হয় ধানের চারা রোপার সময়, নাম আষাঢ়্যা গীত বা কবিগান। দুই, ক্ষেতের কাজ শেষ হলে, অর্থাৎ মকরসংক্রান্তির পর থেকে সুরু হয় উদয়াগীত। এই গান গেয়ে বাগালেরা যুবতীদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন সেজন্য একে বাংলা গানও বলা হয়ে থাকে।

টাঁড়ঝুমুরে দেহজ প্রেমের প্রাধান্য, প্রত্যক্ষ মিলনের আহ্বান ও বর্ণনা। মাটির গন্ধ ও গায়ের গন্ধ, বেশি। যৌনবোধে উদ্দীপিত—

পাকা ডিংলার ভিতর করা
জুয়ান ছাঁড় ভাই পিরীতে ভরা
পিরীত করেলেরে খালভরা
আর পাবি না ঠান্ডা বড়তলা।

কিংবা,

যাতে ছিলি যাতে ছিলি দক্ষিণ সহরে
উলটা দিকের মাথা বাঁধা লো দেখল দেওরে।
ও দেওরা বলো না তোমার দাদাকে
পাকলে ডালিম দিব দু হাতে।

ঝুমুর ছাড়া আর যেসব গান পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রুমুজ গান, বিয়ের গান, সাপুড়িয়া গান প্রভৃতি। স্থানীয়

লোকের বিশ্বাস, দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। গান গেয়ে তাদের জাগাতে হয়। এই বিশ্বাস থেকে থেকে রুমুজ গানের উদ্ভব। সুরের মাধ্যমে আহ্বান জানান হয় দেবতাদের—

আখড়া জাগাও, পিড়াঁ জাগাও, জাগাও সরগের দেবতা।
আগে জাগাও বাসুকী বসুমাতা, পেছু জাগাও চেলা॥

বিয়ের গানে বেশিরভাগ থাকে রঙ্গরসিকতা,

বেহাই যাছ হে বাইসাম খাঁয়ে যাও।
কেঁদকুড়া মরিচগুড়া গাঁইঠে বাঁধে লাও॥

সাপুড়িয়া গান মন্ত্রেরই রকমফের। সুর করে বলা হয় মন্ত্র,

আরাবন্দি মায়াবন্দি সগ্‌গে পাতালে ব্রহ্মাবন্দি
ফলন্তি নজরবন্দি, ফলন্তি মুখবন্দি।
এক খাড় চৌবাশি বাপ, মা ভবানী মন্ডাপান।
কে গা বাঁধে? গুরুর আজ্ঞায় আমি বাঁধি।

লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার মধ্যে মার্গসঙ্গীতের চর্চাও কম ছিল না প্রাক্তন মানভূম জেলার কিছু কিছু জায়গায়। রাজা ও জমিদারেরই ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। পঞ্চকোটের রাজা নীলমনি সিংহদেব মার্গ সঙ্গীতের রীতিমত চর্চা করেছিলেন। বিখ্যাত যদু ভট্টের বাবার নাম ছিল মধুসূদন ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের প্রথম খ্যাতিমান সেতার বাদক। নীলমণি সিংহের সেতার শিক্ষক ছিলেন তিনি।[৩] যদু ভট্টও কাশীপুরে গিয়েছিলেন বলে প্রবাদ আছে। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, পঞ্চকোট রাজ্যের রাজা নীলমণি সিংহ যদুভট্টকে 'রঙ্গনাথ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। উপাধিটি প্রিয় ছিল যদুনাথের। কয়েকটি গানের ভনিতায় রঙ্গনাথ উপাধিটি ব্যবহার করেছিলেন।

কওন রূপ বর্ণি হো রাজাধিরাজ
আজু নয়ন নিরখি রঙ্গনাথ গাওয়ে॥
ত্যজি অগুরু চন্দন, বিভূতি অঙ্গ ভূষণ
জটা মুকুট ক্যায়সি কন আওয়ে॥

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর পিতা জগচ্চন্দ্র গোস্বামী ছিলেন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজ বাদক। তিনিও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন নীলমণি সিংহকে। এছাড়া আরও

---

৩. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য (১) Hindu Intelligencer—Ed. by K. P. Ghosh, Dec 1847, (২) বিষ্ণুপুর—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়—সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েকজন গুণীশিল্পী ছিলেন কাশীপুরের রাজদরবারে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মৃদঙ্গ বাদক হারাধন গোস্বামী, বংশীবাদক পুরণ সিংহচৌতাল, ফরিদ বক্স ও কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী।

মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুর যেমন ধ্রুপদ সঙ্গীতের পাঠস্থানে পরিণত হয়েছিল, বিষ্ণুপুর ঘরানা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল বাংলা ও বাংলার বাইরে, কাশীপুর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। কাশীপুরের রাজারা ঘোঙ্গাগ্রামে কিছু সঙ্গীতজ্ঞকে বসবাসের জন্য জমি দিয়েছিলেন। গান, বাজনা ও নাচ, তারা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত করতেন বলে পরিচিত হয়েছিলেন কথক নামে। সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঘোঙার সঙ্গীত সমাজের আদি গুরু ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কথাটি কতখানি সত্য বিচার্য। ঘোঙার সঙ্গীতশিল্পীরা ধ্রুপদ গানে বেতিয়া ঘরানা অনুসরণ করতেন। বিষ্ণুপুর ঘরণার মত তাদের গান অত সহজ, সরল, মীড়, ও গমক বর্জিত ছিলনা। ধাক্কা বহুল, মীড়, গমক ও তালের মারপেঁচে ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। এই ঘরাণার দুজনের নাম শোনা যায়। শিবু কথক ও আশুতোষ রায়।

কাশীপুর ও ঘোঙার মত সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র ছিল বেড়ো, পাতকুম, বাগমুণ্ডি, মানবাজার, বরাবাজার, গোবরঘুসি এবং নওয়াগড়। বেড়োয় দক্ষিণভারতের সঙ্গীতধারা অনুসৃত হত। গোবরঘুসির রাজা ও নওয়াগড়ের লালসাহেবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন হয়েছিল। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাবে এবং রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঝুমুর গানও মার্জিত, সংস্কৃত ও উন্নীত হয়েছিল।[৪] বহু বাঈজীরও আগমন ঘটেছিল রাজাদের আবাসস্থালগুলির কাছাকাছি। তাদের মধ্যে মণি বাঈজীর নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আর্থিক দিক থেকে রাজা বা বড় জমিদারদের পরবর্তীধাপে সর্দারেরা চালু করেছিল নাচনীনাচের ধারা। এই ধারাটির সঙ্গে পালা ঝুমুর সংযুক্ত হয়ে এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল আনন্দের একটি নতুন উৎস সৃষ্টি করেছিল। এখন তা লুপ্তপ্রায়।

গ. নৃত্য—'গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য' নামে বইখানি সুরু করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ সুন্দর সত্য কথা বলেছেন। 'সব দেশের সব রকমের গ্রামীণ-শিল্প, সংগীত ও নৃত্যই হোলো গ্রামের মনের একটি স্বতঃ

৪. এ বিষয়ে অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়ের অভিমত সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বৈঠকী বা পদাবলী ঝুমুরের প্রাচীনত্ব দুশো বছরের বেশি বলে মনে করেন না।

উৎসারিত প্রকাশ। এতে নেই কোন বিশেষ চেষ্টার, বা বাইরের থেকে ধার করা অনুকরণের স্পৃহা। গ্রামীণ-শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ও কাব্য দিয়ে প্রত্যেক দেশের জনগণের মানসিক উন্নতির পরিচয় যত সহজ হয় অন্য কিছুতে এমন হয়না।'

বাংলায় নাচের প্রাচীন ঐতিহ্য ছিলনা বললেই চলে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় যেটুকু আছে তার মধ্যে পুরুলিয়া জেলা অন্যতম। শুধু অন্যতম নয়, শীর্ষে। পুরুলিয়া জেলা মানভূম হিসাবে দীর্ঘদিন অন্তর্ভুক্ত ছিল বিহারে। প্রধানত আদিবাসী ও উপজাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত। নৃত্যের ঐতিহ্য তাদের মধ্যে দীর্ঘকালের। সে ঐতিহ্য এখনও অনুসৃত হয়ে চলেছে।

ছ, ছো বা ছৌ[৫] নাচ—জেলায় প্রচলিত নৃত্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। খোলা মাঠে, মুখে মুখোস এ'টে, বাজনার তালে তালে অনুষ্ঠিত হয় নৃত্য। দর্শকেরা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকেন গোল হয়ে, প্রয়োজন হয়না উ'চু মঞ্চের। বাজিয়েরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজান। বাজিয়ের সংখ্যা থাকে সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় জন। নাচ অনুষ্ঠিত হয় রাত্রে, চলে সারা রাত।

ছো নাচে নাচেরই প্রাধাণ্য, গান গৌণ। আসর সুরু হয় বন্দনা গান দিয়ে। সে বন্দনা গণেশের।

প্রথমে বন্দনা করি গণেশচরণ
সিঁদুর বরণ অঙ্গ মুষিকবাহন
সকল দেবের সিদ্ধিদাতা—হরগৌরীর নন্দন।

রণসাজে আসরে এসে ঢোকেন গণেশ। বেজে ওঠে ঢোল ও ধামসা। গণেশের মুখে হস্তীমুখ মুখোস, নিজের দুটি হাতের সাথে কাঠের দুটি হাত পিঠের দিক থেকে লাগান। বিশিষ্ট ভঙ্গিতে তিনি দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এক একজন ক'রে নৃত্যের অপর চরিত্রেরা প্রবেশ করেন আসরে। ঢোল ও ধামসার শব্দে সরগরম হয়ে ওঠে আসব।

প্রতিটি দৃশ্যের প্রারম্ভে ঝুমুরিয়া কয়েক কলি গেয়ে পালার বিষয়বস্তু

৫. নাচটির নাম নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ছৌ, ড, সুধীর করণের মতে 'ছো', বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের মতে 'ছ'। উদ্ভব নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, শৌভিক বা মুখোস থেকে নাচটির উদ্ভব, নামেরও। ড. ভট্টাচার্যের মতে উৎসব থেকে। কেউ বলেন, কুমালী ও ওাঁড়িয়া ভাষায় ছুয়া অর্থে ছেলে, এবং এটি ছু-আদের নাচ। কেউ বলেন পাইবদের ছাউনি থেকে ছাউ=ছোউ নাচ। ড. সুধীর করণ বলেন ছু-অ-শব্দের দুটি অর্থ ছলনা ও সং। গাজনের সংকে ছো বলা হয়। ছু-অ থেকে ছো নাচের উৎপত্তি।

বুঝিয়ে দেন। ঢোল ও ধামসার আওয়াজে তা শোনা না গেলেও এটি রীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। যথা,

চিক্কুরাসুরের পুত্র দিগবিজয়ে যায়
মা দুগগাকে দেখে দৈত্য বিবাহ করত্যে চায়।

সানাইয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বেজে ওঠে ঢোল ও ধামসা।

কিংবা, ওমা তারিণী, তুমি জগৎ জননী
দৈত্যকুলে বিনাশিলে হবের ঘরণী।

পালা করে হয় নৃত্য। পালার বিষয়বস্তু সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরানের কাহিনী। নাচের আসর আলোকিত করা হয় হ্যাচাক বা পেট্রোম্যাকসের আলোয়। আলোগুলি থাকে মানুষের মাথায়। নাচিয়েদের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তারাও স্থান বদল করেন। আগে প্রতিটি নাচিয়ের হাতে থাকত রুমাল। এখন যাত্রা থিয়েটারের প্রভাবে রুমালের বদলে চরিত্র অনুযায়ী আয়ুধ থাকে হাতে।

ছো নাচ পৌরুষ-দৃপ্ত। মুখে মুখোস থাকার ফলে চোখ, মুখ ও ভাবের অভিব্যাক্তি প্রতিফলিত হয় না। এই ঘাটতি পরিপূরিত হয় শিল্পীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন, প্রসারণ ও কম্পনের মধ্যে দিয়ে। ঢোলের সুক্ষ্ম তাল ও মাত্রা অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে পদসঞ্চারে, নুপুরের ছন্দে ও বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। সানাইয়ের সুরের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গায়িত হয় হাত ও পায়ের সঞ্চালন। তাকে বলা হয় চাল। যেমন, দেবচাল, বীরচাল, পশুচাল ইত্যাদি। চালগুলির মধ্যেও আবার বিভাগ আছে, যথা, ডেগা, ফন্দি, উড়ামালট, উলফা, বাঁহি মলকা বা বাহুর আন্দোলন, মাটি দলখা প্রভৃতি।[৬]

পুরুলিয়া জেলায় ছো নাচের মাধ্যমে সাধারণত যে পালাগুলি প্রদর্শিত হয ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য দল অনুযায়ী তাদের তালিকা দিয়েছেন।[৭]

---

৬. ড আশুতো ভট্যাচার্য অঙ্গ-সঞ্চালনকে পাঁচ ভাগে ভাগ কবেছেন : (১) মস্তক সঞ্চালন—সমস্ত শরীর স্থির বেখে মাথার মুকুটের সঞ্চালন (২) কাঁধ সঞ্চালন—এটি নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিমা। মাথা ও নিম্নাঙ্গ অনড় থাকে শুধু কাঁধদুটি কম্পিত হয়। (৩) উল্লম্ফন—নাচতে নাচতে লাফিয়ে উঠে দুটি পা জোড়া করে বসে পড়া এবং সেইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে বা পিছনে চলা (৪) বক্ষ সঞ্চালন—সমস্ত শরীর স্থির রেখে কেবল বক্ষদেশ কম্পিত করা (৫) পদক্ষেপ বা সঞ্চালন—দেবচাল ও রাক্ষস বা বীরচাল।

৭. Chhau Dance of Purulia—Dr. Asutosh Bhattacharya, Calcutta 1972. বেশীরভাগ যুদ্ধ বিষয়ক পালা। যথা, অর্জুনের সঙ্গে জয়দ্রথের যুদ্ধ, অভিমন্যু বধ,

নাচে যুদ্ধ দৃশ্য বেশি। নাচের ক্ষেত্রে বান্দোয়ান ও বাগমুণ্ডিতে দুটি পৃথক ধারা পরিলক্ষিত হয়। বান্দোয়ানে সাধারণত পালা ধরে হয় নাচ, ভঙ্গি ভাব-গম্ভীর। বাগমুণ্ডিতে নাচের মধ্যে শৌর্য প্রকাশ পায়, ভঙ্গি বীরত্ব-ব্যঞ্জক। ঝালদা ও আড়সায় বাগমুণ্ডির রীতিটিই বেশি পরিমাণে অনুসৃত হয়। ছো নাচ ও ঝুমুরের ক্ষেত্রে বাগমুণ্ডির রাজা মদনমোহন সিংদেও পরিমার্জিত একটি শৈলী গড়ে তুলেছিলেন। বাগমুণ্ডি হয়ে উঠেছিল ঝিঙাফুলিয়া দেশ বা রোমানটিক ল্যানড। ঝালদায় নাচের ক্ষেত্রে বাগমুণ্ডির প্রভাব থাকলেও, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে রূপান্তরও ঘটেছে। বর্তমানে জেলার প্রায় প্রতিটি থানায়, বড় বড় গ্রামে ছো-নাচের দল আছে। প্রায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অংশ নিয়ে থাকেন।

জেলায় নাচটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভূমিজ ও মুণ্ডারা। তাদের মধ্যে 'ওস্তাদ' বা শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। পরে মাহাত ও অন্যান্য সম্প্রদায় অনুশীলন ও নাচের দল গড়তে সুরু করেছেন। মাহাতোরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হবার ফলে, জেলার বহু দল মাহাতদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। ডোমেরা বাদক হিসাবে অংশ নেন। জেলার প্রসিদ্ধ নাচিয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গম্ভীর সিং মুড়া, পীতাম্বর সিং, মধু রায়, সুচাঁদ মাহাত প্রভৃতি।

চড়ক বা শিব-গাজনের আচার নৃত্য ছো-নাচ। গাজনের আর এক নাম তাই ছো-পরব। সেদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুরু হত নাচ, চলত জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। এখন এই সময় সীমা রক্ষিত হয় না। প্রয়োজনমত জমে ওঠে ছো-নাচের আসর। কিভাবে নাচটির উদ্ভব হয়েছিল এবং কতকাল ধরে প্রচলিত, সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত। হানণ্টার, রিসলে ও কুপল্যানড তাদের গ্রন্থে ছো-নাচের উল্লেখ করেন নি। অন্তত তাদের গ্রন্থ রচনার সময় নাচটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে মনে হয় না।

ছো-নাচের মুখোস তৈরি করেন বাগমুণ্ডি থানার চল্লিশ ঘর সূত্রধর পরিবার। তাদের বসবাস চোড়দা গ্রামে। বর্ধমান জেলা থেকে তারা এখানে এসে গড়ে তুলেছিলেন বসতি। জমি দিয়েছিলেন বাগমুণ্ডির রাজা। সর্ত ছিল দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়ে দিতে হবে। তাদের মধ্যে ভাদুর মূর্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূর্তিগুলি তৈরি হত মাটি দিয়ে। ছো-নাচের মুখোস কেবল মাটি

দুর্যোধনের উরুভঙ্গ; কিরাত—অর্জুন, গরুড়—ইন্দ্র, দুর্গা—মহিষাসুর, লক্ষ্মণ-মেঘনাদ প্রভৃতি যুদ্ধ।

দিয়ে তৈরি হয়না। মাটি গদ, কাগজ চিটানো, কাবিজ-লেপা, কাপড় সাটান, থাপি পালিশ, খুশনি খোঁচ বা নাক মুখ ও চোখ তীক্ষ্ণ করা এবং সাজান —এসবের সাহায্যে গড়ে তোলা হয় মুখোস। মুখোসের গড়নে যে পারিপাট্য দেখা যায় তা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বলে মনে হয়। সম্ভবত স্থানীয়-ভাবে মুখোস তৈরি ও নাচের একটি ধারা প্রবহমান ছিল, পরবর্তীকালে বাগমুণ্ডির রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দুটিই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

সূত্রধর বৃত্তিগত উপাধি। মুখোস নির্মাতাদের পদবী বাংলার কায়স্থ সম্প্রদায়ের মত, দত্ত, শীল, পাল, রায় প্রভৃতি। কয়েকটি পরিবার চোড়দা গ্রাম থেকে জেলার অন্যান্য জায়গায় গিয়েও বসতি স্থাপন করেছিলেন। যথা, জয়পুর থানার ডুমুরডি গ্রামের রায়েরা।

পুরুলিয়ার ছো-নাচের মত মুখোস নৃত্য প্রচলিত আছে উড়িষ্যা রাজ্যের সরাইকেল্লা ও ময়ূরভঞ্জে। সাদৃশ্য আছে ইন্দোনেশিয়া ও বালির ফ্রিশ ও বরং নৃত্যের সঙ্গে। মাথায় মুকুট ও মুখ চিত্রিত করে কেরালার কথাকলি নৃত্যের সঙ্গেও সাদৃশ্য দেখা যায়।[৮] বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাচটির উদ্ভব, বিকাশ ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। তবু ছো-নাচ পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক দিগন্তে অভিনব, স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত ও একক।

নাচনীনাচ—ছো নাচ পৌরুষ দৃপ্ত, নাচনী নাচ রমনী স্নিগ্ধ। ছো নাচে নারীরা দর্শক, অংশগ্রহণকারী নন। নাচনী নাচে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পালা পরিচিত করার জন্য ছো নাচে গীত হয় ঝুমুর, ঢাক ঢোল ধামসার আওয়াজে শোনা যায়না। নাচনী নাচের প্রাণস্পন্দন ঝুমুর। নৃত্যকর্মটি নিয়ন্ত্রিত হয় ঝুমুরের রস, ভাব ও বিষয় অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে ঝুমুরই নৃত্যের আত্মা, নৃত্য অবয়ব। নৃত্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় আটটি অঙ্গ, মাথা, ভুরু, চোখ, মুখ, বাহু, ছাতি, কোমর ও পা। সুস্পষ্টভাবে মুদ্রার ব্যবহার নেই নৃত্যে। হস্তক, বিভিন্ন গতি, চারী, ভ্রমরী প্রভৃতি ঠাটের লক্ষ্মন আছে। লোকনৃত্য থেকে ক্লাসিক্যাল নৃত্যে উন্নীত হবার প্রবণতা ছিল নৃত্যটিতে।

আসর বন্দনা করে সুরু হয় নাচ। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি থাকে

---

৮. দ্রষ্টব্য, Chhau Dance of Purulia—Dr. Asutosh Bhattacharya. ছো-নাচকে জনপ্রিয়, বহুল প্রচারিত, দেশবিদেশের গুণীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে ড ভট্যাচার্যের অবদান অনেকখানি।

আসরে। তাদের প্রণাম করে সুরু হয় বন্দনা গান,

যোগেন্দ্রনন্দন বিঘ্নবিনাশন
জগতে আনন্দ দান হে।

চতুর্বিধ কলার বিন্যাস হয় নৃত্যে। যে গানগুলি গাওয়া হয় তাতে থাকে 'পয়ার, রঙ ও গীত। শৃঙ্গার মুখ্য রস, প্রেম ও ভক্তি প্রধান ভাব, বিষয় রাধাকৃষ্ণ লীলা। আসর হয় উঁচু গোলাকার বেদীতে। উচ্চতা সাধারণত তিন ফুট, আসরের ব্যাস হয় পনের থেকে পঁচিশ ফুট।

ঝুমুরের পয়ার অংশ সুর করে আবৃত্তি করা হয়, তাল থাকেনা।

সখীগণ সঙ্গে করি হোলি খেলিবারে আদেশিল
শুনি সব সখীগন হয়ে আনন্দিত মন নিজ নিজ সাজন করিল।

রঙের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় নাচ। তালে তালে আন্দোলিত হয় শরীর।

নিকুঞ্জ কাননে বনমালী
সখীগন সাথে খেলেন হোলি
খেলেন যেমন মেঘগণ মাঝে বিজলী।

বাজনা থাকে নানা রকম। নাগড়া, ঢোল, মাদল, সায়না বা সানাই, শিঙ্গা, কেড়কেড়ি, কারহা প্রভৃতি। গীত অংশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাওয়া হয়, সঙ্গে চলে নাচ।

লাল নীল রঙ হাতে ধরি
শ্যাম অঙ্গে দেন রাই কিশোরী
খেলেন কত নবীন নবীন কিশোরী।

ধুয়া থাকে প্রথম লাইন। যথা, লাল নীল রঙ···

রাজা ও জমিদারদের পৃষ্টপোষকতায় বাঈজী নাচের যে ধারা আঠারো ও উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নাচনী নাচ এ অঞ্চলে তারই ক্ষয়িষ্ণু রূপ। বৈভবহীন রাজা ও বিত্তহীন জমিদারেরা অবসর বিনোদনের জন্য ব্যয়বহুল বাঈজীদের পরিবর্তে নৃত্যগীত পটীয়সী নাচনীদের পৃষ্ঠপোষকতা সুরু করেছিলেন। জমিদারদের অনুকরণ ক'রে স্থানীয় সর্দারদের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছিল প্রথাটি। প্রথাটিতে মর্যাদা ও গুরুত্ব আরোপ ক'রে, উন্নীত করার প্রবণতাও সুরু হয়েছিল। সম্ভবত এ সময় নৃত্যটি ব্যাপক জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। জনপ্রিয়তা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।[১]

---

১. এ প্রসঙ্গে বাগমুণ্ডি থানার ডাভা ও কাঁডিহেঁসায় নাচনী নাচের যে আসর ১৯৭৪ সালের

নাচের দল সাধারণত পাঁচ থেকে কুড়ি জন নিয়ে গঠিত হয়। দলের প্রধান পুরুষ কে বলা হয় রসক্যা বা রসিক, নাচনী থাকেন তিন থেকে পাঁচ জন, মোট শিল্পী সাত থেকে পনের জন। রসক্যা ও নাচনীদের মধ্যে জেলার একসময় প্রসিদ্ধ ছিলেন কেঁদরীর সিন্ধুবালা, সিরকাবাদের রমানাথ গৌরীনাথ, পুঞ্চার অতুল মাহাত, সালইডহরের বদি গোস্বামী, সটরার রঘুনন্দন কুমার প্রভৃতি।

নাটুয়া বা নাটা নাচ—একক, পৌরুষ দৃপ্ত নৃত্য। দৈহিক শক্তি আড়ম্বরের সঙ্গে প্রদর্শন—নাচটির লক্ষ্য। বলবীর্যের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভারসাম্য বজায় রেখে আন্দোলিত হয় শরীর। দেহ সুগঠিত, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী না হলে এ নাচ করা যায় না। জেলায় সাধারণত হাড়ি, বাউরি ও ডোমেরা নৃত্যটির শিল্পী। মাহাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছু কিছু প্রচলিত। প্রবাদ আছে, যারা নাটা নাচে, তাদের বাঘে ছোঁয়না। অর্থাৎ বাঘও তাদের ভয় পায়।

বন্দনা গান দিয়ে সুরু হয় নাচ। যথা,

নমামি শঙ্করী তব নামে তরী
লীলা সব তোমারি
এ ছল বুঝিতে না পারি মা।

তাল আছে নানা রকম। ছয়ালি, চৈতালী, ধুমসী, হলুদখেড়ি প্রভৃতি। যেমন, হলুদখেড়ি গান,

হইল অনেক বেলা, তাতিল পথের ধুলা
মা গঙ্গা জল কত দূর।

জেলার নানা জায়গায় নাটুয়ার দল ছিল।[১০] বর্তমানে নাচটির অনুশীলন ক্রমশ কমে আসছে। সাধারণত যাতরা বা পয়লা মাঘ থেকে রোহিন বা জ্যৈষ্ঠের

ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রতিবেদনটি দেখা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য, নাচনী-নাচ-জামিদরী ঘরানা—সুবোধ বসু রায়। বর্তমানে রসক্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, খুদুডিরসুচাঁদ মাহাত, শণর লালমোহন সিং, ঘোড়াশির লালমোহন সিং, বুবুহাতুর দিবাকর সিং পাতর, চকাহাতুর পদ্মলোচন সিং ও চামু সিং, উঁলীডির ভুদল সিং, ইচাডির (রাঁচি) চক্রধর সিং প্রভৃতি।

১০. যেসব জায়গায় ওস্তাদ এবং নাটুয়ার দল ছিল ও আছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘড়া-পথরা গ্রামের শ্রীধর মাহাত ও রাজীব মাহাত, কলহাকাটা—আড়তার গোবিন্দসর্দার, ও মনভুলা সর্দার, গড়ুর (বান্দোয়ান) গ্রামের ভিখু কালিন্দী ও নিবারণ কালিন্দী, বড়গ্রামের (হুড়া) মটর কালিন্দী, কোনাপাড়ার (পুঞ্চা) খড়ু ও বাবু সহিস। খড়ুবাবুরা পাঁচ পুরুষ ধরে নাচটির চর্চা করে চলেছেন।

মাঝামাঝি পর্যন্ত নাচের আসর বসে, বায়না হয়। এ ছাড়া পূজাপার্বন, বিয়ে বাড়ি ও গাজনের সময়েও কোথাও কোথও অনুষ্ঠিত হয় নৃত্য।

উৎসব নৃত্য—বিশিষ্ট নৃত্যগুলি ছাড়াও বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে জেলায় নানা ধরনের নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ইঁদপরবের নাচ, করম বা পাঁতা নাচ, জাওয়া নাচ, বাঁধনা, টুসু, ভাদু, ভাঁজো, বিবাহ—প্রভৃতি উৎসবের সঙ্গে বিজড়িত নৃত্য। নৃত্যগুলি আলাদা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা যায় না। গানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসাবেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উৎসব এবং গীতাংশ সেখানে মুখ্য। নৃত্যাংশ গৌণ। করম ঠাকুরের পূজো উপলক্ষ্যে যে নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় করম বা পাঁতা নাচ। পাঁতা নাচের জন্য যেসব ঝুমুর গাওয়া হয় তাদের বলা হয়, দাঁড়শালা ঝুমুর, ঝিঙাফুল্যা গীত, পাঁতাশ্যালা ঝুমুর ইত্যাদি। এই নাচের ভঙ্গিমার মধ্যে ধান্য রোপনের প্রক্রিয়াটি অনুকৃত হয়ে থাকে। সাধারণত কুর্মী, ভূমিজ. কামার, লোধা, মুন্ডা, খাড়িয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় ও উপজাতির মানুষেরা এতে অংশ নিয়ে থাকেন।

উৎসব নৃত্য ছাড়া আরও কিছু কিছু নাচ আছে। যেমন, ওঝার নাচ, কাঠি নাচ, ঢালী নাচ. পাইক নাচ, পাতা নাচ ও দাঁড়শালী ঝুমুর নাচ। দাঁড়শালী বা দাঁড় নাচ পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন নৃত্য। নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে অংশ নেন নৃত্যে। সাধারণত পাশর্ব একাদশীর দিন নৃত্যটি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দাঁড় নাচ যেমন হয় পর্বাশ একাদশীর দিনে, কাঠি নাচ তেমনি হয় মহাষ্টমীর দিনে। বিকেল বেলা চালের গুঁড়ো জলে গুলে গর্ভবতী ধানচারার ওপর ছিটিয়ে দিয়ে সাধ খাওয়ানো হয়। নারীরা গুঁড়োগোলা দিয়ে হোলি খেলেন। কাঠি নাচের আগে ও পরে পাঁতা নাচের অনুষ্ঠান করতে হয়। কাঠি নাচ একান্তভাবে পুরুষদের নাচ। বাজিয়েরা ঢোল, ধামসা, মাদল প্রভৃতি নিয়ে থাকেন মাঝখানে, নাচিয়েরা গোল হয়ে ঘিরে থাকেন তাদের। প্রত্যেকের হাতে দুটি করে কাঠি থাকে। কাঠিগুলি লম্বায় প্রায় দেড় হাত। বাজনার তালে তালে ডানদিকের নাচিয়ে বাঁ দিকের নাচিয়ের কাঠিতে আঘাত করেন এবং বাঁ দিকের নাচিয়ে ডান দিকের নাচিয়ের কাঠিতে আঘাত করেন। আঘাত ও প্রত্যাঘাতের ভঙ্গিতে চলে নৃত্য। নাচিয়েদের পরণে থাকে মেয়েদের পোশাক ও অলংকার। মালকোচা দিয়ে পরা শাড়ি, কানে দুল, হাতে চুড়ি, গলায় হাঁসুলি, নাকে নোলক, পায়ে ঘুঙুর বা নুপুর। যে গানগুলির

সঙ্গে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় তাদের বিষয়বস্তু রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ লীলা। বিশ্বাস, শরৎকালে রাম-রাবণের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাঠিনৃত্য সেই যুদ্ধের স্মৃতিবহ।

রাবণের পরাজয়ের স্মৃতিবহ নাকি ভুয়াঙ নাচ এবং দাসাঁয় নাচ। সুরে থাকে করুণ মূর্ছনা, নৃত্যের ছন্দ বেদনাময় আবহ তৈরি ক'রে। ভুয়াঙ ও দাসাঁয় নৃত্যে অংশগ্রহণ করে থাকেন সাধারণত সাঁওতাল সম্প্রদায়। বর্তমানে কাঠিনাচ রাসনৃত্যে অভিমুখী হয়ে উঠেছে।

সাঁওতালদের নাচ বা এনেচ্—সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় ষোল রকমের নাচ প্রচলিত। বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে নাচগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গানসহ নাচ প্রায় তেরটি। যথা, লাঁগড়ে, দং, গুলাউড়ি, ডাহার, বাহা, রিঞ্জা, ভিনসার, ঝিকা, হুমটি, গুঞ্জার, সহরায়, লবয় ও দুঙ্গেড়। গানবিহীন নাচ আছে তিন রকমের পাকদন, ডম ও লাউড়িয়া।

লাঁগড়ে*, গুলাউড়ি বা গুলুয়ারী এবং হুমটি সব সময় নাচা হয়। বাহা নাচ হয় কেবল বাহা পরবের সময়। সহরায় ও গুঞ্জার নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় সহরায় উৎসবের সময়। কার্তিক মাসে, কালীপূজোয়। করম পরবের সময় নাচা হয় রিঞ্জা ও ভিনসার। দং নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বিয়ে ও নপ্তার সময়। নপ্তার সময় আরও একটি নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, ঝিকা। বিয়ের সময় হয় ডম। ডাহার গ্রীষ্মকালের নাচ, মেয়েরাই শুধু নাচেন। মেয়েদের নাচ যেমন ডাহার, ছেলেদের নাচ তেমনি পাকদন ও লাউড়িয়া। মেয়েরা এই নাচ দুটিতে অংশ নেন না, বাকি সব নাচ ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে নাচেন। পাকদন ও লাউড়িয়া নৃত্য হয় সহরায় ও সাঁকরাত বা পৌষ সংক্রান্তির সময়। লবয় নৃত্য হয় দাসাঁয় বা দুর্গাপূজোর পরবের সময়। শিকারে রাত্রির আড্ডায় যে নাচ হয় তার নাম দুঙ্গেড়। সাঁওতাল সমাজে নাচগান সব থেকে প্রিয় যুবক যুবতীদের মধ্যে। সারারাত ধরে নেচেও তারা ক্লান্ত হননা, পরদিন ভোর থেকে ফের কর্মজীবন সুরু করতে আলসেমি করেন না। নাচ যেন তাদের ক্লান্তি হরণ ক'রে, নতুন শক্তি, তেজ ও কর্মক্ষমতায় অভিষিক্ত ক'রে।

প্রায় প্রতিটি নাচের সঙ্গে বিজড়িত থাকে গান। নাচ ছাড়া যেসব গান গাওয়া হয় তাদের মধ্যে অন্যতম, ক্ষেতে ধান লাগাবার সময় গান, গরমের সময় সন্ধ্যাবেলায় বসে বসে 'গম' সেরেঞ বা ঠাকুরমার গান। বনে বনে কি নদীনালার আড়ালে যুবক যুবতীদের গাওয়া গান 'বির-সেরেঞ'। বির-সেরেঞ সহরায় পরবেও গাওয়া হয়। নৃত্যবিহীন মরণা-গান গাওয়া হয় শ্রাদ্ধের

সময়। তাকে রাঃক বা কাঁদাও বলে। বিয়ের সময় গাওয়া হয় বাংলা বিন্তি সেরেঞ বা বিয়ের গান।

নাচ ও গানের সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজান হয় তাদের মধ্যে অন্যতম কে'দরী বা একতারা, ফাঁপা বাঁশের তৈরি বাঁশি, নাম বার-লাঙ্গা-মাত, মোষ কি শম্বরের শিংয়ের তৈরি শিঙ্গা, হরিণের শিঙ্গে তৈরি ভাউটিয়া, লোহার খোলের দুদিকে কাড়া বা মোষের ছাল দিয়ে ছাওয়া টামাক, মাটির খোলের দু মুখ ছাগলের চামড়ায় ছাওয়া তুমদাঃ, বড় বড় জয়ঢাকের মত ধামসা ইত্যাদি।

ঘ. নাটক—পুরুলিয়া জেলায় নাটকের ঐতিহ্য একশো বছরেরও বেশি প্রাচীন। ধারাবাহিকতায় রীতিমত গৌরবজনক। পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় নাটক অভিনীত হত কাশীপুরে। রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনীত হত সেসব নাটক। মঞ্চসজ্জা, সিনসিনারী. পোশাক-পরিচ্ছদ সবই তৈরি হত স্থানীয়ভাবে। চরিত্রে নাটকগুলি ছিল যাত্রার মত। বছরে এক কি দুবার, কখনও কখনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হত নাট্যানুষ্ঠান। ধারাবাহিকতা ছিলনা সেসব নাট্যপ্রয়াসে। সচেতনভাবে নাট্যামোদী দর্শক, অভিনেতা ও পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও থাকত না সেসব অনুষ্ঠানের নেপথ্যে।

সচেতমভাবে নাটকের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল পুরুলিয়া সহরে। সেটি ছিল ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ। বাংলা সনের বৈশাখ মাস, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। ভাগাবাঁধ পাড়ায় কুণ্ডরীকাক্ষ কোলের বাড়িতে কয়েকজন উৎসাহী যুবক মিলিত হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পুরুলিয়া সঙ্গীত সমাজ'।[১১] অভিনয় সুরু হয়েছিল সীতার বনবাস, সংসার, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক দিয়ে। আকস্মিক উচ্ছ্বাসে যে নাটকের দল গঠিত হয়েছিল, ১৮৮৫ সালে স্থায়ী ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি। নামও বদলে গিয়েছিল। পুরুলিয়া সঙ্গীত সমাজের বদলে পুরুলিয়া মিউজিকাল ইনসটিটিউট। সংক্ষেপে পি. এম. আই।

---

১১. পুরুলিয়া সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন, জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কটুবাবু), জগদানন্দ ব্যানার্জী, মিহির মুখার্জী, নারান চৌধুরী প্রভৃতি। পুরুলিয়া জেলার নাট্যান্দোলন সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায় পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনাটটিউট, শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে, ১৮৮৫-১৯৮৫। তাছাড়া জেলার প্রসিদ্ধ নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা শ্রীসন্তোষ রায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও (এপ্রিল ১৯৮২) অনেক তথ্য জানা গেছে।

প্রতিটি সার্থক প্রতিষ্ঠানের নেপথ্যে বিজড়িত থাকেন এক বা একাধিক অতি উৎসাহী মানুষ। যাদের স্বপ্ন ও সাধনা প্রাণ সঞ্চারিত করে প্রতিষ্ঠানে। জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন পি. এম. আইয়ের প্রাণপুরুষ। একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, পিতা উমেশচন্দ্র ছিলেন পেশায় উকিল, আর্থিক প্রাচুর্য ছিল না পরিবারে। তবু জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন মেজাজ শৌখিন, চরিত্রে বেপরোয়া। পিতা এক বিঘা জমি দান করেছিলেন পি. এম. আইকে, সেখানে ঘর উঠেছিল। লোকে বলত কটুবাবুর থিয়েটার ঘর। জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন ম্যানেজার। পুরুলিয়া সহরে দর্শক সমাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে তৈরি হয়েছিল শিল্পী সমাজ। বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্যও উদ্যোগে নিয়েছিলেন কয়েকজন।

জ্যোতিষচন্দ্রের মৃত্যুর পরে (১৯১৩ খ্রী) দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয়েছিল পি. এম. আইয়ের। কর্ণধার হয়েছিলেন নারানদাস চৌধুরী। দ্বিতীয় পর্ব ছিল বিকাশের যুগ। নাটক প্রয়োজিত হয়েছিল অনেক। স্থানীয় যুবকদের অকুণ্ঠ অংশগ্রহণে পরিপুষ্ট হয়েছিল প্রতিষ্ঠান।

তৃতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছিল নারানবাবুর মৃত্যুর পরে (১৮২৪)। অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ভেঙ্গে দুটুকরো হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। কয়েকজন সরে গিয়ে গঠন করেছিলেন 'সান্ধ্য বান্ধব ক্লাব'। পরে সেটি নাম বদলে হয়েছিল ফ্রেন্ডস্ ইভনিং ক্লাব।[১২] শুধাংশু শেখর চ্যাটার্জী পি. এম. আইয়ের হাল ধরেছিলেন। তাকে সহায়তা করতেন কৃষ্ণকালী মুখার্জী। এরা দুজন পি. এম. আই থেকে অবসর নেবার পর (১৯৩০) তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ হয়।

চতুর্থ পর্ব সুরু হয়েছিল সন্তোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে। তিনি ছিলেন কটুবাবুর ভাগনে। জেলা এবং জেলা ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থসংগ্রহের জন্য অভিনয়ের ডাক পড়ত। পুরুষ অভিনেতারা নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে সরোজপ্রকাশ মুখার্জীর নেতৃত্বে মহিলা শিল্পীদের দিয়ে প্রথম নারীর ভূমিকায় অভিনয় করান হয়। শিল্পীরা ছিলেন কলকাতার পেশাদার অভিনেত্রী। পরবর্তীকালে স্থানীয় মহিলারা অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

পি. এম. আই পুরুলিয়ার গৌরব। নাটকের এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৫ সালে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি কলকাতা এবং মফঃস্বল সহরে নাটকের একটি প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ অতিক্রম করেছে—এ ঘটনা বিরল।

---

১২. ফ্রেনডস ইভনিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন, ক্ষুদিরাম চৌধুরী, সুরেন সরকার, পরেশ সরকার, নানুবাবু, বনবিহারী ঘোষ প্রভৃতি।

পরিচালকমণ্ডলীর নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে।

পুরুলিয়া সহর ছাড়াও জেলার প্রায় প্রতিটি থানায়, বড় বড় গ্রামে নাটকের চর্চা অনুশীলিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামাঞ্চলে আমোদপ্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক জীবনের জানলা খুলে রেখেছে নাট্যামোদীদের সংঘবদ্ধ ও সাময়িক প্রয়াস। বর্তমানে কলকাতার ব্যবসা-ভিত্তিক যাত্রার দলগুলি তাদের জৌলুস, আড়ম্বর এবং বিজ্ঞাপনের বহরে গ্রামাঞ্চলের নাট্যামোদীদের প্রয়াস অনেকখানি হরণ করেছে, লুণ্ঠন করেছে তাদের আমোদপ্রমোদ ও প্রতিভা-বিকাশের সংকীর্ণ ক্ষেত্রটি। তবু ধারাটি যে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি তার প্রধান কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের যাত্রা ও থিয়েটারের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ।

জেলায় দ্বিতীয় বৃহত্তম সহর রঘুনাথপুর। সেখানে প্রথম নাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৬ সালে। কালিকুমার ছিলেন নদীয়ার লোক, ঠিকাদারী সূত্রে এসেছিলেন রঘুনাথপুরে। পত্তন করেছিলেন বারোয়ারী মেলার। নাট্যানুষ্ঠান প্রয়োজিত হত বাইরের দল দ্বারা। স্থানীয়ভাবে নাটকের দল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কালিকুমার বাবুর ছেলে মোহিনীমোহন রায়। দলটি ছিল যাত্রার। তাকে সাহায্য করতেন ক্ষেপু মণ্ডল, জগন্নাথ মণ্ডল প্রভৃতি। পরবর্তীকালে সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল শ্রীদুর্গা অপেরা। তার সময়েই কলকাতার নামী দল আনিয়ে যাত্রা করাবার প্রবণতা চালু হয়েছিল। সে প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। ফলে স্থানীয়ভাবে শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারেনি।

রঘুনাথপুরে থিয়েটারের প্রযোজনা সুরু হয়েছিল স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য রায়চৌধুরী, কাশীনাথ পাল প্রভৃতির উদ্যোগে। রঘুনাথপুরের কাছাকাছি আদ্রা এবং বাঁধা মৌতোড়ে নাটকের দল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল।[১৩] আদ্রার মত সাঁওতালডিতেও মধ্যবিত্তদের একটি কেন্দ্র উপনিবেশ গড়ে উঠেছে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যাণ্টকে কেন্দ্র করে। দুটি জায়গাতেই অনেকগুলি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

পুরুলিয়া শহরে যেমন জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বরবাজারে তেমনি ধ্রুবপ্রসাদ সিংহদেব ছিলেন নাট্যচর্চায় অত্যুৎসাহী ব্যক্তি। দক্ষিণ মানভূমে অনেক জায়গায় তার উদ্যোগ ও পরিচালনায় নাট্যানুষ্ঠান আয়োজিত হত।

---

১৩. বাঁধা মৌতোড়ে দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় নাট্যচর্চার প্রাণপুরুষ। আদ্রায় নাট্যচর্চার প্রধান প্রতিষ্ঠান 'অগ্রণী সংঘ'।

পি এম আইয়ের মত স্থায়ী নাট্যসংস্থা তিনি গড়ে তুলতে পারেননি। তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় বরাবাজারে প্রথম নাট্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল বরাহবনীর রাজা রামকানাই সিংহদেবের পৃষ্ঠপোষকতায়। কলকাতা থেকে অপেরা নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাট্যানুষ্ঠান। স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগ ও অভিনয়ে নাট্যানুষ্ঠান প্রযোজিত হয়েছিল সম্ভবত ১৯০১ কি ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম থিয়েটার টিকিট কেটে অভিনীত হয়েছিল ১৯২৪ সালে। উদ্যোক্তা ছিলেন পশুপতি সিংহমোদক। ধ্রুবপ্রসাদ যাত্রা ছেড়ে থিয়েটার স্থায়ীভাবে করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বছর পাঁচেক পরে। দীর্ঘদিন পরে গোপেশ্বর ঘোষের পরিকল্পনায় নতুন করে নাটকের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। সেসময় অনেকগুলি যাত্রার দলও গড়ে উঠেছিল বরাবাজারে।

বান্দোয়ানে যাত্রানুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল ত্রিশের দশকে। উদ্যোক্তা ছিলেন পারগোনার রাজা বা জমিদার জ্যোতিলাল সিংহবাবু। পথ ভাঙ্গার পর যাত্রাগানের হিড়িক পড়ে যায়। বন্দোয়ান গ্রামের যাত্রানুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন হরিপদ হালদার। ধ্রুবপ্রসাদ বরাবাজার থেকে এখানে এসে মাঝে মধ্যে হাল ধরতেন। পর্দা খাটিয়ে থিয়েটার করার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল পারবাইদ গ্রামে। উদ্যোক্তা ছিলেন বসন্তকুমার মহান্তী। বান্দোয়ান থানার বহুগ্রামে নিয়মিত যাত্রানুষ্ঠান হয়ে থাকে।

ছো নাচের জন্য প্রসিদ্ধ বাগমুণ্ডি থানা। এখানকার শিল্পীদের খ্যাতি জেলা ছাড়িয়ে পশ্চিমবাংলা, ভারত এবং ভারতের বাইরেও প্রসারিত। নাটকের ক্ষেত্রেও থানাটি পিছিয়ে ছিলনা। মাদলা গ্রামে প্রাচীন দুর্গা মন্দিরের চত্বরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাট্যানুষ্ঠান। সম্ভবত সেটি ১৯০৫ সাল। নির্দেশক ছিলেন বিমলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের বছর বাগমুণ্ডির রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাট্যানুষ্ঠান। রাজা মদনমোহন সিংহদেবের পুত্র ক্ষেত্রমোহনের জন্ম উপলক্ষে (১৯১১ সাল) রাজবাড়িতে একুশ দিন ধরে উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। গুণী ও শিল্পী এসেছিলেন অনেক। এ অঞ্চলে নাট্যচর্চা বেশ জমে উঠেছিল। ধীরে ধীরে নাট্যচর্চা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তুনতুড়িতে থিয়েটারের জন্য নির্মিত হয়েছিল স্থায়ী মঞ্চ (১৯২৮)। অম্বিকা নাট্য মন্দির। এখানকার নাট্যচর্চার প্রাণপুরুষ ছিলেন ইন্দুভূষণ

চক্রবর্তী। বুড়দায় ছিল চার্চ। ১৯১০ সালে সেখানে পিলগ্রিসম প্রগ্রেসের বাংলা অনুবাদ 'যাত্রিকের গতি' অভিনীত হয়েছিল। প্রথম থিয়েটার বুড়দায় আয়োজিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। নাটক, দেবলাদেবী। ১৯২০ সালে সিন্দরী এলাকায় মঞ্চস্থ হয় নাটক, উদ্যোক্তা ফলারীমোহন কুইরী। কালিমাটির জমিদার বাড়িতে নাটকের চর্চা সুরু হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দিকে। বাগমুণ্ডি থানায় পরবর্তীকালে নাট্যান্দোলনে যে প্রাণ প্রবাহ দেখা দিয়েছিল সে প্রবাহ এনেছিলেন সিন্দরীর কালিপ্রসাদ কুইরী। নাট্যচর্চায় বাগমুণ্ডি থানার অন্যান্য গ্রামগুলিও পিছিয়ে ছিলনা! যেখানে যেখানে নাট্যচর্চা জোরদার হয়ে উঠেছিল এবং এখনও আছে তাদের মধ্যে অন্যতম, তোড়াং, মাঠা, গোবিন্দপুর, সুইসা, চোড়দা, শ্রাবনডি প্রভৃতি।

বলরামপুরে নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে (১৯১০ খ্রী)। সর্বজনীন কালীপূজা উপলক্ষে ও গতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে। পরবর্তীকালে ডা. কৃষ্ণকিশোর সেনগুপ্তের উদ্যোগে সুরু হয়েছিল থিয়েটারের চর্চা। বরাবাজারের ধ্রুবপ্রসাদ সিংহদেব এখানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আরও পরে গঠিত হয়েছিল সরস্বতী সমিতি। বলরামপুরে নাট্যান্দোলনের ক্ষেত্রে সমিতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল এবং এখনও করে চলেছে। সমিতি ছাড়াও কালীতলা পাড়া এবং স্টেশনপাড়ায় বিছিন্নভাবে থিয়েটার ও যাত্রা আয়োজিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

আড়সা থানায় উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রা ও থিয়েটার আয়োজিত হত। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মহাদেব দাস, দীনবন্ধু মুখার্জী, ভূতুনাথ মাহাত, শম্ভুনাথ দেঘরিয়া প্রভৃতি।

মানবাজারে নাটকের চর্চা সুরু হয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯২৭ খ্রী)। প্রেরণা যুগিয়েছিলেন অম্বিকানগরের রাজা কালাচাঁদ ধবলদেব। উদ্যোক্তা ছিলেন নারায়নচন্দ্র চক্রবর্তী, ব্যয়ভার বহন করেছিলেন রাধামাধব নারায়ণদেব। গঠিত হয়েছিল যাত্রার দল, বলরাম নাট্য সমিতি। স্থান ছিল পাথরমহড়া। এরপর এক এক করে অনেকগুলি যাত্রার দল গঠিত হয়েছিল। নামোপাড়ায় তরুণ অপেরা, বীনাপানি ড্রামাটিক ক্লাব, টাউন ক্লাব, শিল্পী মহল, বান্ধব সমিতি, অগ্রণী নাট্য সংস্থা প্রভৃতি। কাছাকাছি গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল নাট্যচর্চার উদ্যম। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মধুপুর।

দক্ষিণের মত পুরুলিয়া জেলার উত্তরাঞ্চলও নাটকের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। তবে এদিকে রাজা বা জমিদার পরিবারগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ছিল কম। ঝালদার রাজবাড়িতে ঝুলন হত আড়ম্বরের সঙ্গে। সেসময় কলকাতা থেকে আনা হত যাত্রার দল। প্রথম এ জাতীয় যাত্রার দল আনা হয়েছিল সম্ভবত ১৯১৩-১৪ সালে। ঝালদার প্রথম স্থানীয় দল ছিল ভূদেব সমিতি। পরবর্তীকালে আরও যেসব দল গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে প্রধান বীনপাণি নাট্য সমিতি (১৯২৯), রঘুনাথ নাট্য নিকেতন প্রভৃতি।

ঝালদার কাছাকাছি বেগুনকোদর। সেখানেও একটি জমিদার পরিবারের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ছিল। প্রথম দিকে নাটকের ব্যাপারে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না তেমন। স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগেই আয়োজিত হত নাটকাভিনয়। রাজবাড়ির চত্বরে প্রথম নাটক হয়েছিল সম্ভবত উনিশ শো তিরিশ সালের কাছাকাছি। পরবর্তীকালে স্থানীয় স্কুল এবং শিক্ষকদের উৎসাহে রীতিমত নাটকের চর্চা সুরু হয়েছিল। নারীর ভূমিকায় নারীদের দিয়ে অভিনয়ও চালু হয়েছিল ১৯৭২ সালে।

যাত্রানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অগ্রণী পাড়া থানা। অধিকাংশ বড় বড় গ্রামে সুগঠিত যাত্রার দল আছে। তারা অনুষ্ঠানও করে থাকেন মাঝে মাঝে। যেসমস্ত গ্রামে যাত্রার দল আছে এবং নাটক অভিনীত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম, আনাড়া, পাড়া, জোড়বেড়িয়া, ঝাঁপড়া, শাঁকড়া, দুবড়া, জবড়রা, লিপানিয়া, কেটলাপুর, আলকুষা, উদয়পুর, নডিহা, চরপটিয়া, ভাগাবাঁধ, শ্যামপুর, মোহুলা, সুরুলিয়া প্রভৃতি।

গড় জয়পুরে প্রথম যাত্রার দল গঠিত হয়েছিল ১৯২২ সালে। উদ্যোক্তা ছিলেন মহিমচন্দ্র চৌধুরী। নাম, মহালক্ষ্মী নাট্য সমিতি। ১৯২৬ সালে যাত্রার দলটি থিয়েটারের দলে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাজ পরিবারের জামাই বিদ্যাসুন্দর সিংহদেওয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন জোয়ার এসেছিল নাট্যাচর্চায়। তার মৃত্যুর পরে (১৯৩৮) কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হয়েছিল নাট্যচর্চা। বর্তমানে আবার জোরদার হয়ে উঠেছে।[১৪]

জেলাব্যাপী নাট্যচর্চার মাধ্যমে কয়েকজন খ্যাতকীর্তি অভিনেতা, সুরকার, যন্ত্রশিল্পী ও নাট্যকারের উদ্ভব ঘটেছিল। পুরুলিয়া সহরে প্রখ্যাত অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওরফে কটুবাবু, সরোজপ্রকাশ

১৪. গড় জয়পুর মহালক্ষ্মী নাট্যসমিতির ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্পাদক শ্রীনির্মলকুমার গোস্বামী (নিমু গোস্বামী) প্রদত্ত 'রাইট-আপ'-এর ভিত্তিতে লিখিত।

মুখার্জী, রাধাভূষণ মুখার্জী, রামদুলাল অধিকারী, ধনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ রায় প্রভৃতি। নৃত্য শিল্পী হিসাবে খ্যাতি ছিল খোকা মুসলমানের, বংশীবাদক ছিলেন শ্রীরাম সূত্রধর, হারমোনিয়াম বাজনায় নাম ছিল নুনারাম সূত্রধরের। কটুবাবু নাটকও লিখতেন। বেশিরভাগ প্রহসন বা ছড়া জাতীয়। রঘুনাথপুরের মোহিনীমোহন রায় বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন, তৈরিও করতে পারতেন। বরাবাজারের মহম্মদ ইয়াসিনের লেখা একাঙ্ক 'সেলাইন চলছে' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বেগুনকোদরের রাধারমন গোস্বামী, হরিপদ বিদ, তারাশংকর চট্টরাজ ভাল অভিনয় করতেন। ঝালদায় গোবিন্দচন্দ্র ঝালদার রাজপরিবারের চরিত্রগুলি নিয়ে লিখেছিলেন একটি প্রহসন, 'নটবর চরিত্র'।

ঝাঁপড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক যজ্ঞেশ্বর সাহবাবু ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও পরিচালক। বান্দোয়ানে নরেন্দ্রনাথ সিংহ বাবু ছিলেন নামকরা অভিনেতা। বীরভূমের মানুষ নীলকণ্ঠ মুখার্জী দীর্ঘদিন বসবাস করেছিলেন বাগমুণ্ডিতে। নাচ ও গানে নামকরা শিল্পী ছিলেন তিনি। বুড়দার চন্দ্রকান্ত অমৃত ১৯১৫ সালে রচনা করেছিলেন 'অল্পব্যয়ী পুত্র' নামে নাটক। মানভূমে ভাষা আন্দোলনের সময় তারকনাথ ভট্টাচার্য কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে দেশের ডাক, সঞ্জীবনী অন্যতম, অভিনীত হয়েছিল বুড়দাতে। অনিলকুমার খান্নাও কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন। যেমন, রাত্রি আসান, বিজয় গৌরব, গো-সিংহ বধ প্রভৃতি। তার রচিত নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল 'মহাবর্ষার রাঙা জল।' প্রকৃতপক্ষে নাটকটি ছিল পুরুলিয়া জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা জাতীয় 'সেই মহাবর্ষার রাঙা জল' গ্রন্থের নাট্যরূপ।

বাগমুণ্ডি থানায় কয়েকজন শক্তিশালী অভিনেতা ও শিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিল। অভিনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন কালিকাপ্রসাদ কুইরী ও কালিপদ ভুঁই। সুরশিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন আকুল মাছুয়া। স্থানীয় শিক্ষক বাসুদেব মাহাত কয়েকটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন, সিন্দরী গ্রামের জীমূতবাহন রুহিদাসও রচনা করেছিলেন কয়েকটি সামাজিক নাটক। পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন বলরাম কুমারও। আড়সা থানার দীনবন্ধু মুখার্জী ছিলেন প্রকৃত অর্থে শিল্পী। একাধারে যন্ত্রশিল্পী, অভিনেতা ও নাট্যকার। মহাদেব দাস ছিলেন নামকরা ওস্তাদ। গুহিরাম মোহরি ছিলেন

ফ্লুটের ওস্তাদ। ভাঙ্গড়া গ্রামের কেশব গণকও ছিলেন নামকরা হারমোনিয়ম ও বেহালা বাজিয়ে। শম্ভুনাথ দেঘরিয়া থাকতেন বিলতোড়া গ্রামে। নিজে যে কেবল বড় ওস্তাদ ছিলেন তাই নয়, ছেলেদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে নাচ শেখাতেন।

রঘুনাথপুরের বৈদ্যনাথ দে ছিলেন নামকরা সুরকার ও যন্ত্রশিল্পী। তার ছাত্র পঞ্চুপাল বাঁশি-বাজিয়ে হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। মানবাজারের প্রহ্লাদ বাগতি ছিলেন সুরের শিক্ষক, গায়ক হিসাবে নাম ছিল বিনোদ ধাড়া ও রাঙ্গামেট্যার নারায়ণচন্দ্র গোস্বামীর। মানবাজারে সবচেয়ে নামকরা অভিনেত ছিলেন নন্দলাল মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন গোবর্ধন দত্ত।

কলকাতার ব্যবসাভিত্তিক যাত্রাদলগুলির দাপটে গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট দলগুলি প্রায় উঠে যেতে বসেছে। স্থানীয় প্রতিভাধর অভিনেতা, শিল্পী ও নাট্যকারদের বিকাশও প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রামের সংকীর্ণ পরিবেশে আত্মপ্রকাশ ও আমোদপ্রমোদের যে ক্ষুদ্র বাতায়নটি দীর্ঘকালধরে আলো ও বাতাস বয়ে এনে গ্রামীণ জীবন সমুজ্জ্বল করে রাখত, সহুরে যাত্রার ধাক্কায় সেটি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে কিনা, সংস্কৃতির কর্ণধারদের বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

———

দৈনন্দিন জীবন

আহার্য পোশাক পরিচ্ছদ ও সামাজিক সম্পর্ক

হাটু গাড়ি বসবি আটুপাটু চাটুটাকে ধরবি
টুকু বাঁটি টুকু খাবি টুকু বাসি রাখবি
সকাল হলেই ছাল্যা কাঁদা মনে রাখবি।

বিশ শতকের প্রথমার্ধেও পুরুলিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। হিংস্র ও ভয়াবহ প্রাণী ও সরীসৃপের আবাসভূমি। প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাণীকুলের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে হত অধিবাসীদের। এছাড়া ছোট-বড় রাজা জমিদার ছিলেন অসংখ্য। দৈহিক শক্তি, সাহস ও বলিষ্ঠতাই ছিল সার্থকতার মাপকাঠি। মায়েরা কামনা করতেন সন্তান যেন হয় বলিষ্ঠ, লাঠি ও তীরচালনায় সুদক্ষ, দুঃসাহসী। জীবনবোধের এই ধারণা রূপান্তরিত হয়ে চলেছিল ইংরেজ শাসন এ অঞ্চলে একটু একটু করে কায়েম হয়ে বসার পর থেকে।

স্থানীয় রাজা, জমিদার ও সর্দারেরা তাদের কর্তৃত্ব হারাতে সুরু করেছিলেন। নিন্দনীয় হতে সুরু করেছিল কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির প্রাধান্য। বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে সুরু করেছিল। তবু প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনে আহার্যবস্তু, পোশাক পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন জীবনের ধারাটি রাতারাতি রূপান্তরিত হতে পারেনি। কিছু কিছু রেশ এখনও টিঁকে আছে, কিছু কিছু বিলুপ্তপ্রায়, কিছু কিছু অবলুপ্ত।

অরণ্য অঞ্চলে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আহার্যবস্তুর বেশিরভাগ সংগৃহীত

হত বন থেকে। এ বিষয়ে শবরদের আহার্যবস্তু এখনও প্রায় আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে। তারা কৃষিকাজে বিমুখ, প্রধানত অরণ্যের ওপরেই নির্ভরশীল। গ্রীষ্মের সময় শাক, লতাপাতা পাওয়া যায় কম, ফলে তাদের নির্ভর করতে হয় প্রাণীকুলের ওপর। তাদের মধ্যে পাখির বাচ্চা, ঢ্যামনা ও গোসাপ, শামুক ইত্যাদি প্রধান। আষাঢ়ে নতুন বর্ষায় সতেজ হয়ে ওঠে বনভূমি। নানারকম শাকপাতা মেলে, মেলে ফল ও মূল। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় নানাজাতের ঘ্যাঙ, গুঙ্গা বা শামুক, কাঁকড়া, মাছ ইত্যাদি। আমন ধান পাকতে সুরু করলে তারা ক্ষেত থেকে ঝরে পড়া ধান সংগ্রহ করেন, সেইসঙ্গে শিকার করা হয় ইঁদুর। মাঘ থেকে চৈত্রে নানারকমম ফুল ও ফলে ভরে ওঠে বনভূমি। সংগৃহীত হয় মধু। ডিমসহ মৌচাকও যুক্ত হয় খাদ্যতালিকায়। এছাড়া শিয়াল, হুড়াল, খরগোস, পাখি বছরের সব সময়েই শিকার করা হয় খাদ্যের জন্য। খাদ্য যেমন আদিম, খাদ্য তৈরির উপকরণেও তেমনি বাহুল্যতা নেই! শাল বা সেগুণ পাতার খালা তৈরি করে, তার ভেতর খাদ্যবস্তু আগুনে ঝলসিয়ে নিয়ে, চলে খাওয়া। উনুন বা রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই।

শবরদের খাদ্য তালিকা ও প্রস্তুত পদ্ধতি পুরুলিয়ার সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্য তালিকা বা প্রস্তুত পদ্ধতি নয়। তবে অরণ্য চারিদিকে ঘিরে থাকায় খাদ্য তালিকাতেও লতা, পাতা, শাক, ফল, মূল এবং প্রাণীর মাংসের প্রতি পক্ষপাত বেশি। শাকের মধ্যে প্রিয় কলমি, গেঁঠা, লৈটা, পুনকা, বেথো, শুশনি, সালঞ্চ, মুনগা, খাপরা ভাতরাঙ্গা প্রভৃতি। এদের মধ্যে লৈটা খুবই জনপ্রিয়।

বাজারের লাল লট্যা হায় ল লাল লট্যা
পস্তু দিয়ে' কিরণ ল করবি লটপটা।

নানা ধরনের ছাতু তৈরি হয় এসব অঞ্চলে। ছাতুকে এ অঞ্চলে বলা হয় কুঢ়া। যেমন, বুট-কুঢ়া, চাল-কুঢ়া, জনার-কুঢ়া ইত্যাদি। জনার খুব প্রিয়, নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। জনার এমনি খাওয়া যায়, শুকনো জনার ভেজে খায়, কুটে হয় ছাতু।

ভাদর মাসে গাদর জনার লাল টুপায় খাব
আর কি ছাল্যা জনম পাব।

কিংবা—

জনার ফুটে ফাট ফুট মায় বিটি কুঁঢ়া কুট
ভাদর মাসে, তকে জামাই আল্য লিতে।

এডিবল মাশরুমকে এখানে বলা হয় ছাতু। মাটি, কাঠ, গাছের গায়ে গোল ছাতার মত হয়ে গজিয়ে ওঠে ছাতু। পোষাকী নাম ছত্রাক। রান্না হয় মাংসের মত করে। নানা রকমের ছত্রাক হয় এদিকে। সাধারণত হয় জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত। আকৃতি, স্বাদ ও নাম নানা। যথা, ঝাড়ান, ফড়কা, ফুড়কি, কামারা, পুয়াল, উই প্রভৃতি।

মহুয়ার ফলকে বলা হয় কড়চা। খোসা ছাড়িয়ে কড়চার শাঁস ভেজে বা শাকের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে খারাপ লাগেনা। কড়চার বীজ থেকে হয় তেল, তাতে রান্না করা চলে। মহুলের ফুল সেদ্ধ করে খাওয়া হয় পুরুলিয়ায়। উপাদেয় খাদ্যবস্তু। মহুল ফুল শুকিয়েও রাখা হয়, প্রয়োজনে খাবার জন্য। মহুল ফুল চোলাই করে হয় মহুয়া নামক পানীয়।

বনের ভেতর আরও নানারকমের ফল পাওয়া যায়। যেমন, পিয়াল, জাম, কেঁদ, ভ্যালা, কুসুম, তুঁত, মাদল, সিয়াকুল, আমলা, বহড়া, হর্তুকি ইত্যাদি। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত কোন না কোন ফল পাওয়া যায় বনে। গ্রীষ্মে পিয়ালের শরবত তৈরি হয়। কেঁদের ফল শাঁসযুক্ত ও মিষ্টি, জ্যৈষ্ঠে জাম পাকে। ভ্যালা পাকলে মিষ্টি, পুড়িয়েও খাওয়া চলে। মাদালের পোষাকী নাম আতা। পুরুলিয়ার জঙ্গলে প্রচুর মাদাল ফলে। কুসুম ও সিয়াকুল বাচ্চাদের খুব প্রিয়। রসে ভরপুর তুঁতপাকাও খুব মিষ্টি। ফুঁট বা ফুঁটিও পাকে জ্যৈষ্ঠে, ব্রতপার্বনে নাহলে চলে না গৃহিনীদের।

পদ্মডাঁটার খানিকটা অংশ খাওয়া যায়। তাকে বলে মুলুন। আঁটি বেঁধে বিক্রি হয় হাটে। ভাজা করে খাওয়া হয় মুলুন। পদ্ম থেকে উদ্ভূত টাঁটি বা টাটগড়রা খেতেও মন্দ নয়। শালুক থেকে হয় ভেট। ভেটের খৈ গুড় দিয়ে পাক করে তৈরি হয় লাড্ডু বা মোয়া। পানিফল হয় জলে, খেতে সুস্বাদু।

মাটির তলায় হয় খামআলু, আকারে বড় বড়। আলুর বিকল্প। 'ক্যাসর'ও হয় মাটির তলায়, গায়ে কালো বা খয়েরি রঙের খোসা, ভেতরে সাদা। সাদা অংশ ভাল লাগে খেতে। পুরুলিয়ার রুক্ষ মাটিতে আনাজ বা সব্জি বেশি হয় না। যা হয় তাদের মধ্যে প্রধান লাউ, করলা, কুঁদরী, ঝিঙে প্রভৃতি। এদের ভেতর ঝিঙেই হয় বেশি। ফলেও যত্রতত্র

আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঁগা ঝিঁগা ফলে তিরিংরিংগা
তেল বিনা, ঝিঁগা রসুন ফড়নরে, ঝিঁগা সিজবি কখন।

ঝিঁগের ফুল সোনারঙের, ফোটে সকালে, ঝরে সন্ধ্যায়। ফোটেও অজস্র।

নিম মিশিয়ে যেসব তরকারী হয় পুরুলিয়ায় তাকে বলে ছেঁচকী। ঝিঙে, সিম, পেঁপে, বেগুন এসবের ছেচকীর প্রচলন আছে এ অঞ্চলে।

নদীনালা, বাঁধ বা পুকুর বেশি নেই পুরুলিয়ায়। বর্ষার সময় শুকনো বাঁধগুলো জলে ভরে ওঠে, অল্প বিস্তর আমদানী হয় মাছের। তাদের মধ্যে প্রধান গড়ুই বা লেঠা, সোল, মাগুর, রুই, কাতলা, বোয়াল প্রভৃতি। এছাড়া পাওয়া যায় নানাজাতের ছোট ছোট চুনো মাছ। বড় মাছের টুকরোকে এ অঞ্চলে বলে ভেকা। ভেকা খুব প্রিয়।

মাথায় ত বাস্যাম বাটি কাঁখে গাগরা গ
মুনিষরা তো খুঁজে মাছের ভেকা।

তেঁতুল, কচি আম কি টমাটো দিয়ে হয় ইচলা বা চিংড়ি মাছের ঝোল, এদিকে খুব জনপ্রিয়। বিনা তেলে গরম তাওয়ায় ভাজার নাম পঁপড়ান। উনুনের ওপর, বা শিকেয় ঝুলিয়ে পঁপড়ান চিংড়ি রাখা হয় অসময়ের জন্য। বাঁশের ঝুরি কি শালপাতার ঠোঙা বা পটমেও এভাবে রাখা হয়। পুঁটি মাছের চেয়েও ছোট এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায় এদিকে, নাম দাঁড়কিয়া বা ডাইড়কা। ধান গাছে যখন ফুল ধরে, ধানের খেতে এক ধরণের সরু সরু মাছ হয় নাম ধানফুলি বা ধানহুলি। ঝোল বা ভাজা খেতে দুরকমের মাছই খুব উপাদেয়। মাছ পুড়িয়ে খাবার রীতিও আছে এ অঞ্চলে।

গুগলির মাংস হাটে হাটে বিক্রি হয় খুব। ঘঁঘা ও ঝিনুকের মাংসও কিছু কিছু অঞ্চলে খাদ্যবস্তু। রক্ত ভাজাও এদিকে আহার্য হিসাবে চালু। গেরস্থ বাড়িতে খাসি বা ভেড়া কাটা হলে তাজা রক্ত ধরে রাখা হয় থালায়। জমে গেলে টুকরো টুকরো করে কেটে ভাজা খাওয়া হয়। আঁত জড়ানো মাংসের টুকরোর নাম হাড়জড়া। ছাগলের পাকস্থলী টুকরো টুকরো করে ভেজে তৈরি হয় ভুঁটিভাজা। মাথার ঘিলুর চলতি নাম গিধি। গিধিও ভেজে বা পুড়িয়ে খাওয়া হয়। খাসী, মুরগি, ভেড়া, ময়ুর এখানে মোটামুটি সহজলভ্য মাংস। ইঁদুরের মাংস খাবারও রেওয়াজ আছে এ অঞ্চলে। ইঁদুরের মাংস দিয়ে পিঠেও তৈরি হয়।

সবাই গেল উঁদুর খাতে শাম মদের গেল না।
উঁদুর পিঠা বড় মিঠা শামকে দিয়া হল্য না।।

আনন্দে উৎসবে নানাধরনের পিঠে তৈরি করা হয় পুরুলিয়ায়। তাদের মধ্যে প্রধান, খাপরা বা খোলা পিঠে, আসকে, চকলি, গুড় পিঠে, থাপা, গুলা, লাড়ু ও চাটু পিঠে, পোষ পরবের ডুমকা, মাছের ও মাংসের পিঠে, আলতি

কচু, ঢেঁড়স, লাউ ও সীমের পিঠে, বিরি ডালের পিঠে ইত্যাদি।

লাড়ু পিঠা গটা পিঠা চাটু পিঠা ঝাজরা
কামার ঘরে বাইজতেছে জড়া নাগরা।

গুড় ও চালগুঁড়ি মিশিয়ে ভাজা হলে হয় গুড়পিঠা। গুড়ে পাক করা সিড়ি-চনা বা সেউয়ের লাড্ডুর নাম টানালাড়ু। বোঁদের তৈরি লাড্ডুর নাম আঁখড়া মিঠাই। চালগুড়ির ছাঁকা পিঠের নাম পাপচি পিঠা। চাল ও কলাই দিয়ে তৈরি হয় উলউলা পিঠা। আরও কর্তক।

স্থানীয় উপকরণ যা পাওয়া যায়, পুরুলিয়ার মানুষ তাকে কাজে লাগিয়ে যতটা সম্ভব আহার্যবস্তু করে তুলেছেন। খরা মাটির দেশে, কৃপণ প্রকৃতি যতটুকু তাদের সম্ভার দিয়েছেন, যুগযুগধরে তার ওপরেই গড়ে উঠেছে আহার্যের তালিকা, রন্ধন প্রণালী ও খাদ্যের অভ্যাস[১]।

পোশাক পরিচ্ছদে বাহুল্যতা বা আড়ম্বর এদিকে বেশি নেই। অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। পুরুষেরা পরতেন মোটা ধুতি বা কাচা। লম্বায় পাঁচ থেকে সাত হাত, এক থেকে দেড় হাত চওড়া। কাচা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে চলেছে, ধুতিই এখন সাধারণ পরিধেয়। কাচার সঙ্গে প্রায় অপরিহার্য ছিল গামছা, লম্বায় প্রায় পাঁচ হাত, চওড়ায় দু'হাত। ব্যবহৃত হত নানাভাবে। কাচার ওপর জড়ানো হত কখনও, কখনও ক্ষেতে চাষের সময় পাগড়ির মত করে বাঁধা হত মাথায়। গামছার চল এখনও আছে, তবে গ্রাম থেকে বাইরে বেরুলে সেটিকে আর কাচার ওপর জড়ানো হয় না, ভরে রাখা হয় ঝোলায়। প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়। মেয়েরা পরেন ঠেঁটি, দুদিকে পাড় দেওয়া মোটা শাড়ি। বালিকারা পরেন পুটলি বা ফরাণি, ঠেঁটির মতই, কিন্তু লম্বায় ছোট। একই ধরণের কাপড় পরেন বৃদ্ধারা, নাম নহঙ্গা। ঠেঁটি ছাড়াও স্থানীয় আনসারি বা জোলাদের বোনা রঙিন মোতিয়া শাড়িও সাঁওতাল রমণীদের খুব প্রিয়। বর্তমানে মোটা ও সরু সুতোর জনতাশাড়ি ও ধুতি গ্রামাঞ্চলে নারী ও পুরুষের পরিধেয় হয়ে উঠেছে।

শীতের সময় কাঁথার মত শীতবস্ত্র বা গেলাপ দেওয়া হয় গায়ে। পুরনো ছেঁড়া কাপড় একসঙ্গে সেলাই করে কাঁথার মত পোশাক তৈরী করা হয়। নাম 'গেন্দরা'। মেয়েরা এটিই গায় দেন ক্ষেতে কাজ করার জন্য। খড়মের মত একধরণের পাদুকা বা বাঁধা ব্যবহার করা হত। এখন বাঁধার চল প্রায় উঠে

১. এই অধ্যায়টি লিখতে যাদের রচনা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম, শ্রীমহাবীর নন্দী, বঙ্কিম মাহাত, গোপীবল্লভ লাল সিংহদেও প্রভৃতি।

গেছে। বর্ষায় ব্যবহার করা হয় ছাতা কি ঘোঙ বা ঘোঙা, লতা ও পাতা দিয়ে বোনা হয় ঘোঙ, মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢেকে রাখে। শোওয়া বসার জন্য খেজুর পাতার পাটি, তালপাতার তালাই বা বাঁশে বোনা চাটাই ব্যবহার করা হয়। দেশীয়প্রথায় তৈরী কম্বল ও দাড়ি বা সতরঞ্চিও শোয়া বসা ও গায়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক সম্পর্ক ছিল ছাড়া ছাড়া। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উপজাতি ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়কে পরিহার করে চলতেন। আন্তঃ সাম্প্রাদায়িক বিয়ে থাওয়ার চল তো ছিলই না, এমনকি একসঙ্গে আহার-বিহারও চলত না। যদিও সুদূর অতীত থেকে কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতি ও বর্ণগত বিচ্ছিন্নতা দূর করে একত্র মেলামেশার রীতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত ছিল। যেমন, গাজন, ধর্মপূজা, মনসার ভোগ গ্রহণ ইত্যাদি। গ্রামের মানুষ সহজ ও সোহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চমৎকার একটি প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। যথা, ফুল, সঁয়া বা বন্ধুত্ব পাতানো। রীতিটি এখনও চালু আছে। সঁয়াদের মধ্যে জাতিৰ বিভেদ থাকেনা, থাকেনা ধনীনির্ধনের অহমিকা বা হীণমন্যতা। তারা একে অপবের আজীবন বন্ধু। সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, গোপনীয় ও অভিব্যক্ত ভাব প্রকাশে পরস্পরের একান্ত অংশীদার। গ্রামের ভেতর, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এবং বহুদূরে গ্রামের অধিবাসীরাও একে অপরের সংগে পাতিয়ে থাকেন সঁয়া বা বন্ধুত্ব। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রথাটি মন্ত্রের মত কাজ করে।

বর্তমানে রাজনৈতিক দলাদলি ও মতভেদের ফলে গ্রামের সহজ সামাজিক সম্পর্ক অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়েছে। বিষময় হয়ে উঠেছে পারস্পরিক সম্পর্ক। পরিবর্তে এমন কোন সাংস্কৃতিক বা সামাজিক পন্থা উদ্ভূত হয়নি যার দ্বারা একাধারে আদর্শগত মতভেদ অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে চিন্তাবিদদের মনোযোগ দেওয়া অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজড়িত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি একসময় পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম ছিল। ত্রুটি ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংকীর্ণতা, কারণ অনুষ্ঠানগুলি এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রীতি হিসাবে পালিত হত। বর্তমানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করেছে। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠানেও রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, দুর্গাপূজা। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন এমনভাবে করা প্রয়োজন যা রীতিগতভাবে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও তাকে দৃঢ় করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

———

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য

'With an integrated development programme spanning agriculture and industry, it would be possible to liberate this Purulia district from the twin curses of unemployment and near—poverty conditions.
—Purulia Project Report submitted by Purulia Development Board to Dr. B.C. Roy on 10.2.1961

জন্মক্ষণেই পুরুলিয়া জেলা সুগ্রথিত অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। প্রাক্তন মানভূম জেলার কৃষি ও খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল বহির্ভূত হয়েছিল নতুন জেলা থেকে এবং অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিহার রাজ্যের। তবু খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য একেবারে যে নেই তা নয়। তা সত্ত্বেও পুরুলিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবাংলার মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর রয়ে গেছে। আয়তনে জেলাটি পশ্চিম-বাংলায় পঞ্চম বৃহত্তম। কিন্তু মোট এলাকার মাত্র আটচল্লিশ শতাংশ জমি কর্ষণ-যোগ্য। অধিকাংশ কর্ষণযোগ্য এলাকা আবার সেচের জল বঞ্চিত। ফলে এক ফসলী। একের বেশি ফসল হয় এমন জমির পরিমাণ খুবই কম।[১]

প্রকৃতি এবং উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে জেলার সমস্ত চাষ-জমি মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত। বহাল অর্থাৎ নিচু জমি; বাইদ বা উঁচু জমি এবং কানালী অর্থাৎ বহাল ও বাইদের মধ্যবর্তী জমি। এ ছাড়া আর এক ধরণের উঁচু জমি আছে যেখানে চাষ হয় অনিয়মিতভাবে। তাকে বলা হয় ডাংগা বা

---

১. মোট এলাকা ১,৫৪১·৫ হাজার একর। কর্ষণযোগ্য ৭৩১·৭ হাজার একর। একের বেশি ফসল হয় এমন জমির পরিমান (১৯৬৪-৬৫) ৫০,৭০০ একর। মোট জমির নিরিখে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমান (১৯৭০-৭১) ১৩·২০%।

টাঁড়। চাষ পড়লে জমিকে বলে 'গোড়া'। গোড়া ধান ফলান যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি ব্যয় বহুল। জীবিকার প্রয়োজনে তাও চাষ করতে হয় কৃষকদের।

পুরুলিয়া জেলার শতকরা পয়ঁতাল্লিশ ভাগ জমি বাইদ, দশ ভাগ বহাল, তিরিশ ভাগ কানালী এবং দশ ভাগ টাঁড়। চাষ জমিসহ মাটির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন। ওপরের ত্বক পাতলা, জল ধরে রাখার ক্ষমতা কম। ভূত্বক ঢালু হবার ফলে এবং জল সংরক্ষণ ক্ষমতার অভাবে ভূমিক্ষয়ও হয় বেশি। ভূমিক্ষয় রোধের জন্য সাধারণত যে পন্থাগুলি অনুসৃত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম বৃক্ষরোপণ ও নানা ফসলের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ। প্রথমটি সম্ভব হলেও দ্বিতীয়টি সব সময় সম্ভব হয় না। কারণ সব জাতীয় ফসল মাটিতে উৎপন্ন হয় না।

রঙ ও প্রকৃতি অনুসারে মাটিকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয় যেমন, (ক) চিটা মাটি। প্রকারভেদে চিটা তিন রকমের। গোবর চিটা, দুধি চিটা ও ধব চিটা। গোবর চিটার রঙ কালচে, শুকনো অবস্থায় শক্ত, লাঙল চালানো প্রায় অসম্ভব। বেশি জল পেলে নরম হয়, জল ধরে রাখতেও পারে। সাধারণত ধান, তেলবীজ, ছোলা ও কাপাস হয় গোবর চিটায়। দুধি চিটার রঙ সাদা বা লালচে। পাথরের নুড়ি মেশান আঠা আঠা মাটি। চাষের অনুপযুক্ত। ধব চিটার অন্য নাম করনা। প্রকৃতিতে দুধি চিটার মত, চাষের কাজে লাগেনা। চুনের আধিক্য আছে। (খ) আঁশযুক্ত মাটি। এটিরও দুটি ভাগ আছে। দোরসা ও পলি। পাহাড়ের কাছে, শৈলশিরা ও দুই ডুংরির মধ্যবর্তী অঞ্চলে দোরসা জমা হয়। উঁচুস্থান থেকে বর্ষার জলে ধুয়ে আসা পাথরচূর্ণ ও ডালপাতার গলিত অংশকে বলে পলি। পলিতে কাদা বা মাটির ভাগ বেশি থাকলে বলা হয় পলি-বালি, বালির অংশ বেশি থাকলে বলে বালি-পলি। সুবর্ণরেখা নদীবাহিত পলিতে ভাল পাট জন্মায়। বেলে মাটিকে বলা হয় বালি, সাধারণত নদীর গর্ভে পাওয়া যায়। এ মাটিতে তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি জন্মায়। এ ছাড়া আরও নানাধরণের নিকৃষ্ট মাটি আছে যা চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। অন্য কাজে কিছু কিছু লাগে। যথা, সাদা মাটি, কালো মাটি, কাঁকর মাটি, পাথর মাটি ইত্যাদি।

জেলার বেশিরভাগ মাটিই অম্লযুক্ত। নাইট্রোজেন ও ফসফেটের পরিমাণ কম, পটাশ থাকে মাঝারি পরিমাণে। জৈব পদার্থের পরিমাণ কম। ফলে অনুর্বর, উৎপাদন ক্ষমতা কম। টাঁড় ও বাইদে ফলন একর প্রতি গড়ে দুই

থেকে তিন মণ। খরচও অত্যন্ত বেশি, চাষ দিতে হয় অনেকবার। কানালী জমিতে বৃষ্টি ভাল হলে ফলন হয় একরে ছয় থেকে সাত কুইনটল। জেলার গড় উৎপাদন, আমনে একরে দশ থেকে তেরো মণ চাল, আউশে দশ থেকে তেরো মণ ধান। কয়েকটি ব্লকে গড় উৎপাদন অন্যান্য স্থানের তুলনায় ভাল। যেমন, রঘুনাথপুর ১ নং ব্লকে আউশ ও আমনের ফলন একরে প্রায় চোদ্দ কুইনটল। ঝালদা ২ নং ব্লকে বোরো ধানের উৎপাদন একরে প্রায় ২২ কুইনটল, বাগমুণ্ডি ব্লকে ১৬ কুইনটল। বাগমুণ্ডি ব্লকে গমের উৎপাদনও ভাল, একরে ১৫ কুইনটল।

বাইদ জমির পরিমাণ জেলায় বেশি হওয়ায় বৃষ্টিপাত ও বাইদে ফলনের ওপর জেলার বাৎসরিক অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপিত হয়। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে জ্যৈষ্ঠের শেষে বাইদে বীজ বপন করেন চাষী। উপযুক্ত বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয় ভাদ্র মাস পর্যন্ত। আড়াই মাসে বেশ বড় হয়ে ওঠে বিহন বা চারা। ভাদ্রে বর্ষা পেলেও আশ্বিনের প্রথমেই শুকিয়ে ওঠে জমি, তখন ধানে থোড় আসে, ফলে মার খায় ধান। তিন বা পাঁচ বছরে, হঠাৎ এক বছর বাইদে ভাল ফসল হয়। অন্যসময় উৎপন্ন হয় বীজের দ্বিগুণ ফসল যাতে চাষের খরচ পোষায় না। কেবল পাওয়া যায় পোয়াল বা বিচুলি।

সাধারণত তিন রকমের ফসল হয় জেলায়। ভাদোই, আঘনী ও রবি। ভাদোই শরৎকালের ফসল, মেয়াদ ভাদ্র থেকে কার্তিক। নাম গোড়া ও ভাদোই ধান। এ ছাড়া হয় মাড়ুয়া, কোদো, জোয়ার প্রভৃতি। আঘনী কাটা হয় অঘ্রাণে বা ডিসেম্বর মাসে। আমন ধান প্রধান ফসল। এ ছাড়া হয় ইক্ষু ও কয়েকধরণের তৈলবীজ। রবি তোলা হয় বসন্তকালে। ফসলের মধ্যে প্রধান ছোলা, যব, গম, ডাল ও তৈলবীজ।[২]

জেলায় আড়াই একর জমি সম্পন্ন কৃষকদের প্রান্তিক-চাষী হিসাবে গণ্য করা হয়। বৃষ্টি ভাল না হলে তাদের ঋণগ্রস্ত হতে হয়। জেলায় মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ৭৯ ভাগ পাঁচ একরের কম জমির মালিক। আড়াই একরের কম জমি আছে শতকরা ৪২·৮ পরিবারের। এক একরের নিচে জমি আছে শতকরা বারোটি পরিবারের।[৩] প্রান্তিক চাষী পরিবারগুলি

২. মোট চাষ জমির শতকরা ৮৪ ভাগে হয় ধান, ৫ ভাগে গম, ভুট্টা জোয়ার ইত্যাদি ৪ ভাগে, দুরকম ফসল হয় ২ ভগে, তৈলবীজ ১ ভাগে, বাকি জমিতে অন্যান্য ফসল।

৩. জেলায় মোট প্রান্তিক—চাষীর সংখ্যা ১,০৬,৫৪০। এক একরের নিচে জমি আছে ৪,৬৩৯ পরিবারের; এক থেকে ২·৪ একর জমি আছে ১৬,৬৬৯ পরিবারের; আড়াই থেকে ৪·৯

ফসল তোলার পর দুই থেকে তিন মাস কোনমতে দুবেলা দুমুঠো খেতে পারেন। বছরের বাকি মাসগুলি কাটে চরম দুর্দশার মধ্যে। মহাজন, বড় জোতদার প্রভৃতির অনুগ্রহ ছাড়াও নির্ভর করতে হয় টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্যের ওপর। প্রান্তিক চাষী ছাড়াও দিনমজুর ও ভূমিহীনদের সংখ্যাও জেলায় বেশ ভারী।[৪] তাদের দিনযাপনের সমস্যা অবর্ণনীয়। উদর-পূর্তির জন্য খাদ্যাখাদ্যের বিচার অর্থহীন হয়ে ওঠে। উপবাস যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখনই চা-বাগান কি নাবালে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন পিতৃভূমি।

কৃষি প্রধান উপজীবিকা এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা কম হবার ফলে পরিবারপিছু ও মাথাপিছু আয়ও কম।[৫] কৃষি জমির স্বল্পতা ও অনুর্বরতা জেলায় যে কয়েকটি বিকল্প জীবিকার সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে যারা নিয়োজিত তাদের উপার্জনও কৃষিকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তুলনায় বেশি।

প্রাক্তন মানভূম জেলা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে কয়লা উৎপাদনে সর্বাগ্রে।[৬] জেলায় কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস ছিল ঝরিয়ার কয়লাখনি। বিশ শতকের প্রথমদিকে খনিশ্রমিকদের বেশিরভাগ ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী, বাউরি ও সাঁওতাল। খনিতে কাজ করা ছাড়াও তারা নিজেদের জমিতে চাষআবাদ করেতেন। ফলে ধান রোপা ও কাটার সময় দলে দলে অনুপস্থিত হতেন। সংকট দেখা দিত খনিগুলিতে। স্থানীয় অধিবাসীদের বদলে পশ্চিমা শ্রমিকদের নিয়োজিত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন খনি-কর্তৃপক্ষ। বিশ শতকের দ্বিতীয়

একর জমি আছে ৯,৪৭২ পরিবারের; পাঁচ থেকে ৭·৪ একর জমি আছে ৪,৫০৪ পরিবারের; সাড়ে সাত থেকে ৯·৯ একর জমি আছে ১,২২৩ পরিবারের; দশ একরের ঊর্ধ্বে জমি আছে ২১৬১ পরিবারের।

৪. জেলায় মোট চাষী পরিবরের সংখ্যা—২,২৩,৮৮৩। চাষী শ্রমিকের সংখ্যা—৩,৯৬,৯৫৮। দিনমজুর ও ভূমিহীনের সংখ্যা—১,৬৮,৯৮৯। —Annual Plan of Action (Monograph), (1980-81), Districl Agril. Office. Purulia.

৫. কৃষি থেকে মাথাপিছু আয় ছিল (১৯৫১) ১১৭ টাকা, বর্তমনে (১৯৭১) ৩৯৪ টাকা।

৬. মানভূম ছিল কয়লা উৎপাদনে বর্ধমান জেলার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯০৩ সালে মোট চালু কোলিয়ারীর সংখ্যা ছিল ১৪১, তাদের মধ্যে ঝরিয়ায় ছিল ১১৫ এবং রানীগঞ্জে ২৬। মানভূমে ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোক নিয়োজিত হতেন কয়লাখনিগুলিতে। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় চালু কয়লাখনির সংখ্যা ৬, নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ৬০০০। —BDG, Maubhum by H. Conpland (1911) ও Annual Plan.

দশক থেকে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী দশক থেকে পশ্চিমা শ্রমিকেরা খনিগুলিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বর্তমানেও সে ধারা অব্যাহত।[৭]

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে জেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল লাক্ষা শিল্প। ১৯০৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় শুধু রেলের মাধ্যমে জেলা থেকে ২ লক্ষ মণ লাক্ষা রপ্তানী হয়েছিল, আনুমানিক মূল্য ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। উপার্জনের উৎস হিসাবে লাক্ষা ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। প্রায় প্রতিটি পরিবারের দখলে কয়েকটি করে গাছ থাকত যাতে উৎপাদিত হত লা। সাধারণত তিন রকম গাছে হয় লা। কুসুম, পলাশ ও বর বা কুল। এদের মধ্যে কুসুমের লা সবচেয়ে ভাল, দামও বেশি।

বছরে তিন থেকে চারবার চাষ করা হয় লায়ের। কুসুম-লা ছাড়া অন্যান্য লাকে বলা হয় রঙিন। রঙিন হয় দুবার। জুন-জুলাই মাসে লাগিয়ে অকক্টোবর নভেমবরে যে ফসল তোলা হয় তাকে বলা হয় কর্টাক। অকটোবর-নভেম্বর মাসে লাগিয়ে এপরিল-মে মাসে তোলা ফসলকে বলা হয় বৈশাখী। কুসমী লায়েরও দুটি ভাগ, আঘনী ও জ্যেঠই। আঘনী লাগান হয় জুন-জুলাই মাসে, তোলা হয় ডিসেমবর-জানুয়ারী মাসে। জ্যেঠই লাগান হয় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে, তোলা হয় জুন-জুলাইতে।[৮]

লা-পোকার রঙ লাল, লম্বায় আধ মিলিমিটার, বছরের নির্দিষ্ট সময়ে স্ত্রী-পোকার গা থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসে গুড়ি গুড়ি করে, গাছে নতুনভাবে গজিয়ে ওঠা ডালে চলে যায়। সাধারণত দুই থেকে পাঁচশো পোকা এভাবে স্ত্রীপোকার গা থেকে বের হয়। যে গাছে লা হয়, লাসহ সেগাছের ডাল কেটে নতুন গাছে বেঁধে দেওয়া হয়। ডালে তারা থাকে গাদাগাদি ক'রে এক ইঞ্চিতে প্রায় দেড় থেকে দুশো। এক ধরণের রস নির্গত করে তারা। চকচকে ও আঠার মত এই রস শক্ত হয়ে খোলসের মত তাদের আচ্ছাদনের কাজ করে। জীবিত অবস্থায় যখন খোলাসহ পোকাগুলিকে তুলে আনা হয় তাকে বলা হয় 'আরি', মৃতদের আনা হলে বলে 'ফুনকি'।

---

৭. কয়লাখনি ও অন্যান্য খনিজের সঞ্চয় এবং জেলায় তাদের সাহায্যে কোন কোন শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের 'ভূগর্ভ ও ভূপ্রকৃতি' অধ্যায়। অধ্যায়টিতে যে যে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি, সেই শিল্পগুলি সম্বন্ধে বর্তমান অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. Lac Cultivation in India—P.M. Glover. 1937.

গাছ থেকে কাটা লা কারখানায় নিয়ে আসার পর লোহার দাঁতওয়ালা যন্ত্র বা ক্র্যাশারের সাহায্যে ভাঙ্গা হয়। ভাঙ্গা লাকে সাজিমাটি বা সোডা দিয়ে ধুয়ে মেঝেয় রেখে নেওয়া হয় শুকিয়ে। শুকনো পদার্থকে বলে 'দানা'। কুলোয় ঝেড়ে পরিস্কার করা হয় দানা। কারিগর বা মেশিনের সাহায্যে দানা রূপান্তরিত হয় গালায়। এক সময়ে গালা শ্রমিকদের [৯] উপার্জন ছিল জেলায় সবচেয়ে বেশি। বিদেশে তখন রপ্তানী হত গালা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানভূমে গালার কারখানা ছিল অনেকগুলি। এমনকি পুরুলিয়া জেলায় বঙ্গভুক্তির সময়েও কম ছিলনা কারখানার সংখ্যা। এখন শিল্পটি পড়তির মুখে, কারখানার সংখ্যা কমেছে অনেক।[১০] কমেছে মজুরিও। ভারতে মোট গালা উৎপাদনের সিংহভাগ হত মানভূমে, রপ্তানী হত আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। কৃত্রিম গালা বা গালার বিকল্প আবিষ্কৃত হবার পর বিশ্বের বাজারে ভারতীয় গালার চাহিদা কমেছে। তাছাড়া দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার কয়েকটি দেশ এগিয়ে এসেছে গালা রপ্তানীতে। তাদের মধ্যে অন্যতম থাইল্যাণ্ড। গালা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা আছে কিনা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত হলে পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

লাক্ষা শিল্প যেমন অবনতির মুখে, অপর একটি শিল্প তেমনি উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। চাষের যন্ত্রপাতি, কাটলারি, আগ্নেয় অস্ত্র তৈরির জন্য ঝালদার খ্যাতি ছিল দীর্ঘদিনের। ঝালদা ও মুঙ্গেরে তৈরি বন্দুক ছিল প্রায় এক ধাঁচের। ১৮৫৭ সালে ঝালদার বন্দুক নির্মাতারা ছিলেন সরকারের সন্দেহভাজন। তারা বার্মিংহামে তৈরি বন্দুকের মত বন্দুক তৈরি করতে পারদর্শী ছিলেন। যেকোন ইউরোপীয় বন্দুক সারাবার ক্ষেত্রেও ছিল সমান

---

৯. বিভিন্ন কাজের জন্য নানা ধরণের শ্রমিক নিয়োজিত থাকে, তাদের মজুরিও বিভিন্ন। বর্তমানে নারী ও পুরুষ শ্রমিকেরা লা-ভাঙ্গার কাজ করেন, ধোওয়া ও দানা তৈরির কাজ করেন নারীরা। মজুরি, পুরুষদের ৭ টাকা, নারীদের ৬ টাকা। লাক্ষা থেকে গালা তৈরি করেন পুরুষেরা। ১ মন বা ৩৭ কিলো গালা তৈরির জন্য তিনজন শ্রমিকের প্রয়োজন, তিনজনের মজুরি দিনে ২৪ টাকা।

১০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কারখানার সংখ্যা ছিল জেলায় ১৭৫। ১৯৬১ সালে ছিল ৬১। তাদের মধ্যে বলরামপুরে ৩০, ঝালদায় ৯ এবং তুলিনে ২০ এবং পুরুলিয়া সহরে ২। বর্তমানে (১৯৮১) বলরামপুরে (ছোট বড় মিলিয়ে) ৭, ঝালদায় ৯, তুলিনে ভাট্টা আছে কয়েকটা। সেগুলি ছোট ছোট। নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৯৬০।

দক্ষতা। আগ্নেয় অস্ত্র নির্মাতাদের সে দক্ষতা অবলুপ্ত হয়নি কখনও। রূপান্তরিত হয়েছিল মাত্র। আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে তারা তৈরি করতেন তরোয়াল, গুপ্তি, দা, ছুরি, কাঁচি, কোদাল ও চাষের নানা রকম যন্ত্রপাতি। প্রথাগত জিনিষগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ছুতারের যন্ত্রপাতি। তাদের মধ্যে আগর, ছেনি, বাটালি, সাঁড়াশি ও মাংস কাটা দা ইত্যাদি প্রধান।[১১] পুরুলিয়া সহরে, ঝালদা ও জয়পুর সংস্থাগুলি স্থাপিত। বিক্রয়ের ক্ষেত্র বা বাজার পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নানা রাজ্য। যথা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কেরালা প্রভৃতি। আগর বিক্রয়ের বাজার আরও বেশি প্রসারিত। উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ রপ্তানী হয় বিদেশে। যেমন, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, থাইল্যানড্ অস্ট্রেলিয়া, ব্যাঙকক, ইউ. এস. এ প্রভৃতি। আগর শিল্পের সংস্থাও বেড়ে বেড়ে চলেছে। ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ২২টি, ১৯৭৫-৭৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১টি। শিল্পটি এখনও অসংগঠিত বা আন-অর্গানাইজড সেকটরে রয়ে গেছে, প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে দালাল, ফড়ে প্রভৃতি মিডলম্যানদের সেখানে প্রাধান্য। তারাই লভ্যাংশের সিংহভাগ আত্মসাৎ করেন। শিল্পটির আরও উন্নতির পথে সেটি প্রধান অন্তরায়।

ছো-নাচ পুরুলিয়া জেলার একটি বিশিষ্ট নৃত্য। নৃত্যটিকে কেন্দ্র করে মুখোস তৈরির শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রধানত দুটি গ্রামে শিল্পটি কেন্দ্রীভূত। বাগমুণ্ডি থানার চোড়দা ও জয়পুর থানার ডুমুরডি। চোড়দা গ্রামের মুখোস নির্মাতারা একসময় বর্ধমান জেলা থেকে এসে থিতু হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। জীবিকায় তারা সূত্রধর। শিমূল কাঠ দিয়ে প্রথম দিকে তৈরি করতেন মুখোস। পরবর্তীকালে কখন কাপড়, কাগজ ইত্যাদি শিমূল কাঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, এখনও অনির্ণীত। দশ বছর আগে চোড়দায় মুখোস তৈরি করতেন ২৯টি পরিবার। পরবর্তীকালে বেড়ে

---

১১. পুরুলিয়া সহরের প্রয়াত তুলসীদাস কর্মকার দ্রব্যগুলি প্রবর্তিত করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধ। তিনি শেফিল্ড থেকে নমুনা এনেছিলেন বলেও বলা হয়। পুরুলিয়া জেলায় কাটলারি ও আগরশিল্পের প্রায় ২৮০টি সংস্থা আছে। কর্মী নিয়োজিত ৩০৫০ জন। মজুরি এই শিল্পে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। একটি ইউনিটে কমপক্ষে দুজন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাদের মজুরি; কারিগর ১৫ টাকা, সহকারী ১০, শানাই ১০, রং-এর জন্য ৫, তেল বার্ণিশ ৪, বাক্স, প্যাকিং ইত্যাদি ১৬ টাকা। মাথাপিছু গড় বাৎসরিক আয় ১২২৪ টাকা।—শ্রীসুশিত বিশ্বাস (ঝালদা-১ ব্লকের প্রাক্তন বি. ডি. ও) অনুগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর দিয়েছিলেন, এ ছাড়া লেখক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত।

দাঁড়িয়েছে ৪৪টি। ডুমুরডিতে সংস্থা আছে ৩টি।[১২] বর্তমানে আরও কটি জায়গায় মুখোস তৈরি সুরু হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম, পাড়া, ঝালদা ১নং ব্লক, সাঁতুড়ি ও আড়সা।

পুরুলিয়া জেলায় একসময় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল তসর ও তাঁতবস্ত্র। দুটির মধ্যে তসরই ছিল বেশি প্রসিদ্ধ। রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া সহরের কাছে সিংবাজার ও লোহাগড় ছিল তসর বয়ণের প্রধান কেন্দ্র। বয়নে নিয়োজিত পরিবারের সংখ্যা ছিল দেড়শো, তাঁত ছিল ৯৫টি। তসর গুটির চাষও হত তখন। সাধারণত কুর্মী, ভূমিজ ও সাঁওতালেরা করতেন চাষ। যেসব গাছে চাষ হত তাদের মধ্যে ছিল আসন, সিধা ও ধউ। কেঁদা ছিল তসর গুটি পালনের অন্যতম স্থান। বয়ন হত পিট লুমে, তাকে বলা হত 'ঠকঠাক'। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে থাকত ধুতি, শাড়ি, চাদর, রুমাল ও পাগড়ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাঁটা পড়েছিল তসর বস্ত্রের চাহিদায়। দেশভাগের পর আফগানীস্তানে তসর কাপড়ের পাগড়ির জন্য যে চাহিদা ছিল, তাতেও ছেদ পড়েছিল। প্রায় উঠে যেতে বসেছিল শিল্পটি। বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প জীবিকা গ্রহণ করেছিলেন তসর শিল্পীরা।

বর্তমানে তসর বস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে। অভিনবত্ব এসেছে রঙ ও ডিজাইনে। বয়নের জন্য প্রায় দুশো তাঁত চালু। নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা চার হাজার।[১৩] কাঁচা মাল আসে বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে। তসর ছাড়াও সুতি বস্ত্র তৈরির ঐতিহ্যও জেলায় অত্যন্ত প্রাচীন। ছয় হাজারেরও বেশি তাঁত আছে জেলায়।[১৪] অধিকাংশ পিটলুম, থ্রো বা ফ্লাই শাটেলের। ফলে উৎপাদন কম, কম উপার্জনও। জেলায় মোটা কাপড়ের চাহিদা কম নয়।

---

১২. ডুমুরডিতে মুখোস নির্মাতাদের মধ্যে প্রধান মধুসুদন রায়, হীরালাল রায় ও গোকুল রায়। চোড়দাতে দত্ত, শীল ও পাল পদবীধারী সুত্রধরেরা। এ ধরণের ১৫ জনের নাম দিয়েছেন মি. মুখার্জী। —A Few Traditional Cottage and small Industries of Purulia—by A. N. Mukherjee.

১৩ Industrial Horizon, Purulia : An Epitome (Monograph)—S. C. Panja, 1980.

১৪ মোট তাঁত আছে জেলায় ৬০৫৯। সুতিবস্ত্রের তাঁত—৫০৩৯, রেশম বয়নের জন্য ১৩৮, সিনথেটিক বয়নের জন্য—২২। তাঁতির সংখ্যা পুরুষ—৪৪১০, নারী—১১৪৬। —Handloom Census, 1982-83 (Monograph) Prepared by Directorate of Handloom and Texties, Govt. of W. B. (1983). মাথাপিছু বাৎসরিক আয় তসরে ২৬৮ টাকা, সুতিতে ৩১১ টাকা।

তাঁতগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করতে পারলে আরও অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে সবথেকে বেশি কর্মী নিয়োজিত আছেন বিড়ি শিল্পে।[১৫] প্রায় প্রতিটি থানাতেই কিছু না কিছু বিড়ি শ্রমিক আছেন। শিল্পটি নিয়ে কোন সমীক্ষা হয়নি এখনও। কারখানাগুলি প্রধানত সহরাঞ্চলে অবস্থিত। তাদের মধ্যে ঝালদা, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, বলরামপুর ও কাশীপুর অন্যতম। বড় বড় কারখানাগুলিতে একশোর ওপর শ্রমিক নিয়োজিত, ছোটগুলিতে গড়ে দশ জন। কাজের সময় মোটামুটি আটঘণ্টা। কাঁচা মাল বিড়ির পাতা বা কেন্দ পাতা। আসে উড়িষ্যার সম্বলপুর, বিহারের পালামৌ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে। তামাক আসে গুজরাট থেকে। শিল্পটিতে মালিক ও মিডলম্যানদের প্রাধাণ্য। শিল্পটিকে সংগঠিত করে মজুরি বৃদ্ধি ও মিডলম্যানদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারলে, উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

চর্মশিল্প ও জুতা তৈয়ারি জেলায় বহু মানুষের কর্মসংস্থানে সাহায্য করে। সাধারণত জয়পুর, পুরুলিয়া, বিস্পুরিয়া, দুবড়া, গোবরা, মগুরা ও মানবাজারে কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। তিন হাজার ব্যক্তি শিল্পটিতে নিয়োজিত। এ শিল্পটিও অসংগঠিত। সংগঠিত হলে শিল্পটি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে। কারণ জেলায় গো-মহিষাদির সংখ্যা কম নয়।[১৬] এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পুরুলিয়া জেলাকে পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী, বিশেষত তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের মধ্যে পশুপালনের দক্ষতা ও জ্ঞান বহুকাল থেকে বিদ্যমান। পশুপালনের ক্ষেত্রটি সংগঠিত হলে তাকে কেন্দ্র করে যেসব শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলিও গড়ে উঠতে পারে।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মুখ্য সংস্থাগুলি ছাড়াও প্রথাগত যে শিল্পগুলি আবহমানকাল থেকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। হাজার হাজার শ্রমিক শিল্পগুলিতে নিয়োজিত।[১৭] বিভিন্ন থানায় শিল্প-

---

১৫. মোট শ্রমিকের সংখ্যা ১৭,৫০০। মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৩৬৮ টাকা। জেলায় মোট সংস্থা ৫৮। সংস্থা ছাড়াও বহু শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে ফুরনে কাজ করেন।

১৬. ১৯৬৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলায় গরু—৮·৬৮ লক্ষ, মহিষ—·৮১, ভেড়া—·৭১, ছাগল—২·৫, মুরগি—৫·৫ এবং শুকর—·০৬ লক্ষ।

১৭. শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছুতারের কাজ, নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা—৮৫০, ঝুড়ি তৈরি—৫৬০০, তেলঘানি—২০০০, চালকল—১৫০, কুমোরের কাজ—৩০০০, গুড়তৈরি—

গুলির প্রকৃতিও বিভিন্ন। যেমন, আড়সা থানায় গুড় তৈরি, তাঁত, চর্ম ও বিড়ি শিল্প উল্লেখযোগ্য। বান্দোয়ান থানায় একমাত্র দাঁড় তৈরি ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্য কোন ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প নেই। বনাঞ্চলে সাবুই ঘাসের উৎপাদন বেশি, ফলে দাঁড় তৈরির কাজ অন্যতম উপজীবিকা হয়ে উঠেছে। পাথর খোদাই, শোলার কাজ, ডোকরা শিল্প, বাদ্যযন্ত্র তৈরি, পাতাতোলা ও কুড়ান—এসব কাজেও কম লোক নিয়োজিত নন।[১৮] পুরুলিয়া সহরের কাছাকাছি টামনায় কয়েকটি ছোট ফ্যাকটরী গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে দুটি মিনি স্টীল প্ল্যানট ও একটি রিফ্র্যাকটরী উল্লেখযোগ্য।

পুরুলিয়া জেলায় কোন ইনডাসট্রিয়াল এসটেট বা শিল্পক্ষেত্র নেই। শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে গেলে অবিলম্বে শিল্পক্ষেত্র গড়ে তোলা দরকার। পুরুলিয়া সহর, ঝালদা, আদ্রা, রঘুনাথপুর ও বলরামপুরের শিল্প সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত উপযুক্তভাবে সার্ভে করা হয়নি। পুরুলিয়া সহরের কাছে পলেইজা ও বোঙ্গাবাড়ি স্থান দুটি সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পাঞ্চল হিসাবে সনাক্ত হয়েছে। জেলাটি শিল্পে অনগ্রসর এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। ফলে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুদান পাবার যোগ্য।

নানা ধরণের সেচ প্রকল্প গত কয়েক বছর ধরে জেলায় চালু হয়েছে। তাতে ইপ্সিত ফল পাওয়া যায়নি। পাওয়া সম্ভবও নয়। কারণ নদী ও জোড়গুলিতে সারা বছর জল থাকে না। ফলে যখন জলের প্রয়োজন সে সময়েই সেচ প্রণালীগুলি শুকিয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত এবং লভ্য খনিজের সাহায্যে মাঝারি আকারের শিল্প গড়ে তোলা ছাড়া অধিবাসীদের দারিদ্র্যমোচন ও কর্মসংস্থানের বিকল্প পন্থা নেই বললেই চলে। একথা মনে রেখে সম্পূর্ণ নতুনভাবে জেলাটির শিল্প উন্নয়নের কথা বিবেচনা করা দরকার।

১০০০, কাঁসাপিতলের কাজ—১৫০০, সাবান তৈরি—১৫০, টেলারিং—৫০০, রুটির কারখানা—৫০০, গমভাঙ্গা—২০০০, চুনাপাথরের কাজ—২০০০, ছোটবড় যন্ত্রপাতির কাজ—৩০০০, ইত্যাদি।—Report of the Fact Finding Survey on Purulia District by Deptt of Economic Studies, United Bank of India. 1976.

১৮. পাথর খোদাইয়ের কাজে নিয়োজিত ১০৫, শোলার কাজে—১০৭, ডোকরা—২৭৬, বাদ্যযন্ত্র—৬৮১, পাতাতোলা ইত্যাদি—১৬৪০ জন (১৯৭৮ সালে)।

আধুনিক পুরুলিয়া[১]

পুরুলিয়া জেলার জন্ম উনিশশো ছাপ্পানো সালে। স্বাধীনতার নয় বছর পরে।[২] পুরুলিয়া সহরের উদ্ভব ঘটেছিল শতাধিক বছর আগে। ১৮৩৮ সালে প্রাক্তন মানভূম জেলার সদর দপ্তর মানবাজার থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল পুরুলিয়ায়। আনুষ্ঠানিকভাবে সূত্রপাত হয়েছিল পুরুলিয়া সহরের। জঙ্গলে ঘেরা থাকলেও বর্তমান সহরাঞ্চলে ছাড়া ছাড়া কয়েকটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল চকবাজার, নামো পুরুলিয়া, নডিহা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিল কেতিকা ও দুলমি মহল্লা। লোকসংখ্যা ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার।

জেলার মধ্যে প্রাচীনতম সড়ক ছিল অহল্যাবাঈ রোড। উত্তরপূর্ব অঞ্চল দিয়ে, রঘুনাথপুর ছুঁয়ে, পশ্চিম থেকে পূবে প্রসারিত ছিল সড়কটি। প্রাচীনকালে এই পথটি ধরেই পাটলিপুত্র থেকে বণিক ও যাত্রীরা যেতেন তাম্রলিপ্তে। জঙ্গলমহল ইসট ইনডিয়া কোমপানির নিয়ন্ত্রণে আসার পর, সৈন্য চলাচলের জন্য তৈরি হয়েছিল পুরুলিয়া-ঝালদা-গোলা-রামগড় রোড (১৮৪০ খ্রী)। ছোটনাগপুর বিভাগের প্রধান সামরিক ছাউনি ছিল রামগড়ে। ফলে রামগড়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা ছিল অপরিহার্য।

জেলার সদর দপ্তরে প্রয়োজনীয় অফিস ও দপ্তরগুলি এক এক ক'রে বসতে সুরু করেছিল। যথা, ডেপুটি কমিশনারের অফিস ও আদালত, পুলিস অফিস, থানা, পোসট অফিস, জেলখানা, ইত্যাদি। নতুন জন আগমন ও জনবসতিও গড়ে উঠতে সুরু করেছিল স্থানে স্থানে। জনসাধারণের বসবাসের

---

১. আধুনিক পুরুলিয়া বলতে এখানে সহরে সুযোগসুবিধা জেলায় কতখানি প্রসারিত হয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জনগণের রুচি, মানসিকতা এবং দৈনন্দিন জীবনে ক্রম-রূপান্তরের ধারা সম্বন্ধেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

২. এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য এই বইয়ের 'মানভূম থেকে পুরুলিয়া' অধ্যায়।

জন্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল চার্চ, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

বড় জেলা ছিল মানভূম।[৩] আয়তনে বড় হলেও জনবসতি ছিল ছাড়া ছাড়া, স্বল্প। জীবিকার তাগিদে ও প্রয়োজনে সদর দপ্তরে যে জনবসতি গড়ে উঠতে চলেছিল, তাদের পরিপোষণে প্রধান অন্তরায় দেখা দিয়েছিল পানীয় জলের। পুরুলিয়া সহরের অবস্থিতি সমুদ্র সমতল থেকে সাতশো পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে, খরা প্রবণ এলাকার একেবারে কেন্দ্রে। তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল টিকেল অন্তরায়টি দূর করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্তমানে যেখানে সাহেব বাঁধ বা নিবারণ সায়র, সেটির বাঁধানো ঘাটের কাছে পঞ্চকোট রাজাদের একটি পুরনো পুকুর ছিল। অনুমতি নিয়ে সেটিকে কেন্দ্র করে সত্তর বিঘা আয়তনের বিরাট জলাশয় খনন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। জেল খানার কয়েদী ও দিন মজুরদের দিয়ে কাটান হয়েছিল জলাশয়টি।

বর্তমানে এই জলাশয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সহরের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে

---

৩. ১৮৪৫ সালে মোট এলাকা ছিল ৭,৮৯৬ বর্গমাইল। সেই বছরেই ধলভূম মানভূম জেলা থেকে বিযুক্ত হয়ে সংযুক্ত হয়েছিল সিংভূমের সঙ্গে। হানটার যখন A Statistical Account of Bengal লিখেছিলেন, মানভূম জেলা ৪৫টি পরগণা নিয়ে গঠিত ছিল। পঞ্চকোট জমিদারীর অধীন ছিল ১৯টি পরগণা, তাদের মোট আয়তন ছিল ১৮৯০·৩২ বর্গমাইল। যথা, (১) বাগদা—৯৪·১৫ ব. মা. (২) বনচাষ—৬২·৫৩ (৩) বানখণ্ডী—৩৪·৮৫ (৪) বরপাড়া—৪৫·১৪ (৫) চৌরাশি—১৬৩·৭৫ (৬) চৌলিয়ামা—৭৩·৭৭ (৭) ছড়রা—১১০·৯ (৮) দমুরকোণ্ডা—৬·৪০ (৯) জৈতোড়া—২২·৫০ (১০) কাঁসাইপার—২৩৩·৫২ (১১) খাসপেল—২৬০ ০৩ (১২) লধুড়কা—১০৩·৪৯ (১৩) লাখদা—৪৬·২৬ (১৪) মহল—২২·২৯ (১৫) মাড়রা—১৭·৮২ (১৬) নলিচন্দা—৯২ ৬৯ (১৭) পলমা—৬৫·১৩ (১৮) পাড়া—১১৯·৩৫ (১৯) রেকাব—৫৭·৪৩ ব. মা।
পঞ্চকোট জমিদারীর বাইরে ছিল ২৬ পরগণা, মোট আয়তন ছিল ৪৯৬০ ৬২ বর্গমাইল। মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল পরগণাগুলি। যথা, (১) অম্বিকানগর—১৫১·৫৯ ব. মা. (২). বাগমুণ্ডি—১৫৪·৬৬ (৩) বেগুনকোদর—৬৪·৮৩ (৪) বরাভূম—৬৪১·৮৩ (৫) ভেলাইডিহা—৪১·০৪ (৬) হেসলা—১৬·৭৫ (৭) জয়নগর—৩০ ৩৯ (৮) জয়পুর—৮২·৮৮ (৯) ঝালিদা—১২৮·৩৮ (১০) ঝরিয়া—২০০·৮০ (১১) কইলাপাল—২৬ ১১ (১২) কাতরাস—৭০·১৮ (১৩) মানভূম—২৫৮·২৫ (১৪) মাঠা—১৭·৮২ (১৫) মুকুন্দপুর—৬·৬৬ (১৬) নগরকিয়ারী—৪৭·০৬ (১৭) নওয়াগড়—৮৪·৫১ (১৮) পাণ্ড্রা—২৩৯·৩৩ (১৯) পাতকুম—২৯১·৯৩ (২০) ফুলকুসমা—৫৭,৫৯ (২১) রায়পুর—১৩৪·২১ (২২) সিমলাপাল—৭৮·৩৭ (২৩) সুপুর—১৯১·৫৭ (২৪) শ্যামসুন্দরপুর—১৩৯·১৮ (২৫) তোড়াং—১১·১২ (২৬) ও টুণ্ডি—১৫০ ৮৮

গড়ে উঠেছে। জলাশয়টিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে তিন মাইল ব্যাপী পাকা সড়ক। চারদিকে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। যথা হরিপদ সাহিত্য মন্দির, রবীন্দ্রভবন, জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, সরকারি আবাসন প্রভৃতি। বন বিভাগ তৈরি করেছেন সুভাষ উদ্যান। নানা গাছ ও লতায় শোভিত উদ্যানটি অবকাশ ভ্রমণের পক্ষে মনোরম। সাহেব বাঁধ বা নিবারণ সায়র ছাড়াও আরও কয়েকটি বাঁধ আছে সহরে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাজা এডওয়ার্ড স্মৃতি সায়র বা নতুন বাঁধ, বেকার বাঁধ বা রাজা বাঁধে, দশের বাঁধ, পোকা বাঁধ, বুচা বাঁধ ইত্যাদি।

এতগুলি বাঁধ থাকলেও পুরুলিয়া সহরে পানীয় জলের সমস্যা এখনও দূরীভূত হয়নি। সহরাঞ্চল নিয়ে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি যখন গঠিত হয়েছিল, সহর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পুরুলিয়া খাস, নডিহা, এবং পালঞ্জা, কেতিকা, বেলগুমা, ভাটবাঁধ, মাগুড়িয়া ও রাঘবপুরের অংশ বিশেষ। প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরিকল্পিতভাবে সহরটি বিন্যস্ত হতে সুরু করেছিল। বঙ্গভুক্তির পর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুত, এলাকাও বেড়েছে।[৪] জল সমস্যা তীব্র হয়েছে আরও।[৫] সহরের কাছাকাছি জলের প্রধান উৎস কাঁসাই নদী। সহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে। সেখান থেকে পাইপের সাহায্যে আনা হয় জল। কাঁসাই ছাড়াও প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ গ্যালন জল তোলা হয় সাহেব বাঁধ বা নিবারণ সায়র থেকে।

দ্বিতীয় সমস্যা জল নিকাশের। অবশ্য এই সমস্যাটি জল সমস্যার মত গভীর নয়। সহরের ঢাল পশ্চিম থেকে পূবে। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢাল

৪· পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছিল ২৬ জুলাই ১৮৭৬। এলাকা ছিল ৫ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা (১৮৭২) ৫,৬৯৫। ১৯০১ সালে ১৭,২৯১ জন। ১৯৫১ সালে ৪১,৪৬১। ১৯৮১ সালে ৭৪ হাজার, আয়তন ১৩.৯০ বর্গ কিলোমিটার, ওয়ার্ডসের সংখ্যা ২০, হোলডিং ৮,৮৭৫। ১৯০১ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ২,৪৫৮, ১৯৮১ সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৩১২ বা বর্গমাইলে ১৪৮০০। সহরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সম্বন্ধে পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য, 'ঐতিহাসিক কলপঞ্জী ও বিশিষ্ট ঘটনা।'

৫. প্রতিদিন মাথা পিছু ২০ গ্যালন জলের চাহিদা ধরলে জলের মোট প্রয়োজন ১·২৫ এমজিডি। কাঁসাই থেকে যে জল পাওয়া তার পরিমাণ গরমকালে ০·২ mgd, বর্ষাকালে ০·৬ mgd, ফলে ঘাটতি থাকে প্রায় ১ mgd.—Short term Development Schemes and Preliminary Project Report on Purulia Town by CMPO, 1976.

দক্ষিণ দিকে। ফলে প্রধান নিকাশী পথ হয়ে উঠেছে কাঁসাই নদী। যমুনা জোড় নামে ছোট একটি খাল সহরের উদ্বৃত্ত জল কাঁসাইতে নিয়ে গিয়ে ফেলে। অন্যান্য এলাকা থেকে জল ধানের ক্ষেত বেয়ে গিয়ে পড়ে কাঁসাইতে। মাটি শুকনো ও পাথুরে হবার ফলে সমতল বঙ্গের মত জল জমার সমস্যা এখানে নেই। তবু নিকাশী পদ্ধতি আরও সুষ্ঠু ও ভবিষ্যতের উপযোগী করে তোলার জন্য নানা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। কারণ বর্তমান হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একুশ শতাব্দীতে সহরের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে এক লক্ষের ওপর।

পাকা বাড়ির সংখ্যা সহরে বরাবর ছিল কম। অফিস ও কাছারির জন্য বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। গৃহসমস্যা হয়ে উঠেছে প্রবল। বর্তমানে (১৯৮১) একরে জন বসতির ঘনত্ব প্রায় একুশ জন। বাড়ি ভাড়া উর্দ্ধমুখী সহর এলাকায় বেড়ে চলেছে জমির দাম। গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে সহরে একটি আস্তানা তৈরি করে রাখার। ফলে সমস্যাটি দূর করতে সরকারি উদ্যোগে কিছু কিছু আবাসন বা হাউসিং এসটেট তৈরি হয়েছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও তৈরি হয়ে চলেছে নতুন বাড়ি ঘর। তবু প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় সেসব যথোপযুক্ত নয়।

সহরের জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। রেলপথ দ্বারা রাঁচি সংযুক্ত হবার আগে মহানগরীর অধিবাসীদের কাছে পুরুলিয়া সহর ছিল স্বাস্থ্য-নিবাস। চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই গড়ে উঠেছিল হাসপাতাল। যদিও সেটির সূত্রপাত ঘটেছিল দাতব্য চিকিৎসালয় হিসাবে। বর্তমান হাসপাতালটি তৈরি হয়েছিল শচীন্দ্রনাথ ঘোষ বা নসুবাবুর দেওয়া জমির ওপর। বাড়ি তৈরি করতে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন পঞ্চকোটের রাজা জ্যোতি প্রসাদ সিংহদেও।

পুরুলিয়া সহরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কুষ্ঠ হাসপাতালটি অধিষ্ঠিত। জার্মান মিশনারী রেভা. হাইনরিখ উফ্‌ম্যানের উদ্যোগে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৬-৮৭ সালে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় কুষ্ঠ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুরুলিয়ার একদা ডেপুটি কমিশনার নীলমণি সেনাপতির উদ্যোগে। কাঁসাই নদীর তীরে এই 'নবকুষ্ঠ নিবাস'টি গড়ে তুলতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও অধিবাসীরা তাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দান করেছিলেন।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পুরুলিয়া সহরের গৌরব পুরুলিয়া মিউজিকাল ইনস্টিটিউট, হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও সম্প্রতি নির্মিত জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র। শতাধিক বছর আগে সহরের কয়েকজন উৎসাহী যুবক পি. এম. আই সংস্থাটি

গড়ে তুলেছিলেন প্রাণের তাগিদে। শতাধিক বছর ধরে প্রাণের টানই তাকে রক্ষা করেছেন চোখের মণির মত। নিজস্ব জমি, গৃহ ও ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠানটি আজও সহরের বুকে বিদ্যমান। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯২১) মুনসেফডাঙ্গার কয়েকজন যুবকের উৎসাহে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য মন্দির নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার। মহাপ্রাণ হরিপদ দাঁয়ের বদান্যতায় নিজস্ব গৃহ ও ভূখণ্ডে সেটি রূপান্তরিত হয়েছিল সহরের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রে। বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও গুণীদের পাদস্পর্শ ও আগমনে বার বার অভিনন্দিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬৮ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে সুরু হয়েছিল জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্র সংগঠনের কাজ। উদ্দেশ্য ছিল পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কাজ শেখা ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার দীক্ষাগ্রহণ। সম্পূর্ণ হয়েছে বিজ্ঞানকেন্দ্রের নির্মাণকার্য। জেলার ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ প্রতিষ্ঠানটিকে আপনকরে নিতে চলেছেন। পুরুলিয়ার জনজীবনে কেন্দ্রটির প্রভাব হয়ে উঠবে সুদূরপ্রসারী।

খেলাধূলার জগতে সহরের প্রাচীনতম সংস্থা টাউনক্লাব, শক্তিসংঘ, বি. এফ. সি, ইউনিয়ন ক্লাব প্রভৃতি। স্থানীয় ক্লাবগুলির উদ্যোগে মানভূম সোর্টস এসোসিয়েসন নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। বেলগুমা ময়দান ছিল খেলাধূলার প্রধান কেন্দ্র। ময়দানটি এত বড় ছিল যে একসময় বিমানের অবতরণের ক্ষেত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হত। পেশাদার বৈমানিকেরা ভাড়া নিয়ে অধিবাসীদের চড়াতেন। চক্কর দিতেন সহরের ওপর দিয়ে। প্রতি বছর পোলো খেলাও হত সেখানে। ঘোড়ার ওপর বসে এই পুরুষালি খেলা দেখতে ভেঙ্গে পড়ত লোক। বর্তমানে ময়দানটিতে পুলিস ব্যারাক উঠেছে। শরীরচর্চার জন্য গাড়ীখানায় একটি ব্যায়মশালা গড়ে উঠেছিল। সেটির নাম ছিল শ্রদ্ধানন্দ কর্মমন্দির। মেয়েদের শরীরচর্চার জন্য লালকুঠি ডাঙ্গায় গড়ে উঠেছিল অপর একটি কেন্দ্র। কল্যানী সংঘ। বর্তমানে মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি স্টেডিয়াম দফায় দফায় তৈরি হয়ে চলেছে।

পুরুলিয়ায় রেললাইন পাতার কাজ সুরু হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। সম্পূর্ণ হয়েছিল দু'বছর পরে। রানীগঞ্জ-আসানসোল লাইনটি প্রসারিত হয়েছিল পুরুলিয়া সহর পর্যন্ত। ১৯০৩ সালে খড়গপুর-গোমো শাখাটি খোলা হয়েছিল। ফলে উদ্ভব ঘটেছিল আদ্রা সহরটির। ১৯০৮ সালে পাতা হয়েছিল পুরুলিয়া—রাঁচি ছোট লাইনটি। দীর্ঘকাল ধরে এই রেলপথটিই বহির্বিশ্বের

সঙ্গে রাঁচির রেলপথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল। যোগাযোগের দিক থেকে পুরুলিয়া সহরটির অবস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথটি সহর এলাকার উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত। বাঁকুড়া সড়কটি সহরের বুকের গিয়ে চলে গেছে। রাঁচি রোড গেছে সহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে। অপর প্রধান সড়ক বরাকর রোড, সহরের প্রায় মধ্যবিন্দুতে বাঁকুড়া রোড থেকে বেরিয়েছে। প্রসারিত হয়েছে উত্তর-পূর্ব দিকে। কাঁসাই, সুবর্ণরেখা ও দামোদর তিনটি জলধারাই ছিল সড়ক ও রেলপথে যোগা-যোগের ক্ষেত্রে প্রধান বিঘ্ন। তিনটি নদীর ওপর দিয়েই সেতু নির্মিত হয়েছিল বিশ শতকের প্রথমার্ধে। সহরে প্রথম মোটরগাড়ির আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯০৫ সালে। বর্তমানে জেলা আদালতের কাছে বাস টার্মিনাস তৈরি হয়েছে। টার্মিনাসটি সড়কপথে যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র।

পুরুলিয়ার বার একসময় ছোটনাগপুর ডিভিশনের মধ্যে শ্লাঘার বিষয় ছিল। মানভূম জেলা গঠিত হবার পর থেকে আইনের বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে নিয়ন্ত্রিত হত।[৬] মানভূম, সিংভূম ও সম্বলপুরের জন্য জেলা জজ ছিলেন একজন। তার সদর দপ্তর ছিল পুরুলিয়া সহরে। পুরুলিয়া বারের প্রথিতযশা আইনজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, তিনি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতিও হয়েছিলেন। জেলার প্রথম বি. এল ছিলেন নন্দলাল ঘোষ। নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নামকরা আইনজীবি। তিনি পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডের প্রথম নির্বাচিত সভাপতিও ছিলেন। অন্যান্য আইনজীবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ললিতকিশোর মিত্র, জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, করুণাময় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল সহর আদ্রা। পুরুলিয়া সহর থেকে আদ্রার দূরত্ব চব্বিশ মাইল বা আটত্রিশ কিলোমিটার। আসানসোল থেকে আর একটু বেশি।[৭] সহরটির উদ্ভব ঘটেছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে।

---

৬. ১৮৩৩ থেকে ৩১ মার্চ ১৯১২ পর্যন্ত মানভূম জেলা ছিল বাংলার মধ্যে। ১ এপ্রিল ১৯১২ বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত প্রদেশ গঠিত হলে, মানভূম জেলা বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তভূক্ত হয়েছিল। তখনও কলকাতা হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল মানভূম জেলা। ১৯১৬ সালে পাটনা হাইকোর্ট গঠিত হলে, পাটনা হাইকোর্টের অন্তর্গত হয়েছিল মানভূম জেলা।

৭. আসানসোল থেকে আদ্রার দূরত্ব ২৬ মাইল বা ৪১·৬ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে দূরত্ব

প্রাক্তন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের দুটি শাখা, গোমো-খড়গপুর ও আসানসোল-সিনী প্রসারিত হয়েছিল আদ্রার মধ্য দিয়ে। প্রথম দিকে প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন অফিস, শেড, কোয়ার্টার ইত্যাদি।[৮] রেলওয়ে সেটেলমেনটটিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যে সহরটি গড়ে উঠেছে সেটির আয়তন ৩·২৪ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ৮৩৩৩। সহরটি নিয়ন্ত্রিত হয় স্টেশন কমিটির দ্বারা। এটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত নয়। কর্মসূত্রে ইউরোপীয়দের বসবাস ছিল বেশি। ফলে কয়েকটি চার্চ তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে দেশীয় খ্রীস্টানদের জন্যেও দুটি চার্চ প্রতিষ্ঠিত। আদ্রা থেকে আট কিলোমিটার দূরে কাশীপুরে ছিল পঞ্চকোটের রাজাদের বাসস্থান। আদ্রা সহরটি ঘিরে নতুন জনবসতি গড়ে উঠছে। যারা রেলে চাকুরি করতেন, চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সহরের কাছাকাছি গড়ে তুলেছেন স্থায়ী আবাস। আদ্রা সহরটি কাশীপুর থানার অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতিতে মরশুমী হলেও আদ্রার অধিবাসীরা সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য নিজেদের মত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সংস্থাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম নর্থ ইনসর্টিটিউট ও বেঙ্গলী ক্লাব।[৯] বর্তমানে অনেকগুলি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। কয়েকটি পত্রিকাও আদ্রা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। আদ্রা থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথপুর।

তসর শিল্পের একদা প্রসিদ্ধ কেন্দ্র রঘুনাথপুর সহরটি বেড়ে ওঠার দিক দিয়ে অত্যন্ত মন্থর। মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। এলাকা ছিল চার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা চার হাজারের কাছাকাছি। সহরটির প্রধান আকর্ষণ ছিল মুনসেফ-ডেপুটি কালেকটরের আদালত। আদালতের অন্তর্ভুক্ত ছিল বনচাষ, বারপাড়া, বনখণ্ডী, চৌরাশি, চৌলিয়ামা, মহল, মাড়রা, নলিচান্দা ও পাড়া। রেলওয়ের ডিভিশনাল হেডকোয়াটার্স হিসাবে আদ্রার উদ্ভব রঘুনাথপুরের বৃদ্ধি অনেকাংশে খর্ব করেছে। তসর ও সুতি শিল্পের

---

১৭৭ মাইল—২৮৩·২ কি. মি. জনসংখ্যা ১৯৭১ ছিল ১৮,৮০৮। ১৯৮১ সালে ২৭ হাজারের ওপর।

৮. তাদের মধ্যে প্রধান Dist. Engineer, Dist. Loco Superintendent, Traffic Supdt, Medical Officer, Chaplain প্রভৃতি অফিস। সেন্ট বার্থলোমিউ চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। অন্যান্য চার্চগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Roman Catholic Church, Southern Church ইত্যাদি।

৯. বেঙ্গলী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে (?) নর্থ ইনসটিটিউট ১৯১৯ সালে।

অবনতিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে পৌর এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে, মোট আয়তন ১২·৯৫ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ষোল হাজার। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ১২৩৫।

রঘুনাথপুর থানার মধ্যে, আদ্রার কাছাকাছি, দ্রুত গড়ে উঠেছে একটি সহর এলাকা। নাম আড়রা। সহরাঞ্চলটি কোন পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়। বয়সে খুব ছোট, মাত্র ১৯৭১ সালে সহর হিসাবে স্বীকৃত। জনসংখ্যার দিক থেকে রঘুনাথপুর সহরটিকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে।[১০] বৃদ্ধি ও বিন্যাসের ধরণ দেখে মনে হয় অদূরে ভবিষ্যতে এই নব উদ্ভূত সহরাঞ্চলটি রঘুনাথপর থানার মধ্যে বৃহত্তম সহর হয়ে উঠবে।

জেলার মধ্যে তৃতীয় মিউনিসিপ্যাল সহর ঝালদা। মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। এলাকা ছিল তিন বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪,৮৭৭। গালা তৈরির প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল ঝালদা। পৌর এলাকা গঠনের সময় ফ্যাক্টরী ছিল তেতাল্লিশটি। গালা ছাড়াও কাটলারি, বন্দুক, তরবারি, গুপ্তি ইত্যাদি তৈরির জন্যেও অনেকগুলি কারখানা ছিল। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা এই ছোট সুন্দর সহরটি পঞ্চকোট রাজপরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বলে কথিত হয়। এখন ঝালদা রাজপরিবারের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। বর্তমানে লাক্ষাশিল্প অবনতির দিকে, আগর শিল্প ক্রম উন্নতিশীল, এ ছাড়া বিড়ি তৈরির জন্যেও সহরটি প্রসিদ্ধ। জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। স্বল্প মেয়াদী আকাশ কাটাবার পক্ষে চমৎকার। টুরিস্ট স্পট হিসাবে বেড়ে ওঠার আবেদন আছে। কাছাকাছি রাঁচি, হাজারিবাগ ও বোকারো। বর্তমানে পৌর এলাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮·২৯ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা তের হাজার।

পাড়া থানার অন্তর্গত আনাড়া রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে একটি শহরাঞ্চল দ্রুত গড়ে উঠেছে। নাম চাপারী। প্রধানত এটি বাণিজ্যকেন্দ্র। ১৯৭১ সালের জনগণনায় সহরাঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এলাকা মাত্র ২·৮৭ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৫,৭৫৪। পৌরসংস্থা বা স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এখনও নিয়ন্ত্রিত হয় না সহরটি। পুরুলিয়া জেলায় এটিই স্বীকৃত সহরাঞ্চলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম।

ঝালদার মত বলরামপুরও ছিল একদা লাক্ষাশিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্রও। সহর হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। তখন কোন পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এখনও নয়। ১৯৬১ সাল থেকে ইউনিয়ন কমিটি

---

১০. আড়রার আয়তন ৮·৬৪ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ১২,৬৪২ (১৯৭১)।

দ্বারা পরিচালিত হতে সুরু করেছে। সহরাঞ্চলের বর্তমান আয়তন ৯·৫১ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা সাড়ে পনের হাজার। সহরাঞ্চলের পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে গেছে পুরুলিয়া-টাটানগর রোড। সড়কটির জন্য সহরটিও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আয়তনে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবাংলার মধ্যে পঞ্চম, লোকসংখ্যায় চতুর্দশতম। মোট যে এলাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত সেই আয়তনের শতকরা ৭·১২ ভাগ জমি অধিকার করে আছে পুরুলিয়া জেলা। জনবসতি ছাড়া ছাড়া ও বিরল। জনবসতির ঘনত্বে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়।[11] জনবসতি ছাড়া ছাড়া হলেও ভারতের গড় ঘনত্ব থেকে বেশি, যদিও পশ্চিমবাংলার তুলনায় অনেক কম। পশ্চিবাংলায় প্রতি উনত্রিশ জনে একজন পুরুলিয়ার অধিবাসী। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় সহরের সংখ্যা ছিল ২২৩। সহুরে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল এক কোটি। অর্থাৎ প্রতি একশো জনে সহরের বাসিন্দা ছিল পঁচিশ জন। পুরুলিয়ায় শ'য়ে আটজন। মোট ভৌগোলিক চৌহদ্দির শতকরা ০·৮ ভাগ মাত্র সহরাঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে।

যেসব সুযোগসুবিধার যোগফলে আধুনিক জীবন গড়ে ওঠে, যেমন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, যানবাহন, কর্মসংস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ—সেসব বিষয়ে পুরুলিয়ার অনগ্রসরতা পাহাড় প্রমাণ। বিদ্যুতের প্রধান ব্যবহার গেরস্থ বাড়িতে। পশ্চিমবাংলায় শতকরা প্রায় সাতটি গ্রামে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে, পুরুলিয়া জেলায় বিদ্যুৎ পেঁৗছেছে শতকরা মাত্র আড়াইটি গ্রামে। জেলার মধ্যে সাঁওতালডি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্ম হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। প্রকল্পটির বিদ্যুৎ উৎপাদন জেলার অধিবাসীদের কোন কাজে আসেনি। ছিটেফোঁটা যে বরাদ্দটুকু জেলার জন্য নির্দিষ্ট, তাও বণ্টিত হয় কলকাতা ঘুরে।

বিদ্যুতের মত যানবাহনের অবস্থাও শোচনীয়। পুরুলিয়া, জয়পুর ও বলরামপুর থানার মধ্য দিয়ে জাতীয় সড়ক—৩২ প্রসারিত। ছোট বড় বারোটি পাকা রাস্তা জেলার মধ্যে যাতায়াতের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। তাদের মোট পরিধি ছশো চল্লিশ কিলোমিটার। কাঁচা রাস্তার পরিধি প্রায় সাড়ে আটশো

---

১১. ১৯৮১ সালের জনগনণা অনুযায়ী ভারতে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২২০, কেরালা প্রথম ব. কি ৬৫৪, পশ্চিমবঙ্গে ৬১৪। পশ্চিমবাংলার আয়তন ৮৮·৭ হাজার ব.কি, জনসংখ্যা ৫৪৪ লক্ষ। পুরুলি ার আয়তন ৬.২৫৯ বর্গ কিলোমিটার, সহুরে এলাকা ৫৫ বর্গ কি. মি. লোকসংখ্যা ১,০২,৩৬৭ (১৯৭১)।

কিলোমিটার। জেলার আয়তনের তুলনায় সড়ক সংস্থান নগণ্য বললেই চলে। ফলে, অনেক গ্রাম ও অঞ্চল দুরধিগম্য। এমন অনেকগ্রাম আছে যেখান থেকে জেলা সহরে পৌঁছুতে সময় লাগে দুদিন। রেলপথে এগারোটি থানা সংযুক্ত। কটি থানায় রেলস্টেশন নেই। যেমন, বরাবাজার, বান্দোয়ান, হুড়া, মানবাজার, নেতুরিয়া ও পুঞ্চা। রেলপথ সম্প্রসারনের ব্যাপারে গত পঞ্চাশ বছরে জেলায় কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পুরুলিয়া—কোটশীলা ছোট রেলপথটিকে ব্রডগেজ করার চেষ্টাও করা হয়নি। জেলাটির অনগ্রসরতা দূর করতে গেলে অবিলম্বে যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার পুণর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

জেলায় মোটরগাড়ির সংখ্যা দেড় হাজারও নয়।[১২] যাত্রী বহন করতে পারে এমন রেজেষ্ট্রিকৃত গাড়ির সংখ্যা মাত্র সাড়ে ছ'শো। জেলার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে প্রায় সাতশো যাত্রীবাহী গাড়ি। অর্থাৎ প্রতি সাড়ে তেরশো জনের জন্য একখানা মাত্র গাড়ি। সে গাড়ির মধ্যে দুচাকার স্কুটার ও মোটর সাইকেল থেকে বাস পর্যন্ত সব ধরণের গাড়িই অন্তর্ভুক্ত। বাস ধরলে প্রতি সাড়ে নয় হাজার জনে একখানা বাস।

কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কৃষি। জেলার মোট আয়ের শতকরা পাঁচশো ভাগ আসে কৃষি থেকে। অথচ কৃষিজমির পরিমান কম, কম ফলনও। অন্যদিকে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। ফলে মাথা পিছু আয় খুব কম।[১৩] প্রতি বছর জেলার মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের জন্য টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। নাহলে অনাহারে মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় বিকল্প থাকে না। মাথা পিছু আয়ও অত্যন্ত কম। আর্থিক নিরিখে জেলার মোট উৎপাদনও অত্যন্ত কম।[১৪] কৃষি জমির অপ্রতুলতা ও শিল্প সংস্থার অভাবের

---

১২. ১৯৭০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র ১২৭২। তাদের মধ্যে যাত্রী বহন করে মাত্র ৬৫৬। এদের মধ্যে আছে বাস, জীপ, মোটর সাইকেল, স্কুটার, অটো-রিকসা প্রভৃতি। জেলার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করে (৩০.৬.৭১) ১৩৩১ যাত্রীবহনকারী যান।

১৩. তুলনীয়, ১৯৭০-৭১ সালে বর্ধমানে কৃষিক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় ২৯৯·৩, বাঁকুড়ায় ৩৮৪·৪, পুরুলিয়ায় ২৬৭·২। সব সেকটর মিলিয়ে, বর্ধমানে ৭০১·৬, বাঁকুড়ায় ৪৯২·৫, পুরুলিয়ায় ৪০২·১ টাকা। —A Development Plan for Purulia District, CMPO, 1974.

১৪. ১৯৭০-৭১ সালের দ্রব্য মূল্য অনুযায়ী বর্ধমানে মোট আয় ২৭৪·৭১ কোটি টাকা, বাঁকুড়ায় ১০০·১৮ কোটি, পুরুলিয়ায় ৬৪·৭৮ কোটি টাকা। দ্রষ্টব্য ১৩।

ফলে ভূমির ওপর চাপ বেশি। বেকারের সংখ্যাও অধিক।[১৫] সহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেশি। এমপ্লয়মেনট একসচেঞ্জে রেজেস্ট্রিকৃত বেকার ছাড়াও সাক্ষরজ্ঞানহীন বেকারের সংখ্যাও কম নয়। এ ছাড়া আছে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। কর্মক্ষেত্রের অভাবে একই কাজের ওপর বহু ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় ভাবে নির্ভরশীল।

অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতাও সুপরিস্ফুট। ১৯৬১ সালে পরিসংখ্যানে দেখা যায় জেলায় প্রাথমিক স্তরে পাঠ নেবার মত শিশুর সংখ্যা ৩·৭৪ লক্ষ। তাদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১২৯৩ টি। অর্থাৎ প্রতি ২৬৯ টি শিশুর জন্য একটি স্কুল। স্কুলগুলির অধিকাংশ সহরাঞ্চলে অধিষ্ঠিত। ফলে এই তথ্য প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটিত করে না। জুনিয়ার হাই ও হাইস্কুলের ক্ষেত্রে প্রতি ৪৭২ জনে একটি করে স্কুল।

চিকিৎসা বিষয়ে সুযোগ সুবিধার অভাব আরও প্রকট। জেলায় বড় হাসপাতাল বলতে মাত্র একটি। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ১১ ও সাবসিডিয়ারি হেলথ সেনটার ২৫। সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সব মিলিয়ে ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ৫২ জন। যোগ্যতাসম্পন্ন আরও ৩৫ জন ডাক্তার জেলার নানা জায়গায় প্রাইভেট প্রাকটিসে নিরত। যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের সংখ্যা জেলায় ৮৭ জন। জেলার অধিবাসীদের চিকিৎসার দায়িত্ব এই মুষ্টিমেয় ডাক্তারদের হস্তে ন্যস্ত। অর্থাৎ ডাক্তার প্রতি অধিবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২১,৩২৬ জন। অধিকাংশ ডাক্তার আবার সহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত, ফলে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি! গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতুড়ে বদ্যি ছাড়া সান্তনা পাবার মতও কোন বিকল্প নেই।

অনগ্রসরতার প্রতিবন্ধকগুলি যত শীঘ্র সম্ভব দূর করার জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। পুরুলিয়া জেলা কেবলমাত্র খরা পীড়িত নয়, হতাশা জর্জরিত। নানাদিক থেকে বঞ্চিত জেলাটির অসন্তোষে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার নেপথ্যে সঙ্গত কারণ বিদ্যমান। জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা, বেঁচে থাকার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি যে কোন মানুষই আশা করতে পারে। অন্যথায় নিংশেষ হয়ে যাবার আগে অন্তর্নিহিত শক্তি অন্তত একবার মহাবহ্নির আকারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবেই।

---

১৫. ১৯৭৬ সালের লাইভ রেজিস্টার অনুযায়ী এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যায় ১৮,১৩১। তাদের মধ্যে উপজাতি ১৭১৫, তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় ১৫৬৪, অবশিষ্ট সাধারণ। সহরে বেকার ৩১০৮, গ্রামে ১৫,০২৩। —Plan and Progress in Purulia District (1976-77), DC. Purulia.

পরিশিষ্ট

ও

পরিসংখ্যান

পরিচিতি ও প্রশাসন

অবস্থিতি—উত্তর অক্ষাংশ ২৪° ৪২´ ৩৫´´—২৩° ৪২´ ০´´

পূর্বদ্রাঘিমাংশ—৮৫°৪৯´ ২৫´´—৮৬ °৫৪´ ৫৭´´

আয়তন—৬, ২৫৯ বর্গ কিলোমিটার, ১৫৪০· ৫ হাজার একর

মোট চাষ এলাকা—৭৪২ হাজার একর (১৯৭৯—৮০)। বনাঞ্চল—২১৬.৫ হাজার একর

সেচপ্রাপ্ত এলাকা—৯৭.৮ হাজার একর (১৯৭০-৭১)।

মহকুমা—৩, সদর (পূর্ব), সদর (পশ্চিম) ও রঘুনাথপুর।

থানা—১৮,ব্লক—২০, জেলা পরিষদ—১, পঞ্চায়েত সমিতি—২০

গ্রাম পঞ্চায়েত—১৬৯, গ্রাম—২৬৮৭, সহর—৭, বসতিযুক্ত গ্রাম—২৪৫৯।

গ্রামীণ এলাকা—৬,২০৪ বর্গ কিলোমিটার, সহর এলাকা—৫৫ বর্গ কি.

মিউনিসিপাল সহর—৩

জনসংখ্যা—১৮,৫৫,৪২৯ (১৯৮১), ১৬,০২,৮৭৫ (১৯৭১)

পুরুষ—৯,৪৮, ২১১ (১৯৮১),৮,১৬,৫৩৪ (১৯৭১)

নারী—৯,০৭,২১৮ (১৯৮১),৭,৮৬, ৩৩১ (১৯৭১)

দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—+১৬.৯০ (১৯৭১—৮১)+২২.০২ (১৯৬১-৭১)

গ্রামীণ জনসংখ্যা—১৪,৭০,৫০৮ (১৯৭১), সহরে—১, ৩২, ৩৬৭ (১৯৭১)

তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের শতকরা হার—১৪.৯৯% (১৯৭১)

উপজাতিদের শতকরা হার—১৯.৫৮%(১৯৭১)

জনবসতির ঘনত্ব—২৫৬ বর্গ কি (১৯৭১), ২৯৬ (১৯৮১)

সাক্ষরতার হার—২১·৫০ (১৯৭১), ২৯·৮২ (১৯৮১)

সহরে—৪৬.৮, গ্রামে—১৯ ২ (১৯৭১)

উৎস : (১) Census of India 1981, Series—23, West Bengal, Provisional Population Totals. Paper—I of 1981.

(২) Census of India 1971, Series—22, West Bengal, Part—IIA 1973.

(৩) Annual Plan of Action (1980-81), Purulia District (Monograph)

(৪) Plan and Progress in Purulia District, 1976-77 (Monograph) D.C. Purulia.

(৫). Industrial Horizon, Purulia, 1980. (Monograph)—District Industries Centre, Purulia.

চাষীর সংখ্যা (১৯৭১)—২. ২৭, ৯৬৮, চাষী মজুরের সংখ্যা—১,৬৮, ৯৮৯। (১৯৭৬-৭৭ সালে)

প্রাইমারী স্কুল—২৬৩৭, জুনিয়ার হাই—১১৪, হাইস্কুল—১১৩, হায়ার সেকেণ্ডারী—২৯, কলেজ—৮, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ—১২১।

মহকুমা, থানা ও ব্লক পরিচয়

মহকুমা/থানা	এলাকা ব. কিমি.	জনসংখ্যা	ব্লক	প্রতিষ্ঠার সময়	গ্রামের সংখ্যা
সদর (পূর্ব)	২৫০৭.১	৫,৯২,০৬৪	৭	—	১০০৮
১. পুরুলিয়া মফঃস্বল	৫৪৫.৫	১,৫৭,৭৩৫	পুরুলিয়া-২	১.৪.৬২	২৩০
২. পুরুলিয়া সহর	১৩.৯	৫৭,৭০৮	পুরুলিয়া-১	১.৪ ৬২	—
৩. মানবাজার	৬০৩.২	১,৪৩,৩৭২	মানবাজার-১	১.১১ ৫৪	১৭৬
			মানবাজার-২	১.৭.৫৫	১৭৭
৪. বান্দোয়ান	৩৬৭.৮	৫৬,৯৪৭	বান্দোয়ান	২.১০.৫৮	১৩৫
৫. হুড়া	৩৯৩.৭	৮৩ ৮৪৮	হুড়া	২.১০.৫৩	১১৬
৬. পুঞ্চা	৫৮৩.০	৯২,৪৫৪	পুঞ্চা	২.১০.৫৪	১৭৪
সদর (পশ্চিম)	২১৯১.২	৫,৪৪,৯৭২	৭	—	৯৩১
৭. আড়ষা	২৬৪.২	৭৮,৮৯৪	আড়ষা	১.৪.৫৯	৯৬
৮. জয়পুর	২৩০.৫	৬৩,৬৫৪	জয়পুর	১.৮.৬২	১১৩
৯. ঝালদা	৫৬৯ ৮	১,৬২,৭২৪	ঝালদা-১	১ ৩.৫৯	১৩৭
			ঝালদার-২	১ ৪.৬০	১৩৭
১০ বাগমুণ্ডি	৪৪৫.৫	৬৯,৭৪৯	বাগমুণ্ডি	২.১০ ৫৭	১৪২
১১. বরাবাজার	৪১৪.৪	৯৬,৩০৮	বরাবাজার	১.৮.৬২	২১৬
১২. বলরামপুর	২৬৬.৮	৭১,৬৪৩	বলরামপুর	১.৪.৬২	৯০
রঘুনাথপুর	১৫৩৫.৮	৪,৬৫,৮৩৯	৬	—	৭৮৬
১৩. রঘুনাথপুর	৩৯১.১	১,৩৬,৬৪৪	রঘুনাথপুর-১	১.৪.৫৭	১০৫
১৪. কাশীপুর	৪৪৮.০	১,২৪,১৫৩	কাশীপুর	১.৪.৬১	২১১
১৫. পাড়া	৩০৮.২	১,০০,৬৯৭	পাড়া	২.১০.৬১	১৩৫
১৬. নেতুরিয়া	২০৭.২	৫৮,৯৪২	নেতুরিয়া	২.১০.৫৯	১২৬
১৭. সাঁতুড়ি	১৮১.৩	৪৫,৪০৩	সাঁতুড়ি	২.১০.৬১	১০৪

১৮. সাঁওতালডি[১] ৩৬

ঐতিহাসিক কালপঞ্জী ও বিশিষ্ট ঘটনা : পুরুলিয়া

সময়কাল

খ্রীস্ট পূর্বাব্দ (আনুমানিক)

২০০০—	অসট্রো-এসিয়াটিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ অনুমিত।
১৩০০—১০২৮—	প্রাক্তন মানভূম জেলার বনগড়া অঞ্চলে অসট্রো-এসিয়াটিকদের উপস্থিতি অনুমিত।
১২১৫—	অঙ্গদেশের উৎপত্তি। মানভূম জেলার উত্তরাংশ অঙ্গদেশের অন্তর্গত।
১২১০—	বঙ্গ ও সুহ্ম দেশের উদ্ভব। দীর্ঘতমা ঋষির পূর্বভারতে আগমনের (১২০০ খ্রী পূ) অনুমিত সময়। অঙ্গদেশের রাজা বলি।
৫৩৫—২৮—	মহাবীর বর্ধমান কর্তৃক মানভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলে পরিভ্রমণ।
৪০০—৩৫৭—	তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অস্তিত্ব। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত (?)।
৩২৬—২০—	গ্রীক লেখকদের লেখায় টমালিটস সম্ভবত তাম্রলিপ্ত (?)। রাজধানী গঙ্গে বন্দর।
২৫০—	সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়। কলিঙ্গ সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর তোষলি ও দক্ষিণ

১৯৭৮ সালের ২২ সেপটেমবর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম (পুলিস) দপ্তরের ৭১৩১—পি. এল বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সৃষ্ট হয়েছিল সাঁওতালডি থানা। মোট ৩৬টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল থানাটি। তা'দর মধ্যে ৯টি গ্রাম নেওয়া হয়েছিল রঘুনাথপুর থানা থেকে এবং ২৭টি গ্রাম পাড়া থানা থেকে। আয়তন ও লোক সংখ্যা এখনও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি।

উৎস : (১) Census of India, 1971. West Bengal, Series 22. Part—IIA

(২) West Bengal District Gazetters, Purulia, 1985.

(৩) লেখক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

সময়কাল খ্রীস্টপূর্বাব্দ	
	তোষালি। পুরুলিয়া জেলা উত্তর তোষালির অন্তর্গত।
২৪৬—৪১—	সম্রাট অশোক কর্তৃক তাম্রলিপ্তে স্তূপ প্রতিষ্ঠা। পুরুলিয়া জেলার ভেতর দিয়ে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তে আগমণ।
১৬৩—১৫০—	কলিঙ্গের অভ্যুত্থান। কলিঙ্গের সম্রাট খারবেল বা ভিখু রাজা। সাহাবাদ, পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চল লুণ্ঠন। দামোদরের দক্ষিণ-তীরস্থ ভূভাগ খারবেলের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ত্রি-কলিঙ্গর জন্ম। উত্তর ভাগের মধ্যে পুরুলিয়া জেলা অন্তর্ভুক্ত। পুরুলিয়া জেলায় ব্যাপক জৈন প্রভাব অনুমিত।
১৫০—১০০—	উত্তর তোষালির মধ্যে ওড্র বা উড্র দেশের উদ্ভব। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণপূর্বাংশ উড্র দেশের অন্তর্ভুক্ত।
২০০ খ্রীঃ পূ—২০০ খ্রীস্টাব্দ—	মহাভারতের রচনাকাল। পাণ্ডু কর্তৃক সুহ্ম রাজ্য বিজয়ের কিংবদন্তি। পাণ্ডুপুত্র ভীম কর্তৃক সুহ্ম, প্রসুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত বিজয়।
১৬০—খ্রীস্টাব্দ	ওড়িভিষার অস্তিত্ব। নাগার্জুন কর্তৃক ওড়িভিষার রাজা মুঞ্জকে দীক্ষা দান। পুরুলিয়া জেলার একাংশ ওড়িভিষার অন্তর্গত।
৩৫০ (?)—	বাঁকুড়া, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার উত্তরাংশ নিয়ে পোখরণ রাজ্য। রাজা সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মা। চন্দ্রবর্মার সময় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পোখরণ রাজ্য আক্রমণও বিধ্বংস।
৪০৯—৪১১—	ফা-হিয়ানের তাম্রলিপ্তে অবস্থিতি। তাম্রলিপ্ত রাজ্য ও বন্দর। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত।
৪৫৪—	পন্নবনা (প্রজ্ঞাপণা) সূত্রের রচনাকাল।

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
	তাম্রলিপ্ত বঙ্গের অন্তর্গত। পুরুলিয়ার কিছু অংশ বঙ্গের অন্তর্গত।
৪৭২—	মহাকবি কালিদাসের সময় (কীলহর্ণ কর্তৃক অনুমিত)। কালিদাস কর্তৃক কিংবদন্তি আশ্রিত রঘুর বিজয়াভিযানের বর্ণনা। রঘুর সুহ্ম ও বঙ্গবিজয়। পুরুলিয়া জেলা সুহ্ম রাজ্যের অন্তর্গত।
৫২৫—৪০—	গোপচন্দ্রের অধীনস্ত সামন্তরাজা বিজয় সেন। পুরুলিয়া অঞ্চল নিঃসন্দেহে বিজয় সেনের রাজ্যভুক্ত।
৫৬৭—৯৭—	প্রথম কীর্তিবর্মন কর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ বিজয়। পুরুলিয়া অঞ্চল অঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে অন্তর্ভুক্ত।
৫৭৯—	মানবংশের মহারাজা শম্ভুযশ উত্তর ও দক্ষিণ তোষালির অধীশ্বর। উত্তর তোষালিতে সামন্ত রাজা সোমদত্ত। সোমদত্তের রাজ্যাধীন পুরুলিয়া অঞ্চল, বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। ওড্র জাতির উদ্ভব।
৫৯৯—	লোকবিগ্রহ কিছুকালের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ তোষলির শাসক। পুরুলিয়া অঞ্চলের কিছু অংশ সাময়িকভাবে লোকবিগ্রহের অধীন।
৬০৩—	গৌড়ে মহারাজা শশাঙ্কের অধীন উত্তর তোষলির সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশ দণ্ডভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রতিহার শুভকীর্তি প্রত্যক্ষ শাসক। তখীরা বা মেদিনীপুর জেলার তেবরা ছিল সদর দপ্তর।
৬৪০—	হিউয়েন সাঙের বাংলায় ভ্রমণ, তাম্রলিপ্তে অবস্থিতি। চারটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত বাংলা। পুণ্ড্রবর্ধণ, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত।

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
	কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে পুরুলিয়া অঞ্চল।
৬৬৯—৭০—	প্রাক্তন মানভূম জেলার পাতকুমে বরাহ বংশের শাসন। নাথ ও কেশ বরাহ সম্বন্ধে জনশ্রুতি। মানভূম-ইছাগড়ে পাওয়া শিলালিপির সাক্ষ্য।
৯৬৬—	অভয়নাথ শেখর কর্তৃক শেরগড় পরগণায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা অনুমিত। শেরগড় পরগণা নিয়ে শিখরভূম রাজ্যের উদ্ভব।
৯৬৬—১০২০—	বোড়াম লিপি। রাজপুত্র শ্রীবড়ধুগ বা চড়ধুগ। রাজপুত্র শ্রী আতন্দ্রী চন্দ্র। বুধপুরের লিপি, বুধপুর পর্যন্ত পঞ্চাদ্রিশ্বরের রাজসীমা বিস্তীর্ণ।
১০২১—২৩—	রাঢ়ে প্রথম রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতি কর্তৃক বিজয় অভিযান। পশ্চিমবঙ্গ চারটি রাজ্যে বিভক্ত, তণ্ডভুক্তি বা দণ্ডভুক্তি, তক্কন লাড়ম বা দক্ষিণরাঢ়, উত্তিরলাড়ম বা উত্তররাঢ় এবং বঙ্গালদেশ। দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্মপাল, দক্ষিণরাঢ়ের রাজা রণশূর। পুরুলিয়া জেলা দণ্ডভুক্তি ও দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত।
১০৭৭—১০৯০—	পাল সম্রাট রামপাল কর্তৃক সৈন্যসংগ্রহের জন্য রাঢ়ে ভ্রমণ। তৈলকম্প বা তেলকুপির রাজা রুদ্রশিখর। পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ তৈলকম্প রাজ্যের অন্তর্গত। দামোদর থেকে কাঁসাই ও ঝালদা থেকে বুধপুর পর্যন্ত রাজ্যটি বিস্তীর্ণ। কাঁসাইয়ের দক্ষিণাংশ দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ।
১০৯০—১০৯৬	কুলতুঙ্গের সেনাপতি কর্তৃক বঙ্গাভিযান। কলিঙ্গদেশ ভস্মে পরিণত, ওড্র দেশের সীমান্তে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন। বঙ্গ ও বঙ্গালের নৃপতি

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
	কর্তৃক কুলতুঙ্গকে করপ্রদান। পুরুলিয়ার দক্ষিণাংশ বিজিত।
১০১৫—১১৫৮—	বিজয় সেনের রাজত্বকাল অনুমিত। বিজয় সেন কর্তৃক শূর বংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ। তৈলকম্প রাজ্য বিজয় সেনের রাজ্য বহির্ভূত। স্বতন্ত্র রাজ্য।
১১৫৮ –১১৭৯—	বল্লালসেনের রাজত্বকাল। পাঁচটি প্রদেশ বিভক্ত রাজ্য ; বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগড়ী ও মিথিলা। বল্লাল সেনের দানসাগরে শিখরবংশের উল্লেখ। তৈলকম্প রাজ্য বল্লালসেনের রাজ্য বহির্ভূত।
১১৭৯—১২০৬—	লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল। মগধ, গয়া, কাশী ও এলাহাবাদ লক্ষণসেন কর্তৃক বিজিত। তৈলকম্প লক্ষণসেনের রাজ্যভুক্ত। মুহম্মদ সিরাজ কর্তৃক লখনৌর জয়। রাঢ় অঞ্চল থেকে সেনবংশের আধিপত্য উচিছন্ন।
১২০৭—১২১৩—	গঙ্গ বংশীয় তৃতীয় অনঙ্গভীমের সেনাপতি বিষ্ণু কর্তৃক রাঢ় আক্রমণ। লখনৌর অধিকার। পুরুলিয়া জেলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েছিল অভিযান।
১২১৪—১২২৬—	গিয়াসুদ্দিন কর্তৃক লখনৌর পুনরুদ্ধার।
১২৪৩—৪৪—	প্রথম নরসিংহদেব কর্তৃক লখনৌর বিজয়। শিখরভূম ও তৈলকম্প (পঞ্চকোট ?) প্রথম নরসিংহদেবের রাজ্যভুক্ত।
১২৯১—১৩১৬—	জনশ্রুতি অনুসারে পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণশেখর (?)।
১৩৫৩—	ছাতনার রাজা উত্তর হামির। ছাতনা শিখরভূম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।
১৩৬০—১৪১৮—	সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক শিখর ভূমের মধ্য দিয়ে অভিযান। শিখরভূম আক্রমণ।

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
	সম্ভবত সাঁতুড়ি, নেতুরিয়া, রঘুনাথপুর, পাড়া, কাশীপুর এবং বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত শিখরভূম। জীব গোস্বামীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ পদ্মনাভের শিখরভূমে বসবাস।
১৪৬১—৬২—	বরাকরের মন্দিরলিপি অনুযায়ী পঞ্চকোটের রাজা হরিশ্চন্দ্রশেখর।
১৫৫৪—	ছাতনার রাজা হামির উত্তর রায়। ছাতনা পঞ্চকোট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত!
১৫৯১—১৬০০-	মানসিংহের দ্বিতীয়বার উড়িষ্যা অভিযান। পাড়া ও পুরুলিয়ার মধ্যদিয়ে অভিযানের পথ। পাড়ায় মন্দিরগুলির সংস্কার। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির কর্তৃক পঞ্চকোট দুর্গ অধিকার।
১৬০১—১৬১১—	ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত। পশ্চিম-বাংলার জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান। চন্দ্রকোনার জমিদার বীরভান বা চন্দ্রভান, বরদা ও ঝাকরার (ঝাড়গ্রাম) জমিদার দলপত, পাঁচেটের জমিদার শামস খান, পঞ্চকোট দুর্গের অধীশ্বর বীর হাম্বির।
	জাহাঙ্গীর কর্তৃক সুবা বাংলা থেকে সুবা উড়িষ্যা পৃথকীকরণ। সুবা উড়িষ্যার সুবাদার হাশিম খান।
১৬২৪ (পর্যন্ত)	পঞ্চকোটের রাজা দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্র শেখর অনুমিত।
১৬৩২—৩৩—	পাঁচেটের জমিদার বীর নারায়ণ। সম্ভবত মল্লরাজা বীর সিংহ। বীরনারায়ণ কর্তৃক শাহজাহানের অধীনতা স্বীকার। পাঁচেট সুবা বিহারের অন্তর্গত।
১৬৫৮—	সুলতান সিংহের 'জমা তুমারি'তে পাঁচেট

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
	জমিদারী স্থায়ী খাজনা বা পেশকুশ দেবার জন্য নির্দিষ্ট।
১৭০০—	পাঁচেট দুর্গ পরিত্যক্ত। মানভূম ও বরাভূমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।
১৭২২—	মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার। সুবা বাংলা ১৩টি চাকলায় বিভক্ত। বিষ্ণুপুর ও পাঁচেট জমিদারী চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত।
১৭১৪, নভেম্বর—	পাঁচেটে বর্গীর আক্রমণ।
১৭৪৩, মার্চ—	দ্বিতীয়বার বর্গীর আক্রমণ। মানভূমের ভেতর দিয়ে রঘুজীর সম্বলপুরে পলায়ন। পাঁচেটের ভেতর দিয়ে রঘুজী কর্তৃক পেশোয়াকে অনুসরণ। পাঁচেটের রাজা জটল্যা গরুড়নারায়ণের মৃত্যু।
১৭৫৬, ১০ এপরিল—	আলিবর্দীর মৃত্যু।
১৭৫৭, ২৩ জুন—	পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজদ্দৌলার পরাজয়। বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। মীরজাফর বাংলার নবাব।
১৭৬০—	মীরজাফরের বদলে মীরকাশিম বাংলার নবাব। নবাবীর শর্ত হিসারে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—তিনটি চাকলা ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানিকে প্রদান। চাকলা মেদিনীপুরের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার বৃহত্তর অংশ।
১৭৬৫—	ইস্ট ইনডিয়া কোমপানির বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ। মানভূম ও বরাভূম পরগণা চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত। রামগড়ের অন্তর্গত পাতকুম ও বাগমুণ্ডি।
১৭৬৭—৬৮	লে. জন ফার্গুসনের অভিযান। মানভূম ও বরাভূমে শিবির, উভয় পরগণার খাজনা নির্ধারণ। পাঁচেটের জমিদারীর দুই দাবীদার, মোহনলাল ও

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
	মণিলাল। উভয়েই জমিদারী থেকে উচিছন্ন। জাল অনন্তলালের আবির্ভাব। জগন্নাথ ধলের বদলে কোমপানি কর্তৃক নিমু ধলকে ঘাটশীলার রাজা হিসাবে ঘোষণা।
১৭৬৯—	ঘাটশীলা ও বরাভূমের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সর্দারদের বিদ্রোহ। কইলাপালের সর্দার সুবল সিং প্রধান বিদ্রোহী। চার কোমপানি সিপাহিসহ ক্যাপটেন ফরবেস ও লে. নানের অভিযান।
১৭৭০—	লে. নান অর্তার্কতে আক্রান্ত। সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতি। বীরভূম, পাঁচেট ও বিষ্ণুপুর একজন কালেকটারের অধীনে আনীত।
১৭৭১—৭২—	জঙ্গল সর্দারদের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ। পাঁচেটে জমি নীলাম। লীজ নেবার লোকের অভাব। রামকান্ত বিশ্বাস দেওয়ান নিযুক্ত। পাঁচেটে বিক্ষোভ। বিহার থেকে ক্যা. কারটার, লে. গল ও ইয়ংয়ের অভিযান। পাঁচেট ও ঝালদা আলাদা আলাদা কালেকটরের অধীন। উত্তরাধিকার নিয়ে পঞ্চকোট জমিদারীতে পুনরায় বিরোধ।
১৭৭৩—	বরাভূমে পুনরায় বিক্ষোভ। লে, জেমস ভানের অভিযান। মানভূমের জমিদার হরিনারায়ণ গেপ্তার ও মেদিনীপুরে প্রেরিত।
১৭৭৬—	বরাভূমের জমিদারের সঙ্গে হিগিনসনের চুক্তি।
১৭৮১—	পাঁচেটের জন্য কালেকটর নিযুক্ত।
১৭৮২—	পাঁচেটের ভেতর দিয়ে প্রসারিত প্রাচীন বেনারস সড়কটির সংস্কার। ঝালদা ও তামারে বিক্ষোভ। সৈন্যসহ ঝালদায় মেজর ক্রফোর্ডের অবস্থিতি। রঘুনাথপুর নতুন সদর দপ্তর।

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
১৭৮৩—৮৪—	ঝালদার উপজাতি সর্দার মঙ্গলশাহের আত্মসমর্পন। কইলাপালে বিক্ষোভ। বিদ্রোহীদের বীরভূমে আশ্রয় গ্রহণ।
১৭৮৬—	পাঁচেট জমিদারী সরকার মদারুণ ও বর্ধমান চাকলার অন্তগর্ত। পুরুলিয়া পরগণা বিষ্ণুপুর জমিদারীর অধীন।
১৭৯২—	পঞ্চকোটের রাজা মণিলালের মৃত্যু। ভরতশেখর গরুঢ়নারায়ণ উপাধি নিয়ে পঞ্চকোটের রাজা। নতুন রাজধাণী কেশরগড়।
১৭৯৫—৯৮—	পাঁচেট জমিদারীর একাংশ রামগড় কালেকটরের অধীন। পাঁচেটে বিদ্রোহ। রামগড় থেকে বীরভূমের অন্তর্গত পাঁচেট জমিদারী। বরাভূমে ভ্রাতৃবিরোধ। সতেরখানি তরফের সর্দার লাল সিংহের প্রভাব।
১৮০৫—	বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও পাঁচেটের জঙ্গল এলাকা এবং ২৩টি মহল ও পরগণা নিয়ে নতুন জেলা গঠিত। নাম, জঙ্গল মহল। সদর দপ্তর বাঁকুড়া!
১৮১৫—১৮১৮—	ভারতশেখরের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র চেৎসিংহ রঘুনাথনারায়ণ উপাধি নিয়ে পঞ্চকোটের রাজা (১৮১৫)। চেৎসিংহের মৃত্যু (১৮১৮)। জগজীবন গরুঢ়নারায়ণ উপাধি নিয়ে পঞ্চকোটের রাজা
১৮২৩—	নীলমণি সিংহের জন্ম।
১৮৩২—	বরাভূম অঞ্চলে গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ। বরাভূম অঞ্চলে গঙ্গানারায়ণের একছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা। কোম্পানির শাসন অবলুপ্ত। কেশরগড় থেকে কাশীপুরে পঞ্চকোটের রাজধানী স্থানান্তরিত।

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
১৮৩৩—	জঙ্গলমহল জেলার বিলুপ্তি। মানভূম জেলার সৃষ্টি, সদর দপ্তর মানবাজার। নতুন জেলার আয়তন ৭৮৯৬ বর্গমাইল, ৩১টি জমিদারী জেলার অন্তর্ভুক্ত।
১৮৩৮—	মানভূম জেলার সদর দপ্তর মানবাজার থেকে পুরুলিয়া সহরে স্থানান্তরিত।
১৮৪১—	রঘুনাথনারায়ণ উপাধি নিয়ে নীলমণি সিংহ কর্তৃক পঞ্চকোটের রাজ্যভার গ্রহণ।
১৮৪৫—	ধলভূম মানভূম জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ও সিংভূমের সঙ্গে সংযুক্ত।
১৮৫১—	জগজীবনের মৃত্যু। নীলমণি সিংহের আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যাভিষেক।
১৮৫৪—	ছোটনাগপুর ডিভিশনের কমিশনারের প্রিনসিপাল এজেনট মানভূমের ডেপুটি কমিশনার।
১৮৫৭—	মহাবিদ্রোহে নীলমণি সিংহের অংশগ্রহণ। পুরুলিয়ার টেজারী লুণ্ঠন, জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্তি। ইউরোপীয়ানদের রানীগঞ্জে পলায়ন। ক্যাপটেন জি. এন. ওকসের পুরুলিয়া অভিযান। নীলমণি সিংহ বন্দী। বন্দী অবস্থায় কলকাতায় প্রেরণ।
১৮৭১—	ছাতনা ও মহিষাড়া পরগণা মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন ও বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে সংযুক্ত।
১৮৭৯—	সুপুর, রায়পুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল মানভূম থেকে বিযুক্ত ও বাঁকুড়ার সঙ্গে সংযুক্ত।
১৮৮৫—	পুরুলিয়া মিউজিকাল ইনসটিটিউটের (পি. এম. আই) প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৫—১৯০০—	বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের বিদ্রোহ। মানভূম জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড গঠিত।
১৯০১—	মানভূম ভিকটোরিয়া ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠা।

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
১৯০৮—০৯—	পুরুলিয়া—রাঁচি ছোট রেল চালু। ভূমিকম্প। ছোটনাগপুর টেনানসি এক্ট মানভূম জেলায় সম্প্রসারিত।
১৯১০—	মি. জি. ডি শিফটন কর্তৃক বরাভূমে সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট কার্য শেষ। মানভূম জেলার জন্য জেলা-জজ নিযুক্ত।
১৯১১—	কংসাবতী সড়ক-সেতু নির্মাণ। মেদিনীপুর জেলা থেকে বদলি হয়ে নিবারণচন্দ্রের মানভূমে আগমণ।
১৯১২—	মানভূম জেলা নবগঠিত বিহার-উড়িষ্যা যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত।
১৯১৮—(২২)—	মি বি কে. গোখেল কর্তৃক প্রথম ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে সম্পাদন।
১৯২০—	লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিনহা বিহার—উড়িষ্যা যুক্ত প্রদেশের প্রথম ভারতীয় গভর্নর।
১৯২১—	পুরুলিয়ায় অসহযোগ আন্দোলন। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের শিক্ষকতা ত্যাগ ও আন্দোলনে যোগদান। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। অতুলচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য ও উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক ওকালতি ত্যাগ ও আন্দোলনে যোগদান। নীলকুঠি ডাঙ্গায় শিল্পাশ্রম।
১৯২৫—	পুরুলিয়া সহরে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন। গান্ধীজীর পুরুলিয়ায় আগমণ। দেশবন্ধু প্রেস প্রতিষ্ঠা ও মুক্তি পত্রিকা প্রকাশ। কাশীপুরের রাজা জ্যোতি-প্রসাদ সিংহদেবের দানে ও ললিতমোহন ঘোষের দেওয়া ২০ বিঘা জমির ওপর পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা।

সময়কাল
খ্রীস্টাব্দ

১৯২৬— পুরুলিয়া সহরের গাড়ীখানা অঞ্চলে বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, বীররাঘব আচারিয়া ও অন্যান্য যুবকদের উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৯২৭— রেলকর্মীদের ধর্মঘট। আদ্রায় আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পুরুলিয়ায় আগমণ। নিবারণ চন্দ্র বাঁকুড়া রাজনৈতিক সম্মেলনের বিষ্ণুপুর অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২৮— অন্নদাকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে রামচন্দ্রপুরে মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। পুরুলিয়ায় মহিলা সভা গঠিত। চাইবাসা থেকে তরুণশক্তি পত্রিকা প্রকাশিত। ঝালদায় সত্যকিংকর দত্ত নিহত।

১৯২৯— নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং অন্নদাকুমার চক্রবর্তী কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বীর রাঘব আচারিয়া 'মুক্তি' পত্রিকার নতুন সম্পাদক। ঝালদায় দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন।

১৯৩০— মানভূমে আইন অমান্য আন্দোলন। নিবারচন্দ্র গেপ্তার। রামচন্দ্রপুরে পুলিসের হামলা, অন্নদাকুমার চক্রবর্তীর ওপর অত্যাচার। ঝালদায় সত্যমেলায় পুলিসের গুলি চালনা, পাঁচজন নিহত।

১৯৩২- মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র গেপ্তার। পুরুলিয়া শিল্পাশ্রম বাজেয়াপ্ত।

১৯৩৩—৩৪ হরিজন আন্দোলনের প্রচারে গান্ধীজীর পুরুলিয়ায় আগমণ। শান্তময়ী গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা। জওহরলাল নেহরুর পুরুলিয়ায়

সময়কাল খ্রীস্টাব্দ	
	ভ্রমণ।
১৯৩৫—	পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে নিবারণচন্দ্রের মৃত্যু। পুরুলিয়ায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পত্তন।
১৯৩৬—৩৭—	গভর্নমেণ্ট অব ইনডিয়া একট ১৯৩৫ অনুসারে বিহার উড়িষ্যা যুক্ত প্রদেশ ভেঙ্গে দুটি প্রদেশ গঠিত। মানভূম বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। নবকুষ্ঠ নিবাস (১৯৩৭) প্রতিষ্ঠা। মানভূমে কিষাণ সভা গঠিত।
১৯৩৯—৪০	পুরুলিয়া সহরে পশুপতি-গঙ্গাধর সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। মানভূম জেলায় কমিউনিসট পার্টির একটিভিস্‌ট গ্রুপ গঠিত। ফরোয়াড ব্লক গঠিত। নেতাজীর পুরুলিয়ায় ভ্রমণ।
১৯৪২—	জেলার প্রায় সর্বত্র আন্দোলন। শিল্পাশ্রম বাজেয়াপ্ত, নেতারা গেপ্তার। মানবাজার ও বরাবাজারে পুলিসের গুলি চালনা। মানবাজারে নিহত দুইজন।
১৯৪৫—	মানভূম জেলার কিছু অংশ সিংভূমের অন্তর্গত।
১৯৪৭—	ভারতের স্বাধীনতা। বিহার প্রাইভেট ফরেসট এ্যাকট।
১৯৪৮—	স্বর্গত জগন্নাথ কিশোর লাল সিংহদেওয়ের বিধবা পত্নী কর্তৃক প্রদত্ত ১ লক্ষ টাকা অনুদানে জে. কে. কলেজ প্রতিষ্ঠা। লোকসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৯—	পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপলাই করপোরেশন প্রতিষ্ঠা (১০ জুলাই)।
১৯৫৬—	পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সংযুক্ত ক'রে পূর্বদেশ গঠনের প্রস্তাব। পুরুলিয়ায় টুসু আন্দোলন। প্রাক্তন মানভূম জেলার বৃহত্তর অংশ পশ্চিমবঙ্গের

সময়কাল
খ্রীস্টাব্দ

অন্তর্ভুক্ত ক'রে পুরুলিয়া জেলার সৃষ্টি (১ নভেম্বর)।

১৯৫৭— নিস্তারিণী কলেজ (মেয়েদের) প্রতিষ্ঠা। পুরুলিয়া পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৮—৫৯— মূকবধির স্কুল প্রতিষ্ঠা। জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ। সরযূপ্রসাদ ওঝা কর্তৃক প্রদত্ত ১ লক্ষ টাকায় ঝালদায় দুর্গা জুনিয়ার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গঠিত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক পাঁচেট ড্যাম উদ্বোধন (৬ ডিসেমবর ১৯৫৯)।

১৯৬১— রঘুনাথপুর কলেজ ও রঘুনাথপুরে ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনসটিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। সাঁওতালডিতে কয়লা শোধনাগার প্রতিষ্ঠা।

১৯৬২— পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৪— রঘুনাথপুর কলেজ ও ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনসটিটিউট চালু। মহিলাদের বিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা। পঞ্চায়েত রাজের পত্তন। জিলা পরিষদ গঠন। ছোটনাগপুর রুরাল পুলিস এ্যাকট বাতিল ও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন চালু।

১৯৬৫— পুরুলিয়া ওয়াটার ওয়ার্কসের কাজ সম্পূর্ণ। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমি সংগ্রহ সুরু। সাহেব বাঁধ মৎস্য দপ্তরকে হস্তান্তর।

দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি

পুরুলিয়া সদর মহকুমা

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
১. আনাইজামবাদ পুরুলিয়া মফঃস্বল	গ্রামের অন্য নাম মহাদেববেড়্যা। প্রাচীন জৈন পুরাক্ষেত্র। সম্প্রতি ধানবাদ জেলার খরখরির সরাক জৈন সমিতি আধুনিক মন্দির তৈরি করিয়েছেন। মন্দিরে ক'টি সুন্দর মূর্তি রক্ষিত। ২টি পার্শ্বনাথের মূর্তি, ১টি চন্দ্রপ্রভার। মূর্তিগুলির অঙ্গ সৌষ্ঠব কোমল ও মসৃণ, সম্ভবত পালযুগের প্রভাব যুক্ত। গ্রামে দালান মন্দিরে রক্ষিত ২টি শিবলিঙ্গ, ১ বিষ্ণুমূর্তি বাইরে ১ কার্তিক মূর্তি।	পুরুলিয়া হুড়া রাস্তায় ৩ কি মি। কংসাবতী নদীর কাছে। বিশ্রামস্থল, পুরুলিয়া।
২. রালিবেড়্যা পুরুলিয়া মফঃ	কাঁচা ঘরে কয়েকটি সুন্দর মূর্তি রক্ষিত। ৩টি হরপার্বতী মূর্তি, ২টি মূর্তিতে শিব চতুর্ভুজ যোগাসনে উপবিষ্ট, পার্বতী সালংকারা, শিবের উরুর ওপর উপাবিষ্ট। ১টি মূর্তিতে শিব দ্বিভুজ। প্রতিটি মূর্তি ভাস্কর্যে অনবদ্য। ১টি কালো পাথরে খোদিত গণেশ মূর্তি। মন্দিরের বাইরে রক্ষিত সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্তি, বড় পাথরের প্যানেল, তাতে সম্ভবত নরকের দৃশ্য খোদিত।	পুরুলিয়া সহর থেকে কাকওড়ায় ৯ কি. মি. কংসাবতী নদীর কাছে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	মূর্তিগুলি কাছাকাছি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত।	
৩. ভাঙড়া পুরুলিয়া মফঃ	পাথরের দুটি প্রাচীন জৈন মন্দির ছিল। একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর খরখরির জৈন সরাক সম্প্রদায় আধুনিক মন্দির তৈরি করিয়েছেন। মন্দিরে ক'টি জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি রক্ষিত। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে দালান মন্দিরে ঋষভনাথের ৪ ফুট মূর্তি দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা।	পুরুলিয়া হুড়া রাস্তায় পুরুলিয়া সহর থেকে ১১ কি. মি.।
৪. টুভুহুড়ু পুরুলিয়া মফঃ	গ্রামের দুর্গামন্দিরের বারান্দায় রালিবেড়্যার প্যানেলের মত একটি প্যানেল আছে। দুর্গামন্দিরের মুখোমুখি একতলা বাড়িতে রক্ষিত দুটি পুরুষ মূর্তি, সম্ভবত দিকপাল।	রালিবেড়্যা থেকে ১ মাইল দক্ষিণে।
৫. নাংটি বা নঙ্গির থান, পুরুলিয়া মফঃ	পাথরের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তিনটি পাথরের ঋষভনাথের মূর্তি। জিতুজুড়ি গ্রামের কাছাকাছি আরওকটি স্থানে পাথরের মন্দির ও মূর্তি দেখা যায়। যথা, পিচাসী পাথরকাটা। সম্ভবত পাথরকাটায় এক সময় পাথরের খাদান ছিল এবং মূর্তি তৈরির জন্য এখান থেকে সংগৃহীত হত পাথর।	জিতুজুড়ি গ্রামের কাছে। কংসাবতী নদীর অপর পারে।
৬. ছোট বলরামপুর পুরুলিয়া মফঃ	ইটের তৈরি বিরাট রেখ-দেউল আছে। প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত। ডালটন (১৮৬৬) অনেকগুলি	পুরুলিয়া সহর থেকে ৬ কি. মি. দক্ষিণ পূর্বে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	জৈন তীর্থংকর মূর্তি দেখেছিলেন। দেউলটি সম্ভবত মুসলিম যুগে (১৬-১৭ শতকে) নির্মিত। প্রাক-মুশলিম যুগের জরাজীর্ণ একটি পাথরের মন্দির আছে নদীর ধারে। বর্তমানে কোন মন্দিরেই মূর্তি নেই।	
৭. বেলকুঁড়ি পুরুলিয়া মফঃ	সাত থেকে আট ফুট উঁচু ছোট একটি পাথরের মন্দির আছে। কড়চাতেও ভাঙ্গা একটি মন্দির আছে। লাগদাতেও অনুরূপ মন্দির আছে একটি।	পুরুলিয়া-রাঁচি রোডে পুরুলিয়া সহর থেকে ১৩ কি. মি.। পাকা সড়ক থেকে ২ কি. মি.।
৮. ছড়রা পুরুলিয়া মফঃ	বড় গ্রাম, জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। কিছুদিন আগেও গ্রামের ভেতর পাথরের দুটি রেখ-দেউল ছিল। বর্তমানে আছে একটি। গ্রামের মধ্যে বহু জৈন মূর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে একটি দালানের গায়ে কয়েকটি মূর্তি লাগান আছে। দু'মাইল দূরে ঘোলা-মারায় একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেখানে উৎকীর্ণ লিপিসহ জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। লিপির সময়কাল ১১-১২ খ্রীস্টাব্দ। সিংহের উপর উপবিষ্ট অষ্টভুজ দেবী মূর্তিও পাওয়া গিয়েছিল।	পুরুলিয়া সহর থেকে ৬ কি. মি. উত্তর-পূর্বে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
৯. চাকলতোড় পুরুলিয়া মফঃ	মাঝারি গ্রাম, লোক সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ভাদ্র মাসে ছাতা পরবের জন্য বিখ্যাত। সাত দিন চলে মেলা। গ্রামের মধ্যে শ্যামচাঁদের একটি জোড়বাংলা মন্দির আছে। বিগ্রহ, রাধাকৃষ্ণ। মন্দিরের নির্মাণকাল আঠারো শতক।	পুরুলিয়া-ধরাবাজার রাস্তায় পুরুলিয়া সহর থেকে ১১ কি. মি. দক্ষিণে।
১০. পুরুলিয়া সহর পুরুলিয়া	বেগলার লিখেছেন (১৮৭২-৭৩) সহরের পূর্বদিকে উঁচু খোলা জায়গায় দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। একটি বড়, অপরটি ছোট। নির্মাণকাল ১১ থেকে ১৩ বা ১৬ খ্রীস্টাব্দ। সম্ভবত বর্তমানে তেলকল পাড়ার মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপের ওপর নির্মিত হয়েছিল। সহরের মধ্যে সাহেব বাঁধ বা নিবারণ সায়র অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। ১৮৪৩ সালে বাঁধটির খনন কার্য সুরু হয়েছিল, শেষ হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। বর্ষাকালে জল এলাকা দাঁড়ায় ৫০ একর। বাঁধের চারদিক ঘিরে পাকা সড়ক। দক্ষিণ তীরে বন বিভাগ কর্তৃক নির্মিত ও সুরক্ষিত মনোরম পার্ক, 'সুভাষ উদ্যান'। উত্তর তীরে জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র। সহরের কেন্দ্রস্থলে ঋষি নিবারণ	কলকাতা থেকে সড়কে ৩৫৫ কি. মি. ৩২৪ কি.মি. রেলপথে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	পার্ক, শিল্পী গোপেশ্বর পাল নির্মিত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের মর্মর মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত। নিবারণ সায়রের পূর্ব-দিকে হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও সংগ্রহশালা। পাঠাগার হিসাবে সাহিত্য মন্দিরের উদ্ভব ঘটেছিল ১৯২১ সালে। সংগ্রহ-শালা চালু হয়েছিল ১৯৬০ সালে। জৈন তীর্থংকর মূর্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধ, ফসিল, টেরাকোটা, অলংকার, পুথি প্রভৃতির সংগ্রহে মিউজিয়ামটি সমৃদ্ধ। কাছাকাছি রবীন্দ্র সদন।	
	১৯৫৮ সানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। বর্তমানে প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনে পরিণত হয়েছে। আশ্রমিক পরিবেশে প্রায় ৬০০ ছাত্রের থাকা ও পড়া-শুনার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যা-পীঠের সামগ্রিক পরিবেশ ও সংলগ্ন সংগ্রহশালাটি দর্শনীয়। পুরুলিয়া-রাঁচি রোডের ওপর মাগুরিয়ার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৬২ সালে সুরু হয়েছিল সৈনিক	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	স্কুল। ভারতবর্ষে এ জাতীয় সতেরোটি স্কুলের মধ্যে এটি একটি। সেণ্ট্রাল বোর্ড অব সেকেনডারী এডুকেশনের অন্তর্গত (১৯৬৯)। বিদ্যালয়টি আবাসিক। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্কুলটির বোর্ড অব-গভর্ণরের সভাপতি।	
১১. মানবাজার মানবাজার	বড় গ্রাম, সহরে পরিণত হতে চলেছে। লোকসংখ্যা প্রায় ছ হাজার। একদা মানবাজার রাজ পরিবারের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ছিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সদর দপ্তরও ছিল মানভূম জেলার। পাথর মহড়ায় রাজ বাড়ির দুর্গা মন্দিরে কয়েকটি বড় বড় জৈন তীর্থংকর মূর্তি রক্ষিত আছে। মানবাজার থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর।	পুরুলিয়া সহর থেকে দক্ষিণ পূর্বে ৪৫ কি. মি.। ডাকবাংলো আছে।
১২. বুধপুর মানবাজার	ছোট গ্রাম। বুদ্ধেশ্বর শিবের বড় মন্দির আছে গ্রামে। কাছা-কাছি পাঁচটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন বেগলার। বড় মন্দিরটি ১৯২৬ সালে সংস্কৃত হয়েছিল। বেগলার মন্দিরটির সময়কাল ১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে নির্দিষ্ট করেছিলেন। গ্রামের মধ্যে কতকগুলি পাথরে খোচিত প্যানেল ছিল। স্তম্ভও ছিল	মানবাজার থেকে ৬ কি. মি. উত্তরে হুড়া রোডের ওপর। কাঁসাই নদীর তীরে, কাছাকাছি বাংলো আছে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	ক'টি। তাদের মধ্যে দুটিতে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছিল। লিপিগুলির একটি ছিল ৮-১০ শতকের, অপরটি ১১ শতকের। মন্দির ছাড়াও মূর্তি আছে ক'টি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু ও গণেশের মূর্তি।	
১৩. টুশামা পুঞ্চা	ছোট গ্রাম। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। কাঁসাইয়ের তীরে প্রাচীন জীর্ণ পাথরের মন্দির আছে একটি। মন্দিরের সামনে বহু স্তম্ভ পোঁতা আছে দেখা যায়। স্তম্ভগুলির গায়ে খোদিত মূর্তি আছে। গ্রামের মধ্যে অসংখ্য পটারির চিহ্ন বিকীর্ণ। অধিবাসী বেশিরভাগ মানাবাউরি।	বুধপুর থেকে ১½ কি. মি.। কাঁসাই নদীর তীরে।
১৪. পাকবিড়রা পুঞ্চা	মাঝারি গ্রাম, অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। প্রাচীন জৈন ক্ষেত্র। বেগলার ২১ টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ১৯টি পাথরের। প্রাচীন মন্দিরগুলির উপাদান দিয়ে পরবর্তীকালে পাঁচটি মন্দির পুনর্নির্মিত হয়েছিল। সেগুলি এখনও বিদ্যমান। জৈন মন্দির গুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধাঁচে নির্মিত একটি মন্দিরও ছিল।	পুরুলিয়া সহর থেকে ৪০ কি. মি.। পুঞ্চা থেকে ৩ কি. মি. পূর্বে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	সেটির নির্মানকাল বেগলার নবম খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করেছিলেন। মন্দির ছাড়াও বহু মূর্তি ও শিলালিপি ছিল। মূর্তিগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য সাড়ে সাত ফুট উঁচু তীর্থংকর শ্রেয়ংসনাথের মূর্তিটি। স্থানীয়ভাবে এটিকে বলা হয় ভীরম। এ ছাড়া আরও অনেক জৈন মূর্তি একটি আধ-পাকা ঘরে রক্ষিত। মূর্তিগুলির মধ্যে ঋষভনাথ, মহাবীর, শম্ভুনাথ, পদ্মপ্রভ, চন্দ্রপ্রভ, যক্ষিনী ও শ্মশাণদেবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলির কাছাকাছি পাথরের ঘাট বাঁধানো বড় পুকুরও ছিল।	
১৫. লাথন ডুংরি পুঞ্চা	পাকবিড়ার ও বরমাসিয়ার মধ্যে, খড়াকিগড়ের কাছে ছোট পাহাড়, লাথন—ডুংরি। ডুংরির মাথায় একটি স্থানকে বেগলার উল্লেখ করেছিলেন থলাবির স্থান বলে। সেখানে বহু চৈত্য, গোল এবং লম্বা পাথরের স্তম্ভও দেখেছিলেন। প্রাচীন মন্দিরের উপাদান দিয়ে চিহ্নিত ছিল ভুঁইয়াদের কবরস্থল। সেখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল বলে অনুমান করেছিলেন বেগলার।	পাকবিড়রা থেকে ১½ কি. মি.

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	ডুংরির মাইলখানেক দূরে, শাল জঙ্গলের মধ্যে দুটি পাথরের শৈব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। তাদের মধ্যে একটিতে ছিল লিঙ্গ। ধাধকি-টাঁড়েও বিরাট পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল।	
১৬. পলমা পুঞ্চা	ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা ১ হাজারের কম। হানটার জৈন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলেন। মূর্তিও ছিল অনেকগুলি, তাদের মধ্যে একটি ছিল মানুষ-সমান, দুই ভাগে ভাঙ্গা। পরিকীর্ণ পাথরের টুকরো ও ইঁট দেখে অনুমান করেছিলেন এখানে এক সময় অনেকগুলি মন্দির ছিল। ওয়ালশ ১৯৩৭ সালে অনেকগুলি স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কার করে-ছিলেন। সেগুলি পাটনা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।	পুরুলিয়া—মানবাজার রোডে, পুরুলিয়া থেকে কয়েক কি. মি. দূরে। কাঁসাই নদীর তীরে।
১৭. লাকড়া পুঞ্চা	অনেকগুলি মূর্তি ও মূর্তির অংশ রক্ষিত আছে। শিব মন্দিরও আছে একটি।	পাকবিড়রা থেকে কাঁচা পথে ৫ কি. মি.
১৮. হুড়া হুড়া	বড় গ্রাম। হুড়া থানা ও ব্লকের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। থানার অন্তর্গত দলদলি গ্রামে তাঁতবস্ত্র তৈরি হয়। বড়গ্রামে তৈরি হয় মাটির তৈজসপত্র। বর্তমানে	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	বাঁকুড়া-হুড়া-পুরুলিয়া সড়কটি চালু হবার ফলে গ্রামটি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।	
১৯. ভবানীপুর হুড়া	ছোটগ্রাম। গ্রামের পূর্বদিকে, মাঠে, পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঋষভনাথের মূর্তিও আছে একটি, নিচে শিলালিপি খোদিত। বুধপুর ও টুশামার মত রিলিফে খোদিত মূর্তিসহ পাথরের পাটা এখানেও দেখা যায়। গেরামথানে পার্বতী ও যমের দুটি মূর্তি ছিল, বর্তমানে অন্তর্হিত। ভবানীপুর সম্ভবত আগে জৈন ও পরে ব্রাহ্মণ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।	পুরুলিয়া—হুড়া সড়কে পুরুলিয়া থেকে ১১ কি. মি.।
২০. ধাধকিটাঁড় হুড়া	অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ভাঙ্গাচোরা মূর্তির অংশ আছে কিছু। পুরাক্ষেত্রের এলাকা প্রায় ১২০ বর্গ ফুট।	পাকবিড়রা গ্রামের কাছে। হুড়া-মানবাজার সড়কের ওপর।
২১. বান্দোয়ান বান্দোয়ান	বড় গ্রাম। থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর। উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি নেই। আই. এল-ও-র একটি প্রকল্প থানায় চালু। প্রকল্পটির কিছু অফিস আছে।	
সদর মহকুমা (পশ্চিম)		
২২. দেউলঘাট বা বোড়াম, আড়ষা	একসময় অনেকগুলি মন্দির ছিল, বর্তমানে তিনটি ইটের মন্দির মাটির ওপর দণ্ডায়মান। মন্দিরগুলির বাইরের দেয়াল অলংকৃত।	গড়-জয়পুর রেল স্টেশন থেকে ৭ কি. মি.। কাঁসাই নদীর তীরে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	দেয়ালের আস্তরে ছাঁচা হাঁস, ফুল-লতা, বামন, কীর্তিমুখ, পদ্ম প্রভৃতি—পাল-সেন আমলের শিল্পশৈলীর স্মৃতিবহ। মন্দির-গুলির সঙ্গে সম্ভবত একসময় মণ্ডপ সংযুক্ত ছিল, পরে ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনটি দণ্ডায়মান মন্দির ছাড়াও অনেকগুলি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্থানটিতে পরিকীর্ণ। পাথরের স্ল্যাবে নবম-দশম খ্রীষ্টাব্দের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছিল। মন্দির ছাড়া দেউলঘাটে মূর্তি আছে অনেকগুলি। মূর্তিগুলি ভাস্কর্য ও কারুকার্যে অনবদ্য। মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যোনিপট্টসহ শিবলিঙ্গ, পার্বতী, মহিষমর্দিনী দুর্গা, গণেশ ইত্যাদি। লিপিও পাওয়া গিয়েছিল। লিপি ছিল ১০ম ও ১৩।১৪ খ্রীস্টাব্দের। বুধপুরের মত ওয়ালশ এখান থেকেও তিনটি স্মারকস্তম্ভ পেয়েছিলেন। তাদের গায়ে খোদিত লিপিও পেয়েছিলেন। লিপিটি ছিল ১৩।১৪ খ্রীস্টাব্দের।	
২৩. আড়ষা আড়ষা	আড়ষা গ্রামে দালান মন্দিরে রক্ষিত একটি লোকেশ্বর বিষ্ণু-মূর্তি, মাথায় সপ্ত নাগের ফণা,	পুরুলিয়া আড়ষা পাকা সড়কে ৫৫ কি. মি.

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	চতুর্ভুর্জ। একটি কুলগাছের নিচে রক্ষিত মহাবীরের মূর্তি। দুটি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।	
২৪. জৈদা আড়ষা	মন্দির ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে।	
২৫. বামুনডিহা আড়ষা	ইটের তৈরি প্রায় বিধ্বংস মন্দির। কাঁসাইনদীর গর্ভে ভেঙ্গে পড়েছে।	
২৬. বাগমুণ্ডি বাগমুণ্ডি	বড় গ্রাম, লোক সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। বাগমুণ্ডি থানা ও ব্লকের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। রাজবাড়ির চত্বরে আটচালা রাধা-গোবিন্দ মন্দির (১৭৩৩ খ্রী) আছে। দেয়ালে টেরাকোটার অলংকরণ। পঞ্চরত্ন শিবের মন্দির আছে একটি। আটকোনা রাসমঞ্চ (৩'৫"×৪'৯") আছে। চার-দিকে টেরাকোটার অলংকরণ। অনুরূপ রাসমঞ্চ দেখা যায় ধানবাদের ডুমরা, বাঁকুড়ার সোনামুখী, অযোধ্যা, রাজগ্রাম, কৃষ্ণনগর ও বেলিয়াতোড়ে। নির্মাণকাল ১৯ খ্রীস্টাব্দ।	
২৭. অযোধ্যা পাহাড় বাগমুণ্ডি	পূর্বে আড়ষা, পশ্চিমে বাগমুণ্ডি, দুই থানার মাঝখানে উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত অযোধ্যা বা বাগমুণ্ডি পাহাড়। পাহাড়ে প্রায় এক হাজার অধিবাসীর	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	বসবাস। পাহাড়ের মাথায় ছোট বড় ক'টি গ্রাম আছে। অধিকাংশ সাঁওতাল বা মাহাত গ্রাম। সাঁওতাল গ্রামই বেশি। বাগমুণ্ডি থানা থেকে যে আঁকাবাঁকা পথটি পাহাড়ে উঠে গেছে, তার পাশে দুটি সুন্দর ঝরণা আছে। পাহাড়ের পাদদেশে তৈরি হয়েছে ঠুড়গা সেচ প্রকল্প, বাংলো প্রভৃতি। সাঁওতালদের প্রসিদ্ধ শিকার উৎসব বা দিশম সেন্দ্রা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর অযোধ্যা পাহাড়ে। পাহারচূড়াটির গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মি. বা ২০০০ ফুট।	
২৮. চোড়দা বা চাঁড়দা বাগমুণ্ডি	ছোট গ্রাম, অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ছো-নাচের মুখোস তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। মুখোস তৈরি করেন এমন পরিবারের সংখ্যা ৪০। বাগমুণ্ডির রাজা ছিলেন ছো-নাচের পৃষ্ঠপোষক।	বাগমুণ্ডি থেকে ৩ কি. মি। বাগমুণ্ডিতে বাংলো আছে।
২৯. দেউলি বাগমুণ্ডি	ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা প্রায় ন'শো। করম গাছের নিচে বেগলার এক গুচ্ছ পাথরের মন্দির দেখেছিলেন। মন্দিরগুলি তখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। তিন ফুট উঁচু জৈন তীর্থংকরের মূর্তি ছিল, স্থানীয় লোকে বলত এঁড়ুনাথ। গ্রাম থেকে ৫০০	পুরুলিয়া থেকে ৭২ কি. মি.। সুইসার কাছে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	ফুট দূরে দুটি পুকুর ছিল, নাম জোড়া পুকুর। রিলিফে সেখানে একটি গজারূঢ় মূর্তি ছিল।	
৩০. সুইসা বাগমুণ্ডি	বড় গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। গ্রামে অনেকগুলি মূর্তি রক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দুর্গা, বিষ্ণু, শিবলিঙ্গ, এবং জৈন মূর্তি। গ্রামের মধ্যে ভূমিজদের একটি প্রাচীন কবরক্ষেত্রে আছে। সেখানে ১ থেকে ৪ ফুট উঁচু বহু স্তম্ভ পোঁতা ছিল, এখনও কিছু আছে।	দেউলির কাছে।
৩১. জয়পুর জয়পুর	বড় গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর। জয়পুর রাজ পরিবারের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। রাজবাড়ি ও রাজপরিবারের তৈরি অসমাপ্ত পাথর-দালান অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু।	
৩২. ঝালদা ঝালদা	মিউনিসিপ্যাল সহর। থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর। লোকসংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। ঝালদা রাজ পরিবারের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা সহরটি ছবির মত সুন্দর। জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। স্বল্প-কালীন অবকাশ কাটাবার জন্য	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	মনোরম। সহরের উত্তর দিকে শিবের মন্দির আছে। সেখানে কিংবদন্তিখ্যাত প্রস্তরীভূত কপিলা-গাইয়ের চিহ্ন নাকি বিদ্যমান। পঞ্চকোট রাজ-পরিবারের আদি পুরুষ অনন্তলাল নাকি কপিলা গাইয়ের দুধের ধারায় পালিত হয়েছিলেন। সহরের মধ্যে ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়ের শীর্ষদেশ পরিণত হয়েছে পার্কে। মিউনি-সিপ্যালিটি কর্তৃক পার্কটি উদ্বোধন করা হয়েছিল ২০ অকটোবর ১৯৭৩। ঝালদা একসময় লাক্ষা শিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। শিল্পটি বর্তমানে অবনতির মুখে। কাটলারি ও আগর শিল্প এখন প্রসিদ্ধ। সহর ও গ্রামের মধ্যে সীমারেখা টেনেছে শাল-ডোহা নদী।	
৩৩. তুলিন ঝালদা	বড় গ্রাম। লোকসংখ্যা ছয় হাজারের ওপর। ঝালদা-রাঁচি রোডের ওপর অবস্থিত। তুলিনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। নদীর তীরে পোষ পার্বণের দিনে বিরাট মেলা বসে। এখানকার তপোবন পার্ক অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান।	সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। বাস ও ট্রেনে যাওয়া যায়।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
৩৪. বরাবাজার বরাবাজার	বড় গ্রাম, লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার। থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর। বরাহবাজার রাজ-পরিবারের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। মানবাজার থেকে স্থানান্তরিত হবার পর ১৮৮০-১৮৯৮ পর্যন্ত মুনসেফ আদালতের অবস্থিতি ছিল। রাজ পরিবারের দেবাঙ্গনে কটি মন্দির ও বিগ্রহ আছে। আটকোনা রাসমঞ্চ আছে একটি। রাসমঞ্চে লিপিও আছে। রাজ-বাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জরাজীর্ণ মন্দিরের সামনে ক'টি জৈন তীর্থংকর মূর্তি রক্ষিত আছে। ইঁদ-পুজো উপলক্ষে প্রতি বছর বড় মেলা বসে।	বরাভূম রেল স্টেশন থেকে ১৯ কি. মি.। বাসেও যাওয়া যায়।
৩৫. বড়াঙ্গা বরাবাজার	আটচালা ইঁটের মন্দির আছে। লিপিও আছে। লিপিটি চুণ দ্বারা এমনভাবে লিপ্ত যে পাঠ করার উপায় নেই। নির্মাতা, গৌরীপ্রসাদ সিংহ হিকিম, রাজাদের একদা অসি-সরবরাহ-কার। মন্দিরটির দেয়ালের গায়ে, খোপে টেরাকোটার মূর্তি ছিল, এখন লুপ্ত হয়েছে। কাছাকাছি পবনপুর কিংবদন্তিখ্যাত ও বরাবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের রাজ-ধানী ছিল বলে কথিত।	বরাবাজার থেকে ২ কি.মি.

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
৩৬. কদমজোড়া বরাবাজার	পাথরের শিব মন্দির ও কিছু পাথরের জৈন ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রক্ষিত আছে।	
৩৭. বলরামপুর বলরামপুর	ছোট সহর, আরবান কমিটি দ্বারা পরিচালিত। লোকসংখ্যা ১৩ হাজার। প্রাচীন জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে-ছিলেন বেগলার। বর্তমানে একটি বড় রেখ দেউল আছে। জৈন তীর্থংকর মূর্তিও ছিল কয়েকটি। লাক্ষাশিল্পের বড় কেন্দ্র ছিল একসময়। এখনও কয়েকটি কারখানা আছে। থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর।	কলকাতা থেকে ৩৫৭ কি. মি. পুরুলিয়া থেকে ৩২ কি. মি.। ট্রেন ও বাসে যাওয়া যায়।
রঘুনাথপুর মহকুমা		
৩৮. রঘুনাথপুর রঘুনাথপুর	মিউনিসিপাল সহর। লোক-সংখ্যা তেরো হাজার। আগে ছিল রেসিডেনট ম্যাজিস্ট্রেটের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। বর্তমানে অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের দপ্তর আছে। এছাড়া থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর। তসর ও তাঁত বস্ত্র বয়নের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল একসময়। সহরের বিভিন্ন পাড়ায় বহু মন্দির আছে। মন্দিরগুলি বেশিরভাগ ইটের ও আঠারো ও উনিশ শতকে নির্মিত। গঠন-শৈলীতে অভিনবত্ব নেই।	আদ্রা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৫ কি. মি. রঘুনাথপুরের ভেতর দিয়ে অনেক বাস চলে।
৩৯. চেলিয়ামা	অহল্যাবাঈ রোডের ওপর বড়	রঘুনাথপুর থেকে

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
রঘুনাথপুর	গ্রামে। রঘুনাথপুর ২ নং ব্লকের সদর দপ্তর। লোকসংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। গ্রামে টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত একটি মন্দির আছে। সতের খ্রীস্টাব্দে নির্মিত যে অল্প কয়েকটি সুন্দর মন্দির এখনও মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এটি তাদের মধ্যে অন্যতম। নির্মাণকাল ১৬১৯ শকাব্দ বা ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ। বিগ্রহ রাধাবিনোদ। টেরা-কোটার বড় প্যানেলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামরাবণের যুদ্ধ, চণ্ডী ও অন্যান্য মাতৃকা মূর্তি, শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ, বিষ্ণুর অবতার, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি।	১৯ কি. মি, দামোদরের তীরে। ফেরি সার্ভিসে নদী পেরিয়ে অপর পারে গেলে ৫ কি. মি. দূরে সিন্দ্রি (বিহার) সার কারখানা।
৪০. বান্দা রঘুনাথপুর	গ্রামের নাম দেউলঘেরা। ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা ২০০। টাঁড় ও জঙ্গলের মধ্যে পাথরের রেখদেউল। ১৩ বর্গ ফুট ভিত্তি ভূমির ওপর অধিষ্ঠিত, গড়নে ত্রি-রথ। গায়ে অন্যান্য মূর্তির সঙ্গে লতাপাতার অলংকরণ, মধ্য পূর্ব ইসলামিক যুগের স্মৃতিবহ। মহামণ্ডপ বিধ্বস্ত, আটটি বড় বড় পাথরের পিলার পড়ে আছে।	চেলিয়ামা থেকে ১ কি. মি.। রঘুনাথপুর থেকে ১৮ কি. মি.।
৪১. তেলকুপি রঘুনাথপুর	ছোট গ্রাম। লোকসংখ্যা ৩০০। বেগলার যখন দেখেছিলেন	চেলিয়ামা থেকে ৮ কি. মি. উত্তর

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	স্থানটিতে ছোট নাগপুরের মধ্যে সব থেকে সুন্দর ও বেশি সংখ্যায় মন্দির ছিল। কুড়িটি মন্দিরের কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল ইট ও পাথরের ধ্বংসস্তূপের কথা। ব্লক যখন দেখেছিলেন (১৯০২) মন্দিরের সংখ্যা ছিল ১০টি। বর্তমানে মাত্র দুটি মন্দির অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় পাঁচেট জলধারের মধ্যে বিদ্যমান। তৈলকম্প রাজ্যের একদা রাজধানী তেলকুপির অবস্থিতি দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে। বিহার উড়িষ্যার মধ্যে সংযোগকারী বাণিজ্য সড়কটির মধ্যে প্রতিবিঘ্নে দামোদর নদ পার পার হতে হত তেলকুপিতে। যেসব মন্দির ছিল ১৯৬০ সালে আর্কিওলজিকাল দপ্তর তাদের ছবি নিয়েছিলেন। ছবি অনুসারে দেখা যায় অনেকগুলি মন্দিরের সঙ্গে বান্দার মন্দিরের সাদৃশ্য ছিল।	পূর্বে। দামোদর ও পাঁচেট ড্যামের গর্ভে নিমজ্জিত।
৪২. গুরুডি রঘুনাথপুর	ছোট গ্রাম। গ্রামের উপান্তে একটি ঘরে কাছাকাছি পাওয়া অনেকগুলি মূর্তি রক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পার্শ্বনাথের দুটি মূর্তি, ঋষভনাথের দুটি মূর্তি,	তেলকুপি থেকে ১½ কি মি., দামোদর নদের তীরে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	অম্বিকা ইত্যাদি। কাছাকাছি টালির একটি ঘরে আছে কটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি। গুরুড়ির কাছে লালপুর গ্রাম। সেখানে একটি বটগাছের নিচে রক্ষিত আছে অম্বিকাও জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি প্রভৃতি।	
৪৩. আজকোদা রঘুনাথপুর	বড় গ্রাম। গ্রামে কয়েকটি বাংলা ধাঁচের টেরাকোটার মন্দির আছে। বড় মন্দিরটি মাধবানন্দ স্বামী কর্তৃক নির্মিত বলে জনশ্রুতি। মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার্চনার জন্য কাশীপুরের রাজা পাঁচটি মৌজা দান করেছিলেন। বাউরিপাড়ায় একটি চালাঘরে ধর্মরাজ আছেন। গোলাকার কৌটোর মত ধর্মরাজের আকৃতি।	রঘুনাথপুর থেকে চেলিয়ামা রাস্তায় ৮ কি. মি.
৪৪. বুঁদলা রঘুনাথপুর	বরাকর রোডের কাছে ছোট গ্রাম। ধ্বংসাবশেষ আছে মন্দিরের। শ্লেট পাথরে বিষ্ণুমূর্তি ও শিবলিঙ্গ বটগাছের নিচে অযত্নে রক্ষিত।	রঘুনাথপুর থেকে ২ কি. মি.।
৪৫. শাঁকা রঘুনাথপুর	বড় গ্রাম। জনসংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইঁটের আটচালা মন্দির আছে, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। জৈন মূর্তি আছে কয়েকটি। তাদের মধ্যে মহাবীরের মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য।	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
৪৬. মঙ্গলদা রঘুনাথপুর	একদা সমৃদ্ধ গ্রাম। কয়েকটি টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত মন্দির ছিল। দুটি ছিল নেপাল কর্মকারের বাড়ির ভেতর, ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। একটি ছিল অমূল্যরতন গোস্বামীর বাড়ি, সেটিও ভাঙ্গা হয়েছে।	
৪৭. কুলসড়া রঘুনাথপুর	মাঝারি গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছ'শো। মাঠের মধ্যে নৃসিংহ মূর্তি অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে একটি। জনশ্রুতি, একটি কূপের মধ্যে অনেকগুলি মূর্তি একসময় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের ভেতর, কর্মালিয়া পুকুরের পাড়ে, তেঁতুল গাছের নিচে আছে হরপার্বতী, ও ভাঙ্গা গন্ধর্ব মূর্তি। দুটিই অযত্নে রক্ষিত।	রঘুনাথপুর থেকে ৫ কি. মি.।
৪৮. সিমরা, সাগরকা, রঘুনাথপুর	রঘুনাথপুর চেলিয়ামা রাস্তায় পড়ে গ্রাম দুটি। দুটি গ্রামেই কিছু জৈন মূর্তি রক্ষিত আছে।	
৪৯. বেড়ো রঘুনাথপুর	বড় গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। কাশীপুরের রাজাদের গুরু বংশের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। মন্দির চত্বরের মধ্যে একটি জীর্ণ জোড়বাংলা মন্দির আছে, সেটির নির্মাণকাল সম্ভবত সতের শতকের শেষ কি আঠারো	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	শতকের প্রথম দিক। এছাড়া বড় একটি রঘুনাথজীর মন্দির আছে! চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে গ্রামটি অবস্থিত।	
৫০. কাশীপুর কাশীপুর	বড় গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় দু'হাজার। থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর। পাঁচেট রাজ পরিবারের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। রাজবাড়ি বা প্রাসাদ দ্রষ্টব্য বস্তু। কাশীপুরের রাজপরিবার ভাদু উৎসবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ফলে একসময় আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত ভাদু উৎসব। দুর্গাপূজাও হত আড়ম্বরের সংগে। রাজবাড়ি ঢোকার মুখে একটি সাম্প্রতিককালের মন্দির আছে। তাতে কটি পাথর ও ধাতব মূর্তি আছে। রাজবাড়ির সংগে কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিংহ দেব ও পরবর্তী রাজাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। গ্রামটি ক্ষয়িষ্ণু।	আদ্রা থেকে ৮ কি.মি.। বাস চলে। বাংলো আছে।
৫১. ক্রোশজুড়ি কাশীপুর	ছোট গ্রাম। লোকসংখ্যা এক হাজারের কম। এখানকার পাথরের মন্দিরটি জেলায় পাথরের মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। কেউ কেউ সেটিকে সপ্তম খ্রীস্টাব্দের বলে অনুমান করেন। কারও মতে বারো শতকের সমসাময়িক। প্রতিষ্ঠি	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	দরজার চৌকাঠে গঙ্গা, যমুনা ও দুটি করে চতুর্ভুজ দ্বারপাল খোদিত। বিরাট শিবলিঙ্গ, দুর্গা, দশভুজ শিব, চতুর্ভুজ কালী প্রভৃতি মূর্তি আছে। কিছু দূরে আছে দুটি ইঁটের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।	
৫২. আদ্রা কাশীপুর	স্টেশন কমিটি দ্বারা পরিচালিত ছোট সহর। লোকসংখ্যা ১৮, ৮৩৮। সহরটির উদ্ভব ঘটেছিল ১৯০৩ সালে গোমো—খড়্গপুর রেল শাখাটি চালু হলে। পুরুলিয়া সহরের মত পানীয় জল যোগানের জন্য এখানেও একটি সাহেব-বাঁধ আছে। ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ গ্যালন জল সংরক্ষিত থাকে। এখানে কয়েকটি সুদৃশ্য চার্চ আছে। তাদের মধ্যে গঠন-সৌকর্যের দিক থেকে সাউদার্ন চার্চটি উল্লেখযোগ্য।	কলকাতা থেকে রেলপথে ২৮৩ কি. মি. পুরুলিয়া থেকে ৩৮ কি. মি.।
৫৩. পাড়া পাড়া	বড় গ্রাম। লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারের ওপর। গ্রামের পূব দিকে দুটি প্রাক্-মুসলমান যুগের মন্দির আছে। একটি পাথরের, অপরটি ইঁটের। ইঁটের মন্দিরটির গঠন শৈলী দেউলঘাটের ইঁটের মন্দিরগুলির কথা স্মরণ করিয়ে	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	দেয়। মন্দিরটির উপরিভাগ ভেঙে পড়েছিল। পাথরের মন্দিরটি ইঁটের মন্দিরটির মত অত উঁচু নয়। দেয়ালে বেলে-পাথরের ওপর সুন্দর অলংকরণ আছে। মন্দিরটি বরাকরের পাথরের মন্দিরগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরের উপরিভাগ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। ইঁটের মন্দিরটিতে দশভূজা দুর্গার মূর্তি দেখেছিলেন বেগলার ও ব্লক। পাথরের মন্দিরটিতে কালো পাথরের গজলক্ষ্মী দেখেছিলেন বেগলার। দুটি মূর্তিই অন্তর্হিত। গ্রামের অপর প্রান্তে পাথরের আর একটি মন্দির আছে। সেটি রাধারমন মন্দির নামে পরিচিত। মানসিংহের সময় পুরুষোত্তম দাস মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। গ্রামের মধ্যে অপর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মূর্তিও আছে কিছু। তাদের মধ্যে গরুড় আরূঢ় ভাঙগা বিষ্ণুমূর্তি ও একটি বহুভুজ মূর্তি উল্লেখযোগ্য।	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
৫৪. দেউলভিড়্যা পাড়া	ছোট গ্রাম। গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে। একটি ধ্বংসস্তূপের ভেতর বহু শিবলিঙ্গ আছে দেখা যায়। শিবলিঙ্গগুলি সংখ্যায় এত বেশী এবং এত কাছাকাছি রক্ষিত যে মনে হয় বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত লিঙ্গগুলি এখানে জড়ো করা হয়েছিল। অথবা শৈব-সন্ন্যাসীদের এটি সমাধিক্ষেত্র ছিল। ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি একটি কাঁচা ঘরে কটি সুন্দর পাথরের মূর্তি রক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে তিনটি হরপার্বতীর মূর্তি রালিবেড়্যার অনুরূপ, চতুর্ভুজ গণেশ জননী, কয়েকটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি ও গায়ত্রী মূর্তি ও লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি উল্লেখযোগ্য। গায়ত্রী মূর্তিটি চতুর্ভুজ। গলায় উপবীত, নিচের ডান হাত ছড়ানো, প্রসারিত করতল, অপর হাতে অক্ষসূত্র। বাঁদিকের একহাতে কমণ্ডুল, অপর হাতে চক্র। গায়ত্রী মূর্তিটি, কারুকার্য ও ভাস্কর্যে অপরূপ।	
৫৫. ভজুডি সাঁওতালডি	ভজুডি কয়লা ধোতাগারকে কেন্দ্র করে একটি সহর এলাকা দ্রুত গড়ে উঠতে চলেছে। কোল	সাঁওতালডি থারমাল প্ল্যানট থেকে ৩ কি. মি.

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	ওয়াশারি বা কয়লা ধোতাগারের কাজ সুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালে। উৎপাদন সুরু হয়েছিল ১৯৬২। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উপযুক্ত মানের মেটালারজিকাল কয়লার জন্য হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড কর্তৃক ওয়াশারিটি স্থাপিত হয়েছিল। প্রতি ঘণ্টায় ৫০০ টন কয়লার ব্যবস্থা নেবার মত ক্ষমতা আছে, ৪০০ টন ধৌত হয়, ১০০ টন বাতিল হয়। ধৌত কয়লা টাটা আয়রণ এনড স্টীল কোং এবং রাউরকেল্লা স্টীল প্ল্যানটে চলে যায়। ভজুডি সহর এলাকার আয়তন ৫৪৭·৮৫ একর। সহর হিসাবে স্বীকৃত হয়নি এখনও।	
৫৬. সাঁওতালডি সাঁওতালডি	রঘুনাথপুর থানার ভেতর সাঁওতালডি ছিল ছোট গ্রাম। ১৯৬৬ সালে প্ল্যানিং কমিশন চারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট পত্তন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। প্রতিটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উপাদন ক্ষমতা হবে ১২০ মেগাওয়াট। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুটি ইউনিট তৈরির তোড়জোড় সুরু হয়ে যায়। ১৯৭০ সালে রাজ্য সরকার বাকি দুটি ইউনিটের	পুরুলিয়া থেকে ৪৮ কি. মি. আদ্রা-গোমো শাখার রেলস্টেশন। থারমাল প্ল্যানটের বাংলো আছে।

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	কাজ সুরু করে। মোট ১২৫০ একর জমি সাঁওতালডি থারমাল প্লানটের জন্য অধিগৃহীত হয়েছিল। তার ভেতর ৬২০ একর পাওয়ার ষ্টেশনের জন্য, ২৮০ একর ছাই গাদার জন্য এবং ৩৫০ একর সহরাঞ্চলের জন্য। সহর ও প্লানটের জন্য জল পাওয়া যায় দামোদর ও দামোরের শাখানদী গোয়রি থেকে। আসানসোল প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন কৃষি ও শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। সাঁওতালডি সে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আসানসোলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে সাঁওতালডিকে সংযুক্ত করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে।	
৫৭. গড় পঞ্চকোট নেতুরিয়া	পাঁচেট পাহাড়ের দক্ষিণ সানুদেশে পঞ্চকোট রাজাদের গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মির্জা নাথানের বাহারি-স্তান-ঘায়েবিতে (১৭ শতক) গড়টির উল্লেখ আছে। বেগলার দুটি খোদিত লিপি দেখেছিলেন। একটিতে শ্রীবীর হাম্বিরের নাম ছিল, সময়কাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। গড়ের ভেতরকার মন্দিরগুলির	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	অবস্থা জরাজীর্ণ। দুটি পরিণত ধ্বংসস্তূপে। একটি লাটেরাইটের, পাহাড়ের ওপরে রঘুনাথমন্দিরের অনুরূপ। দুটি টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত ইটের পঞ্চরত্ন মন্দির। টেরাকোটার অলংকরণ এবং ইটের চেহারা দেখে ম্যাককাচ্চান অনুমান করেছিলেন সেগুলি প্রাক্-মুসলমান যুগের। পশ্চিম দিকে আর একটা মন্দিরে টেরাকোটার অলংকরণ আরও বেশি ছিল। সে মন্দিরটির একটি দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আর একটি টেরাকোটায় সুসজ্জিত মন্দির আছে। জোড়বাংলা ধাঁচের মন্দিরও আছে দুটি। মন্দিরগুলি বিগ্রহ হীন। বিগ্রহের নামে ছিল মন্দিরগুলির নাম। যেমন বিষ্ণুপুরে। যথা, শ্যামচাঁদ, রাধারমন, রাধাশ্যাম, মদনমোহন, মদনগোপাল প্রভৃতি। পঞ্চকোটের রাজারা বিগ্রহগুলি তাদের কাশীপুরের ঠাকুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাশীপুরের রাজাদের কুলদেবী রাজেশ্বরী মাতা। প্রকৃতপক্ষে কালী।	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতের উপায় ও বিশ্রামস্থল
	পঞ্চকোট বা পাঁচেট পাহাড়টিও দ্রষ্টব্য বস্তু। লম্বায় ৫ কি. মি সাগরাঙ্ক থেকে উচ্চতা ২৩৪ মিটার। গড় পঞ্চকোট গ্রামটি ছোট। লোকসংখ্যা এক হাজারের কম।	
৫৮. বিরিঞ্চিনাথ নেতুরিয়া	পাঁচট পাহাড়ের দক্ষিণ সানুদেশে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মন্দিরের বিভিন্ন অংশের প্রস্তরখণ্ড পরিকীর্ণ। পাথরের টুকরোগুলি দেখলে মনে হয় মন্দিরটি ছিল পাথরের রেখ দেউল। নন্দী, লিঙ্গ, আমলক প্রভৃতি এখনও পড়ে আছে। পুরনো স্তম্ভের ওপর আধুনিক মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। আধুনিক একটি ঘরে মাটির রাধাকৃষ্ণ, ষড়ভুজ ও জগদ্ধাত্রী রক্ষিত আছে।	
৫৯. দেউলি নেতুরিয়া	দামোদরের তীরে, সুন্দর পরি-বেশে, শ্যামলজীর মন্দিরের সামনে অটলানন্দ ও বিটলানন্দ স্বামীর সমাধি আছে।	
৬০. গাঙপুর সাঁতুড়ি	ছোটগ্রাম। লোকসংখ্যা ৫১০। গ্রামের বাইরে পরিত্যক্ত একটি আটচালা মন্দিব আছে। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল, সাব্রাকোন ও তেজপালের মন্দিরগুলির মত গড়ন মন্দিরটির। বরাকরের	

স্থানের নাম ও থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	যাতায়াতউপায় ও বিশ্রামস্থল
	বেলেপাথরে নির্মিত। কাছাকাছি একটি ইটের রাসমঞ্চ ছিল। বিগ্রহ ছিল রঘুনাথ। বিগ্রহটি বর্ধমান জেলায় কুলটি থানার ছোলবালপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে।	
৬১. রামচন্দ্রপুর সাঁতুড়ি	বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম ও চক্ষু চিকিৎসালয়ের জন্য গ্রামটি বিখ্যাত। বড় গ্রাম, লোকসংখ্যা দেড় হাজার। অন্নদাকুমার চক্রবর্তীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনি সন্ন্যাস নেবার পর নাম হয় স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী। আশ্রমটি অসীমানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।	মুরাড়ি ষ্টেশন থেকে ৩ মি. কি. আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা আছে।

পুরুলিয়া ও মানভূমে ঐতিহাসিক সূত্র

১. ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি :

সময়কাল ৬৬৯—৭০ খ্রীষ্টাব্দ : শশাঙ্কের লিপির ৫০ বছর পরে।

১ম. লিপি—শ্রী বল বরাহ

মহা বজ ব (ন) নঃ

অর্থ—একটি নাম। বৃহৎ পদ্মবনের বলবান বরাহ (স্বরূপ)।

২য় লিপি—গ ম র র ল

পাঠ—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৮/২.

২. (ক) বোড়াম বা দেউলঘাটে প্রাপ্ত শিলালিপি

সময়কাল—নবম/দশম খ্রীস্টাব্দ

লিপি—ব, ক, পাঠ—বেগলার

(খ) বোড়াম বা দেউলঘাটে স্মারকস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি

সময়কাল—তেরো—চোদ্দ খ্রীস্টাব্দে। ভাষা—অশুদ্ধ সংস্কৃত

লিপি : ১ম লাইন—শ্রী—রুদ্র—শিশু যুয়রাজ :

২য় লাইন—বলী—অক্ষয় চ ত্রিভুব

৩য় লাইন—ন—অধিপতি ॥ বলী

৪র্থ লাইন—অক্ষয় চ সিংহাসন

৫ম লাইন—চক্রবর্তী ॥

অর্থ—ত্রিভুবনের অধীশ্বর, প্রতাপশালী, অক্ষয়, খ্যাতিমান রুদ্রের পুত্র, যুবরাজ। প্রতাপশালী ও অক্ষয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নৃপতি।

পাঠ—ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। JBORS, VOL-IX, Pt III, IV

৩. (ক) বুধপুরের লিপি, সতীস্তম্ভ ও বীরস্তম্ভে উৎকীর্ণ

সময়কাল – দশম খ্রীষ্টাব্দ

লিপি—১. রাজ—পুত্র শ্রী বড়ধুগ (বা চড়ধুগ)

২. রাজ—পুত্র শ্রী আতন্দ্রী চন্দ্র

পাঠ—Patna Museum Cotalogue of Antiquities, edited by Parameshwarlal Gupta, 1965.

(খ) সীমানা—স্তম্ভে উৎকীর্ণ ঃ প্রাপ্তিস্থান, বুধপুর

সময়কাল—১১ খ্রীস্টাব্দ

লিপি—রড়ম বড়ম পণ্ড (T) দ্রিশ্বর সীমা ধ জীব

ইয়ে ন ব রস অই

অর্থ—পণ্ড-অদ্রি (পর্বত) অধীশ্বরের সীমান্ত নিশানা,

কেউ যেন খর্ব না করে।

পাঠ—Patna Museum Catalogue of Antiquities.

৪. (ক) তৈলকম্প ঃ রামচরিতম—সন্ধ্যাকর নন্দী

সময়কাল –১০৭০—১১২০ খ্রীস্টাব্দ

শ্লোক—বন্দ্যগুণ—সিংহবিক্রম শূরশিখর—ভাস্করপ্রতাপৈ—স্তৈঃ।

স মহাবলৈ –রুপেতো জেতু জগতী—মলম্ভূষ্ণু ।।

অর্থ—তিনি (রামপাল) এইসব যোদ্ধৃবর্গের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পৃথিবী বিজয়ের সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন। এরা ছিলেন বন্দ্য (ভীমযশ), গুণ (বীরগুণ), সিংহ (জয়সিংহ), বিক্রম (বিক্রমরাজা), শূর (লক্ষ্মীশূর), শিখর (রুদ্রশিখর), ভাস্কর (ময়গলসিংহ) এবং প্রতাপ (প্রতাপসিংহ)।

পাঠ—রাধাগোবিন্দ বসাক।

(খ) তৈলকম্প ঃ রামচরিতম. টিকা।

সময়কাল—১০৭০—১১২০ খ্রীস্টাব্দ

শ্লোক—শিখর ইতি সমরপরিসর বিসরদরিরাজ রাজিগণ্ড গর্ব গহন

দহন দাবানল স্তৈলকম্পীয় কল্পতরু রুদ্রশিখর।

অর্থ—শিখর অর্থাৎ যুদ্ধে যার (প্রভাব) নদী পর্বত ও উপান্তভূমি জুড়ে বিস্তীর্ণ, পর্বত কন্দরের রাজবর্গের (বা স্লেচ্ছ জাতিবিশেষের) যিনি দর্প দহনকারী দাবানলের মত, (সেই) তৈলকম্পের কল্পতরু রুদ্রশিখর।

পাঠ—ড. রাধাগোবিন্দ বসাক

৫. পঞ্চকোট গড়ে তোরণের ওপর উৎকীর্ণ লিপি ঃ
দুয়ারবন্ধ ও খড়িবাড়ি তোরণ ঃ (দুটি লিপি)
সময়কাল—১৬৫৭ বা ১৬৫৯ সংবৎ—১৬০০ খ্রীস্টাব্দ
লিপি—৬ লাইনে, বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ।
লিপির উল্লেখমাত্র আছে। লিপির বিষয়বস্তু আংশিক জ্ঞাত।
নাম উল্লেখ—শ্রী বীর হামির
উৎস—Report of a Tour in the Bengal Provinces, 1872-73 by J.D. Beglar.

৬. গোলমারায় পাথরের স্ল্যাবে উৎকীর্ণ
সময়কাল—১১—১২ খ্রীস্টাব্দ
লিপি—শ্রী দনপতি সাধকস্য
পাঠ—শ্রী অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ JBORS, pt I, 1919.

৭. ছোট রেখদেউলের পা-ভাগে উৎকীর্ণ
প্রাপ্তিস্থান—পলমা, সময়কাল—১১ খ্রীস্টাব্দ
লিপি—দানপতি অনীস্যুম
পাঠ—ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।

৮. কেলাহি লিপি ঃ পাথরের বোলডারে উৎকীর্ণ
সময়কাল—১৩-১৪ খ্রীস্টাব্দ
লিপি—পণ্ডিতাবধূত শ্রীমিত্র যোগী পদেন গুহকৃত।
পাঠ—ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।

৯. পাড়ায় উৎকীর্ণ লিপি ঃ
(ক) ষড়ভুজ সিংহবাহিনী মূর্তিতে উৎকীর্ণ।
সময়কাল—অনির্ণীত
লিপি—শ্রী বেনাবাসিনী শ্রী চর…
পাঠ—জে. ডি. বেগলার
(খ) রঘুনাথ মন্দিরে দরজার চৌকাঠে (পাথর) উৎকীর্ণ
সময়কাল—অনির্ণীত, লিপি—অপঠিত।

১০. জৈন তীর্থংকর মূর্তিতে উৎকীর্ণ
প্রাপ্তিস্থান—ভবানীপুর। সময়কাল—অনির্ণীত।
লিপি—দানপতি…

পাঠ—ড দীনেশচন্দ্র সরকার।

১১. চাণ্ডিলে পাওয়া উৎকীর্ণ লিপি ঃ

(ক) প্রাপ্তিস্থান—জৈদা।

সময়কাল—৮—৯ খ্রীস্টাব্দ।

লিপি—(১) শ্রী—ভগবত্যা (ম) ত্রৈলোক্যবিজয়ম দাম্পপ (হ) শ (স) তত (ম) ভক্তি-ভাবে তিষ্ঠাত না (ম)—শরণম

(২) প্র (ত্যক্ষ) জিত—অঞ্জলিম—অষ্টাঙ্গ শিরসা যোজ্যা পট (ম) প্রণমামি!

ভোগুলাস্য শু (সু) তা—দামপ্পিনা

(৩) দেবকুল (ম) স্থাপিতম।

পাঠ—ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।

(খ) প্রাপ্তিস্থান—জৈদা ঃ সময়কাল—১০ খ্রীস্টাব্দ

লিপি—দেবকুল স্থাপিত

পাঠ—ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।

১২. বরাবাজার রাসমঞ্চে উৎকীর্ণ লিপি

সময়কাল—১৬৭১ শকাব্দ=১৭৪৯ খ্রী, মতান্তরে ১৭৬১ শকাব্দ =১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ

লিপি—'৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

শাকে ভূমিরসাকর্পীতিসুধাসংপুরিত হায়নে

ঊর্জায়াং ত (ম) সেধুনা বুধদিনে 'ষ্টম্যাংগতায়াংতিথৌ।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—ঈশ্বরমুদে রাসোৎসবংমন্দিরং

প্রাদাদ্ভপবরো মুদা হরিহরো বারা (ই)-(পু) থুশ্বর ।।

সনাতন মিস্ত্রী ।।

পাঠ—ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।

১৩. অন্যান্য লিপি ঃ

(ক) প্রাপ্তিস্থান—পাকবিড়রা ঃ সময়কাল—অনির্ণীত, লিপি—অপঠিত।

(খ) প্রাপ্তিস্থান—সীমগুণ্ড ঃ সময়কাল—আনর্ণীত, লিপি—অপঠিত।

(গ) প্রাপ্তিস্থান—আনাই ঃ সময়কাল—অনির্ণীত, লিপি—অপঠিত।

(ঘ) প্রাপ্তিস্থান—বারুইডি ঃ সময়কাল—অনর্ণীত, লিপি—অপঠিত।

(ঙ) প্রাপ্তিস্থান—কড়চা ঃ সময়কাল—অনির্ণীত, লিপি—অপঠিত।

১৪. ইংরাজী ১৭৭৩ খ্রী (বাং ১১৮০) পুরীর রথযাত্রা উপলক্ষে গিয়ে,

রঘুনাথনারায়ণ (মনিলাল) পান্ডাকে যে সনন্দ দিয়েছিলেন :

শ্রীশ্রী সীতারামজী

জাত ঔরস জগত দেবকা আওলাদ লিখিতং মোহর

মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী রঘুনাথ নারায়ণ দেব পিতা

৺ভীখমলাল, পিতামহ ৺গরুঢ়নারায়ণ, পুত্র শ্রীশ্রী ভারতশেখর দেব ও শ্রীশ্রী ভীমলাল দেব, রাজ পান্ডাকে আমার বংশে যে কেহ আসিবে সে সম্ভালেকে পুরোহিত করিবে। ইতি সন ১১৮০ নিজ সন ২৭ সাতাইস, ২রা আষাঢ় নবমী তিথি কৃষ্ণপক্ষ ইতি।

১৫. ইংরাজী ১৯০৯ খ্রী (বাং ১৩১৬) পুরুলিয়ার গালা কুঠিতে যারা কাজ করতেন তাদের মুচলেকা বা বন্ড দিতে হত। অনুরূপ একটি মুচলেকার কিছু অংশ।

"মহামহিম শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দত্ত পিতা *মহাভারৎ দত্ত

জাতি তামুলী পেশা ব্যবসাদি হাংসাং পুরুলিয়া পং ছড়রা

মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী অরদা থান্দার পিতা *গোপাল থান্দার জাতি থান্দার পেশা চাকুরী সাংসোনামুখি পং বিষ্ণুপুর হাংসাং পুরুলিয়া পং ছড়রা কস্য এগ্রিমেন্ট পত্র মিদং কার্যঞ্চাগে এই যে আমি মহাশয়ের অত্র পুরুলিয়ার গালাকুটিতে অদ্য হইতে দুই বৎসর কাল পর্যন্ত মহাশয়ের অধীনে গলিন্দারের কার্য করিবার জন্য এই এগ্রিমেন্ট লিখিয়া দিয়া অঙ্গিকার করিতেছি যে অদ্য হইতে উক্ত ম্যাদ কাল পর্যন্ত মহাশয়ের গালাকুটী ব্যতিত অপর কোন গালাকুটী বা অন্য কোন কলকারখানায় আমি স্বয়ং অথবা অপরের অধীনে কোন প্রকার কার্য্য করিতে পারিব না ও করিব না যদি উক্ত সময় মধ্যে আপনার বিনা অনুমতিতে অন্য স্থানে কোন রূপ কার্য্য করা প্রকাশ হয় অথবা সর্ব সাধারণ গালন্দায় মজুরগণের ন্যায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে যথানিয়মে মহাশয়ের কুটীতে হাজির না হইয়া কার্য্য নাকরি কিম্বা আমার কার্য্যের শৈথিল্যে আপনার কোনরূপ হানি হয় তাহা হইলে সন ১৮৫৯ সালের ১৩ আইনের বিধানমত দন্ডনীয় হইব এবং মহাশয়ের নিকট ২৫, পঁচিশ টাকার ক্ষতির দায়ি হইব এবং উক্ত টাকা আমার অপরাপর স্থাবর সম্পত্তি ও শরীর হইতে আদায় হইবেক...... আপনখুশিতে বিনানুরোধে শুদ্ধান্তঃ করণে এই এগ্রিমেন্ট পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৩১৬/২৫শে ফাল্গুন

পুরুলিয়া জেলায় সহরাঞ্চল

	নাম	এলাকা (বর্গ কিলোমিটার)	সহরের প্রকৃতি	লোকসংখ্যা (১৯৭১)
১.	পুরুলিয়া সহর	১৩.৯	মিউনিসিপ্যালিটি (১৮৭৬)	৫৭,৭০৮
২.	রঘুনাথপুর	১২.৯৫	মিউ (১৮৮৮)	১২,৭২১
৩.	ঝালদা	৩.৮৮	মিউ (১৮৮৬)	১১,৭৪৭
৪.	আদ্রা	৩.২৪	স্টেশন কমিটি (১৯৪১)	১৮,৮৩৮
৫.	বলরামপুর	৯.৫১	ইউনিয়ন কমিটি (১৯৪১)	১২,৯৫৭
৬.	আড়রা	৮.৬৪	সেনসাস সহর (১৯৭১)	১২,৬৪২
৭.	চাপারী	২.৮৭	সেনসাস সহর (১৯৭১)	৫,৭৫৪

পাবলিক হল ও অডিটোরিয়াম

	নাম	কাদের দ্বারা পরিচালিত	আসনসংখ্যা
১.	রবীন্দ্রভবন পুরুলিয়া সহর	ম্যানেজিং কমিটি চেয়ারম্যান, ডি. সি. পুরুলিয়া	৬০০
২.	পশুপতি-গঙ্গাধর সংগীত বিদ্যালয় (১৯৩৯) পুরুলিয়া সহর	পরিচালক মণ্ডলী	৩০০
৩.	গভঃ গার্লস হাই স্কুল, পুরুলিয়া সহর	স্কুলের গভর্নিং বডি	৩০০
৪.	রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পুরুলিয়া সহর	সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন	৬০০
৫.	নর্থ ইনসটিটিউট (১৯১৯) আদ্রা সহর	রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আদ্রা, পুরুলিয়া	৪০০
৬.	হরিপদ সাহিত্য মন্দির (১৯২১), পুরুলিয়া সহর	পরিচালক মণ্ডলী	৩০০

উৎস : ১. Census of India, 1971, West Bengal, Series 22, Part 11A, General Population Tables.

২. Census 1961, West Bengal, District Census Handbook, Purulia.

পুরুলিয়ার প্রাচীন রাজা ও জমিদার বংশ

মানভূম জেলা যখন গঠিত হয়েছিল ৪৫টি পরগণা ছিল জেলাটির অন্তর্ভুক্ত। পাঁচেট জমিদারীর অধীন ছিল ১৯টি পরগণা, বাকি ২৬টি পরগণা ছিল পাঁচেট জমিদারীর বহিভূ‍ত। অধিকাংশ পরগণা ছিল ছোট বা বড় জমিদার, জোতদার বা তালুকদারের অধীন। যে বংশগুলি একাদিক্রমে দীর্ঘদিন জমিদারীতে সমাসীন ছিলেন, বর্তমান অধ্যায়ে সেইসব বংশগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১. কাশীপুরের রাজ পরিবার—মহারাজা নীলমণি সিংহদেবের সময়েই পাঁচেট রাজ্য জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। নীলমণি সিংহ জমিদারীটির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর (১৮৯৮ খ্রী) সে স্বাতন্ত্র্যও বিলুপ্ত হয়েছিল। জমিদার হয়েছিলেন নীলমণির কনিষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ সিংহ। তিনি ছিলেন মধ্যম রাণীর পুত্র। তখন জমিদারীটি ছিল কোর্ট অব ওয়াডর্সের অধীন। হরিনারায়ণের মৃত্যুর সময় (১৯০১ খ্রী) জ্যোতিঃ প্রসাদের বয়স ছিল আঠারো বছর। ফলে তখনও কোর্ট অব ওয়াডর্সের অধীন ছিল জমিদারীটি। ১৯২১ সালে ইংরাজ সরকার জ্যোতিঃপ্রসাদকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি দান করে। তখন পাঁচেট জমিদারীর আয়তন ছিল ২৭৭৯ বর্গমাইল। ময়ূরভঞ্জের রাজা রামচন্দ্রের বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জ্যোতিঃপ্রসাদের। নানাবিধ দান ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য তার প্রসিদ্ধি ছিল। জ্যোতিঃপ্রসাদের ছিল তিন ছেলে। বড় কল্যাণীপ্রসাদ, মেজ রাজকৃষ্ণ ও ছোট অজিতপ্রসাদ। জ্যোতিঃপ্রসাদের মৃত্যুর পর (১৯৩৮) বড় ছেলে কল্যাণীপ্রসাদ হয়েছিলেন জমিদার। কল্যাণীপ্রসাদেরও ছিল তিন ছেলে, যথাক্রমে শংকরীপ্রসাদ, জগদীশ্বরীপ্রসাদ ও জয়ন্তিপ্রসাদ। পিতার মৃত্যুর পর শংকরীপ্রসাদ জমিদারীর অধিকারী হয়েছিলেন। শংকরীপ্রসাদের সময় কাশীপুরে ভুবনেশ্বরী মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শংকরীপ্রসাদের ছিল দুই

স্ত্রী। দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানাদি ছিল না। প্রথম পত্নীর পুত্র ভুবনেশ্বরীপ্রসাদ হয়েছিলেন কাশীপুরের জমিদার। বর্তমান জমিদার রাজরাজেশ্বরী সিংহদেব থাকেন কলকাতায়।

২. ঝালদার রাজবংশ—কিংবদন্তি অনুসারে পাঁচেট রাজাদের আদিভূমি ছিল ঝালদা। ঝালদাতেই কপিলা পাহাড়ে নাকি পঞ্চকোট রাজপরিবারের আদি পুরুষ অনন্তলাল কপিলা গাইয়ের দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ঝালদার রাজবংশ তালিকা কর্তৃক এই তথ্য সমর্থিত হয় না। জনশ্রুতি অনুসারে ঝালদা রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন বনবীর সিংহ। বনবীর থেকে দ্বাদশ পুরুষ চয়ন সিংহ পর্যন্ত সবাই কিংবদন্তির পুরুষ হিসাবে অনুমিত হয়।

নটবর সিংহ থেকে উত্তরপুরুষদের মোটামুটি হদিস পাওয়া যায়। মি গ্রাণ্টের সমীক্ষায় দেখা যায় ঝালদা পঞ্চকোট জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেটি ঘটেছিল পাঁচেটের রাজা রঘুনাথনারায়ণের সময়েই। অর্থাৎ ১৭৮৭ সালের আগেই পঞ্চকোটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ঝালদা। আঠারো শতকের শেষদিকে ঝালদা ও তার পার্শ্ববর্তী জমিদারীগুলি যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, মেজর ক্রফোর্ড সামরিক শিবিরের সদর দপ্তর করেছিলেন ঝালদায়। ঝালদার এলাকা তখন ছিল ৮২ হাজার একর, খাজনা নির্ধারিত হয়েছিল টা ২৭৮৭।

নটবরের পর ঝালদার জমিদার হয়েছিলেন বিশ্বম্ভর সিংহ। বিশ্বম্ভরের পুত্র হরিহরের সময় সংঘটিত হয়েছিল মহাবিদ্রোহ। তিনি ছিলেন পাঁচেটের রাজা নীলমণি সিংহদেবের সমসাময়িক। হরিহর ছিলেন অপুত্রক। তার মৃত্যুর পর জমিদার হয়েছিলেন সেজভাই কুমার রাধামাধব। রাধামাধবের পুত্র বলরাম হয়েছিলেন পরবর্তী জমিদার। বলরামের পুত্র ছিলেন উদ্ধবচন্দ্র। জমিদার হিসাবে উদ্ধবচন্দ্র ছিলেন দুর্দান্ত। তার সময়েই সত্যকিঙ্কর দত্ত নিহত হয়েছিলেন। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন ঝালদার মানুষ। উদ্ধবের পুত্র অনন্তনারায়ণ হয়েছিলেন পরবর্তী জমিদার। অনন্তনারায়ণের পুত্র অমরনাথ বর্তমান জমিদার।

৩. বেগুনকোদরের জমিদারবংশ—কিংবদন্তি অনুসারে বেগুনকোদর জমিদার বংশের উদ্ভব ঘটেছিল করণ সিংহের সময়। করণ সিংহ থেকে চার পুরুষ, যথাক্রমে দলেল, কোশল, সুর্জুন সিংহ ছিলেন বেগুনকোদরের জমিদার। ঐতিহাসিকক্রমে দেখা যায় ঝালদা জমিদার বংশের একটি শাখা

বেগুনকোদর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাধামাধবের পুত্র বলরাম সিংহের সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল জমিদার বংশটি। বলরামের জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্ধবচন্দ্র ছিলেন ঝালদার জমিদার। অপর এক পুত্র রতন সিংহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বেগুনকোদরের জমিদারী।

প্রকৃতপক্ষে বেগুনকোদর জমিদারীটি ছিল পাঁচেট জায়গীরের অন্তর্গত দিঘওয়ারী তালুক। ঝালদা দিঘওয়ারীর অন্তর্গত ছিল বেগুনকোদর। তালুকের সংখ্যা ছিল আটটি, আয়তন ৮৯৭৩ বিঘা। গ্রাম সর্দার ছিলেন ১১ জন, তাবেদার ২৭ জন। ঝালদা থেকে বেগুনকোদরের দূরত্ব ৯ কিলোমিটার।

রতন সিংহের পর বেগুনকোদরের জমিদার হয়েছিলেন দিগম্বর। তারপর দিগম্বরের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র বংশীবদন ছিলেন মনোনীত পরবর্তী জমিদার। সেজন্য তাকে বলা হত টিকাইত বংশীবদন। জমিদার হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন তিনি। বংশীবদনের পুত্র ছিলেন শম্ভুনাথ সিংহ। কিছুকালের জন্য জমিদার হয়েছিলেন। শম্ভুনাথের সময় বেগুনকোদরের অদ্ভুত রাসমণ্ডটির নির্মাণকার্য সুরু হয়েছিল প্রধানত তার দুই স্ত্রী রাধিকাকুমারী ও লোচনকুমারীর উৎসাহে। অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল রাসমণ্ডটি। বংশীবদনের ভাই হিকিম বিশ্বম্ভর সিংহ দেখাশুনা করতেন জমিদারী। পরে তিনিই হয়েছিলেন জমিদার। বিশ্বম্ভরের পর যথাক্রমে শিবচরণ, বনবিহারী ও প্রতাপনারায়ণ পরবর্তীকালে জমিদার হয়েছিলেন।

৪. বরাহভূম রাজবংশ—অন্যান্য রাজবংশের মত বরাহভূম রাজবংশেও পূর্ব পুরুষদের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। তালিকাটি সুরু হয়েছে নাথ ও কেশ বরাহ থেকে। হরিনাথ ঘোষের আবিষ্কৃত শিলালিপির নিরিখে বরাহ বংশের সূত্রপাত অন্তত সাত খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল মনে হয়। যদিও রাজবংশ তালিকা অনুসারে নাথ বরাহের সময় ২১০ সম্বত (?)। সম্বতটি যদি শকাব্দ বলে ধরা যায় নাথ বরাহের সময় দাঁড়ায় ২৮৮ খ্রীস্টাব্দ। নিঃসন্দেহে সেটি অনৈতিহাসিক। নাথ বরাহ থেকে ৩৩শ তম পুরুষ, শংকর বরাহ দর্প স্বাহা দেব। তার মৃত্যু ঘটেছিল ১২৯৪ শক বা ১৩৭২ খ্রীস্টাব্দে। শংকর থেকে মোটামুটি সময়কাল রক্ষিত হয়েছে। এবং তা হয়েছে শকাব্দে। শংকর—প্রতাপ—বিবেক—লক্ষী—প্রতাপ—হরিনারায়ণ ইত্যাদি। শকাব্দ—গণিত সময়কালে হরিনারায়ণ শেষ রাজা, সময়কাল ১৫২২ শকাব্দ বা ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ হরিনারায়ণ ছিলেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীর হাম্বিরের

সমসামায়িক। হরিনারায়ণের পর থেকে সুরু হয়েছে বঙ্গাব্দ। হরিনারায়ণের পুত্র লক্ষীনারায়ণের মৃত্যু ঘটেছিল ১১২০ বঙ্গাব্দে। তারপর থেকে উত্তর-পুরুষদের তালিকা যথাক্রমে লক্ষী—বিবেক—রঘুনাথ—গঙ্গানারায়ণ ও গোবিন্দ, হরিহর—রাধাকৃষ্ণ—ব্রজকিশোর—রামকানাই ও হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের সময়কাল ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ বা ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ। তালিকা দেখে মনে হয় বঙ্গাব্দের লক্ষীনারায়ণ বর্তমান বরাহভূম জমিদার বংশটির আদি পুরুষ ছিলেন।

ঘাটোয়ালী প্রথা প্রচলিত ছিল বরাহভূমে। ঘাটোয়ালী প্রথা মুণ্ডারী প্রথার অপর দিক। ঘাটোয়ালী প্রথার সর্বনিম্নে থাকেন তাবেদার বা প্রকৃত চাষী। তাদের ওপর যথাক্রমে গ্রাম সর্দার ও তরফ সর্দার। আঠারো শতকে বরাভুমের আয়তন ছিল ৬৩৫ বর্গ মাইল। বরাভূম ও মানবাজার ছিল পশ্চিমের জঙ্গল বা জঙ্গল মহলের অন্তর্গত। চাকলা মেদিনীপুরের মধ্যে। অধীনস্ত ছিল উড়িষ্যার। অবশ্য সে অধীনতা ছিল নামে মাত্র। ১৭৭৮ সালে জঙ্গল মহল বিভক্ত ছিল দুটি থানায়, বলরামপুর ও জৌনপুরে। বরাভূম আরও ৬টি থানাসহ অন্তর্ভুক্ত ছিল বলরামপুরের। বর্ধমানের কলেকটর মি. হিগিনসনকে মুচলেকা দিয়েছিলেন বরাভূমের জমিদার। মুচলেকাতে দেখা যায় বরাভূমের জমিদার ছিলেন কার্যত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

৫. মানবাজারের জমিদার বংশ—পুরুলিয়া সহর থেকে ২৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে মানবাজার। স্থানীয় জমিদার বা মানভূমের রাজাদের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। অধুনালুপ্ত মানভূম জেলার মানভূম নামটি রাজপরিবারের নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। রাজপুতানায় তাদের আদি বসবাস ছিল বলেও দাবী করে থাকেন। রাজপুতানা থেকে তাদের প্রথম বাসস্থান ছিল বর্ধমানে, পরে বাঁকুড়ায়। বিবাহসূত্রে অম্বিকানগর, খাতড়া, বিষ্ণুপুর ও ঝাড়গ্রামের জমিদার পরিবারগুলির সঙ্গে তারা সম্পর্কযুক্ত।

রাজবাড়িতে রক্ষিত হাতে লেখা বংশতালিকা অনুসারে মোহম্বাগড়ের বিখ্যাত রাজা পরিমল সিংহদেব ঠাকুর (রাজপুত) থেকে এই বংশের সূত্রপাত। চতুর্থপুরুষ অনন্তনারায়ণ সিংহদেব ঠাকুর বুধপুরে এসেছিলেন বলে কথিত হয়। অনন্তনারায়ণের পর দশম পুরুষ, পঞ্চম হরিনারায়ণ দেব মানবাজারে এসে বসবাস সুরু করেছিলেন। একথা যদি সঠিক বলে গ্রহণ করা যায়, তাহলে মানবাজারের জমিদারবংশটি আঠারো শতকে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ আঠারো শতকের শেষার্ধে লে. ফাগুসনের অভিযানের সময় মানভূমের জমিদার ছিলেন হরিনারায়ণ।

কুপল্যানড অনুমান করেছিলেন মানবাজারের জমিদার বংশটি ছিল হয় ভূমিজ অথবা বাউরি। গ্রন্থকারের অনুসন্ধানের ফলাফল ইংগিত করে তারা ছিলেন বাউরি। গোত্র চন্দ্রঋষি, কুল দেবতা দাউজী বা রেবতী-বলরাম। কুলদেবী রঙ্কিনী।

জমিদারীটি আয়তনে ছিল বেশ বড়। ৪০৮ বর্গমাইল বা ৭,৮৫,১৯২ বিঘা। তালুকের সংখ্যা ছিল ১১৭টি। দিঘওয়ার ছিলেন ২ জন, গ্রাম সর্দার ১১৪, তাবেদার ৩২১।

হরিনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশধ্বজ বালকবয়সের মারা গিয়েছিলেন। অপর পুত্র ভুবনধ্বজের সঙ্গে মুকুন্দনারায়ণ ও মুকুন্দের ভাই ত্রিপুরাচরণের সুদীর্ঘ মামলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইস্ট্ ইনডিয়া কোম্পানির সহায়তা লাভ করেছিলেন মুকুন্দনারায়ণ এবং পরবর্তীকালে তিনিই জমিদার হয়েছিলেন। মুকুন্দনারায়ণ ছিলেন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহদেবের সমসাময়িক। মুকুন্দনারায়ণই পাথর মহড়াতে নতুন আবাস ও গড়বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন।

মুকুন্দনারায়ণের পর জমিদার হয়েছিলেন কিশোরীপ্রসাদ। কিশোরীপ্রসাদের পর রাধাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দের পর তার স্ত্রী কালীকুমারী দীর্ঘদিন জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশুনা করেছিলেন। পরে জমিদার হয়েছিলেন ভবতারণ। ভবতারণের পর জমিদারীর অধিকারী হয়েছিলেন ভক্তনারায়ণ। ভক্তনারায়ণের পুত্র দেবাশীষ নারায়ণ দেব বর্তমানে জমিদার।

৬. গড় জয়পুরের জমিদার বংশ—২৪ সেপটেমবর ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে গড় জয়পুরের রাজা ভিক্ষাম্বর সিংদেও যে উইল করেছিলেন তাতে দেখা যায়, ভিক্ষাম্বরের বাবার নাম ছিল রাজা কাশীনাথ সিংদেও। কখন জমিদার বংশটির উদ্ভব ঘটেছিল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ১৮৭২ সালে জয়পুর জমিদারীর এলাকা ছিল ৮২.৮৮ বর্গমাইল। ভিক্ষাম্বর ছিলেন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহদেবের সমসাময়িক। জন্ম আনুমানিক ১৮৩৮ সালে, বেঁচে ছিলেন দীর্ঘকাল। আশি বছরের ওপর। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিলেন। ভিক্ষাম্বরের ছিল তিন স্ত্রী, রুক্মিনী, শ্রীমতী ও চন্দ্রাবলী দেবী। রুক্মিণী দেবীর সন্তান ছিল না। শ্রীমতী দেবীর ছিল দুই মেয়ে ও এক ছেলে, টিকাইত রাধিকাপ্রসাদ সিংদেও। তিনি অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। চন্দ্রাবলী দেবীর প্রথম দিকে একটি পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্র টিকাইত হরিনন্দন সিংদেও জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। কিন্তু তিনিও মারা গিয়েছিলেন অল্প বয়সে। কন্যার নাম ছিল

রজককুমারী। বিয়ে করা স্ত্রীর পুত্র নাহলেও আর একটি ছেলে ছিল ভিক্ষাম্বরের, নাম রঘুনন্দন। তিনি ছিলেন হরিনন্দনেরই সমসাময়িক। জমিদারীটি পরবর্তীকালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনস্ত হয়েছিল এবং সর্বসান্ত হয়েছিল গৃহবিবাদে।

৭. বাগমুণ্ডির জমিদার বংশ—বাগমুণ্ডি পরগণাটি আয়তনে ছিল বড়। ১৫৪·৬৬ বর্গ মাইল। জনশ্রুতি অনুসারে জগৎ সিংহ নামে জনৈক কোল সর্দার আঠারো শতকের প্রথম দিকে জমিদারীটি দখল করে নেন। মি. ডালটনের কাছে জমিদারেরা জানিয়েছিলেন তারা কোল বা মুণ্ডা উপজাতি থেকে উদ্ভূত। জমিদারীর ভোগস্বত্ব পাঁচটি গ্রুপে (গ্রামের) বিভক্ত ছিল। প্রথম গ্রুপটি থাকত জমিদারদের খাস দখলে, বাকি চারটি থাকত মানকিদের অধীনে। এখানে মুণ্ডারী ভূমি ব্যবস্থা চালু ছিল। সে প্রথার সর্বনিম্নে ভুঁইহার, তার ওপরে ক্রমপর্যায়ে থাকত মুণ্ডা, মানকি ও পাড়া। ঘাটোয়ালী প্রথার তরফ ও মুণ্ডারী প্রথার পাড়া ছিল মর্যাদার দিক থেকে প্রায় সমান্তরাল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই বাগমুণ্ডি এলাকা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ইসট ইনডিয়া কোমপানি বাজেয়াপ্ত করেছিল জমিদারী। পরবর্তীকালে একাংশ জামিদারকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল (১৭৯৯ খৃী)। তখন জমিদার ছিলেন আনন্দ সিংহ। বাগমুণ্ডির জমিদার মদনমোহন সিংহদেব ছিলেন ছো-নাচ ও ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষক। তিনি সংস্কৃতির এই দুটি ধারাকেই পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার পুত্রের নাম ছিল ক্ষেত্রমোহন সিংহদেব।

৮. মাঠারঠাকুর বংশ—মাঠা ছিল বাগমুণ্ডি জমিদারীর অন্তর্গত। আয়তনে ছিল ১৭·৮২ বর্গ মাইল। বাগমুণ্ডির জমিদার আনন্দ সিংহ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে বাগমুণ্ডি জমিদারী কোমপানি বাজেয়াপ্ত করেছিল। পরে যখন প্রত্যার্পিত হয়েছিল (১৭৯৯) মাঠা তালুকটি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। সরকারি নথি অনুসারে মাঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বয়ার সিংহ। মাঠার ঠাকুরেরা বয়ার সিংহের বংশধর। বয়ার ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ভয়ংকর, এমনকি সরকারের কাছেও। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য যে দারোগা প্রেরিত হয়েছিলেন তিনিও বয়ার সিংহের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

বয়ার সিংহের পুত্র পবন সিংহ ছিলেন মাঠার স্বীকৃত জমিদার। ১৮৬০ সালে ডালটন যে বন্দোবস্ত করেছিলেন তাতে মাঠা তালুকটি বাগমুণ্ডির অন্তর্গত পৃথক জমিদারী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

৯. কইলাপাল জমিদারী—পশ্চিমে বরাভূম ও মানভূম, পূর্বে

শিলদা ও শ্যামসুন্দরপুরের মধ্যে ছোট জমিদারী ছিল কইলাপাল। আয়তনে ২৬·১১ বর্গ মাইল। তালুক ৯টি, সর্দার ৯ জন ও তাবেদার ১৩ জন। ১৭৮৪ সালে কইলাপালের জমিদার ছিলেন সুবল সিং। কোমপানির বিরুদ্ধে তিনিও ছিলেন বিদ্রোহীদের একজন। কোমপানি তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহের সময় কইলাপালের জমিদার ছিলেন বাহাদুর সিংহ। তার দুই ভাই গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। জঙ্গলমহলের কালেকটর মি. হ্যারিংটন দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে হাজির করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে নির্দেশ পালন করেছিলেন বাহাদুর সিং। খুশি হয়ে হ্যারিংটন কইলাপাল জমিদারী নিষ্কর বলে ঘোষণা করেছিলেন।

১০. সতেরখানির তরফদার বংশ—মাঠা যেমন ছিল বাগমুণ্ডি জমিদারীর অন্তর্গত, সতেরখানি তরফ তেমনি ছিল বরাভূম জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। উনিশ শতকের প্রথম দিকে সতেরখানির সর্দার, লাল সিং ছিলেন জঙ্গল এলাকায় সবচেয়ে পরাক্রান্ত। পিতা ত্রিভন সিংহের মৃত্যুর পর তার জন্ম হয়েছিল। নিজের শক্তি, সাহস ও বুদ্ধিবলে তিনি পৈতৃক তরফে সর্দার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নিজের তরফের বাইরে, কাছাকাছি প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকে আদায় করতেন কর। তাকে বলা হত 'সুখনিদি' বা নিশ্চিন্তে নিদ্রাযাবার মাশুল।

সতেরখানি তরফে লালসিংহের পূর্ব পুরুষদের আধিপত্য সুরু হয়েছিল কয়েক পুরুষ আগে। প্রথম পুরুষ ছিলেন খাঁড়েপাথর। খাঁড়ে পাথর থেকে পুরুষানুক্রমে, খাঁড়ে পাথর—যুঝার সিংহ—হেমৎ—ত্রিভন। লালসিংহের পর তার পুত্র পঞ্চানন সিংহ হয়েছিলেন তরফ সর্দার। পঞ্চাননের পর, তৎপুত ভরত সিংহ ভুঞা। ভরত সিংহের পুত্র ছিল না। সর্দারী বর্তেছিল তার কন্যা চিন্তামণি দেবীর ওপর। বেগুনকোদর জমিদার বংশের কুমার দিগম্বর সিংহের সঙ্গে চিন্তামণি দেবীর বিয়ে হয়েছিল।

১১. গদী বেড়োর মোহান্ত বংশ—জনশ্রুতি অনুসারে রঙ্গরাজ গোস্বামী পঞ্চকোটের রাজা বলভদ্র শেখরকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কারও মতে রঙ্গরাজ পঞ্চকোটে এসছিলেন ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে। কারও মতে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে। দ্বিতীয় অভিমতটিই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। কোর্টে প্রদত্ত রাজা নীলমণি সিংহের বিবরণ থেকে দেখা যায় তার পিতা দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে রামমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এবং কেশব রায় জীউয়ের সেবা পূজার জন্য ৮৪॥ টি মৌজা মোহান্তকে দান করেছিলেন। যদি সে

ব্রাহ্মণের নাম রঙ্গরাজ হয়, তা হলে দেখা যায় রঙ্গরাজের পর মোহান্ত হয়েছিলেন পর পর তিনজন নারী। যথাক্রমে আরচম্মা—বেংকম্মা—লক্ষীপ্রিয়া ও কাদোবিবি বা কদুবিবি। কদু বিবির পুত্রের নাম ছিল শ্রীনিবাসাচার্য। শ্রীনিবাসের পুত্র লক্ষণাচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন রাজা নীলমণি সিংহদেব। লক্ষণাচার্যের সন্তান ছিল না। ফলে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। দত্তকের নাম ছিল বিজয় লক্ষণাচার্য। বিজয় লক্ষণাচার্য রাজা হরিনারায়ণকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বিজয় লক্ষণ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে লক্ষণাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালাচার্য হয়েছিলেন মোহান্ত। গোপালাচার্যের পুত্র রামচন্দ্রাচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহদেও। রামচন্দ্রের ছিল তিন পুত্র, রাজগোপাল, জগন্নাথ ও সত্যগোপাল। রামচন্দ্রের পর বেড়োর মোহান্ত হয়েছিলেন যথাক্রমে রাজগোপাল ও জগন্নাথ। রাজা কল্যাণীপ্রসাদ সিংহদেও দীক্ষা নিয়েছিলেন রাজগোপালের কাছ থেকে।

পুরুলিয়া জেলায় বেড়ো গ্রামটি দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি অনুসরণ করে চলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও অগ্রসর।

যে সব মেলা ও উৎসবে পাঁচ হাজার বা ততোধিক মানুষ জমায়েত হন।

স্থান (থানা)	সময়	উপলক্ষ্য	কতদিন চলে	জনসমাবেশ
১. উলুগোড়িয়া (আড়ষা)	আশ্বিন	দুর্গাপূজো	—	৮ হাজার
২. উলুগোড়িয়া (আড়ষা)	কার্তিক	কালীপূজো	—	৬ হাজার
৩. উলুগোড়িয়া (আড়ষা)	চৈত্র	চড়কপূজো	—	৮ হাজার
৪. দেউলঘাটা (আড়ষা)	পৌষ	পৌষপার্বন	১ দিন	৩০-৪০ হাজার
৫. দেউলঘাটা (আড়ষা)	চৈত্র	বারুণীস্নান	১ দিন	২৫-৩০ হাজার
৬. দেউলিহারুপ (বাগমুণ্ডি)	জ্যৈষ্ঠ	শিবপূজো (এড়ুনাথ, নাংটি ঠাকুরানী)	১ দিন	৪০ হাজার
৭. দর্দা (বলরামপুর)	চৈত্র	শিবপূজো	১ দিন	৩০ হাজার
৮. মালটি (বলরামপুর)	মাঘ	ভানসিং পূজো	১ দিন	৫ হাজার
৯. ছোট উরমা (বলরামপুর)	আশ্বিন	দুর্গাপূজো	৩ দিন	১০ হাজার
১০. বরাবাজার (বরাবাজার)	ভাদ্র	ইঁদপূজো	১ দিন	১০ হাজার
১১. বরদহ (বরাবাজার)	ফাল্গুন	শিব চতুর্দশী	৩ দিন	১২ হাজার
১২. চিল্লা (বান্দোয়ান)	মাঘ	খেলাইচণ্ডী পূজো	১ দিন	১৫ হাজার
১৩. চিল্লা (বান্দোয়ান)	পৌষ	টুসুপূজো	৩ দিন	২০ হাজার
১৪. করালীকোল (বান্দোয়ান)	কার্তিক	কালীপূজো	৩ দিন	৫ হাজার
১৫. বান্দোয়ান (বান্দোয়ান)	আষাঢ়	রথযাত্রা	১ দিন	১৫ হাজার
১৬. বান্দোয়ান (বান্দোয়ান)	চৈত্র	শিব-গাজন	৩ দিন	৫ হাজার
১৭. বান্দোয়ান (বান্দোয়ান)	পৌষ	টুসুপূজো	৩ দিন	১৫ হাজার
১৮ কেন্দাপাড়া (বান্দোয়ান)	চৈত্র	শিব গাজন	৩ দিন	৭ হাজার

স্থান (থানা)	সময়	উপলক্ষ্য	কতদিন চলে	জনসমাবেশ
১৯. কেন্দাপাড়া (বান্দোয়ান)	পৌষ	টুসুপূজা	৩ দিন	১২ হাজার
২০. কুঁচিডো (বান্দোয়ান)	পৌষ	টুসুপূজা	৩দিন	১২ হাজার
২১. কইলাপাল (বান্দোয়ান)	চৈত্র	শিব গাজন	৩ দিন	৫ হাজার
২২. কইলাপাল (বান্দোয়ান)	পৌষ	টুসুপূজা	৩ দিন	১২ হাজার
২৩. বড়গ্রাম (হুড়া)	পৌষ	শীলবাতী-মাতা পূজা	৭ দিন	৮ হাজার
২৪. তুলিন (ঝালদা)	পৌষ	মকরসংক্রান্তি	১ দিন	১ লক্ষ
২৫. তুলিন (ঝালদা)	চৈত্র	শিবপূজা	১ দিন	১০ হাজার
২৬. জারগো (ঝালদা)	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	১ দিন	৭ হাজার
২৭. জারগো (ঝালদা)	চৈত্র	শিবপূজা	১ দিন	৮ হাজার
২৮. জারগো (ঝালদা)	মাঘ	শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ উৎসব	৩ দিন	১৫ হাজার
২৯. নয়াদিয়ালিয়াস কোরাডি, সতীঘাট, (ঝালদা)	ফাল্গুন	হরিনাম সংকীর্তন	৩-৫ দিন	২০ হাজার
৩০. বেগুনকোদর (ঝালদা)	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩ দিন	১২ হাজার
৩১. পাট-ঝালদা (ঝালদা)	মাঘ	সত্যমেলা	৩ দিন	৬ হাজার
৩২. বড়রা (কাশীপুর)	চৈত্র	শিব-গাজন	৭ দিন	১৫ হাজার
৩৩. কালাপাথর (কাশীপুর)	মাঘ-ফাল্গুন	মাঘীপূর্ণিমা	৪ দিন	১০ হাজার
৩৪. সোনাথল (কাশীপুর)	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৪ দিন	২৫ হাজার
৩৫. কোশজুড়ি (কাশীপুর)	চৈত্র	শিবপূজা	৩ দিন	৮ হাজার
৩৬. আদ্রা (কাশীপুর)	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩ দিন	১০ হাজার
৩৭. বুধপুর (মানবাজার)	চৈত্র	চড়ক	২ দিন	১০ হাজার
৩৮. জাগদা (মানবাজার)	চৈত্র	চৈত্রমেলা	২ দিন	৫ হাজার
৩৯. জনার্দনডি (নেতুরিয়া)	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩ দিন	১৫ হাজার
৪০. পঞ্চকোট (নেতুরিয়া)	চৈত্র	ধর্মপূজা	১ দিন	৬ হাজার
৪১. শালতোড় (নেতুরিয়া)	চৈত্র	পীরের উরস	১৫ দিন	১০ হাজার
৪২. মদনডি (নেতুরিয়া)	ফাল্গুন	হরিনাম সংকীর্তন	৪ দিন	৬ হাজার
৪৩. পাড়া (পাড়া)	বৈশাখ	ধর্মপূজা	৩ দিন	৩০ হাজার

স্থান (থানা)	সময়	উপলক্ষ্য	কতদিন চলে	জনসমাবেশ
৪৪. চাকোলতোড় (পুরুলিয়া মফঃ)	ভাদ্র	ছাতা পরব	১ দিন	৪০ হাজার
৪৫. আনাই (পুরু মফঃ)	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	২ দিন	১০ হাজার
৪৬. ঘাঘরজুড়ি (পুরু মফঃ)	আশ্বিন	দুর্গাপুজো	৩ দিন	১০ হাজার
৪৭. ঘাঘরজুড়ি (পুরু মফঃ)	চৈত্র	শিবগাজন	১ দিন	১০ হাজার
৪৮. ঘাঘরজুড়ি (পুরু মফঃ)	কার্তিক	কালীপুজো	১ দিন	১০ হাজার
৪৯. বেড়ো (রঘুনাথপুর)	মাঘ	খেলাইচণ্ডী	৩ দিন	১২ হাজার
৫০. মৌতোড় (রঘুনাথপুর)	কার্তিক	রাসযাত্রা	৪ দিন	১০ হাজার
৫১. মৌতোড় (রঘুনাথপুর)	কার্তিক	কালীপুজো	৩ দিন	১২ হাজার
৫২. শাঁকা (রঘুনাথপুর)	পৌষ	পৌষপার্বণ	৬ দিন	৫ হাজার
৫৩. শাঁকা (রঘুনাথপুর)	পৌষ	পৌষপার্বন	৬ দিন	৫ হাজার
৫৪. শাঁকা (রঘুনাথপুর)	মাঘ	সরস্বতী পুজো	৬ দিন	৬ হাজার
৫৫. জুরাড়ি (রঘুনাথপুর)	আশ্বিন	দুর্গাপুজো	৪ দিন	৫ হাজার
৫৬. জুরাড়ি (রঘুনাথপুর)	কার্তিক	বাঁধনা	১ দিন	৫ হাজার
৫৭. দণ্ডহিত (সাঁতুড়ি)	মাঘ-ফাল্গুন	বরশাল-চণ্ডী	৪ দিন	৫ হাজার
৫৮. অযোধ্যা (বাগমুণ্ডি)	বৈশাখ	দিসুম সেন্দ্রা বা দেশ শিকার উৎসব	১ দিন	২০ হাজার

গ্রন্থপঞ্জী ও প্রকাশিত, অপ্রকাশিত উৎস

বাংলা ও সংস্কৃত বই

১. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন—১, মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য, ১৯৭৯।

২. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন—২, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, ১৯৮২।

৩. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু।

৪. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ৪র্থ খণ্ড।

৫. পঞ্চকোট ইতিহাস—রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী।

৬. লাল সিংহ—হরিনাথ ঘোষ।

৭. পুরুলিয়া পরিচিতি—সুফল মণ্ডল।

৮. লোকায়ত ঝাড়খণ্ড—ড. বিনয় মাহাত।

৯. কুর্মালী ভাষা – ক্ষুদিরাম মাহাত।

১০. সাদরীর রূপরেখা—পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য।

১১. বাংলার লোক সাহিত্য – ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

১২. সীমান্তবঙ্গের লোকসাহিত্য—সুভাষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

১৩. বিষ্ণুপুর—রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

১৪. বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়—সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫. আত্মবোধ—জগদ্রাম রায়।

১৬. চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ—সত্যকিংকর সাহানা বিদ্যাবিনোদ।

১৭. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়।

১৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ—সুকুমার সেন।

১৯. বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ—সুকুমার সেন।

২০. মধুসূদন গ্রন্থাবলী।

২১. শ্লোকার্থবোধিকা—বঙ্গানুবাদ, রামসুন্দর বিদ্যালংকার, ১৭৯২ শকাব্দ।

২২. মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
২৩. ভবিষ্য পুরাণ।
২৪. কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর।
২৫. রঘুবংশ—কালিদাস।
২৬. বৃহৎ কথাকোষ—হরিসেন।
২৭. রামচরিতম সন্ধ্যাকর নন্দী।
২৮. রাজতরঙ্গিনী—কলহন।
২৯. ভাগবতী সুত্ত—আগমোদ্যোগ সমিতি (১৯১৮—২১)।
৩০. দানসাগর—বল্লাল সেন।
৩১. লঘু বৈষ্ণবতোষণী—জীব গোস্বামী (১৪৭৬ শ্রী)।
৩২. ভক্তি রত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী (চৈতন্যাব্দ ৪০২)।
৩৩. মহারাষ্ট্র পুরাণ—গঙ্গারাম (১৭৫০)।
৩৪. আমার জীবন—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, ১-৪ খণ্ড!

পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকা

১. নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের জীবনকথা—অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, ২য় সং, ১৯৪০।
২. নিস্তারিনী কলেজ পত্রিকা।
৩. মানভূমের কথা।
৪. পশ্চিমবঙ্গ মফঃস্বল সংবাদপত্র সম্পাদক ও সাংবাদিক সমিতির রাজ্য-সম্মেলন, পুরুলিয়া ১৯৭৯, স্মারকগ্রন্থ।
৫. অগ্রগতির পথে পুরুলিয়া,১৯৭৩।
৬. পুরুলিয়া জেলা সাহিত্য মেলা স্মারক গ্রন্থ, ১৩৮১।
৭. মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি, একাদশ বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন, রঘুনাথপুর, স্মরণিকা, ১৯৮২।
৮. লোকসেবক সংঘের সীমা কমিশন ইস্তাহার—বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৯৫৪।
৯ প্রদেশ বণ্টন ও ভাষা বিষয়ে জেলায় উত্থাপিত ভ্রান্তি সমূহে জেলাবাসীর কর্তব্য (বুলেটিন)—অতুলচন্দ্র ঘোষ।
১০. পুরুলিয়া সমস্যা, বুলেটিন (১)—শ্যামাপদ তেওয়ারী।
১১. সংগঠন, অসীমানন্দ সংখ্যা।

১২. মানভূম সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন, প্রথম অধিবেশন, ১৩৭৯, স্মরণিকা।
১৩. পুরুলিয়া মিউজিকাল ইনসটিটিউট, শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, ১৮৮৫-১৯৮৫।
১৪. পুরুলিয়া পৌরসভা, শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ।

লিখিত বিবরণ

১. পুরুলিয়া জেলায় আধুনিক শিক্ষা—অশোক চৌধুরী, পুরুলিয়া।
২. মানভূম ও পুরুলিয়া জেলায় নাট্যান্দোলন—সন্তোষ রায়, পুরুলিয়া।
৩. গড় জয়পুরে নাট্যান্দোলন—নির্মল কুমার গোস্বামী, গড় জয়পুর।
৪. সাঁওতালি সাহিত্য ও নাট্যান্দোলন—গোমস্তাপ্রসাদ সরেণ, বান্দোয়ান।
৫. পুরুলিয়া জেলায় লাক্ষা ও আগরশিল্প—সুশিত বিশ্বাস, ঝালদা।
৬. আদ্রায় খ্রীষ্টান সমাজ—জ্যোতি রাণা, আদ্রা।
৭. পুরুলিয়ায় সাঁওতাল সমাজ—বিশাখা মাঝি, আদ্রা।
৮. মানবাজার রাজবংশের বিবরণ—দেবাশীষ নারায়ণ দেব, মানবাজার।
৯. মানা বাউরিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—অম্বুজ সিং সর্দার, টুশামা।

সাক্ষাৎকার

১. শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ (৭৬), আগস্ট ১৯৮১, শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া।
২. অরুণচন্দ্র ঘোষ, আগস্ট, ১৯৮১, শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া।
৩. অশোক চৌধুরী (স্বর্গত), ২৪.৮.৮১, পুরুলিয়া।
৪. ধীর রাঘব আচারিয়া, ২৪.৮ ৮১, পুরুলিয়া।
৫. সন্তোষ রায় (৭২) এপ্রিল ১৯৮২, পুরুলিয়া।
৬. ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (৭৮), (স্বর্গত), জুলাই ১৯৮২।
৭. প্রবীর মল্লিক, ২১.৭ ৮২, পুরুলিয়া।
৮. অমূল্য কর্মকার, ১৭.৪.৮২, পুরুলিয়া। ৯. শশাঙ্কশেখর চৌধুরী, ২৩.৮.৮১, রঘুনাথপুর। ১০. অম্বুজ সিং সর্দার, ১৪. ৪. ১৯৮২, টুশামা ১১. শিবপ্রসাদ কোরিয়া (৬২) জুলাই ১৯৮২, পুরুলিয়া।
১২. কমলকৃষ্ণ কবিরাজ, জুলাই ১৯৮২, গড় জয়পুর। ১৩. ডা. বি. আর চ্যাটার্জী, ২০.১১.৮২, ঝালদা। ১৪. বরজু মাহাত (৮০), ঠাকুর সীমা, নভেম্বর ১৯৮২। ১৫. সুনীতিকুমার পাঠক (৬২), দেউলঘাটা, আগস্ট ১৯৮২। ১৬. গৌরহরি রায় (৪০), নারায়ণপুর, নেতুরিয়া, ২.১০.১৯৮২। ১৭. রামচন্দ্র রায় (৭২), নারায়ণপুর, ২.১০.১৯৮২।

১৮. আনন্দমোহণ সিংহদেব (৭৭) হাকিমসাহেব, বরাবাজার, এপরিল ১৯৮২। ১৯. সনাতন মাঝি (৩২), বহড়াঘটু, বান্দোয়ান, এপরিল ১৯৮২। ২০. বিরিঞ্চিমোহন দে (৪৮), বাগমুণ্ডি, ১৬. ১০. ৮২। ২১. অধ্যাপক সুবোধ বসু রায় (৫৬), পুরুলিয়া, জুলাই ১৯৮২। ২২. সুদেবকুমার মাজি (৪৯), ১৩.১০.৮১, গোবিন্দপুর। ২৩. মহাদেব মাজি (৫৬), ১৩.১০.৮১, গোবিন্দপুর। ২৪. রামচন্দ্র আচারিয়া গোস্বামী (৬৩), ১২.১০.৮১, গদীবেড়ো। ২৫. শিবনারায়ণ সিংহ দেও, (৭৯) ২২. ৮.৮১, কাশীপুর রাজবাড়ি। ২৬. সত্যনারায়ণ সিংহ দেও (৫৫), ২২. ৮. ৮১, কাশীপুর রাজবাড়ি। ২৭. সন্তোষকুমার মাহাত (৭৫), ১৪.২.৮৩, হুড়া। ২৮. তারিণীপদ মাহাত (৫২), ১৪.২.৮৩, হুড়া। ২৯. ড. ডি. সি. সরকার (স্বর্গত), ২৯ ৮.৮২, কলকাতা।

ইংরেজি বই ও পত্রপত্রিকা

1. Bihar and Orissa in 1921—G. E. Owen, 1921.
2. History of Bihar—Sree Gobind Misra, Delhi, 1970.
3. Freedom Movement in Bihar, vol-II, K. K. Dutta, 1957.
4. The Comprehensive History of Bihar by K. P. Jaiswal Institute, vol-I, Part I & II.
5. The Antiquarian Remains in Bihar-Dr. D. R. Patil.
6. Patna Museum, Catalogue of Antiquities—P. Gupta, 1965.
7. History of Orissa—R. D. Banerjee, vol I & II.
8. Feudatory States of Orissa—L. E. B. Cobden Ramsay. 1910.
9. Jungle Life in India etc—V. Ball, London. 1880.
10. Excavations in Mayurbhanj—Dr. N. K. Bose & D. Sen 1948.
11. Studies in the Geography of Ancient and Medieval India—Dr. D.C. Sircar, 1960.
12. Contributions to the Geography and History of Bengal—H. Blochmann.
13. Contributions to the History of the Hindu Revenue System—U. N. Ghosal, 1929.
14. New History of Maratha—G. S. Sardesai, vol-II
15. Later Mughals—William Irvine, vol I & II, Calcutta 1922.
16. Indian Tracts—Major James Browne, 1788.
17. Bengal under the Lieutenant Governors—C. E. Buckland,

vol-I & II.
18. Autobiography—Dr. Rajendra Prasad.
19. The Dust Storm and Hanging Mist—Dr. Suresh Singh, 1966.
20. Golden Bough—J. G. Frajer.
21. Ancient Art and Ritual—J. Harrison.
22. Sacred Book of the East, vol-22.
23. Indian Epigraphical Glossary—Dr. D. C. Sircar, 1966,
24. Tabaquat-I—Nāsiri.
25. Akbarnama, vol-III. tr. by H. Beveridge.
26. Baharisthan-i-Ghaibi -by Shitab khan (Mirza Nathan) Eng. tr. by Dr. Borah, 1936.
27. Padishanama.
28. Siyar-ul-Mutakherin—Ghulam Hussain, vol-III.
29. Ain-I-Akbari, vol—I,
30. Descriptive Ethnology of Bengal—E. T. Dalton, 1872.
31. Tribes and Castes of Bengal, vol—I & II—H. H. Risley, 1891.
32. Chhau Dance of Purulia—Dr. Asutosh Bhattacharya.
33. Late Medieval Temples of Bengal—David Mc Cutchion.
34. Monographs on Fundamental Education, UNESCO, 1951.
35. Bengal District Gazetteers, 24 Parganas.
36. Prehistory and Proto-history of Eastern India—Dr. A. H. Dani.
37. Memorandum Before States Reorganisation Commission by Govt. of West Bengal,
38. Supplementary to the Memorandum Before State Reorganistion Commission by Govt. of West Bengal.
39. Report of States Reorganisation Commission, 1955.
40. Report of Linguistic Provinces Commission, 1948.
41. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918.
42. Report of the State Directorate of Mines and Geology, West Bengal.
43. Report on Census of Bengal—H. Beverly, 1872.
44. Census of India 1971, West Bengal, Series 22. Part II A.
45. Census of India, West Bengal, Provisional Population Totals, Paper I of 1983.
46. Census of India, 1901, vol-VI—E. A Gait, 1902.

47. The Linguistic Survey of India, Report vol—V, Part I & II —G. A. Grierson.
48. Specimen Translations in Various Indian Languages—G. A. Grierson.
49. Speech of Jawaharlal Nehru, Prime-Minister of India, 27 Nov 1947.
50. Report of Mr. Dent, 1833.
51. Circular of District Inspector of Schools, Manbhum 1948.
52. Report of a Tour Through the Bengal Provinces etc—J. D. Beglar, 1878.
53. Fifth Report from the Select Commitee of the House of Commons etc, ed by W. K. Firninger vol-II, 1917.
54. Selections from Unpublished Records from the Govt—Rev. J. Long.
55. Bengal District Records, Midnapur vol—I & II.
56. Mr. Higginson's Report—1771.
57. Notes on Burrabhum—Henry Strachey, 1800.
58. Weekly Report of the Bihar Provincial Congress Committee and young India, May 1930.
59. Manbhum Police Reports.
60. Ethnic Groups, Villages and Towns of Pargana Burrabhum by Dr. S. Sinha, and others 1964.
61. Reports on Purulia or Manbhum (etc)—H. Ricketts, 1855.
62. Acts and Rules : (a) Chotanagpur Tenures Act, 1869. (b) Indian Forest Act 1878 (c) Defence of India Rules 1942 (Amended), (d) Regulation XVIII of 1805. (e) Regulation XIII of 1833 (f) Act XX of 1854.
63. Annual Plan of Action, 1980-81, Purulia District—District Agril officer, Purulia (Monograph).
64. Purulia, People, Problems and Potentialities—N. Chatterjee IFS, 1962 (Monograph)
65. Report of the Fact Finding Survey on Purulia District —United Bank of India, 1971.
66. Industrial Horizon, Purulia, 1980 (Monograph)—District Industries Centres.
67. Plan and Progress in Purulia District, 1966-67

(Monograph)—D. C. Purulia.

68. Purulia Project Report—Submitted by Purulia Dev. Board to Dr. B. C. Roy, 1961.
69. Lac Cultivation in India—P. M. Glover, 1937.
70. Glimpses of the History of Manbhum—Subhas Chandra Mukhopadhyay, Cal 1983.
71. A Few Traditional Cottage and Small Industries of Purulia—A. N. Mukherjee
72. Handloom Census, 1982-83 (Monograph)—Directorate of Handloom & Textiles, Govt. of West Bengal, 1983.
73. Short term Development Schemes and Preliminary Project Report on Purulia Town—CMPO, 1976.
74. A Development Plan for Purulia District—CMPO, 1974.
75. Bengal District Gazetteers, Manbhum—H. Coupland, 1911.
76. A Statistical Account of Bengal, Vol—XVII—W. W. Hunter.
77. District Census Hand Book, 1961—B. Roy.
78. West Bengal District Gazetteers, Purulia, 1985.

নির্দেশিকা